মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

~~Rizon~~

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪১৫

সর্বনাশের দূত

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

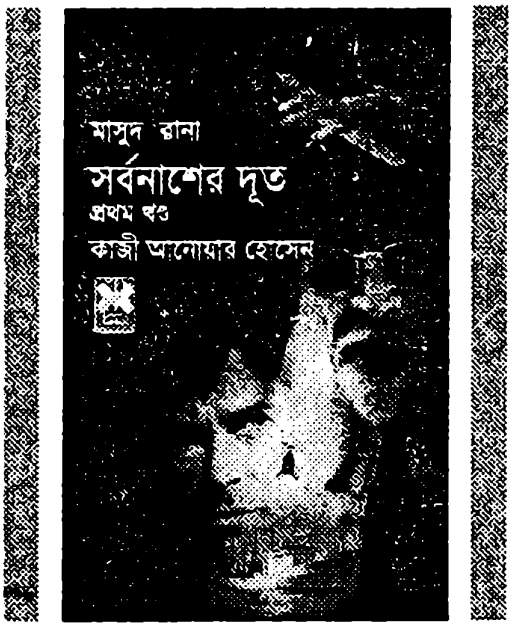

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7415-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-415
SHARBANASHER DOOT
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

নব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট* সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শাস্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ *অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ *শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস *জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ *গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে *শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু *মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা *মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ *বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী *স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব *ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু *আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা *দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান*জলরাক্ষস *মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট *অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা *চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার *আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত।

এক

দিগন্তে ঝুলছে হালকা কুয়াশা মোড়া মস্ত পূর্ণিমার চাঁদ। রুপালি আলোয় টলমল করছে তীব্র শীতল, নিথর সাগর। শীত মৌসুম প্রকৃতিকে এখনও বসন্তের হাতে তুলে দেয়নি। এ বছর সূর্য ওঠেনি এখনও। তবে দূর দিগন্ত বরাবর, যেখানে আকাশ মিশেছে সাগরে, ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে সেখানে সরু একটা সাদা রেখার আভাস। ওটা বলছে: দিন বদলের পালা এই এল বলে। মাসখানেকের মধ্যেই উঁকি দেবে সূয্যি-মামা। সেই যে উঠবে, বিদায় নেবে এক্কেবারে সেই হেমন্তের শেষে। আর্কটিক দিনরাত্রির সাইকেল কোটি কোটি বছর ধরে চলছে এভাবেই।

এটা নরওয়ের ব্যারেন্টস্ সি। প্রায় সত্তর বছর আগের দৃশ্য। তারিখ: উনিশ শ' বেয়াল্লিশ সালের ২২ এপ্রিল।

উত্তর গোলার্ধের এতটা উপর দিকের সাগর বছরের বেশির ভাগ সময়ই জমে বরফ হয়ে গিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুপযোগী থাকার কথা। কিন্তু ব্যারেন্টস্ সির ব্যাপারটা আলাদা। গালফ স্ট্রিমের সঙ্গে ট্রপিকের উষ্ণ স্রোত মিশে উঠে আসছে উপরে। এই জোরাল প্রবাহের কারণেই উত্তর নরওয়ে ও স্কটল্যাণ্ডে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে মানুষের পক্ষে। ঘোর শীতের ভিতরও নাব্য থাকে ব্যারেন্টস সাগর, তাই এ পথে আমেরিকা থেকে আসতে পারছে লক্ষ লক্ষ টন মারণাস্ত্র, পৌঁচচ্ছে যুদ্ধরত সোভিয়েত ইউনিয়নে।

এ ধরনের বেশ কিছু সমুদ্র প্যাসেজ, যেমন ইংলিশ চ্যানেল বা জিব্রাল্টার স্ট্রেইট, হয়ে উঠেছে ভয়ানক বিপজ্জনক। ওঁৎ পাতছে এখানে জার্মান ক্রিয়েক্সমেরিন, বিশেষ করে দ্রুতগতি টর্পেডো বোট শ্নেলবুটসগুলো ঝামেলা করছে বেশি। সেই সঙ্গে ইউবোটের সুপরিকল্পিত অতর্কিত হামলা তো রয়েছেই।

ঠিক যেন দাবার ছক, নির্ভুল চাল দিচ্ছে কোনও দক্ষ দাবাড়ু গ্র্যাণ্ডমাস্টার। তুমুল দাপটে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মান সেনাপতিরা নিজেদের আওতার ভিতর রাখতে চাইছে মহাসমুদ্র। খুঁটিনাটি প্রতিটি সামরিক তথ্য সংগ্রহ করছে তারা, পরীক্ষা করছে বোর্ডে সাজিয়ে। যুদ্ধে জিততে হলে প্রয়োজন প্রবল শক্তি, সেই সঙ্গে দ্রুতগতির সিদ্ধান্ত। জার্মান নেভি নজর দিয়েছে মিত্রপক্ষীয় জাহাজের গতিপথের উপর। উত্তর আটলাণ্টিক সাগরে কখন কোন্ জাহাজে হামলা করবে ইউবোট, জানে না মিত্রশক্তি।

নরওয়ে ও ডেনমার্কের বেস থেকে আকাশে উঠছে জার্মান এয়ারক্রাফট, চোখ রাখছে সাগরে। বাণিজ্য জাহাজ দেখলে দেরি না করে জানিয়ে দিচ্ছে ফ্লিটের হেডকোয়ার্টারে। ইউবোটগুলো ফাঁদ পাতছে, আক্রমণ চলছে জাহাজগুলোর উপর। যুদ্ধের প্রথম বছর ছিল সাবমেরিনগুলোর বিজয়ের সাল। তারাই ছিল সাগরের রাজা। কত মিলিয়ন টন মালামাল ডুবিয়ে দিয়েছে, কেউ জানে না। হাজারো মানুষ অকালে ডুবে মরেছে। মিত্রশক্তি জাহাজ-গুলোকে যতই এসকোর্ট করুক, তাদের ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ারগুলো প্রতি এক শ' জাহাজের মধ্যে রক্ষা করতে পেরেছে মাত্র একটি। ঠাণ্ডা মাথায় খেলেছে জার্মান নেভি। কিছুই করবার ছিল না মিত্রপক্ষের মার্চেন্ট মেরিনের।

তবে আজ রাত থেকে বদলে যাবে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি।

আকাশে ভাসছে চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিশাল এক বিমান,

ফোক-উলফ এফডাব্লিউ-২০০ কণ্ডোর। দৈর্ঘ্যে ওটা সাতাত্তর ফুট, ডানার বিস্তার এক শ' দশ ফুট। যুদ্ধের আগে ডিজাইন করা হয়েছিল ওটা লুফ্‌ত্‌হানসার প্যাসেঞ্জার এয়ারলাইনার হিসাবে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় মিলিটারি কাজে নামিয়ে দেয়া হয়েছে কণ্ডোরকে। মালামাল বহন করছে, সেই সঙ্গে কাজ করছে লং-রেঞ্জ রিকনিসেন্স প্ল্যাটফর্ম হিসাবে। কণ্ডোরের রেঞ্জ আড়াই হাজার মাইল, ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে পারে আকাশে, উপকূল থেকে বহুদূর সাগরে খুঁজতে পারে মিত্রশক্তির জাহাজ।

যুদ্ধ-বিমান হিসাবে কণ্ডোরকে প্রথম উনিশশ' একচল্লিশ সালে ব্যবহার করা হয়। ফলাফল ভাল হয়নি। চারটি পাঁচ শ' পাউণ্ডের বোমা ডানার নীচে নিয়ে হামলা করতে গিয়ে এসব বিমানকে প্রচণ্ড ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এরপর থেকে এসব বিমানকে রিকনিসেন্স-এর কাজ দেয়া হয়। অ্যালাইড অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট গানের রেঞ্জের বাইরে থেকে চারদিকে চোখ রাখে ফোক-উলফ এফডাব্লিউ-২০০ কণ্ডোর।

কয়েক ঘণ্টা হলো সাগরের উপর চোখ রেখেছে এয়ারক্রাফটের পাইলট জ্যাকব শুমাখার। নীচে দেখবার কিছুই নেই, শুধু ঘন কালো অন্ধকার। তিক্ত হয়ে আছে শুমাখারের মন। কোনও ফাইটার বিমানের পাইলট হতে চেয়েছিল সে। বদলে হয়েছে এই! যুদ্ধ করবার উপায় নেই তার! সত্যিকারের যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে সে! হাজার হাজার ফুট উপরে আকাশে ভেসে চলেছে, নীচে শুধু কালো মরা সাগর! সে যদি মিত্রপক্ষের কোনও জাহাজ দেখে, হামলা করবে অন্য কেউ, ডুবিয়ে দেবে সে জাহাজ, বাহবা নেবে। কৃতিত্বের ভাগ পাবে না শুমাখার।

বেসে কঠোর ভাবে মিলিটারি আইন মেনে চলে জ্যাকব।

সবসময় তার দলকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাধ্য করে। তবে আকাশে যখন থাকে, শৃঙ্খলায় খানিক ঢিল দেয় সে। পাঁচজন তারা বহুদিন ধরে এই একই কাজ করছে—আকাশ থেকে চুপচাপ চোখ রাখছে বিশাল সাগরের উপর। সময় কাটতে চায় না বিমানে, তাই মাঝে-মধ্যে খানিক হাসি-ঠাট্টাও চলে এখানে—তবে সব সময় নয়।

'ওটা সুবিধা দেবে,' মন্তব্য করল পাইলট জ্যাকব শুমাখার, মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল নিঃসঙ্গ চাঁদটার দিকে।

'অথবা ওটার আলো প্রতিফলিত হবে সাগরে, আর তাই হারিয়ে যাবে জাহাজের প্রপেলারের ঢেউ,' বলল শুমাখারের কো-পাইলট, হ্যানসেল মুয়েলার। নেতিবাচক কথা বলার ওস্তাদ সে।

'এখন সাগর যেমন শান্ত, ওদের দেখতে পাব সহজে।'

'আমরা কি জানি এদিকের সাগরে জাহাজ আছে?' জানতে চাইল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। ক্রুদের ভিতর সবচেয়ে কম বয়সী সে, কণ্ডোরের রিয়ার গানার। ফিউজেলাজের পিছনে, নীচের দিকে তার গণ্ডোলা। প্লেক্সিগ্লাস শিল্ডের পিছনে বসেছে। ডানহাত রেখেছে এক নলা এমজি-ফিফটিন মেশিনগানের উপর। এ বিমান যে এলাকা পিছনে ফেলে আসে,'শুধু সেটুকু দেখতে পায় সে।

'স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার আমাকে বলেছেন এক ইউবোটের কাছ থেকে মেসেজ পেয়েছেন। ওটা ফিরছিল গত পরশুদিন। ফেয়ারো দ্বীপপুঞ্জের কাছে অন্তত এক শ' জাহাজ দেখেছে।' নীচে চাইল পাইলট শুমাখার। 'ওসব জাহাজ উত্তর দিকে আসে। কাজেই এদিকেই কোথাও থাকবে।'

'বোধহয় খোঁজ নিলে জানা যাবে ইউবোটের কমাণ্ডার সব ক'টা টর্পেডো হারিয়ে বাড়ি ফিরেছে, এখন মিলবে ঊর্ধ্বতন অফিসারের বকা, তাই একটা কিছু বানিয়ে বলে দিয়েছে।'

তিতকুটে চেহারা করল হ্যানসেল মুয়েলার। ঠাণ্ডা, কৃত্রিম কফি—চুমুক দিয়ে আরও তেতো হয়ে গেল সে।

'আমি চাই জাহাজগুলো আমাদের সামনে পড়ুক, ডুবিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরব,' বলল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। মাত্র আঠারো বছর তার বয়স। তার ইচ্ছা একদিন মস্ত ডাক্তার হবে। কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার আগেই ডাক পড়েছে মিলিটারি থেকে। ব্যাভারিয়ার গরিব এক পরিবার থেকে এসেছে সে, মনে মনে জানে, মেডিকেলে পড়বার সুযোগ তার হবে না। টাকা কোথায়? তবুও অবসরে নাক গুঁজে রাখে মেডিকেল জার্নালে। কয়েকটা ডাক্তারি বইও কিনেছে, বারবার পড়ে ওগুলো।

'সত্যিকারের জার্মান যোদ্ধা এ কথা বলবে না,' নরম স্বরে শাসন করল ক্যাপ্টেন শুমাখার। সে জানে, তাদের কপাল ভাল যে কখনও কোনও শত্রুর সামনে পড়েনি। তার ধারণা, যদি সত্যি লড়তে হয়, প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবে ক্যাপেল। একটা গুলিও বেরোবে না তার মেশিনগান থেকে। ক্রুরা কেউ রিয়ার গণ্ডোলার বদ্ধ পরিবেশে থাকতে চায় না, তাই ওখানে রাখা হয় ক্যাপেলকে। ওখানে বসে কীসের যেন আশা নিয়ে ঝিমিয়ে চলে ছোকরা, বোধহয় ভাবে যুদ্ধ জয় করবে।

তিক্ত মনে ভাবছে শুমাখার, পুব ফ্রন্টে মারা পড়ছে হাজার হাজার জার্মান সৈনিক। শত শত ট্যাঙ্ক ও বিমান পাঠানো হচ্ছে ওখানে। আশা করা হচ্ছে রাশানদের হটিয়ে মস্কো জয় করে নেবে জার্মান সেনাবাহিনী। আর আমরা কী করছি, নিজেকে জিজ্ঞেস করল শুমাখার। ছটফট করে ওঠে তার বুকের ভিতরটা—ভাল হতো দু'চারটে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারলে!

অতি ধীরে পেরিয়ে গেল একটি ঘণ্টা। আঁধারে চোখ জ্বেলে চারদিক দেখছে ওরা। যদি সত্যি ওই কনভয়ের দেখা মেলে!

আরও কিছুক্ষণ পর শুমাখারের কাঁধের উপর টোকা দিল কো-পাইলট হ্যানসেল মুয়েলার। তার লগ দেখিয়ে দিল। অফিশিয়াল ন্যাভিগেটর সামনের গণ্ডোলার গানার, তবে মুয়েলার হিসাব কষে বের করেছে ফ্লাইট টাইম ও ডিরেকশন। নিচু স্বরে জানিয়ে দিল সে, এবার সময় হয়েছে বিমান ঘুরিয়ে নেয়ার। সাগরের আরেক অংশ থেকে আবারও নতুন করে শুরু হবে খোঁজা।

রাডারে চাপ দিল পাইলট শুমাখার, ধীরে নাড়ছে ইয়ক, বামে ঘুরতে শুরু করল বিমান। একবারের জন্য দিগন্ত থেকে চোখ সরল না শুমাখারের। মনে হলো সরতে সরতে আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে চলে গেল মস্ত চাঁদটা।

এ বিমানের ক্রুদের ভিতর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ নজরের অধিকারী ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। যখন অনেক ছোট ছিল, তখন থেকেই নিজেদের খামারে কোনও জন্তু মারা গেলে সেটার মৃতদেহ কাটাকাটি করত সে—অ্যানাটমি শিখবে বলে। এ বিষয়ে কোনও বই পেলে বারম্বার পড়ত। সেই বয়স থেকেই সে জানত তার চোখ খুব ভাল; শুধু তা-ই নয়, কখনও কাঁপে না হাত। মন বলত, ডাক্তার হলে ভাল করবে সে। আর এখন সৈন্য হয়েও খারাপ করছে না। তার চোখ খুঁজছে শত্রুপক্ষের জাহাজ বহরকে।

ক্যাপেলের স্টেশন থেকে বহুদূর চোখ চলে না, কাজেই সবার আগে শত্রুকে দেখবার কথা নয় তার, কিন্তু সে ঠিকই দেখল! বিমান ভেসে চলেছে মসৃণ ভাবে, এমন সময় জ্যোৎস্নায় অস্বাভাবিক একটা সাদা ঝিলিক চোখে পড়ল তার।

'ক্যাপ্টেন!' ইন্টারকমে বেসুরো শোনাল ম্যাক্সিমিলিয়ানের কণ্ঠ। 'স্টারবোর্ড সাইড, স্যর! বেয়ারিং তিন শ'র মত!'

'ওটা কী?' চাপা উত্তেজনার সঙ্গে জানতে চাইল শুমাখার। বুকে ছলকে উঠেছে আদিম উত্তেজনা। যেন পাওয়া গেছে শিকার।

'ঠিক নিশ্চিত নই, স্যর। কী যেন। হঠাৎ ঝিলিক দিল।'

ওদিকের অন্ধকারে চেয়ে রইল শুমাখার ও হ্যানসেল মুয়েলার। কিন্তু কিছুই নেই ওদিকে।

'তুমি ঠিক দেখেছ?' আবারও জানতে চাইল পাইলট।

'ইয়েস, স্যর,' জোর দিয়ে বলল ক্যাপেল। 'আমরা যখন ঘুরছিলাম, ঠিক তখন। আমাদের অ্যাঙ্গেল বদলে গেল তারপর। আমি শিওর, ওখানে কিছু দেখেছি।'

'কোনও কনভয়?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল মুয়েলার।

'ঠিক জানি না, স্যর,' বলল ক্যাপেল।

'স্মিট, রেডিও চালু করো তো,' অ্যানসিলারি পজিশনের ফোর গানারকে নির্দেশ দিল শুমাখার। নিজে আরও কিছুটা পাওয়ার সরবরাহ করল বিএমডাব্লিউ ইঞ্জিনগুলোতে। বাঁক নিতে শুরু করেছে বিমান। খানিক নামছে ওটা, তীব্র বাতাস কাটছে প্রপেলারগুলো।

চোখে বিনকিউলার তুলেছে মুয়েলার, অন্ধকার সাগরের দিকে চেয়ে রইল সে। প্রায় দু শ' মাইল গতি তুলে ছুটছে বিমান, কো-পাইলট আশা করছে যে-কোনও সময়ে দেখবে মিত্রপক্ষের জাহাজ বহর। এক এক করে মুহূর্ত কাটছে, পেরিয়ে গেল দুটো মিনিট—কিছুই দেখা গেল না। বিনকিউলার নামিয়ে নিল মুয়েলার। 'কোনও ঢেউ বোধহয়,' ইন্টারকমের মাইক্রোফোন সরিয়ে রাখল সে।

'সত্যি কিছু থাকতে পারে,' বলল ক্যাপ্টেন শুমাখার। 'রাতের আঁধারে বিড়ালের মত দেখে ক্যাপেল।'

সাগর সমতলে শত্রুদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার পথ বের করে ফেলেছে অ্যালাইড ফোর্স। তাদের বাঁকাচোরা ক্যামোফ্লেজ প্যাটার্নগুলো ফ্রেইটার ও ট্যাঙ্কারগুলোকে লুকিয়ে

রাখে। কিন্তু রাতের আঁধারে তাদের কনভয়কে আড়াল করে না। জাহাজের প্রপেলারের ফেনা ও স্রোত ঠেকাবে কে? কুচকুচে আঁধার সাগরে জ্বলজ্বলে সাদা দাগের মত রয়ে যায় ওগুলো।

আরেশ্‌শালার কপাল—বিড়বিড় করল মুয়েলার, আঙুল তুলে দেখাল দূরে।

প্রথমে মনে হলো ওটা কালো সাগরে এক স্তূপ ধূসরতা। বিমান আরও কাছে যেতে দেখা গেল, ওগুলো ডজনখানেক লম্বা সাদা রেখা। ঠিক যেন ব্ল্যাকবোর্ডের উপর সরু রেখা টেনেছে সাদা চক। ওরা বুঝে গেল, ওখানে রয়েছে জাহাজের বড় একটা বহর! প্রপেলারের ঢেউ পিছনে ফেলে দ্রুতগতি তুলে চলেছে পুবে। এত উপরের কণ্ডোর থেকে মনে হলো, ওগুলো বড়সড় হাতি, হেলেদুলে চলেছে পাল বেঁধে।

জাহাজগুলোর আরও কাছে চলে এসেছে কণ্ডোর, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল স্লথ গতির ফ্রেইটার ও ট্যাঙ্কারগুলোকে। সেসবের দু'পাশে চলেছে ডেস্ট্রয়ার, তৈরি করছে সরু ঢেউ। যেন ভেড়ার পালকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে পাহারাদার কুকুর।

কণ্ডোর থেকে চেয়ে রইল বৈমানিকরা, হঠাৎ তারা দেখল কনভয় থেকে স্টারবোর্ডের দিকে সরে গেছে একটা ডেস্ট্রয়ার, দ্রুত চলেছে ওটা। চিমনি দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। দেখতে দেখতে কনভয়ের মাথায় চলে গেল ডেস্ট্রয়ার। তারপর আবারও কমিয়ে নিল গতি। অপেক্ষা করছে, আবারও ফ্রেইটারগুলো তাকে পাশ কাটাবে। বেশ কিছু দিন হলো এই পদ্ধতি ব্যবহার করছে অ্যালাইড ফোর্স। নাম দিয়েছে, ইণ্ডিয়ান রান। এক মাইল লম্বা কনভয়ের পিছনে পড়ে গেলে আবারও গতি তুলে সামনে হাজির হবে ডেস্ট্রয়ার। বারবার চলবে এই নিয়ম।

এতে যুদ্ধ-জাহাজের প্রয়োজন হয় কম।

'অন্তত দু' শ' জাহাজ,' আন্দাজ করল মুয়েলার।

'ওখানে যত রসদ, কয়েক মাস যুদ্ধ চালাতে পারবে রাশা,' সায় দিল শুমাখার। 'স্মিট, রেডিও কী বলে?'

'স্ট্যাটিক ছাড়া কিছু নেই।'

প্রায় নিয়মিত আর্কটিক সার্কেলে চলে রেডিওর এই খড়খড় আওয়াজ। যোগাযোগ কঠিন হয়ে ওঠে। বিশ্বের দুই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আঘাত হেনে চলেছে চার্জড্ পার্টিক্ল্, ফলে বেশির ভাগ সময় অকেজো থাকে রেডিওর ভ্যাকিউয়াম টিউব।

'আমাদের পজিশন লিখে নাও,' বলল শুমাখার, 'আমরা বেসের কাছে পৌঁছলে রেডিওতে রিপোর্ট করব। আর, ক্যাপেল, হ্যাঁ, ভাল দেখিয়েছ। আমি আরেকটু হলে ঘুরতে শুরু করতাম, দেখতাম না কনভয়।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' তরুণ সৈন্যের কণ্ঠে গর্ব প্রকাশ পেল।

'আন্দাজ করে লিখে রাখো কনভয়ে ক'টা জাহাজ থাকতে পারে। সেই সঙ্গে ওগুলো কী গতিতে চলেছে।'

'ওগুলোর বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না,' সাবধান করল মুয়েলার। 'ডেস্ট্রয়ার থেকে গোলা আসতে পারে।' নিজ চোখে বিমান লড়াই দেখেছে সে। তার বাম উরুর ভিতর এখনও রয়েছে শ্র্যাপনেল। লণ্ডন শহর আক্রমণ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে তার দল। ক্যাপ্টেন জ্যাকব শুমাখারের চোখে স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে সে। লোকটার কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা। নিচু স্বরে বলল মুয়েলার, 'ক্যাম থেকে সাবধান।'

'আমার উপর বিশ্বাস রাখো,' আত্মবিশ্বাস ও গর্ব ঝরল শুমাখারের কণ্ঠে। বিরাট বিমানটা ঘুরিয়ে কনভয়ের দিকে নিয়ে চলেছে সে। দশ হাজার ফুট নীচ দিয়ে ধীর গতিতে চলেছে

জাহাজগুলো। 'বেশি কাছে যাব না। তবে ওরা তীর থেকে অনেক দূরে। হারিকেনের সাপোর্ট পাবে না।'

জার্মানদের রিকনিসেন্স-এর পাল্টা জবাব অ্যালাইড ফোর্সের ক্যাম, বা ক্যাটাপল্ট এয়ারক্রাফ্ট্ মার্চেন্টমেন। ফ্রেইটারের বো থেকে লম্বালম্বি থাকে রেইল পাত, ওখানে রকেট নিয়ে প্রস্তুত থাকে হকার সি হারিকেন ফাইটার এয়ারক্রাফট্। ও জিনিস ছিটকে উঠে আসে আকাশে। ওই বিমান সহজেই কণ্ডোর বা পানির উপর উঠে আসা ইউবোট ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু ক্যামের অসুবিধা, ওটা আবারও মাদার শিপে ফিরতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেনের কাছাকাছি থাকতে হয় হারিকেনগুলোকে, অথবা কাছাকাছি বন্ধু কোনও দেশে নামতে হয়। তা যদি না পারে, তাদের নামতে হয় সাগরে, তলিয়ে যায় মূল্যবান বিমান। তবে বেশির ভাগ সময় পাইলটকে উঠিয়ে নেয়া যায় জাহাজে।

এফডাব্লিউ ২০০-র নীচে এগিয়ে চলেছে কনভয়। তারা অ্যালাইড টেরিটোরি থেকে অন্তত এক হাজার মাইল দূরে। আকাশে যতই থাকুক উজ্জ্বল চাঁদ, কোনও হারিকেন এয়ারক্রাফট আঁধার সাগরে নামলে সঙ্গে সঙ্গে ডুববে পাইলটসহ। ধরে নেয়া যায় আজ রাতে আকাশে উঠবে না অ্যালাইড ফোর্সের বিমান। কণ্ডোরের কোনও ভয় নেই, অ্যালাইড শিপিঙের কাছাকাছি না গেলেই হলো। ডেস্ট্রয়ারের অ্যান্টিক্রাফ্ট গোলা থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে।

সারি সারি জাহাজের সংখ্যা গুনছে ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল, এমন সময় হঠাৎ দুটো ডেস্ট্রয়ারের ডেকে আলোর ফুলকি দেখল। 'ক্যাপ্টেন!' বেসুরো সুরে ডাকল সে। 'কনভয় থেকে গোলা আসছে!'

বিমানের ডানার অনেক নীচে ডেস্ট্রয়ারগুলোকে দেখল

শুমাখার। 'ভয় নেই, বাছা,' মৃদু হাসল সে। 'ওগুলো সিগনাল লণ্ঠন। জাহাজগুলো কড়াকড়ি ভাবে রেডিও সাইলেন্স মানছে। ওই বাতি দিয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করছে।'

'ও। দুঃখিত, স্যর।'

'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ভালভাবে গুনে রাখো ক'টা জাহাজ।'

জাহাজের বহরকে ঘিরে অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে কণ্ডোর, চলে গেল উত্তরদিকের সারির উপর। ঠিক তখন সামনের দিকের মেশিনগানার সিগফিয়েড শুল্‌ৎয্‌ চেঁচিয়ে উঠল, 'গোলা আসছে! গোলা আসছে, স্যর!'

ব্যাটা বলে কী! ভাবল ক্যাপ্টেন শুমাখার। দেরি হয়ে গেল তার কর্তব্য স্থির করতে। নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে গেল মেশিনগানের ৭.৭ এমএম বুলেটগুলো। কণ্ডোরের উপর অংশে লাগল। প্রথমে বিঁধল ভার্টিকাল স্ট্যাবিলাইজারের গোড়ায়, এরপর পুরো বিমান ফুটো করল বুলেট। কিছু বুঝবার আগেই মারা গেল মেশিনগানার সিগফিয়েড শুল্‌ৎয্‌। ককপিটের ভিতর ভিমরুলের মত গুঞ্জন তুলেছে বুলেট। ঠন-ঠন লাগছে বিমানের ধাতব দেয়ালে। ফিউজেলাজের যেসব জায়গা ফুটো করছে বুলেট, সেখান থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ হাওয়ার শিস। কো-পাইলটের চাপা আর্তনাদ শুনল শুমাখার। চট্‌ করে ওদিকে চাইল, মুয়েলারের ফ্লাইট জ্যাকেটের বুকে চট্‌ চট্‌ করছে আঠালো রক্ত!

রাডার চেপে ধরল শুমাখার, একইসঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিল ইয়োকে, ডাইভ দিয়ে সরে যেতে চাইছে অ্যালাইড এয়ারক্রাফটের কাছ থেকে। ভাবছে, হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো বিমানটা!

ভুল দিকে সরতে চেয়েছে শুমাখার।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে নৌবহরে যোগ দিয়েছে এমভি

এম্পায়ার ম্যাকঅ্যালপাইন। ওটা তৈরি করা হয় ফসল বহনের জন্য। জাহাজটা আট হাজার টনের। গত পাঁচ মাস ধরে বার্নট আইল্যাণ্ড শিপইয়ার্ডে ওটাকে মডিফাই করা হয়েছে। প্রচুর অদল-বদল আনা হয়েছে সুপারস্ট্রাকচারে। যার ফলে ওটা এখন হয়ে উঠেছে ছোটখাট একটা দ্বীপের মত। চার শ' ষাট ফুটের রানওয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ওটায়। পাশেই হ্যাঙার, তাতে চারটে ফেয়ারলি সোর্ডফিশ টর্পেডো বম্বার। জাহাজ এতই বদলে নেয়া হয়েছে যে প্রয়োজনে ওটা এখনও একই পরিমাণ ফসল বহন করতে সক্ষম। অ্যাডমিরাল্টি সবসময় ভেবেছে তারা ক্যাম ব্যবহার করছে স্বল্প দিনের জন্য, তাদের দরকার অন্যকিছু। এত দিন সেই অন্যকিছু খুঁজেছে বিশেষজ্ঞরা। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে মার্চেন্ট এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, বা ম্যাক। ইংল্যাণ্ড এ জিনিস আগে যুদ্ধে নামায়নি, কারণ জাহাজটা এস্কোর্ট করবার কিছু ছিল না তাদের। কিন্তু এখন আমেরিকা থেকে পেয়ে গেছে তারা এসেক্স ক্লাস এস্কোর্ট ক্যারিয়ার।

কনভয়ের উপর ভাসছে কণ্ডোর, কিন্তু ম্যাকঅ্যালপাইন থেকে উঠে এসেছে দুটো সোর্ডফিশ বিমান। প্রথমে রাতের আঁধারে ও-দুটো সরে গেছে কনভয় থেকে, তারপর অ্যাম্বুশ করে বসেছে জার্মান বিমানকে। ফেয়ারলিগুলো বাইপ্লেন, টপ স্পিড কণ্ডোরের অর্ধেক। সোর্ডফিশের তুলনায় অনেক দ্রুত চলে কণ্ডোর, কিন্তু শুমাখার বা তার দলের কেউ টের পায়নি যে, হামলা হতে পারে তাদের উপর। বাইপ্লেন দুটোর রেডিয়াল ইঞ্জিনের কাউলিঙের উপর একটা করে ভিকার্স মেশিনগান, আর পিছনের ককপিটের উপর একটা করে গিমবল্ড লিউস গান।

ফোক-উল্‌ফ্‌ এফডাব্লিউ ২০০ কণ্ডোরের তিন হাজার ফুট নীচে তক্কে-তক্কে ছিল দ্বিতীয় সোর্ডফিশ, অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য।

প্রথম বিমানের আক্রমণ থেকে সরে যেতে চেয়েছে কণ্ডোর, আর ঠিক তখনই ফাঁদে পড়েছে দ্বিতীয় বিমানের। ওটার মেশিনগান ছিন্নভিন্ন করতে চাইল বড়সড় বিমানটাকে।

কণ্ডোরের সামনের অংশে প্রচণ্ড স্রোতের মত এসে লাগল ভিকার্সের বুলেট। সোর্ডফিশের দ্বিতীয় গানার ককপিট প্রায় পেরিয়ে বাগিয়ে ধরেছে লিউস গান—লক্ষ্য, কণ্ডোরের পোর্ট উইঙের বিএমডাব্লিউ ইঞ্জিনগুলো।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেলের চারপাশে পঞ্চাশ পয়সার সমান অসংখ্য ফুটো দেখা দিল। এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হলো অ্যালুমিনিয়ামের দেহ টকটকে লাল হয়ে উঠছে, পরক্ষণে খয়েরী হয়ে আঁধার হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে শুল্‌ৎযের কাতর ধ্বনি শুনেছে সে, পরক্ষণে টের পেয়েছে কণ্ডোরের নীচের অংশে এসে লাগছে বুলেট। ভয় পাওয়ার সময়টুকু পায়নি ক্যাপেল, তার আগেই বুঝে নিয়েছে, কর্তব্য পালন করতে হবে তাকে। দু'বার বড় করে ঢোক গিলল সে, খালি খালি লাগল পেট—দ্রুতগতিতে নেমে চলেছে কণ্ডোর। এমজি-ফিফটিনের ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরল ওর আঙুল। মুহূর্তে পিছনে পড়ে গেল স্বল্প গতির সোর্ডফিশ, ওটা থেকে ছিটকে আকাশ ভরে তুলল ট্রেসার বুলেটের ঝাঁক।

আক্রমণকারী বিমান লক্ষ্য করে ৭.৯২ এমএম বুলেট ছুঁড়তে শুরু করল ক্যাপেল। সে যেন কোনও ফায়ারম্যান, পানি দিয়ে নিভিয়ে দিতে চাইছে আগুন। বুলেটের আগুনের টুকরো দূর থেকে দূরে গিয়ে আঁধারে মিলিয়ে চলেছে। ফেয়ারলির রেডিয়াল ইঞ্জিন থেকে ভেসে আসছে ফট-ফট আওয়াজ। ওটা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করল ক্যাপেল। তার খেয়াল নেই নিজের বিমান পাথরের টুকরোর মত নীচে পড়ছে, ফিউজেলাজের ভিতর ঢুকছে অজস্র বুলেট।

আকাশের গায়ে বাঁকা লাল টুকটুকে রেখা এঁকে ছুটে চলেছে ক্যাপেলের ৭.৯২ এমএম বুলেট। তারপর হঠাৎ মনে হলো, অ্যালাইড বিমানের নাকের উপর নাচছে আগুনের প্রজাপতি। তা এক সেকেণ্ডের জন্য, এরপর আগুনের বিশাল এক জিভ গ্রাস করল সোর্ডফিশকে। শত শত বুলেটে ছিন্নভিন্ন হলো বিমানের অ্যালুমিনিয়াম ও ফ্যাব্রিক। মনে হলো একটানে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে প্রপেলার, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো রেডিয়াল ইঞ্জিন, ফ্র্যাগমেণ্টারি গ্রেনেডের মত চারদিকে ছিটকে পড়ল। জ্বলন্ত ও গরম অকটেন গিয়ে পড়ল পাইলট ও গানারের উপর। এক সেকেণ্ড আগে কণ্ডোরের ডাইভ অনুসরণ করছিল সোর্ডফিশ, তবে এবার আকাশ থেকে খসে পড়ল নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে।

বিমানের অবশিষ্টাংশ সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নামছে দুই ডানা, আঁধার রাতে মনে হলো আকাশ থেকে পড়ছে উল্কাপিণ্ড। ততক্ষণে কণ্ডোরের ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে জ্যাকব শুমাখার। গণ্ডোলা হতে চেয়ে রইল ক্যাপেল, অনেক নীচে চলে গেছে জ্বলন্ত বিমানটা। কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ আকৃতি বদলে গেল ওটার। ফিউজেলাজ থেকে ছিঁড়ে গেছে দুই ডানা। একটু আগেও সোর্ডফিশে সামান্য এয়ারোডাইন্যামিক ছিল, এখন সেটাও হারিয়ে বসল পুরোপুরি। পাথরের মত আকাশ থেকে পড়তে থাকল জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপ, ক'সেকেণ্ড পর ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল সাগরে পড়ে।

এতক্ষণ লড়তে গিয়ে আতঙ্ক ভুলে ছিল ক্যাপেল, কণ্ডোরের পোর্ট উইঙের দূর-কিনারা দেখে শিউরে উঠল—নয় সিলিণ্ডারের ইঞ্জিনগুলো থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া! ভয়ে ঢোক গিলতে শুরু করল ক্যাপেল। বুক ধকধক করছে, প্রতি সেকেণ্ডে বিশ্রী মিসফায়ার করছে ইঞ্জিনগুলো!

'ক্যাপ্টেন!' মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'একদম চুপ, ক্যাপেল!' ধমক দিল শুমাখার। 'রেডিওম্যান, ওখান থেকে উঠে এসো। আমার সাহায্য দরকার। মুয়েলার মারা গেছে।'

'ক্যাপ্টেন, ওই পোর্ট ইঞ্জিনগুলো,' আবারও বলতে চাইল ক্যাপেল।

'হ্যাঁ, জানি! একদম চুপ, গাধা!'

হামলাকারী প্রথম সোর্ডফিশ অনেক পিছনে পড়েছে, সম্ভবত ঘুরে রওনা হয়েছে কনভয়ের দিকে। এখন আর ওটাকে আক্রমণ করবার উপায় নেই ক্যাপেলের। আতঙ্কিত চোখে নিষ্পলক চেয়ে রইল সে, কণ্ডোরের পোর্ট ডানা হতে পিছনে ছুটছে ঘন কালো ধোঁয়া। ইনবোর্ড ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল শুমাখার, আশা করল আগুনের শিখা নিভবে। ঠিক করেছে আপাতত উইণ্ডমিলের মত ঘুরতে থাকুক প্রপেলার, একটু পর আবারও নতুন করে স্টার্টার টিপবে। কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর নতুন করে স্টার্টার টিপল সে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের কাউলিং ঘিরে দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। দেখতে দেখতে কুচকুচে কালো হয়ে গেল বিমানের দেহের অ্যালুমিনিয়াম।

ইনবোর্ড ইঞ্জিন থেকে দ্রুত গতি পাওয়া অসম্ভব, কাজেই ঝুঁকি নিল শুমাখার, বন্ধ করে দিল বাইরের মোটর। একটু পর আবার যখন স্টার্টার টিপল, চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। তবে মাঝে মাঝে ওটার ভিতর থেকে ভলকে উঠছে ধোঁয়া। এবার দেরি করল না শুমাখার, বন্ধ করল জ্বলন্ত ইনবোর্ড ইঞ্জিন। আসলে উপায় নেই তার, বেশি ঝুঁকি নিলে আগুন ধরবে কণ্ডোরের ফিউয়েল লাইনে। বাইরের দিকের মোটরও ক্ষতিগ্রস্ত, তবুও ঠিক করেছে যতক্ষণ পারা যায় ইনবোর্ড ইঞ্জিন বিশ্রামে রাখবে। আপাতত পূর্ণ গতিতে চলছে দুটো ইঞ্জিন, তৃতীয়টা অর্ধেক শক্তিতে চলছে। কাজেই

আশা করা যায় নিরাপদে বেসে পৌঁছতে পারবে তারা।

অতি দীর্ঘ দশটি মিনিট পেরিয়ে গেল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে তরুণ ক্যাপেল। জানতে চাইছে পরিস্থিতি কেমন। মনে মনে নিজেকে বলল, একটু পর নিশ্চয়ই জানাবেন ক্যাপ্টেন। ঠিক তখনই নতুন একটা আওয়াজ শুরু হলো। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল ক্যাপেল, স্ট্রাটের সঙ্গে ঠকাস্ করে ঠুকে গেল মাথা। পিছন থেকে এল জোরাল হুউশ্-হুউশ্ আওয়াজ। যে প্লেক্সিগ্লাস ক্যানোপির ভিতর বসে আছে ক্যাপেল, সেটার উপর ঝরঝর করে পড়ছে কোনও তরল। পরক্ষণে টের পেল হিসাব কষেই কাজটা করেছে ক্যাপ্টেন। তাদের পজিশন থেকে নার্ভিকের বেস পর্যন্ত যত তেল লাগবে, সেটুকু রেখে কণ্ডোরের বাড়তি তেল ফেলে দেয়া হচ্ছে। ক্যাপ্টেন চাইছে বিমান যতটা পারা যায় হালকা রাখতে। ক্যাপেলের গান পজিশনের খানিক উপর রয়েছে ফিউয়েল ডাম্প টিউব।

'ওখানে কী অবস্থা তোমার, ক্যাপেল?' অকটেন ফেলে জানতে চাইল জ্যাকব শুমাখার।

'উম্, ভাল, স্যর,' থমকে থমকে বলল ক্যাপেল। 'ওই প্লেনগুলো কোত্থেকে এল, স্যর?'

'আমিও দেখতে পাইনি।'

'ওগুলো বাইপ্লেন ছিল। গুলি করে একটাকে ফেলে দিয়েছি।'

'বোধহয় সোর্ডফিশ,' বলল শুমাখার। 'অ্যালাইড ফোর্সের আস্তিনে লুকানো নতুন জাদু ওটা। ওগুলো কোনও ক্যাম থেকে আসেনি। রকেটের সাহায্য নিলে বাইপ্লেনের ডানা খসে পড়ত। এখন ব্রিটেনের হাতে নতুন এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার পড়েছে।'

'আমরা কিন্তু কোনও বিমান উড়তে দেখিনি।'

'ওরা বোধহয় আগেই রেইডারে আমাদের দেখেছে। তখনই

আকাশে তুলেছে সোর্ডফিশ। আমরা কনভয় দেখবার আগেই।'

'আমরা কি বেসে খবর দিতে পারি?'

'স্মিট সেই চেষ্টা করছে। এখনও রেডিওতে স্ট্যাটিক ছাড়া কিছু নেই। আধঘণ্টা পর উপকূলে পৌঁছব, তারপর পরিষ্কার রিসেপশন পাওয়ার কথা।'

'আমি আপাতত কী করব, স্যর?'

'স্টেশনে থাকো, চোখ খোলা রাখো। আশপাশে আরও সোর্ডফিশ থাকতে পারে। আমরা এক শ' নটের কম গতিতে চলেছি। ওগুলোর কোনও একটা হামলা করতে পারে।'

'লিউট্যানেণ্ট মুয়েলার আর কর্পোরাল শুল্‌ৎযের কী অবস্থা, স্যর?'

'শুনেছি তোমার বাবা চার্চের ব্রাদার, বা এ ধরনের কিছু?'

'আমার দাদা, স্যর। গ্রামের লুথারান চার্চে রয়েছেন।'

'পরেরবার যখন তাঁকে চিঠি লিখবে, তাঁকে প্রার্থনা করতে বলবে। মুয়েলার আর শুল্‌ৎয্‌ মারা গেছে।'

এরপর আর কোনও কথা চলল না। আঁধার আকাশে চেয়ে রইল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। তার ভয় লাগছে, আবারও কোনও শত্রু বিমান দেখবে। তবে মনে মনে প্রার্থনা করল, যেন দেখতে না হয়। ভুলে যেতে চাইছে, একটু আগে দু'জন লোককে খুন করেছে। এটা যুদ্ধ, ওই লোকগুলো ওদের সতর্ক না করেই আক্রমণ করেছিল, কাজেই মনের ভিতর পাপ থাকার কথা নয়। কিন্তু শিরশির করছে তার মেরুদণ্ড। এভাবে হাত কাঁপা উচিত নয়। পেটের ভিতর পাকিয়ে উঠছে কী যেন। ভাল হতো, যদি ক্যাপ্টেন ওর দাদার কথা না তুলত। ম্যাক্সিমিলিয়ান জানে দাদা জানলে কী বলবেন। এই জার্মান সরকারকে দেখতে পারেন না তিনি। সব সময় বলেন, 'আমরা বোকামি করে যুদ্ধ শুরু করেছি।'

আর এখন বলবেন, 'দেখো, এই ভুল যুদ্ধ কী করেছে, আমার নাতিকে খুনি বানিয়ে দিয়েছে!'

ম্যাক্সিমিলিয়ান জানে, আর কখনও দাদার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে না সে।

'আমি দূরে উপকূল দেখতে পেয়েছি,' চল্লিশ মিনিট পর ঘোষণা দিল শুমাখার। 'কিছুক্ষণ পর পৌঁছব নার্ভিকে।'

কণ্ডোরের উচ্চতা কমিয়ে তিন হাজার ফুটে নিয়ে এসেছে শুমাখার, এক মুহূর্তের জন্য নরওয়ের উত্তর উপকূল দেখা গেল। বিরান এলাকা, দেখতে লাগে কুৎসিত। উপকূলে আছড়ে পড়ছে ফেনায়িত ঢেউ। এখানে-ওখানে রুক্ষ দ্বীপ, তারপর একের পর এক টিলা। ভাঙাচোরা তীর, সেখানে মাঝে মাঝে জেলে-গ্রাম। আদিবাসী মানুষগুলো সামান্য যা উপার্জন করে, তা আসে সাগর থেকেই। কায়ক্লেশে চলতে হয় ওদের।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল টের পেয়েছে, বিমান চলেছে উপকূলের উপর দিয়ে। তাতে খানিক স্বস্তি মিলছে মনে। এটা ঠিক, নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়লে বাঁচবে না, তবুও মরলে সে মাটির উপর মরতে চায়। বিমানের বিধ্বস্ত টুকরো পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে তার দেহাবশেষ। কবর হবে। যে দুই ব্রিটিশ পাইলটকে গুলি করে সাগরে নামিয়েছে, তাদের চেয়ে ঢের ভাল থাকবে। সাগরে পচবে না তার মৃতদেহ।

এমন সময় শেষ তাস খেলল নিয়তি। এতক্ষণ অর্ধেক শক্তি দিয়ে চলেছে পোর্টের আউটবোর্ড ইঞ্জিন, ভারসাম্য রেখেছে বিশাল রিকনিসেন্স বিমানের, কিন্তু এবার কোনও সুযোগই দিল না—থেমে গেল আচমকা। প্রপেলারের কারণে উড়েছে পোড়া বিমান, কিন্তু এবার পাখা বন্ধ হতেই শুরু হলো প্রচণ্ড ড্র্যাগ।

ফ্লাইট ডেকে সর্বশক্তিতে রাডার চেপে ধরল ক্যাপ্টেন

শুমাখার। আশা করল ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে মাটিতে পড়বে না কণ্ডোর। স্টারবোর্ডের ডানা এগিয়ে যেতে চাইল, তার সঙ্গে যোগ দিল পোর্টসাইডের ড্র্যাগ। ফলে যা হয়, অসম্ভব হয়ে উঠল বিমান ভাসিয়ে রাখা। বামদিকে বাঁক নিতে চাইল কণ্ডোর, সেই সঙ্গে চাইল নীচের দিকে ডাইভ দিতে।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গান-মাউন্টের উপর পড়ল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। ওকে সাপের মত জড়িয়ে নিতে চাইল অ্যামিউনিশন লূপ। নাকে-মুখে বেল্টের চপেটাঘাত খেয়ে ঘোলা হয়ে গেল মাথা। আবছা হলো দৃষ্টি, রক্তের স্রোত ছিটকে বেরুল নাকের দুই ফুটো দিয়ে। আবার ছুটে এল বুলেটের বেল্ট, এবার লাগবে মাথার বাঁ পাশে। তবে আগেই উবু হয়ে বসে পড়ল ক্যাপেল, দু'হাতে ধরে ফেলল পিতলের বেল্ট, শক্ত করে ঠেসে ধরল বাল্কহেডের সঙ্গে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড বিমান স্থির রাখতে পারল শুমাখার, তবে টের পেল, হার হচ্ছে এ যুদ্ধে। কণ্ডোরের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। শুমাখার জানে, যদি নিরাপদে নামতে হয়, তার আগে থ্রাস্ট ও ড্র্যাগকে বাগে আনতে হবে। গ্লাভস পরা হাত দ্রুত নাড়ল সে, পটাপট বন্ধ করে দিল স্টারবোর্ডের ইঞ্জিনগুলো। এবার দ্রুত নামবে বিমান। স্তব্ধ প্রপেলারগুলো পোর্টসাইডে বাড়তি ড্র্যাগ তৈরি করছে। সেটা না হয় সামলে নেবে, তিক্ত হাসল শুমাখার—কিন্তু এখন আর সে বিমানের পাইলটই রইল না, কণ্ডোর হয়ে উঠেছে বিশাল এক গ্লাইডার।

'ক্যাপেল, ওখান থেকে উঠে এসো,' ইণ্টারকমে চেঁচিয়ে উঠল শুমাখার। 'সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আমরা ক্র্যাশ করছি।'

বড়সড় এক পাহাড়ের উপর দিয়ে গেল কণ্ডোর। পরক্ষণে পিছনে পড়ল সাগরের সরু এক ইনলেট। ওটার মাথার কাছে

ছোট এক গ্লেসিয়ার। রুক্ষ কালো পাথুরে জমি, তার বিপরীতে ঝিকমিক করছে ধবল তুষার ও বরফ।

কাঁধের স্ট্যাপদুটো খুলে ফেলল ক্যাপেল, ক্রল করে বেরিয়ে আসবে গান পজিশন থেকে, এমন সময় অনেক নীচে কী যেন দেখল। একটা ইনলেটের পাশে গভীর খাদের মত, তার পাশে বিশাল কোনও দালান। খানিক অংশ গ্লেসিয়ারের ভিতর। ওটা হতে পারে প্রাচীন কোনও দালান, এখন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে গ্লেসিয়ার। মাত্র দু'সেকেণ্ড দেখতে পেয়েছে ক্যাপেল। নিশ্চিত নয়, তবে মনে হয়েছে, ওটা সত্যিই মস্ত কিছু। হয়তো অনেক আগের কোনও ভাইকিং স্টোরহাউস।

'ক্যাপ্টেন,' অনিশ্চিত স্বরে বলল ক্যাপেল। 'আমাদের পিছনে। ওখানে একটা দালান। মনে হয় বরফে নামা যায়।'

শুমাখার দেখেনি, তবে পিছন দিকে চোখ ছিল ক্যাপেলের। ইনলেটের ওদিক ভাল দেখবার কথা তার। কণ্ডোরের সামনে যতদূর চোখ চলে, এবড়ো-খেবড়ো জমিন। এখানে-ওখানে বরফ ছাওয়া টিলা, একেকটা যেন তীক্ষ্ণধার ছোরা। কণ্ডোর ওখানে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডারক্যারিজ ধসে যাবে। পাথরের স্তর মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে বিমানের পাতলা দেহ। ফলাফল...!

'তুমি ঠিক দেখেছ তো?' জানতে চাইল শুমাখার।

'ইয়েস, স্যর। গ্লেসিয়ারের এক ধারে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখেছি। ওখানে কোনও দালান আছে, স্যর।'

ইঞ্জিনগুলোর সাহায্য মিলবে না, কাজেই মাত্র একবার নামবার সুযোগ পাবে শুমাখার। জানে, যদি পাথুরে জমির উপর নামে, সঙ্গে সঙ্গে মরবে ওরা। গ্লেসিয়ারে নামাও সহজ নয়, তবে হয়তো বাঁচা সম্ভব।

দু'হাতে ইয়ক টেনে নিল শুমাখার, নড়তে চাইছে না কণ্ডোর।

ওটাকে ঘোরাতে গিয়ে দ্রুত উচ্চতা হারাতে হলো। গ্লাইড করবার সময় কিছুটা ধীরে নেমেছে বিমান, কিন্তু এবার বনবন করে উল্টো ঘুরছে অল্টিমিটার। এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই, জানে শুমাখার। এটা সহজ-সরল ফিযিক্স।

আকাশে কাত হয়ে ঘুরছে বিশাল বিমান, খানিক পর পিছনে ফেলে আসা পথে আবার ফিরল—চলেছে উত্তর দিকে। যে পাহাড় গ্লেসিয়ারকে লুকিয়েছে, সেটা এবার সামনে পড়ল। দূরে পরিষ্কার দেখল শুমাখার। নিঃশব্দে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, জ্বলজ্বল করছে পূর্ণ চাঁদ। পাহাড়ের পায়ের কাছে সাদা বরফের বিস্তৃত গ্লেসিয়ার, দৈর্ঘ্যে অন্তত এক মাইল। ক্যাপেলের সেই দালান চোখে পড়ল না। তাতে কিছু যায় আসে না। বরফের মাঠের দিকে মনোযোগ দিল শুমাখার।

সাগর থেকে ধীরে উঠেছে বরফের প্রান্তর, এরপর অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ পাহাড়ের পাশে হয়ে উঠেছে খাড়া দেয়ালের মত। ওটা পুরু বরফের। অনিশ্চিত আলোয় নীলচে লাগছে। দীর্ঘ ইনলেটে ভাসছে ছোট কিছু হিমশৈল।

দ্রুত নেমে চলেছে কণ্ডোর। এইমাত্র ঘুরেছে শুমাখার। অল্টিচ্যুড এত কমে এসেছে যে, যে-কোনও সময়ে আছড়ে পড়বে বিমান। গ্লেসিয়ারের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে লাইন আপ করল শুমাখার। পায়ের নীচ থেকে বিদায় নিল পাহাড়ের চূড়া। ওটার কাঁধের পাঁচ ফুট উপর দিয়ে পেরিয়ে এল বিমানের দুই ডানার প্রান্ত। হাজার ফুট উপর থেকে যে বরফ-প্রান্তরকে মসৃণ মনে হয়েছে, কাছ থেকে দেখে তা মনে হলো, পুরোপুরি এবড়ো-খেবড়ো। যেন ছোট ছোট ঢিবি। ল্যাণ্ডিং গিয়ার নামাল না শুমাখার। যদি ওগুলোর স্ট্রাট ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে পুরো বিমান চরকির মত ঘুরতে শুরু করবে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বিমান ও যাত্রীরা।

'শক্ত করে ধরো!' জানিয়ে দিল শুমাখার। ঢোক গিলতে গিয়ে টের পেল, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জিভ।

নিজের পজিশন থেকে উঠে এসেছে ক্যাপেল, নিজেকে আটকে নিয়েছে সিট বেল্টের সঙ্গে। ফ্লাইট ডেকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রয়েছে মার্কওয়াল্ড স্মিট। রেডিওর ডায়ালগুলো দুধ-সাদা লাগছে। কাছাকাছি কোনও জানালা নেই, কাজেই এয়ারক্রাফটের ভিতর গাঢ় আঁধার। ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণী শুনে উবু হলো ক্যাপেল, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল ঘাড়ের পিছনটা। দুই কনুই গুঁজে দিল দুই হাঁটুর ভিতর। এভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওদের।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা বেরিয়ে আসছে ক্যাপেলের মুখ থেকে।

গ্লেসিয়ারে ধড়াস্ করে নেমে এল কণ্ডোর, পরক্ষণে লাফিয়ে উঠল বারো ফুট। পরেরবার নামল আরও জোরে। বরফের সঙ্গে সংঘর্ষের ধাতব আওয়াজ, যেন কোনও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটছে দ্রুতগতির রেলগাড়ি। প্রচণ্ড গতিতে সেফটি স্ট্র্যাপের উপর হোঁচট খেল ক্যাপেল, কুঁকড়ে গেল ভয়ে। নড়বার সাহস নেই। ভাবছে, কোনও ঢিবির উপর লাফিয়ে উঠেছে বিমান! রেডিও ম্যান্যুয়ালের পাতাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে গেল। বরফে ধাক্কা দিল এক দিকের ডানা। সঙ্গে সঙ্গে কুমারের চাকার মত ঘুরতে শুরু করল বিমান। অ্যালুমিনিয়াম দেহকে খাবলে নিল সুকঠিন বরফ।

ক্যাপেল জানে না, কীসে ভাল হতো। বিমানে থাকা ভাল, নাকি বাইরের পৃথিবীতে? ককপিটে থাকা উচিত ছিল? কিন্তু সেখানেই বা নিরাপত্তা কোথায়—হয়তো এক্ষুণি ছিন্নভিন্ন হবে কণ্ডোরের ককপিট!

ক্যাপেল যেখানে গুটিসুটি মেরেছে, ঠিক তার নীচে বিকট আওয়াজ শুরু হলো। ফিউজেলাজের নীচ থেকে ছিটকে এল

বরফ-শীতল ঝোড়ো হাওয়া। ফরওয়ার্ড গানারের নিরাপদ প্লেক্সিগ্লাসের গণ্ডোলা এক গুঁতো খেয়ে চুরচুর হয়ে ভিতরে ঢুকল। এগিয়ে চলেছে কণ্ডোর, যেন শেভ করছে গ্লেসিয়ারের বুক। বিমানের ভিতর ছিটকে ঢুকছে ধারালো বরফ টুকরো। গতি কমছে না কণ্ডোরের, চলেছে তো চলেইছে, যেন থামবে না কোনদিন।

হঠাৎ সমস্ত শব্দ চাপা পড়ল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে। ভয়ানক ভাবে চুরমার হচ্ছে ধাতু, পরক্ষণে নাকে এল বিশ্রী গন্ধ। হাই অকটেন এভিয়েশন ফিউয়েল। ক্যাপেল জানে কী ঘটছে। বরফের ভিতর আটকা পড়েছে একদিকের ডানা, পরক্ষণে ছিঁড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন শুমাখার বেশির ভাগ গ্যাসোলিন ফেলে এসেছে, ছিল শুধু চলবার মত। তবে সেটাও লাইনে আগুন তৈরি করতে যথেষ্ট!

দ্রুত গতিতে গ্লেসিয়ারের বুকে পিছলে চলেছে কণ্ডোর, সামনে নিচু হয়েছে বরফের প্রান্তর। এদিকে ধীরে ধীরে কমে আসছে গতি। পোর্ট উইং ছিঁড়ে যাওয়ায় আড়াআড়ি ভাবে চলেছে বিমান। আণ্ডারক্যারিজে আরও ঘষা দিচ্ছে বরফ। দ্রুত কমছে কণ্ডোরের গতি, ওটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে বরফ।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ক্যাপেল। আর কিছুক্ষণ, তারপর থামবে বিমান। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ল্যাণ্ড করেছে ক্যাপ্টেন শুমাখার, এবং জিতেও গেছে। দুই কনুইয়ের ভিতর থেকে হাঁটু বের করে নিল ক্যাপেল, সিটে সোজা হয়ে বসবে, ঠিক তখনই স্টারবোর্ডের ডানা গোড়া থেকে ছিঁড়ে বরফের ভিতর গেঁথে গেল!

ছেঁড়া ডানাকে চেপ্টে দিয়ে চলেছে কণ্ডোর, তারপর চরকির মত ঘুরেই উল্টে গেল! এত দ্রুত ঘটল যে আরেকটু হলে সেফটি বেল্ট ছিঁড়ে ছিটকে পড়ত ক্যাপেল। প্রচণ্ড ব্যথা পেল ঘাড়ে। মুহূর্তে অবশ হলো সারা দেহ।

বেশ কিছুক্ষণ পর টের পেল, ও ঝুলছে উল্টো হয়ে যাওয়া সিটে—চার দিকে অ্যালুমিনিয়াম ও বরফের সংঘর্ষের আওয়াজ আর নেই! থেমে গেছে কণ্ডোর! বনবন করে ঘুরছে ক্যাপেলের মাথা। খুব সাবধানে সিট বেল্ট খুলল সে, আস্তে করে নেমে এল বিমানের ছাতে। পায়ের নীচে কী যেন নরম বাধল। চারপাশে ঘন অন্ধকার। উবু হয়ে জিনিসটা স্পর্শ করল ক্যাপেল, পরক্ষণে ঝট্ করে সরে গেল। একটা লাশ ছুঁয়েছে। আঙুলে চটচট করছে উষ্ণ কী যেন। মুহূর্তে বুঝে গেল, ওটা রক্ত!

'ক্যাপ্টেন শুমাখার?' নিচু স্বরে বলল ক্যাপেল। 'স্মিট?'

জবাবে বিমানের ভিতর বয়ে গেল হু-হু শীতল হাওয়া।

রেডিওর নীচের কেবিনেটটা হাতড়ে দেখল ক্যাপেল, ফ্ল্যাশলাইট পেয়ে জ্বালল। চোখে পড়ল হ্যানসেল মুয়েলারের লাশ। বিমান-হামলা শুরু হওয়ার শুরুতেই মারা যায় সে। আবার ক্যাপ্টেন ও স্মিটকে ডাকল ক্যাপেল। আলো ফেলল উল্টে থাকা ককপিটে। শুমাখার ও স্মিট এখনও ঝুলছে সিটের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায়, হাতগুলো অলস ভাবে দুলছে। মানুষগুলো যেন শিথিল কোনও পুতুল, চোখ খোলা, কিন্তু নড়ছে না!

ক্রল করে কাছে চলে গেল ক্যাপেল, ক্যাপ্টেনের কাঁধে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। মাথা ঝুলছে শুমাখারের, নিষ্প্রভ দুই নীল চোখে পাতা পড়ছে না। লালচে মুখ, উল্টে থাকায় প্রচুর রক্ত জমেছে বুক ও মস্তিষ্কে। আস্তে করে গাল স্পর্শ করল ক্যাপেল। ত্বক এখনও উষ্ণ, তবে টানটান ভাব হারিয়েছে পেশি। দুই গাল থলথলে। রেডিওম্যান/গানার স্মিটের উপর আলো ফেলল ক্যাপেল। সে-ও নেই। স্মিটের মাথা ঠুকে গেছে একটা বাল্কহেডে—ওখানে লেগে আছে এক পোঁচ রক্ত। ক্যাপ্টেন শুমাখারের ঘাড় ভেঙেছে বিমান উল্টে পড়বার সময়।

মাথা ঘোলাটে লাগছে ক্যাপেলের, তবে কিছুক্ষণ পর হঠাৎ টের পেল নাকে আসছে গ্যাসোলিনের কড়া গন্ধ। টলতে টলতে রওনা হলো সে, চলে গেল বিমানের পিছনে। মেইন ডোর ওখানে। ক্র্যাশ করবার সময় মুচড়ে গেছে কণ্ডোরের ফ্রেম। ক'বার কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেয়ার পর ধুপ্ শব্দে খুলে গেল ধাতব দরজা। হোঁচট খেয়ে বরফের উপর পড়ল ক্যাপেল। পিছনের গ্লেসিয়ারে ছিটিয়ে রয়েছে ফিউজেলাজ ও ডানার অংশ। গভীর, দীর্ঘ দাগ তৈরি করেছে কণ্ডোর, এসে থেমেছে বহু দূরে।

হঠাৎ বিমানে আগুন ধরবে কি না, ঠিক বুঝতে পারছে না ক্যাপেল। তবে জানে, যত দ্রুত সম্ভব বিমান থেকে সরে যেতে হবে। এদিকে গ্লেসিয়ার ছুঁয়ে বইছে বরফ-শীতল হাওয়া। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে টিকবে না। মাথা খেলাতে চাইল ক্যাপেল। কিছুক্ষণ পর বুঝল, আকাশ থেকে যে দালান দেখেছে, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। নইলে... মৃত্যু! ওই বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করবে। যখন নিশ্চিত হবে কণ্ডোর বিস্ফোরিত হবে না, তখন আবারও ফিরবে। কপাল ভাল, ক্র্যাশ করবার সময় নষ্ট হয়নি রেডিও। ওটা যদি কাজ না করে, অন্য ব্যবস্থা রয়েছে। বিমানের লেজের কাছে রাখা আছে ছোট একটা ইনফ্লেটেবল বোট। যদি তীরের পাশ দিয়ে যায়, দু'তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়বে কোনও গ্রাম।

গত এক ঘণ্টা কেমন ভয়ের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তা বুকের ভিতর পুঁতে ফেলল সে। পরিকল্পনা ঠিক হতেই খানিক সাহস ফিরেছে মনে। এখন মনোযোগ দিতে হবে আত্মরক্ষার ব্যাপারে। যখন নার্ভিকে নিরাপদে পৌঁছবে, তখন মৃত সঙ্গীদের নিয়ে ভাববে। ওর সঙ্গে কারও বাড়তি খাতির ছিল না। ও সবসময় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তবুও, মানুষগুলো ছিল একই

দলের।

ব্যথায় দপদপ করছে ক্যাপেলের মাথা-ঘাড়, এপাশ-ওপাশ ফিরাতে পারছে না। দূরের সেই পাহাড়ের দিকে মনোযোগ দিয়ে চাইল সে, তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। ওই পাহাড়ের ওদিকে রয়েছে সরু সেই ইনলেট্। ওর জানা নেই এ গ্লেসিয়ার আকারে কী রকম, আর বরফে দূরত্ব বোঝাও কঠিন। ক্যাপেলের মনে হয়েছে গন্তব্য বড়জোর দুই কিলোমিটার, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, পাহাড়ে পৌঁছল না সে। বুটের ভিতর জমে যেতে চাইল আঙুলগুলো। তারপর হঠাৎ শুরু হলো ঝমঝম বৃষ্টি। কোট ভিজতেই বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে গেল বরফ। এক পা এগুলে ঠুস-ঠাস করে পড়ছে বরফ টুকরো, মড়মড় করে ভাঙছে বুটের নীচে।

বহুক্ষণ পর ক্যাপেলের মনে হলো, অনেক তো হলো, আর পারি না—বরং ফিরতি পথ ধরি, ঢুকি গিয়ে ওই কণ্ডোরের ভিতর। তারও অনেক পরে গ্লেসিয়ারের ধারে দেখল সেই দালান—এক অংশ বরফে ঢাকা। আরও কাছে চলে যাওয়ার পর আবছা আঁধারে মোটামুটি দেখা গেল ওটাকে। শীত লাগছে ওর, কিন্তু তার চেয়ে বেশি শিউরে উঠল ভিন্ন কারণে। সামনে ওটা কোনও দালান নয়!

বিশাল এক জাহাজের বো'র সামনে গিয়ে থেমেছে ক্যাপেল। ওটা পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি, বেশির ভাগ অংশ তামা দিয়ে মোড়া। জাহাজের একদিকের অংশ চাপা পড়েছে গ্লেসিয়ারে। ক্যাপেল জানে অতি মন্থর গতিতে নড়ে গ্লেসিয়ার। কাজেই আন্দাজ করতে পারল, হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে আটকা পড়েছে এ জাহাজ! আগে কখনও নিজ চোখে এ ধরনের কিছু দেখেনি ক্যাপেল। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে আনমনে মাথা নাড়ল। তা-ই কি হয়? ...কিন্তু, হতেও তো পারে? আগে এ

জাহাজের ছবি দেখেছে ও। ঠাকুরদা'র বাইবেলে। স্কেচ করা ছবি। এর সঙ্গে ছিল এক দীর্ঘ উপাখ্যান। যখন ছোট ছিল, ওকে পড়ে শোনাতেন দাদা। ওটা ছিল ওল্ড টেস্টামেন্টের অংশ। ক্যাপেলের মনে পড়ে, ওই গল্পে বলা হয়: সেই জাহাজের দৈর্ঘ্য ছিল এক শ' কিউবিট, চওড়ায় ছিল পঞ্চাশ কিউবিট, উঁচু ছিল তিরিশ কিউবিট!

'সে-জাহাজে একজোড়া করে প্রতিটি প্রাণী তোলেন নূহ্ নবী!'

এটাই কি সেটা?

দুই

তিন দিন হলো পুরনো লক্কর-ঝক্কর ফ্রেইটারটা নোঙর ফেলেছে অ্যাশকেলন নেভি বেসের বাইরে। বেশিরভাগ ফ্রেইটার ব্যবহার করে না এ বন্দর। তাই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে ওটাকে ইজরায়েলি নেভি। একটু আগে নেভাল বেস থেকে রওনা হয়েছে এক আর্মড প্যাট্রল বোট, তরতর করে চলেছে পাঁচ শ' ফুটি জাহাজটির দিকে।

এ ফ্রেইটারের নাম, দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রি। রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তাইওয়ানে। জ্যাক স্টাফ থেকে ল্যাগ-ব্যাগ করছে ময়লা লাল-নীল পতাকা। নীলের জমিতে সাদা সূর্য, এখন হয়ে উঠেছে খয়েরী। জাহাজটা দেখলে বোঝা যায়, যৌবনে জেনারেল কার্গো ভেসেল ছিল, এখন বদলে নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে কন্টেইনার শিপ হিসাবে। ডেকের উপর থম মেরে হুকুমের প্রতীক্ষায় রয়েছে

পাঁচটি কার্গো বুম, একেকটা যেন ডাল ভাঙা গাছ। সামনের ডেকে তিনটে বুম, পিছনে দুটো। প্রতিটা ঘিরে ঝলমল করছে সব কন্টেইনার। সেগুলোর মিঁছিল শেষ হয়েছে গিয়ে ব্রিজের জানালার নীচে। ডেকে অজস্র কন্টেইনার, তবুও উঁচু হয়ে ভাসছে জাহাজ। ম্যাক্সিমাম-লোড নেয়ার দাগটা পানির পনেরো ফুট উপরে রয়েছে। এই অংশটা টুকটুকে লাল অ্যান্টিফাউলিং রং করা। জাহাজের নীল খোলে রঙের পোচ পড়েনি বহু দিন। আরেকটু উপরে ফ্যাকাসে সবুজ ও খয়েরী ছোপ। নানা রঙে বিশ্রী লাগছে জাহাজটাকে। কালিঝুলি দিয়ে ভরা চিমনি জোড়া। সত্যিকারের রং বুঝবার উপায় নেই। দুই চিমনি থেকে বেরিয়ে আসছে ছাই রঙের ধোঁয়া, স্থির হচ্ছে জাহাজের মাথার উপর। চারদিকে এক ফোঁটা বাতাস নেই।

লর্ভেমার ফ্যানটেইল থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ধাতব পাটাতন, তার শেষ প্রান্তে ব্যস্ত কর্মীরা। গায়ে গ্রিজ মাখা কভারল, ঘামে ভেজা। মেরামত হচ্ছে ফ্রেইটারের রাডার বেয়ারিং।

কাছাকাছি চলে এসেছে ইজরায়েলি প্যাট্রল বোট, ওটার ক্যাপ্টেন বা এনসিও দু'হাতে মুখের সামনে তুলে ধরল মেগাফোন। 'অ্যাহয়, লর্ভেমা!' তারপর ইদ্দিশ ভাষায় এল ঘোষণা: 'আপনাদের জানানো যাচ্ছে, আমরা আপনাদের জাহাজে উঠব।' দ্বিতীয়বার একই বক্তব্যে ইংরেজি ব্যবহার করল হাগ্যাই এলফেনবেইন। মেরিটাইম ট্রেডে ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছে সবাই।

কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর ডেকে বেরিয়ে এল এক মোটা লোক, চলেছে গ্যাংওয়ের দিকে। লোকটার শার্টের বগল জবজব করছে ঘামে। এক অধস্তনের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল সে। এবার জাহাজের পাশে নামতে লাগল সরু সিঁড়ি।

ডেকে উঠতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল হাগ্যাই। ভাবছে, এ লোকের কাঁধে আবার ক্যাপ্টেনের এপোলেট! বিরক্ত বোধ করছে সে। নোংরার হদ্দ কোথাকার! ভদ্র পোশাক পর্যন্ত পরতে শেখেনি। আর দেখবার মত একটা পেটও বানিয়েছে হারামজাদা: উপচে পড়েছে বেল্টের দশ ইঞ্চি নীচে। সাদা ক্যাপের পাশে সাদা পাকা চুল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শুধু জেহোভা জানেন, কেন এ লোককে চাকরিতে রাখা হয়েছে।

হাগ্যাইয়ের এক লোক প্যাট্রল বোট থেকে .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান বাগিয়ে ধরেছে। হাগ্যাই ইশারা করল আরেকজনকে। গ্যাংওয়ের সঙ্গে বোট বেঁধে ফেলল সে। আরেক সৈন্য জাহাজে উঠছে, দু'হাতে ধরেছে উজি সাবমেশিনগান। একবার আলতো করে হোলস্টারের ফ্ল্যাপ স্পর্শ করল হাগ্যাই, তারপর রেইলিং টপকে নামল ডেকে। এবার পিছু নিল বোটের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। উস্কোখুস্কো চুল গোছাতে চাইছে জাহাজের ক্যাপ্টেন, তারপর ডলে ঠিক করতে চাইল কোঁচকানো শার্ট। এ কাজেও সফল হলো না সে।

ডেকের চারপাশে চাইল হাগ্যাই এলফেনবেইন। এখানে-ওখানে জাহাজের প্লেটিং খসে আসছে। শুধু জেহোভা জানেন কতদিন হলো এক পোচ রং চড়ে না জাহাজে। খোল ও ডেকে পুরু মরিচা। তবে কণ্টেইনারগুলো ঝকঝকে নতুন। নিশ্চয়ই ক'দিন আগে তোলা হয়েছে, নইলে এ জাহাজের নাবিকরা ওগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিত। এদের কর্তব্যজ্ঞান বলতে যদি কিছু থাকত! রেইলিঙের এখানে-ওখানে পাত নেই, সেসব জায়গা আটকেছে শিকল দিয়ে ঘায়ের মত জং দগদগ করছে সুপারস্ট্রাকচারে। একবার চাইলে মনে হয় এখুনি বুঝি সব খসে পড়বে।

বিরক্তি চেপে রাখল এলফেনবেইন, চৌকশ ভাবে খটাস করে স্যালিউট দিল ক্যাপ্টেনকে। খসখস শব্দে মোটা পেট চুলকে চলেছে ক্যাপ্টেন, তড়িঘড়ি স্পর্শ করল ক্যাপের বিল। ওটাই তার পাল্টা সালাম।

'ক্যাপ্টেন, আমি লেফটেনেন্ট এলফেনবেইন, ইজরায়েলি নেভি। ইনি সাব-লেফটেন্যান্ট জিল গোল্ডবার্গ।'

'আসুন, দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রিতে আপনাদের স্বাগতম,' বলল মোটা ক্যাপ্টেন। 'আমি অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান। আমি...'

কথা শেষ হবার আগেই এক লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। কথার সঙ্গে ভক্ ভক্ করে অতি জঘন্য পচা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে ক্যাপটেনের মুখ দিয়ে।

তাছাড়া স্প্যানিশ উচ্চারণের ইংরেজি এতই বিদ্ঘুটে যে অতি কষ্টে বক্তব্য আন্দাজ করে নিল হাগ্যাই। তার চেয়ে তিন ইঞ্চি উঁচু সেবাস্তিয়ান, কিন্তু লোকটার দুই কাঁধে চর্বির তাল, পেটের টানে মেরুদণ্ড এমন বেঁকে গেছে, তাকে দেখতে লাগছে হাগ্যাইয়ের সমান। চোখের মণিদুটো কুচকুচে কালো, জ্বলজ্বল করছে। হাগ্যাইয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার সময় হাসল সে, বেরিয়ে এল এবড়ো-খেবড়ো হলুদ দাঁতের সারি। একটু আগে মুখ দিয়ে যে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুল, আন্দাজ করল হ্যাগাই, তা স্রেফ পচা দুধ থেকেই আসা সম্ভব।

'স্টিয়ারিং গিয়ারে কীসের সমস্যা?' জানতে চাইল সে।

কাকে যেন স্প্যানিশে অভিশাপ দিল ক্যাপ্টেন, ধীরে মাথা নাড়ল। 'বেয়ারিং বিগড়ে গেছে। এক মাসে এই নিয়ে তিনবার। জাহাজের মালিক হলো ফকিরের বাচ্চা ফকির! শিপইয়ার্ডে কাজ করাতে দেবে না। আমার নিজের লোকদেরকেই ঠিক করতে হবে। কথা ছিল দু'দিন আগে বন্দর ছাড়ব। হলো না। দেখি

আগামী কাল যেতে পারি কি না।'

'কোথায় যাবেন? সঙ্গে কীসের কার্গো?' বাতাসের দিকে নাক ফিরিয়ে জানতে চাইল সে।

ডানহাত তুলে একটা কন্টেইনারে চড়াৎ করে চাপড় দিল ক্যাপ্টেন। 'খালি বাক্স। সবগুলো। লর্ভেমা এর বেশি আর কী পাবে।'

'আপনার কথা বুঝলাম না,' বলল হাগ্যাই।

'আমরা ইতালি থেকে ফাঁকা কন্টেইনার নিই, পৌঁছে দিই হং-কঙে। ভরা কন্টেইনার আসে, আনলোড করা হয়, কন্টেইনার পড়ে থাকে ডকে। আবার ওগুলো তুলে নিই আমরা, নিয়ে যাই হং-কঙে। আবার রিলোড হয়।'

এবার বোঝা গেল জাহাজ কেন এত হালকা, ভাবল হাগ্যাই। খালি কন্টেইনারের ওজন বড়জোর কয়েক টন। 'আর ফিরে আসবার সময় কী বহন করেন?'

'টুকটাক যা পাওয়া যায়, খরচ উঠলেই হলো,' তিক্ত শোনাল সেবাস্তিয়ানের কণ্ঠ। 'এমন কিছু থাকে না যে কেউ বীমা করবে।'

'আপনার ক্রু ম্যানিফেস্ট দেখব, সেই সঙ্গে কার্গো ম্যানিফেস্ট ও জাহাজের রেজিস্ট্রেশন।'

'কোথাও কোনও সমস্যা?' চট্ করে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'আগে আপনার কাগজ দেখি, তারপর জানতে পারব ঝামেলা আছে বা হয়েছে কি না,' ফালতু লোকটাকে ভড়কে দিতে চাইছে লেফটেন্যান্ট হাগ্যাই। বুঝল, সফল হয়েছে। 'আপনার জাহাজ কিন্তু ইজরায়েলি পানিতে। কাজেই জাহাজের প্রতিটা ইঞ্চি তল্লাসী করতে পারি, যদি চাই।'

'নো প্রোবলেমা, সেনোর,' সেবাস্তিয়ানের কথা থেকে গলে পড়ছে ঘি। হাসতে চাইল, তবে মনে হলো ভেংচি কাটছে। 'এই

গরমে দাঁড়িয়ে আছেন, আমার অফিসে চলুন।' একহাতে দেখিয়ে দিল সুপারস্ট্রাকচার।

এ বছর সত্যিই গরম পড়েছে। তার উপর আজ এক ফোঁটা হাওয়া নেই। স্টিলের ডেক হয়ে উঠেছে তপ্ত তাওয়া। এসব হচ্ছে ওই গ্রিন হাউসের বদ খেয়ালে।

'পথ দেখান,' প্রায় ধমকে উঠল হাগ্যাই।

দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রির বাইরের অবস্থা যেমন, ঠিক তেমনই অভ্যন্তর। মেঝে থেকে উঠে গেছে লিনোলিয়াম, দেয়ালগুলো ন্যাংটো লোহার, এখানে-ওখানে নতুন রঙের পোচ। ছাতে জ্বলজ্বল করছে ফ্লুরেসেন্ট বাতি, কোনওটার শেড নেই। বেশ কয়েকটা জ্বলছে-নিভছে। প্যাসেজের সেসব জায়গা ছায়াচ্ছন্ন।

লেফটেন্যান্ট হাগ্যাই ও সাব-লেফটেন্যান্ট গোল্ডবার্গকে নিয়ে সরু কমপ্যানিয়ানওয়ে দিয়ে চলেছে অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান। পাশেই নড়বড়ে রেইলিং। ওটা পেরিয়ে সামনে পড়ল খাটো এক করিডোর। একটা দরজার সামনে থামল ক্যাপ্টেন, ওটা খুলে হাতের ইশারা করল। হাগ্যাই ও গোল্ডবার্গের পর নিজে ঢুকল অফিসে। ঘরের আরেক দিকে হাঁ করা এক দরজা। কেবিনের ভিতর অংশ চোখে পড়ছে। নোংরা বিছানা, বদলানো হয় না চাদর। এক প্রান্ত মেঝের উপর, তাতে জুতোর হিলের কাদাটে দাগ। একদিকের দেয়ালে বোল্টু দিয়ে আটকানো ড্রেসার। ওটার উপর আয়না, কোনাকুনি ফাটা।

ক্যাপ্টেনের অফিস আয়তাকার, একদিকের দেয়ালে একটা পোর্টহোল। ওখানে এত্ত লবণ জমেছে যে কাঁচের ওপাশে চোখ চলে না। চার দেয়ালে ঝুলছে কিছু পোস্টার, নানা ভঙ্গি নিয়ে প্রায়-উলঙ্গ রমণী। দুই ছবির মাঝে এক সরু দরজা, খোলা। ওপাশে ছোট্ট টয়লেট। এমনই নোংরা যে ঢাকার পাবলিক টয়লেট

হার মানবে। অফিসে প্রচুর সিগারেট ফোঁকা হয়, সবকিছুতে লেপ্টে রয়েছে জঘন্য, বদ গন্ধ। হাগ্যাইয়ের মনে হলো তিতা লাগছে জিভ। সে নিজে ধূমপায়ী, কিন্তু এই ক্যাপ্টেন শালা বোধহয় গাঁজাও টানে।

ডেস্কের পাশে থামল ক্যাপ্টেন, ল্যাম্প জ্বালতে চাইল। সুইচ টিপতেই ছিটকে উঠল স্পার্ক। তবে মনে হলো বাতি জ্বলে ওঠায় সে খুশি। এবার ডেস্কের পিছনে নিজ আসনে ধপ্ করে বসে পড়ল। গুঙিয়ে উঠল চেয়ার। দুই পরিদর্শকের জন্য দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল সেবাস্তিয়ান।

শার্টের পকেট থেকে কলম বের করল হাগ্যাই, ওটা দিয়ে খুঁচিয়ে চেয়ারের উপর থেকে ফেলে দিল এক তেলাপোকার লাশ, তারপর সাবধানে বসল চেয়ারে; ভাবছে, ছারপোকা নেই তো?

ডেস্ক হাতড়াতে শুরু করেছে সেবাস্তিয়ান, দু'সেকেণ্ড পর হাতে তুলে নিল মদের বোতল। জুলজুল করে চাইল দুই অফিসারের দিকে। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে কী যেন বলে বোতল রেখে দিল। 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, এই তো পাওয়া গেছে ম্যানিফেস্ট।' হাগ্যাইয়ের দিকে বাইণ্ডার বাড়িয়ে দিল সে। 'যা বলছিলাম, আমরা কন্টেইনার ছাড়া কিছুই সঙ্গে নিই না। খালি হাতে ফিরতে হয় হং-কঙে।' একে একে বাইণ্ডারগুলো ডেস্কের উপর রাখছে সে। 'এটা আমার ক্রুদের ম্যানিফেস্ট। সব ক'টা অলসের হাড্ডি। আপনারা যদি দু'চারটাকে ধরে জেলে ভরতে চান, আমি খুশিই হবো। আর এগুলো লর্ভেমার রেজিস্ট্রেশনের কাগজ।'

ক্রুদের নামের লিস্ট পড়ছে হাগ্যাই। নোটবুকে কিছু তথ্য তুলে নিল। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল ক্রুদের জাতীয়তা ও পরিচয়-পত্র। জাহাজে তাইওয়ানিজ, চিনা, ইন্দোনেশিয়ান, ভারতীয়, বাংলাদেশি ও ইতালিয়ান নাবিক রয়েছে। এদের

কয়েকজনকে দেখেছে হাগ্যাই, লোকগুলো রাডার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ক্যাপ্টেন নিজে স্পেনের বার্সেলোনার লোক। অরিয়ন-ওশন শিপিং অ্যাণ্ড ফ্রেইটারের সঙ্গে ঝুলে আছে গত বারো বছর ধরে। লর্ভেমার ক্যাপ্টেন হিসাবে ছয় বছর। একটু বিস্মিত হয়েছে হাগ্যাই, ভাবতে পারেনি লোকটার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। দেখলে মনে হয় প্রায় ষাট।

সন্দেহ করবার মত কিছু পাওয়া গেল না। তবে হাগ্যাই ঠিক করেছে, পুরো জাহাজটা তল্লাসী করবে।

'এখানে বলা হয়েছে আপনারা আট শ' সত্তরটা কণ্টেইনার নিয়ে চলেছেন।'

'কমবেশি ওরকমই।'

'সব হোল্ডে রেখেছেন?'

'ডেকে যা আছে, সেগুলো ছাড়া বাকি সব।'

'আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না, ক্যাপ্টেন, কিন্তু এ ধরনের জাহাজ কণ্টেইনার বহনের উপযুক্ত নয়। আমার ধারণা আপনার হোল্ডে আরও বেশি কিছু আছে। লুকিয়ে রেখেছেন। আমি ছয় হোল্ড ঘুরে দেখব।'

'নিশ্চয়ই দেখবেন, স্যর, যতক্ষণ আমার স্টিয়ারিং গিয়ার ঠিক না হয়, ততক্ষণ আমার কোনও কাজ নেই।' আরেকটু কুঁজো হয়ে বসল ক্যাপ্টেন। 'আপনি তো পুরো জাহাজ ঘুরে দেখতে চান? ওখানে লুকানোর কিছু নেই।'

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। এক চাইনিজ নাবিক ঢুকল, পরনে কভারঅল। ঝড়ের মত ক্যান্টোনিজ বলে চলেছে। তারই ফাঁকে কাকে যেন অভিশাপ দিল সেবাস্তিয়ান, অবিশ্বাস্য গতিতে চেয়ার থেকে টেনে তুলল ভারী শরীরটা। সতর্ক হয়ে উঠেছে দুই ইজরায়েলি, হোলস্টারের উপর চলে গেছে হাত।

তাদেরকে পাত্তাই দিল না সেবাস্তিয়ান, প্রায় দৌড়ে চলেছে। কে ভাববে এ লোকের ওজন হবে দুই শ' আশি পাউণ্ডের বেশি! মাত্র টয়লেটের দরজার কাছে গেছে, এমন সময় প্লামিঙের ভিতর থেকে ভয়ানক কাশির আওয়াজ শুরু হলো। থমকে দাঁড়াল মোটকু ক্যাপ্টেন, ঠাস্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু যা ঘটবার ঘটে গেছে আগেই। বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলেছে কমোড, সিলিঙে গিয়ে ছিটকে লেগেছে নোংরা হলুদ পানি। এবার নতুন ও ভয়ানক এক গন্ধ পাওয়া গেল স্রেফ দোজখ হয়ে উঠল এই বদ্ধ অফিস-ঘর।

'খুবই দুঃখিত, স্যর,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল সেবাস্তিয়ান। 'আমাদের এই ফু-চুং সেপটিক সিস্টেম ঠিক করছে। তবে ওটা এখনও ঠিক হয়নি।'

ঊর্ধ্বতন অফিসারকে কানে কানে ইদ্দিশে বলল গোল্ডবার্গ, 'এরা যদি সত্যিই কিছু লুকিয়ে রেখে থাকে, আমার মনে হয় না সেটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের জান দেবার দরকার আছে।'

'ঠিক,' বলল এলফেনবেইন। 'মেডিটারেনিয়ানে স্মাগলার নেই।' ক্যাপ্টেন সেবাস্তিয়ানের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইল সে। চাপা স্বরে বলল, 'দেখছি জাহাজ ঠিক করতে জীবন দিচ্ছেন, ক্যাপ্টেন। ...আপনার কাগজ-পত্র ঠিকই আছে। আর আপনার সময় নিতে চাই না।'

'যা আপনাদের ইচ্ছা,' বিনয়ের সঙ্গে বলল সেবাস্তিয়ান। এক ভুরু উঠেছে কপালে। 'আপনারা চাইলে ঝটপট জাহাজটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।'

উঠে দাঁড়াল হাগ্যাই এলফেনবেইন। 'তার আর কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'ঠিক আছে,' দুই অফিসারকে পিছন থেকে প্রায় তাড়া করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। ফিরতি পথে চলেছে তারা।

প্রায়ান্ধকার হলওয়ে পেরিয়ে এল। মধ্য আকাশে জ্বলছে আগুনের গোলা, কফিনের মত সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে অন্ধ হয়ে গেল প্রত্যেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর সামলে নিল ওরা। অনেক দূরে চোখে পড়ল এক সুপারট্যাঙ্কার, হোল্ডগুলো টইটম্বুর ক্রুড অয়েলে। বোধহয় চলেছে সাইপ্রাসের দিকে।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের মুখে থামল হাগ্যাই, নাক কুঁচকে করমর্দন করল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। কড়া স্বরে বলল, 'কাল সকালের মধ্যে যদি স্টিয়ারিং ঠিক না হয়, আপনি অ্যাশকেলনের বন্দর কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করবেন। নেভি চায় না কেউ আমাদের বেসের এত কাছে থাকুক।'

'আশা করি সুস্থ হয়ে উঠবে এই বেটি,' একটু রাগ নিয়ে বলল সেবাস্তিয়ান। 'বুড়ি লর্ভেমার নাড়ির ভিতর এখনও অনেক প্রাণশক্তি।'

সন্দেহ নিয়ে একবার জাহাজের চারপাশে চাইল হাগ্যাই, তারপর গোল্ডবার্গ ও সৈন্যকে নিয়ে নেমে চলে গেল প্যাট্রল বোটে। ক্রুদের উদ্দেশে মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক থেকে খুলে নেয়া হলো দড়ি, দ্রুতগতিতে রওনা হয়ে গেল বোট। দু'পাশে ছড়িয়ে গেল প্রপেলারের ঢেউ, মাথার উপর ফেনা।

রেইলিঙে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে সেবাস্তিয়ান, তবে নেভির কেউ ঘুরেও চাইল না তার দিকে। বামহাতে ভুঁড়ি চুলকে চলেছে সে। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল বোট। এরপর সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। ক্যাপ্টেনের চেয়ে অনেক কম বয়স তার, বড়জোর তিরিশ। হাঁটছে ক্ষিপ্র চিতার মত। থামল সেবাস্তিয়ানের পাশে এসে।

'ভাল বুদ্ধি করেছিলি,' মৃদু হাসছে যুবক। 'মনে হলো একেবারে ছিটকে বেরিয়ে গেল ব্যাটারা প্রাণ হাতে নিয়ে।'

'তাই মনে হলো?' সঙ্গীকে নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন। ইজরায়েলি নেভি বেসের কাছের অংশ এখান থেকে কম করে হলেও এক মাইল। ওদিকে আর চাইল না ক্যাপ্টেন, নিশ্চিন্ত। দুই পাটি দাঁতের পিছন থেকে বের করে আনল মেডিকাল গজ। ফোলা গাল সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ হয়ে গেল। ক্যাপ খুলতেই ওটার সঙ্গে উঠে এল তেলতেলে উইগ। এবার তাকে তরতাজা যুবক মনে হলো। আসল চুল চমৎকার ভাবে ছাঁটা। খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলো অবশ্য তার নিজেরই। তিন দিন শেভ করেনি। হয়তো আবারও প্রয়োজন পড়তে পারে অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান সাজার।

'শুনলাম প্যানিক বাটন টিপেছিস,' বলল সোহেল আহমেদ। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সে। ট্রেনে বামহাত কাটা পড়বার পর তাকে সরিয়ে নেয়া হয় অ্যাকটিভ এসপিয়োনাজ থেকে। তবে অফিসে বসবার মন ওর কখনও ছিল না। আজকাল সুযোগ পেলেই প্রিয় বন্ধু মাসুদ রানার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ সব অ্যাসাইনমেন্টে।

এ জাহাজে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ক্যাপ্টেনের রয়েছে একটা কন্ট্রোলবক্স, ডেস্কের নীচে। তাতে রয়েছে বেশ কিছু সুইচ। তারই একটা ডেকে আনে লিউ ফু-চুংকে। একটু আগে সে ছিল কপাল-পোড়া এক ইঞ্জিনিয়ার, প্লামিঙের পাম্প চালিয়ে ঠিক করছিল নষ্ট কমোড। ওই পাম্প ব্যবহার করলে আগ্নেয়গিরির লাভার মত ছিটকে ওঠে কমোডের পানি। তাতে এমন কেমিক্যাল মেশানো, বেরোয় ভয়ানক দুর্গন্ধ।

'হাগ্যাই এলফেনবেইন শার্লক হোম্‌স্ হতে চাইল,' বলল মাসুদ রানা। 'তাকে অনিচ্ছুক না করে উপায় কী?'

'তোর কী মনে হয়, আবার আসতে পারে?'

'কাল সকাল পর্যন্ত এখানে বসে থাকলে, আসতেও পারে।'

'অতএব আজ রাতেই সব কাজ সারতে হবে,' একটু গম্ভীর হয়ে গেল সোহেল।

দুই বন্ধু থেমেছে একটা ইউটিলিটি ক্লজিটের সামনে। দরজা খুলতেই দেখা গেল ঝাড়ু, মপ ও ক্লিনিঙের নানা জিনিস। তবে কখনও ব্যবহার হয় না এসব। দুটো ঝাড়ু খানিক সরাতেই দেয়ালের গা থেকে উঠে এল গোল এক ডায়াল, মনে হলো ওটা কোনও সিন্দুকের। নির্দিষ্ট সংখ্যা ঘোরাতেই ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা, সরে গেল দেয়াল। সামনে চমৎকার কার্পেটে ঢাকা হলওয়ে। গাঢ় মেহগনি প্যানেল দু'পাশের দেয়ালে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ঝাড়বাতি, বিলিয়ে চলেছে নরম আলো।

আবারও শিপিং টাইকুন চ্যাঙ্গো পাপাগোপালার কাছ থেকে মার্ভেলকে ধার নিয়েছে মাসুদ রানা, জরুরি এক অ্যাসাইনমেন্টের জন্য। জাহাজটা বাইরে থেকে যা মনে হয়, আসলে মোটেই তা নয়। বর্তমান নামটা পর্যন্ত নকল। বো এবং স্টার্নে যে নাম, সেই অক্ষরগুলোকে ধরে রাখছে চুম্বক। সত্যিকার নাম দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। মস্ত জাহাজ ব্যবসায়ী চ্যাঙ্গো পাপাগোপালা এটা নিজের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু কখনও ব্যবহার করেননি। কিছুদিন আগে যখন বিসিআইয়ের চিফ রাহাত খানের পরামর্শে তাঁর কাছে একটা আধুনিক জাহাজ চাইল মাসুদ রানা, এটাই তিনি ঘুরিয়ে দেখান। বলেন, 'তুমি আধুনিক জাহাজ চাইছ। তোমাকে দেব অত্যাধুনিক জাহাজ! কিন্তু তার বদলে...'

তখনই ঠিক হয়, প্রশান্ত মহাসাগরে যারা একের পর এক তাঁর সুপারট্যাঙ্কারগুলো ছিনতাই করছে বা ডুবিয়ে দিচ্ছে, তাদের শায়েস্তা করবে রানা। বিনিময়ে মার্ভেলকে যে-কোনও সময় যে-কোনও প্রয়োজনে ধার নিতে পারবে ও। সে-সময় এ জাহাজের

বাইরের অংশ পাল্টে ফেলা হয়। মার্ভেলে আগেই ছিল ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন, যা জাহাজটাকে প্রায় উড়াতে সক্ষম। যোগ করা হয় স্ট্যাবিলাইযিং ফিন। এরপর মজবুত করা হয় বো, যাতে সহজে চলতে পারে বরফ ভেঙে। সাধারণ ওয়্যারিং ও যন্ত্রপাতি ফেলে বসানো হয় কয়েক শ' কিলোমিটারের বিশেষ ওয়্যারিং ও সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিক্স। যোগাড় করা হয় মিলিটারি-গ্রেড রেইডার ও বারোটা ক্লোজড সার্কিট টেলি ক্যামেরা—সব নিয়ন্ত্রণ করে মাইক্রো সিস্টেম্স্ সুপারকম্পিউটার।

সংযুক্ত হয় নানান ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র। যোগ করা হয় দুটো টর্পেডো টিউব ও একটি ১২০ এমএম কামান। সঙ্গে এম১এ১ অ্যাব্রাম্স্ ব্যাটল্ ট্যাঙ্কের টার্গেটিং সিস্টেম। তিনটে জেনারেল ইলেকট্রিক ২০ এমএম গ্যাটলিং গান কেনা হয়। ভার্টিক্যাল লঞ্চের জন্য থাকে সারফেস-টু-সারফেস অ্যান্টিশিপ মিসাইল। এ ছাড়া ডেকের উপর ঝালাই করা এক ড্রামের ভিতর থাকে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। জার্মানরা যেভাবে কে বোটে লুকিয়ে রাখত অস্ত্র, সেভাবে সব লুকানো হয় জাহাজের খোলে। দূর থেকে রিমোট-কন্ট্রোলের সুইচ টিপে প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করা যায়।

জাহাজে আরও চমকের ব্যবস্থা রেখেছে রানা। একটা ফোর-প্যাসেঞ্জার রবিনসন ও আর-৪৪ হেলিকপ্টার আছে। পিছনের এক হোল্ডের ভিতর ওটার হ্যাঙার। ডেকের উপর হেলিপ্যাড উঠে আসে হাইড্রোলিক্যালি। জাহাজের অভ্যন্তরে বিশেষ কয়েকটি কামরায় রাখা হয় ছোট ছোট জলযান। ওখান থেকেই সাগরে নামানো যায় জোডিয়াক ও সিল অ্যাসল্ট বোট। এ ছাড়া মার্ভেলে তৈরি করা হয় বিশাল এক সুইমিং পুল বা মুন পুল। ওখান থেকে

প্রয়োজনে সাগরে নামাতে পারে মিনি-সাবমার্সিবল।

এরপর মার্ভেলের প্রস্তুতি শেষে জাহাজে ওঠে একদল প্রশিক্ষিত ক্রু। তারা কোনও জাহাজ কোম্পানির লোক নয়, বেশির ভাগ এসেছে বাংলাদেশ নেভি থেকে। তারপর জাহাজে ওঠে বিভিন্ন দেশের কয়েকজন সুপার-স্পাই। তারা সবাই রওনা হয় এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে।

'স্বর্ণ বিপর্যয়ে'র সেই অসমসাহসিক অভিযানে রানার সঙ্গে যারা মার্ভেলে ছিল, তাদের প্রায় সবাই এবারও এসেছে—নতুন আরেক অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে। নতুন মুখও আছে সঙ্গে।

প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে কনফারেন্স রুমে ঢুকল মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। একটু আগে এখানে মিটিং চলছিল। ওরা যেইমাত্র সেকেণ্ডারি রেইডারে দেখেছে ইজরায়েলি প্যাট্রল বোট, কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রানা। চটজলদি বনে গেছে ক্যাপ্টেন অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান।

এ মুহূর্তে ফ্ল্যাট-প্যানেল টেলিভিশনের স্ক্রিনে লেজার পয়েণ্টার তাক করেছে লিউ ফু-চুং। সে কোনও প্লামার নয়, বাস্তবে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের সেরা এজেণ্টদের অন্যতম। অতুলনীয় এক রত্ন, জটিল সব মিশন সফল হয়েছে শুধু তার সহজ-সরল পরিকল্পনার জন্য।

প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুমে ফু-চুং সহ রয়েছে ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের তীক্ষ্ণধী স্পাই অনিল চ্যাটার্জী। কম্পিউটার জিনিয়াস বলা যায় তাকে। ঘরে সে ছাড়া রয়েছে ইন্দোনেশিয়ান নেভাল ইণ্টেলিজেন্সের লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার উর্বশী দাশা। সাব-মার্সিবল পরিচালনার উপর ব্রিটিশ নেভির সার্টিফিকেট রয়েছে তার। এরপর রয়েছেন পাইলট হিসাবে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন (অবঃ) আলম সিরাজ, বিমান ও হেলিকপ্টার বিশেষজ্ঞ।

আরও রয়েছে অস্ত্রের ডিলার রানার বন্ধু ভিনসেন্ট গগল, লেবানিজ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতাসি, হল্যাণ্ডের ডাক্তার ফারা রাইনার ও দুর্ধর্ষ ছ'জন বাংলাদেশি কমাণ্ডো।

রানা পাশে বসতেই নিচু স্বরে বলল উর্বশী দাশা, 'ওখানে কী হলো, ইজরায়েলিদের তাড়িয়ে দিলে স্রেফ মুখের দুর্গন্ধ দিয়ে?' সে মার্ভেলের অপারেশন্স ডেপুটি ডিরেক্টর। লিউ ফু-চুং অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে কমাণ্ডোদের নেতৃত্ব দেবে।

'সত্যি দুঃখিত,' আসল দাঁতগুলোর উপর থেকে প্লাস্টিকের খাপ সরিয়ে নিল রানা, ও-দুটো চলে গেল প্যান্টের পকেটে। আরেক পকেট থেকে বেরুল মিণ্ট লজেন্স, ফেলল মুখে। মেইন ডেকে যাওয়ার আগে লিমবার্গার পনির চিবিয়ে গিয়েছিল। চেয়ারে হেলান দিল এবার, মৃদু স্বরে বলল, 'বোধহয় মুখের দুর্গন্ধ আসল না, মনে হয় আমার ইংরেজির ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি।'

মৃদু হেসে ফেলল ফারা রাইনার ও উর্বশী। দু'জনই অপূর্ব সুন্দরী ও যার যার কাজে অত্যন্ত যোগ্য। তবে এখনও তাদের ভিতর কোনও বিরোধ দেখা যায়নি।

দুই রূপসীর উল্টো দিকে বসেছে মার্ভেলের চালক, ভিনসেন্ট গগল। পরিচিতরা জানে, অদ্ভুত কঠোর মনের মানুষ সে, কিন্তু বন্ধুদের জন্য যে কোনও সময় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। একবার মুখ দিয়ে কিছু বললে তা করেই ছাড়ে, সবসময়।

তার পাশে বিশালকায় আতাসি, মার্ভেলের চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার। কমাণ্ডো হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ, মাসুদ রানার একটি কথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আগুনে। আরেকটা কাজে দক্ষ, প্রায় যে-কোনও তালা, তা সাধারণ হোক বা ইলেকট্রনিক, কয়েক সেকেণ্ডে খুলতে পারে।

রানার এক পাশে বসেছে সোহেল আহমেদ। রানা জাহাজে

না থাকলে এ দলের দায়িত্ব বর্তায় তার উপর। ও যখন অ্যাকটিভ এসপিয়োনাজে ছিল, রানা আর ওকে বলা হতো, পাকিস্তানের ব্রাইটেস্ট এজেন্ট।

'রানা কি ফিরেছে?' স্পিকার-ফোনে বলে উঠল গম্ভীর এক কণ্ঠ। সিকিওর চ্যানেলে বিসিআই হতে যোগাযোগ করেছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।

'জী, স্যর। ফিরেছি।'

'ইজরায়েলিরা কিছু সন্দেহ করছে, রানা?'

'খুব বেশি নয়, স্যর। ওদের নেভাল বেসের কাছেই থেমেছি। আশপাশে দু'চারটে জাহাজও আছে।'

'তোমরা যদি ফিরে আসতে চাও, কেউ কিন্তু দুষবে না,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা জানি এটা সুইসাইডাল মিশন, কিন্তু...'

'আমরা কাজ শেষ না করে ফিরছি না, স্যর,' বলল রানা।

ও জানল না, তাঁর নিজ হাতে গড়া প্রিয় শিষ্যের কথা শুনে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে বৃদ্ধ জেনারেলের।

বেশ কিছু দেশের সিক্রেট সার্ভিস চিফ ভরসা করছেন রানা ও তার বন্ধুদের উপর। কেউ কেউ পাঠিয়েছেন তাঁদের সেরা এজেন্টকে।

উপায়ই বা কী তাঁদের!

আজ থেকে এক মাস বারো দিন আগে খবর শুনে চমকে ওঠেন তাঁরা। তার তিন দিন আগে মাসুদ রানার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর এক পশ্চিমা পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন রাহাত খান। তখন লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিল রানা, রানা এজেন্সির কাজে। হঠাৎ ওর অফিসে এসে ঢুকল কমপিউটার জাদুকর রায়হান রশিদ, হাতে মোটা এক ফাইল, কুঁচকে রেখেছে ভুরু।

'কী নিয়ে এলে?' জানতে চাইল রানা। খেয়াল করেছে, দু'দিন ধরে অফিসে কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করছে রায়হান রশিদ। চোখ-মুখ কী যেন বলতে চায়, আবার চেপেও যায়। রানার আন্দাজ, হয়তো বিয়ে করতে চলেছে ছোকরা।

'জানি সব শুনলে আমাকে কান ধরে রানা এজেন্সি থেকে বের করে দেবেন আপনি, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'কিন্তু... সেটা কী ঠিক হবে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ওর মুখ দেখল মাসুদ রানা, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'খুলে বলো কী বিষয়!'

আস্তে করে রানার সামনে ফাইলটা নামিয়ে রাখল রায়হান। 'একবার পড়ে দেখুন কী দারুণ বিষয়।'

'গল্প লিখেছ?'

'ঠিক তা নয়। ওটা পেন্টাগনের ফাইল, মাসুদ ভাই। ইজরায়েল ও পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য তৈরি করা।'

'আবারও হ্যাকিং শুরু করেছ, রায়হান?' কড়া ধমক দেয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রানা।

'এই একটু আর কী!' কানের লতি চুলকাতে লাগল রশিদ।

'তার মানে আবারও পিছনে লাগবে সিআইএ, এরপর সত্যিই খুন হয়ে যাবে তুমি ওদের হাতে!'

'তাতেও কষ্ট নেই, মাসুদ ভাই। একবার কাগজগুলো পড়ে দেখুন।'

রায়হান রশিদকে হাতের ইশারায় বসতে বলল রানা, চোখ বোলাতে শুরু করল প্রথম পৃষ্ঠার উপর। দু'মিনিট পেরুনোর আগেই চমকে উঠল। বুঝতে শুরু করেছে, ও পড়ছে এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার নীলনক্সা।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ইজরায়েলকে দেয়া হবে দুটো

ট্রাইডেন্ট ইলেভেন সাবমেরিন। সঙ্গে দশটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইউজিএম ওয়ান-থ্রি-থ্রি ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট ইলেভেন ব্যালেস্টিক মিসাইল। এসব বিনামূল্যে ইজরায়েলকে দান করছে আমেরিকা। এক মাস দশ দিন পর ইজরায়েলের নেভি বেস অ্যাশকেলন-এ পৌঁছবে এসব অস্ত্র। ততদিনে ইজরায়েল নেভির দুই গ্রুপ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবে ইউএস নেভাল বেসে।

এবার একের পর এক পৃষ্ঠা পড়তে শুরু করল রানা। একটু পর টের পেল, শুকিয়ে গেছে জিভ।

ফাইলের মূল বক্তব্য:

বেশি কিছু করতে হবে না ইজরায়েলকে। তারা শুধু দুটো করে আণবিক বোমা ফেলবে পাঁচটা দেশের উপর। তেহরানকে দিয়ে শুরু হবে, তারপর একে একে আরও চারটি তেলসমৃদ্ধ দেশের উপর। বদলে তেল আবিব পাবে ক্রুড অয়েলের ভাগ। এদিকে কিছু দেশে উস্কে দেয়া হয়েছে বিরোধী দলগুলোকে। যেমন হয়েছে মিশর, লিবিয়া ও সিরিয়ায়। পরবর্তী সময়ে এসব দলকেও শায়েস্তা করা হবে। মোটকথা অস্থির করে তোলা হবে গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে। এরপর যা করবার করবে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আরও কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। সৌদি আরব, কুয়েত সহ অন্যান্য আরব দেশে একই সঙ্গে নামবে লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ সৈনিক। চাপের মুখে থাকা নড়বড়ে সরকারগুলো কিছু বুঝবার আগেই আধুনিক অস্ত্রের জোরে কেড়ে নেয়া হবে খনিগুলোর কর্তৃত্ব। সোজা কথায়, বেদখল হয়ে যাবে তেল-সমৃদ্ধ আরব বিশ্ব। পশ্চিমাদের রুখতে চাইবে রাশা, চিন ও ভারত; কিন্তু পিছিয়ে যেতে হবে তাদেরকেও। হুমকির মুখে থাকবে তারা নিজেরাও। পশ্চিমা বিশ্ব ক্রুড অয়েলের চালান বন্ধ করলে মুখ থুবড়ে পড়বে তাদের অর্থনীতি।

এ পরিকল্পনায় বিশদ পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায় যে অবস্থা তৈরি করা গেছে, ঠিক তেমনই করা হবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশে। বর্তমান বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে এখনই সঠিক সময় পশ্চিমা দেশগুলোর গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কব্জায় আনার। নির্লজ্জ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোনও দেশের জনগণ বিরোধিতা করতে চাইলে কীভাবে দমন করা সম্ভব। এতে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ সেনাও মারা পড়বে, কিন্তু সেই মৃত্যুর বদলে তাদের দেশ পাবে আগামী কয়েক শ' বছরের অকল্পনীয় সমৃদ্ধি। শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য বর্ণ ও জাতির মানুষ কাটাবে ক্রীতদাসের জীবন।

পুরো ফাইল পড়বার পর রায়হানের দিকে চাইল রানা। শুধু এটুকু বলল, 'তুমি আমাদের সেফ হাউসে চলে যাও, তোমাকে যত দ্রুত সম্ভব আমার সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে।'

'আমি কিন্তু ধরা খাইনি, মাসুদ ভাই,' হেসে ফেলল রায়হান। 'ওরা জানে না আমি হ্যাক করেছি।'

'তবুও।'

পরদিন রায়হান রশিদকে নিয়ে আমেরিকা ত্যাগ করল রানা। তার আগেই সিকিওর্ড ই-মেইলে বিসিআই-এ পাঠিয়ে দিয়েছে ওই ফাইল।

এরপর এশিয়ার শক্তিশালী কয়েকটা দেশ সফর করেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। বেইজিঙে গোপন একটি মিটিং হয়। তাতে যোগ দেন বেশ কিছু দেশের সিক্রেট সার্ভিস চিফ। শুরু হয় প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রণয়ন। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের পরামর্শে একটি গোপন মিশনের কথা ওঠে। ঠিক হয় সুপার-স্পাইদের একটি দল গঠন করা হবে। এবার বিসিআই

চিফ তুখোড় কয়েকজন এজেন্টের কথা তোলেন। আলোচনায় ঠিক হয়, 'মিশন ইজরায়েল'-এ যোগ দেবে সংশ্লিষ্ট এজেন্টরা। সিক্রেট সার্ভিসগুলোর প্রধানদের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, এসব এজেন্টদের দলনেতা হিসাবে থাকবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। তার দলের কাজ ইজরায়েলি সাবমেরিন হামলা নস্যাৎ করা। এই মিশন সফল হওয়ার পর পরই পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার প্রধানকে জানানো হবে, তাদের হীন ও নোংরা পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে। এবং সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এ মুহূর্তে ইজরায়েলি নেভি বেস অ্যাশকেলন-এ হাজির হয়েছে মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, লিউ ফু-চুং, অনিল চট্টোপাধ্যায়, উর্বশী দাশা, আতাসি ও কর্তব্যপরায়ণ ক'জন বাঙালি কমাণ্ডো। এ ছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ নেভির দক্ষ অফিসার ও নাবিকরা। রানার অনুরোধে এসেছে ভিনসেন্ট গগল ও ডক্টর ফারা রাইনার। জাহাজে উঠবার পর তারা জেনেছে যদি এ মিশন সফল না হয়, শুরু হবে পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

স্পিকার-ফোনে বলে উঠলেন রাহাত খান, 'তোমরা কখন রওনা হবে, রানা?'

'ঠিক মাঝ রাতে, স্যর।'

'বেশ, মিশন শেষ হলে জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলব আমি,' বললেন চিফ। 'গুড লাক বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস।'

কেটে গেল ফোন লাইন।

ভিনদেশি এজেন্টরা একটু গম্ভীর হলো। কেউ কেউ ভাবছে, বোঝাই যাচ্ছে, রানা ও সোহেলের জন্য কী পরিমাণ চিন্তিত ওদের বস। এভাবেই কি উদ্বিগ্ন হন আমার চিফ? না বোধহয়!

এ ঘরের সবাই ইতিমধ্যে জেনেছে, আগামীকাল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করবেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। উনি কথা বলে টের পেয়েছেন, আমেরিকান সরকার কী ঘটাতে চলেছে, এখনও জানেন না নুমার চিফ। কাজেই রানাদের যদি কোনও সাহায্য প্রয়োজন পড়ে, তা মিলতে পারে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন তথা নুমার কাছ থেকে।

'আশা করি কালকে এ সময়ে আমরা পাঁচ শ' মাইল দূরে,' বলল কমাণ্ডোদের একজন। 'চলেছি সুয়েজ খাল পেরিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালীর দিকে।'

'না-ও হতে পারে,' আপত্তি তুলল বাংলাদেশ নেভির কট্টর অফিসার লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা। ভাল কবিতা লেখে সে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল পারে বেয়াড়া লোকদের পেটাতে। তটস্থ হয়ে রয়েছে পুরুষ কমাণ্ডোরা, খুব একটা কথা বলছে না। কে চাইবে মান খোয়াতে! 'শেষ খবর অনুযায়ী মেডিটারেনিয়ানে রয়েছে আমেরিকান আটলান্টিক ফ্লিটের এক অংশ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফু-চুং। 'মিথ্যা নয়।'

'ওরা আমাদের থামাতে চাইবে? কেন?' প্রথমবারের মত মুখ খুলল ডক্টর ফারা রাইনার।

'তুমি তাদের প্রিয় দোসরের সর্বনাশ করবে, আর তারা সহজে ছেড়ে দেবে তোমাকে?' বলল সোহেল। 'তা ছাড়া, এই মিশন সফল হলে গালে চড় খাবে আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলো।'

নৈঃশব্দ্য নামল ঘরে।

'কারও কোনও প্রশ্ন?' খানিক পর জানতে চাইল রানা।

'ডেকের কন্টেইনার, রানা,' বলল সোহেল। 'আমরা ওগুলো সন্ধ্যার পর খুলে নেব, না অপারেশন শেষে? আরেকটা ব্যাপার, রং এবং অন্য ক্যামোফ্লেজের কী ব্যবস্থা?'

মার্ভেলের ডেকে যে কন্টেইনার, প্রতিটি নকল। সহজেই ভাঁজ করে রেখে দেয়া যায় মাত্র একটি হোল্ডে। জাহাজের খোলে যে নীল ও অন্য রং, সব পরিবেশ-বান্ধব পিগমেন্ট, চাইলেই ফায়ার-সাপ্রেশন ওয়াটার ক্যানন দিয়ে ধুয়ে নামিয়ে দেয়া যায়। ওসব রঙের নীচে লুকিয়ে রয়েছে অন্য রঙের পোঁচ। যে-কেউ দেখলে ভাববে, গত তিরিশ বছরে অন্তত পাঁচবার মালিকানা বদল হয়েছে এ জাহাজের। এবং কেউ যত্ন নেয়নি এটার। তবে আসল কথা হচ্ছে, ওই রং অত্যন্ত দামি এক ধরনের কোটিং। ওটা ফাঁকি দিতে পারে রেইডারকে। চিনের তৈরি এ জিনিস আমেরিকার স্টেলথ ফাইটার বিমানে ব্যবহার করা জিনিসের সম মানের।

এ ছাড়া মার্ভেলের বিভিন্ন অংশে যোগ করা হয়েছে ধাতব পাত, সেগুলো আকৃতি বদলে দিয়েছে জাহাজটির। এই মিশন শেষে মার্ভেলের বো থেকে নামিয়ে নেয়া হবে হালকা একটা খাপ। ওটা অন্য আঙ্গিক দিয়েছে জাহাজকে, দেখলে মনে হয় বো'র মুখ সুঁচালো। এরপর সরিয়ে নেয়া হবে জোড়া চিমনি। তার বদলে বসিয়ে দেয়া হবে পেট-মোটা এক চিমনি। ওটাই আবার রক্ষা করবে মেইন রেইডার ডোমগুলো। আপাতত সেসব রাখা হয়েছে জাহাজের ভিতর। শেষে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরে নিলেই টইটম্বুর হয়ে উঠবে মার্ভেল, দেখে মনে হবে মালামালে ঠাসা।

ক্রুদের সবাই চার ঘণ্টা খাটলে উধাও হবে দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রি, বদলে হয়ে যাবে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, 'আজ রাতে চাঁদের কত অংশ উঠবে, গগল?'

'চার ভাগের এক ভাগ।' জাহাজের ন্যাভিগেটর ও ওয়েদার-ম্যান গগল। 'মিটিওরলোজিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী মাঝ রাতের পর আকাশে থাকবে মেঘ।'

'তা হলে মাঝ রাতের পর কাজে নামুক ক্রুরা। আমরা ফিরব রাত দুটোর দিকে। তাও চার ঘণ্টা হাতে থাকবে জাহাজ পাল্টে নেয়ার জন্য। যদি নেভাল বেসে কোনও মস্ত ভুল করি, তা হলে তোমরা সবাই আগের মত করে নেবে জাহাজটা। ...কারও কোনও প্রশ্ন?'

কয়েকজন আস্তে করে মাথা নাড়ল। শুরু হলো খসখস আওয়াজ, সবাই প্ল্যানের কাগজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

'রাত এগারোটার সময় মুন পুলে থাকব আমরা,' বলল রানা। 'যে যার ইকুইপমেন্ট চেক করে নেব। মিনি-সাব নামানো হবে বারোটার আগে। যদি তার পরে রওনা হই, জোয়ার-ভাটার ফাঁদে পড়ব।' উঠে দাঁড়াল ও, একবার সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল। 'প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের হেড খেয়াল করো, বিশেষ করে শোর অপারেশন্স...' গগল ও অনিলের দিকে চাইল। 'জানি তোমরা পূর্ণ সতর্ক থাকবে। তারপরও, আমরা যদি ব্যর্থ হই, দেরি না করে উধাও হয়ে যাবে জাহাজ নিয়ে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল অনিল। 'আমাদের পরিকল্পনা খারাপ নয়। আশা করা যায় মসৃণভাবেই চলবে সব।'

'আমারও তাই আশা,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

তিন

চট্ করে ভেঙে গেল রানার অগভীর ঘুম। বোর্ডরুমের কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে প্রথমেই সেবাস্তিয়ানের পোশাক খুলে সাবান মেখে স্নান সেরেছে, তারপর সন্ধে পর্যন্ত জরুরি কাজগুলো শেষ করেছে একের পর এক। ঠিক সাড়ে সাতটায় মোস্তফা আবুলের ডাক পেয়ে ডিনার খেয়ে নিয়েছে সবার সঙ্গে বসে। তারপর সোজা বিছানায়। মহাবিপদের দিকে চলেছে, তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই—ঘুমিয়ে পড়েছে এক মিনিট পেরুনোর আগেই ।

ওর কোনও অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার পড়ে না, ঠিক তিন ঘণ্টা পর জেগে উঠেছে। আর পঞ্চাশ মিনিট পরেই ডাক পড়বে মুন পুলে।

বিছানা ছেড়ে সোজা বাথরুমে ঢুকল রানা, শাওয়ার নেবে। ইলেকট্রিসিটির অভাব নেই মার্ভেলে, সারাক্ষণই চালু থাকে গিজার। শাওয়ার খুলে গা-পোড়ানো গরম পানির নীচে দাঁড়াল রানা, তবে তা মাত্র দু'মিনিটের জন্য। আরেকটা বোতাম টিপতেই নামল বরফ-ঠাণ্ডা পানির বর্ষণ। তিন মিনিট পর তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিল দেহ, শেভ করে নিল চটপট। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ না থাকায় নিজেকে ভদ্রলোক মনে হলো। পোশাক পরে এসে ঢুকল বেডরুমে।

ঠিক তখনই সুইটের দরজায় টোকা পড়ল। পরক্ষণে খুলে

গেল দরজা, নিঃশব্দে ঢুকল মার্ভেলের বাবুর্চি মোস্তফা আবুল। হাসি মুখে বলল, 'আপনার মিডনাইট কফি, স্যর।'

বাংলাদেশ নেভির বাবুর্চি ছিল, রিটায়ার করেছে কিছুদিন আগে—রান্নার উপর ডিপ্লোমা কোর্স করেছে অস্ট্রেলিয়ান এক কুকিং কলেজ থেকে। কঞ্চির মত চিকন এক লোক, গোঁফ দেখে মনে হয় বদমেজাজি কোনও জেনারেল। পরনে সর্বক্ষণ কালো কোট, সুতির সাদা শার্ট—কখনও কোঁচকানো দেখা যায় না। কাহিনি বলার ওস্তাদ, জাহাজে কে কী করছে, কার মনে কী চলছে সব খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। একটু সুযোগ পেলেই একজনের কথা জানিয়ে দেয় আরেকজনকে।

'ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখুন,' বেডরুম থেকে বলল রানা। পাশেই ওর ছোট্ট স্টাডিরুম। এটা সাজানো হয়েছে দামি হোটেলের ঘরের মত। স্টাডিরুমের চার দেয়াল ও সিলিঙে কালচে মেহগনির প্যানেল, ডেস্ক ও কেবিনেটগুলো সেগুনকাঠের। একদিকের দেয়ালে বিশাল এক ছবি, ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভিতর দিয়ে চলেছে অকুতোভয় জাহাজ।

রুপোর ডিশগুলো ডেস্কে নামিয়ে রাখল মোস্তফা। ঢাকনি খুলে ফেলল সে। তার হিরোকে কখনও শুধু কফি দেয় না সে। সঙ্গে রয়েছে অমলেট, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পাউরুটির টোস্ট আর মোটাসোটা এক টুকরো বিফ স্টেক। কেবল রান্না করেই নয়, পরিবেশন করেও আনন্দ পায় রন্ধনশিল্পী। গন্ধে ম-ম করে উঠল সুইট। ট্রের পাশেই রেখেছে রেড ওয়াইন। প্রায় ছুটে এল রানা।

চেয়ারে বসে স্টেকে কাঁটাচামচ গাঁথতেই বলল আবুল, 'জলিল খানের শেষ খবর জানেন, স্যর?' কমাণ্ডো জলিল খানের কথা উঠলেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মোস্তফার চেহারা।

'জানি না তো।'

'আর্জেন্টিনার মেয়েটি এখনও ইন্টারনেটে যোগাযোগ রাখছে। জলিল খান প্রথমে ভেবেছে ওই মেয়ে তাঁর জীবনের শেষ প্রেম, তবে এখন সন্দেহ করছে, সে আসলে মেয়েই নয়!' প্রায় ফিসফিস করল বাবুর্চি।

মুচকি হাসল রানা। ডেস্কের পিছনের অ্যান্টিক সেফ খুলছে।

'মন ভেঙে গেছে জলিল খানের। কাসেম বক্সের কাছে সেই মেয়ের বা লোকের—যাই হোক—একটা ছবি দেখেছি। তার ধারণা ফোটোশপ দিয়ে বানানো হয়েছে ছবি। চ্যাট রুমে কপাল খুলছে না জলিল খানের।'

সিন্দুকের ভারী দরজা খুলে ফেলল রানা। ভিতরে নানা ধরনের অস্ত্র। মার্ভেলের আর্মারির পাশেই সাউণ্ডপ্রুফ শুটিং রেঞ্জ, তবে রানা নিজের অস্ত্রগুলো এ ঘরে রাখে। সিন্দুকে রয়েছে মেশিন পিস্তল, অ্যাসল্ট রাইফেল ও বিভিন্ন হ্যাণ্ডগান।

'ডক্টর রাইনারের কাছে গেছে এবার জলিল খান। ছবি দিয়ে বলেছে, একবার দেখুন তো এ ছেলে না কি মেয়ে...' বলে চলেছে মোস্তফা।

ওয়ালথার তুলে নিল রানা, একবার চেম্বার চেক করে কোমরে গুঁজে রাখল। স্টেক শেষ, দু'কামড় অমলেট নিল এবার। টের পেল শিরার ভিতর দ্রুত চলছে রক্ত। আনমনে প্রশ্ন করল, 'ডক্টর রাইনার কী বললেন?'

'মন্তব্য করেননি। এখন কথা হচ্ছে জলিল খান কী করবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা।

'সন্দেহ ঢুকে গেছে মানুষটার মনে। কাশেম বক্স অবশ্য সাহস যোগাচ্ছে: তুই চালিয়ে যা, জলিল। কোনও ভয় করবি না। আমরা তোর পিছনে আছি। তুই মরলে নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দেব।'

'তাই বলেছে?'

'জী, স্যর।' ডিশগুলো ট্রে-তে তুলে নিল বাবুর্চি। 'বুঝলেন স্যর, কাশেম বক্সের মন পাথরের মত শক্ত। গর্ব করে বলে, কখনও কোনও মেয়ের প্রতি দুর্বল হয়নি।' দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাল মোস্তফা। 'স্যর, সকালে কী নাস্তা দেব?'

তার মূল বক্তব্য: স্যর, আপনারা সহি সালামতে ফিরে আসুন, আমার তৈরি সেরা ব্রেকফাস্ট তৈরি থাকবে।

'কিছু দিয়ো।'

প্রায় একই সঙ্গে সুইট থেকে বেরিয়ে এল মোস্তফা আবুল ও রানা। বাবুর্চি বাঁক নিল গ্যালির দিকে। বামদিকের করিডোর ধরল রানা। এলিভেটরে উঠে তিনতলা নেমে এল, দরজা খুলে যেতেই সামনে পড়ল বিশাল এক গুহার মত ঘর। ফ্লাডলাইটে জ্বলজ্বল করছে চারপাশ। সাগর থেকে আসছে নোনা জলের গন্ধ। একটু দূরে প্রকাণ্ড এক সুইমিং পুল, এখন খালি। তার পাশেই শক্তিশালী ক্রেন। ওটা থেকে ঝুলছে সাবমারসিবল, ডিসকভারি-১০০০। জিনিসটা দৈর্ঘ্যে পঁয়ষট্টি ফুট। পাইলট, কো-পাইলট সহ ওটার ভিতর আঁটে ছ'জন। বো'র দিকে রয়েছে তিনটে পোর্টহোল, সঙ্গে আর্মার্ড যেনন ল্যাম্প, আর একটি বাহু। ওই বাহু দিয়ে ইস্পাতের পাতও ছেঁড়া যায়। পানির নীচে এক হাজার ফুট নামতে পারে ডিসকভারি-১০০০। সে-তুলনায় ডিসকভারি-৯৯৯ অনেক কম নীচে নামতে পারে—মাত্র এক শ' ফুট। আপাতত উপরের এক ক্রেডলে রাখা আছে ওটা। তবে ওটার সঙ্গে রয়েছে ছোট একটা ডাইভিং চেম্বার, ফলে পানির নীচ দিয়ে ঢুকতে বা বেরুতে পারে সাঁতারুরা।

ডিসকভারি-১০০০-এর নীচের ডেক থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে গ্রেইটিং, নীচে হাঁ হয়ে রয়েছে গহ্বর—সেই মার্ভেলের

কীল পর্যন্ত। এখনও খোলা হয়নি জাহাজের নীচের দিকের দরজা। তবে পাম্পগুলো দ্রুত ভরে তুলছে সুইমিং পুল। কিছুক্ষণ পর রওনা হবে সাবমারসিবল।

কালো ওয়েট সুট পরছে ফু-চুং, আতাসি ও সোহেল। ওটার নীচে সুইম ট্রাঙ্ক। ইতিমধ্যে সবার স্কুবা ইকুইপমেন্ট তোলা হয়েছে সাব-এ। পাশে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে উর্বশী।

ওয়েট সুট পরতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছে আতাসি।

কাছে গিয়ে তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'তোমার পেট বড় হয়ে উঠছে। এখনই সামলে নেয়ার সময়।'

'লোভটুকু না হয় আমার, বস্, কিন্তু আসল দোষ আপনার ওই বাবুর্চির,' বলল আতাসি। 'প্যাটিস-পেস্ট্রি খাইয়েই তো...'

পাশের বেঞ্চে বসে পড়ল রানা, ওয়েট সুটের বদলে পরছে ড্রাই সুট। 'উর্বশী, প্রিলঞ্চ চেক শেষ করেছ?'

'রওনা হতে পারি।'

'আর ক্রেডল?'

'সব সিকিওর করা হয়েছে।'

পাশে চলে এসেছে এক ইঞ্জিনিয়ার, তার কাছ থেকে হেডসেট নিল রানা, যোগাযোগ করল অপারেশন্স সেন্টারে। ওখানে আতাসির বদলে রয়েছে বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। 'রানা বলছি। বাইরের অবস্থা কী?'

'সব ধরতে গেলে সুনসান, মাসুদ ভাই। শুধু একটা কন্টেইনার শিপ থেমেছে মেইন ডকে। তাও দু'ঘণ্টা হলো।'

'নেভাল বেস থেকে কোনও নড়াচড়া?'

'নেই। সব ফ্রিকোয়েন্সি চেক করেছি। মেডিটারেনিয়ান থেকে আসছে জাহাজে জাহাজে ভ্যাজর-ভ্যাজর। জরুরি কিছু নয়।'

'গগল, অনিল, তোমরা তৈরি তো?'

গগল ও অনিল টিম হিসাবে কাজ করছে। ওদের দায়িত্ব ন্যাভিগেশন ও ওয়েপন্স সিস্টেম-এর উপর নজর রাখা।

'আমরা তৈরি,' প্রায় একইসঙ্গে বলল ওরা দু'জন।

'আমরা ডিসকভারির ভিতর ঢুকলে আরেকবার কমিউনিকেশন চেক করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

ফু-চুং, আতাসি ও সোহেল তুলে নিয়েছে ওদের অস্ত্র ও গিয়ারের ব্যাগ, উঠে পড়েছে মিনি-সাবের উপর। গোল হ্যাচ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ওদের পর পর উর্বশী ও রানাও। ভারী হ্যাচ ভিতর থেকে আটকে নিল রানা। এক ঘণ্টা লাগবে ওদের তীরের কাছে পৌঁছতে। যে যার সিটে বসে পড়ল রানা, সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি। যাওয়ার পথে ওরা ভাগ করে নেবে স্কুবা ইকুইপমেন্ট।

সোহেল ও রানাকে পাশ কাটাল উর্বশী, গিয়ে বসে পড়ল পাইলটের সিটে। ওটা নিচু একটা চেয়ার, চার দিকে অসংখ্য সুইচ, ডায়াল ও মনিটর। চারদিক থেকে আসছে সবুজ আভা, দেখে মনে হয় ভিনগ্রহের মানুষ উর্বশী। 'মার্ভেল, কী অবস্থা?' হেডসেট পরে নিয়ে জানতে চাইল।

'ফাইভ বাই ফাইভ,' মার্ভেলের কমিউনিকেশন সিস্টেম ১৩২-বিট এনক্রিপশন-এ চলে। প্রতি সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে চলে সাইকেল। অর্থাৎ ইন্টারসেপ্ট বা ডিক্রিপশনের সুযোগ নেই।

সাব-এর সবাই কমিউনিকেশন চেক করে নিল। ওরা যে ডাইভ হেলমেট সঙ্গে নিয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড আলট্রাসনিক ট্র্যান্সিভার, ফলে নিজেদের ভিতর যোগাযোগ করতে পারবে। চাইলে ডিসকভারি-১০০০ বা মার্ভেলের সঙ্গেও কথা বলা

সম্ভব।

'এবার আমাদের নামিয়ে দেয়া যায়,' নির্দেশ দিল উর্বশী।

মুন পুলের আলো মৃদু হয়ে উঠল, পানির গভীরে যাবে না সেই প্রভা। এদিকে ধীরে ধীরে খুলছে কীলের দরজা। মন্থর গতিতে নড়ল সাবমারসিবল। যেন হোঁচট খেল, পরক্ষণে নামতে লাগল। পোর্টহোলগুলোকে চুমু দিল মেডিটারেনিয়ানের পানি। অতি ধীরে পানিতে নেমে গেল সাব, পেল নিউট্রাল বয়্যান্সি। এবার সরে গেল ক্ল্যাম্পগুলো, একটু টলমল করে উঠল সাব।

ব্যালাস্ট পাম্প অ্যাকটিভেট করল উর্বশী, ভরে উঠছে ট্যাঙ্ক, তারপর ধীরে মার্ভেলের নীচ থেকে বেরিয়ে এল সাব। প্র্যাকটিস করেছে অন্তত বারো বার, তবুও খুব সাবধানে নামতে শুরু করল উর্বশী। ডেপথ গজ দেখছে, খেয়াল রাখছে লেজার ফাইণ্ডারের উপর। কীলের কাছ থেকে সরে এসে বলল, 'ডিসকভারি সরে এসেছে।'

সাবমারসিবল এখন জাহাজের বিশ ফুট নীচে।

মার্ভেল থেকে বলা হলো, 'এবার দরজা বন্ধ হবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

আরও চল্লিশ ফুট নেমে এল উর্বশী, আর মাত্র তিন ফুট নীচে সাগর তল। এবার নেভাল বেসের দিকে রওনা হয়ে গেল ও। প্রপেলারের আওয়াজ যেন যতটা সম্ভব মৃদু হয় তাই অতি মন্থর গতিতে চলেছে। পানির ভিতর জেগে থাকতে পারে অ্যাক্টিভ সোনার। হয়তো টের পাবে কোনও অপারেটর। অ্যাশকেলন বন্দরে জাহাজের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে। কাজেই একটু অ্যাকুস্টিক ওয়েভ পেলেই টের পেয়ে যাবে ইজরায়েলিরা।

ভিয়্যুয়াল ডিটেকশন হতে পারে। পানির গভীরতা ষড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টি ফুট। ডিসকভারি-১০০০-এর বাইরের আলো নিভিয়ে

রাখা হয়েছে। লাইট ডিটেকশন অ্যাণ্ড রেঞ্জিং সিস্টেমের রিফ্লেকটেড লেজার ব্যবহার করছে উর্বশী। লিডার সিস্টেম-এ সামনের দিক থেকে যোগান মিলছে তথ্যের। কাজ করে চলেছে থ্রি-ডিমেনশনাল কম্পিউটার। সামনের দিক সহজেই দেখাবে লিডার। একটা কোকের ক্যান পড়ে থাকলেও।

'আপনাদের পাইলট বলছি,' কাঁধের উপর দিয়ে চাইল উর্বশী। 'আমরা পানির আটষট্টি ফুট নীচ দিয়ে চলেছি। গতি ঘণ্টায় তিন নট। আমরা গন্তব্যে পৌঁছব মোটামুটি বাষট্টি মিনিট পর। এই সময়ে অ্যাপ্রুভড ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করতে পারেন। কিছু চাইলে অ্যাটেণ্ডেন্টের কাছে বলুন।'

'আমার বিয়ার গরম কেন?' আপত্তি তুলল সোহেল।

'আমার একটা কম্বল দরকার, সেই সঙ্গে বালিশ,' আবদার জুড়ল ফু-চুং। 'তা ছাড়া আপনাদের মেয়েটি এখনও ডাবল স্কচ দিয়ে গেল না!'

'ওসব হবে না,' কড়া স্বরে বলল উর্বশী। 'আপনারা টিকেটবিহীন যাত্রী, ঘাড় ধরে ফেলে দেয়া হবে বিমান থেকে।'

পরবর্তী আধঘণ্টা সবার হাসি-ঠাট্টা থেকে মনেই হলো না, এরা আসলে ইজরায়েলের সবচেয়ে হেভিলি সিকিওর্ড নেভি বেসে ঢুকছে। যেন কোনও বিপদই হতে পারে না। তবে জানে কী ধরনের ঝুঁকি নিতে চলেছে। ওরা পেশাদার, মনের উপর চাপ না দিয়েই দায়িত্ব পালন করতে অভ্যস্ত।

পরবর্তী আধঘণ্টা হাসি-ঠাট্টা চলল না। রানা, সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি নিজ নিজ স্কুবা গিয়ার পরতে ব্যস্ত থাকল। সবাই চেক করল সবার গিয়ার, সেগুলো রিচেক করা হলো। সুট পরা হলে রানা ও সোহেল ঢুকে পড়ল ফোন বুদ আকৃতির লকারে। এ চেম্বারের উপর রয়েছে একটা হ্যাচ, খোলা যায় ককপিট থেকে।

এয়ার লক থেকেও অপারেট করা যায়। চেম্বারের দু'পাশে সমান প্রেশার তৈরি হলে খোলা যায় আর্মার্ড দরজা। সময় নষ্ট না করে নিজে চেম্বারের কন্ট্রোলগুলো অপারেট করল রানা। চেম্বার ভরে উঠছে সাগরের পানিতে। লবণ-পানি ঘিরে ফেলছে রানা ও সোহেলকে। সুটগুলো সেঁটে গেল দেহে। ড্রাই সুটের কোঁচকানো ভাঁজগুলো ঠিক করে নিল রানা। এ জিনিস সহজেই ছেঁড়ে। দু'জন বারকয়েক চোয়াল নাড়ল, ঠিক হয়ে গেল কানের ভিতরের প্রেশার। গলার কাছে পানি চলে আসতেই আবারও সুইচ টিপল রানা। এবার ডাইভ হেলমেট পরে নিল ওরা।

'আপনাদের কোনও অসুবিধে?' জানতে চাইল আতাসি। মনে হলো অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল ওর কণ্ঠ।

'সব ঠিক,' বলল রানা। 'ফু-চুংকে নিয়ে চেম্বারে আঁটবে তুমি, নাকি একজন একজন করে বেরুবে?'

'উনি চেপ্টে যাবেন, হাতির চাপে পিঁপড়ের যা হয়। তবে বাঁচতেও পারেন।'

'রানা, লিডার তথ্য দিচ্ছে,' বলল উর্বশী। 'সামনে সাবমেরিন পেনের দরজা। আমরা ওটা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে।'

'ঠিক আছে, উর্বশী। ড্রাই ডকের দরজার ডানে রাখো।'

'রজার।'

এক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর থরথর করে নড়ে উঠল ডিসকভারি-১০০০। দু'মিনিট পর নেমে এল বালির উপর। 'অপ্রয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট বন্ধ করে দিলাম। এবার তোমরা নেমে পড়তে পারো।'

'চল্,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, চল্।' হেলমেট দোলাল সোহেল।

একবার হেলমেটের লকিং রিং পরীক্ষা করল রানা। সুটের

ভিতর ঢুকবে না পানি। ট্যাঙ্ক থেকে আসছে তরতাজা বাতাস। হাতের ইশারা করে ডাইভ সিগনাল দিল সোহেল। ও-ও তৈরি। এবার সুইচ টিপল রানা, সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ভরে উঠল এয়ার লকের সিলিং। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে আগেই, এবার খুলতে শুরু করল হ্যাচ।

উপরের দিকে খুলে গেল গোলাকার দরজা। ভিতরে সামান্য বাতাস ছিল, সেটুকু টলতে টলতে রওনা হলো উপরের দিকে। আবছা আলোয় মনে হলো সব হীরার টুকরো। তবে পিয়ারের পাশে মিলিয়ে যাবে, খেয়াল করবে না কেউ।

ডাইভ চেম্বার থেকে উঠে এল রানা, থামল সাবমারসিবলের উপরের ডেকে। ওর পাশে এসে থামল সোহেল। ওরা কোনও আলো জ্বালছে না, সাগরের পানি যেন কুচকুচে কালো কালি। হ্যাচ আটকে দিল সোহেল। ফু-চুং ও আতাসির জন্য অপেক্ষা করছে। একবার আণ্ডারওয়াটার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, উপর দিক ঢেকে রেখেছে বাম হাত দিয়ে।

সাবমেরিন পেন তৈরি করতে গিয়ে ছয় শ' গজ মাটি খুঁড়েছে ইজরায়েলিরা। পেনের প্রবেশ পথ এক শ' গজ চওড়া। বিরাট এলাকা ঢেকে দিয়েছে রিইনফোর্সড-কংক্রিট দিয়ে। আন্দাজ আট ফুট চওড়া দেয়াল। সরাসরি বোমা পড়লেও ধসবে না। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে নেভাল বেসের ড্রাই ডক। পুব-দক্ষিণ ও পশ্চিমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দালান। এরপর দুই মাইল জুড়ে ব্যারাক।

পেনের দরজা সাগরের দিকে। প্রকাণ্ড দুটো কবাট, হাইড্রোলিক পাওয়ারে বাইরের দিকে খোলে। দরজার সঙ্গে রয়েছে ইনফ্লেটেবল ব্ল্যাডার। সেগুলো দরজা ও সিমেন্টের মাঝখানে থাকে। দরজা বন্ধ হলে দালানে ঢোকে না পানি। বোমা

মেরে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া দরজা দিয়ে ঢুকবার উপায় নেই। অবশ্য অ্যাসেটিলেন কাটিং টর্চ দিয়ে কাটা সম্ভব, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে তাতে।

ফিন নেড়ে দরজার কাছ থেকে সরে এল রানা, পিছু নিয়েছে ওর ছোট্ট দল। একটু পর পর টর্চ জ্বালছে রানা, দেয়ালের পাশ দিয়ে চলেছে। গুগলি-শামুকে ছাওয়া দেয়াল। ওটাই সাগরের আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছে। পঞ্চাশ ফুট যাওয়ার পর আলো পড়ল একটা চারকোনা জায়গার উপর। এটাই খুঁজছে রানা। দেয়ালের উপর বসানো চার ফুট বর্গাকার কালভার্ট। ওই কালো খোড়ল দিয়ে ড্রাই ডকের পানি বের করে দেয় পাম্প। টর্চের উপর দিকে হাত রেখে আলো তাক করল রানা কালভার্টের উপর। কংক্রিটের বুকে বসানো হয়েছে স্টিলের গ্রিল। কেউ চাইলে কণ্ডুইট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে না। স্টিলের গায়ে সামান্য জং ধরেছে। এক মিনিট পর পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। গ্রিলের উপর-নীচে ছ'টা রডে রয়েছে তারগুলো।

কালভার্টের সঙ্গে মোশন ডিটেক্টর নেই। থাকবার কথাও নয়, বারবার আসবে কৌতূহলী মাছ, ফলে একটু পর পর বাজতে থাকবে অ্যালার্ম। তার চেয়ে ভাল গ্রিলের সঙ্গে ইলেকট্রিক সংযোগ দেয়া। যদি কেউ কেব্‌ল্ বা গ্রিল কাটে, টের পেয়ে যাবে গার্ডরা।

আতাসিকে তারগুলো দেখিয়ে দিল রানা। ওগুলোর সামনে থামল আতাসি, প্রায় অন্ধকারে চলছে দু'হাত। দুটো রডে বাইপাস করল ও, নীচের অংশে আটকে দিল অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প। সঙ্গে ইলেকট্রিক তার। ওগুলোর ভিতর দিয়ে চলবে বিদ্যুৎ। এবার ডাইভ ব্যাগ থেকে বের করে নিল দুটো স্কুইজ টিউব। একটার মুখ খুলে ভিতরের ধূসর জিনিসটা মাখিয়ে দিল রডগুলোর নীচে ও উপরের দিকে। দ্বিতীয় টিউব থেকে বেরুল

হলুদ জিনিস, সেগুলো লাগিয়ে দিল ধূসর ক্রিমের উপর।

শুরু হলো দুই কম্পাউণ্ডের প্রতিক্রিয়া। দ্রুত তৈরি হলো কস্টিক অ্যাসিড। এক মিনিট পেরুনোর আগেই ক্ষয় ধরল স্টিলে। রড দুটো দুই হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল আতাসি। ওর রাখা তার ও অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্পের ভিতর দিয়ে বইছে বিদ্যুৎ। সার্কিট ঠিকই আছে, কাজেই বাজবে না অ্যালার্ম। রডগুলো নামিয়ে রাখল বালির উপর। আরও দুটো রডে বসাল অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প ও তার, দু'মিনিট পর সরিয়ে নিল রডগুলো। সাবমেরিন পেনে ঢুকবার পথ তৈরি। রানা, সোহেল ও ফু-চুং ঢুকে পড়ল কালভার্টের ভিতর। ওদের পিছন পিছন আতাসি। সামনে পড়ল মোটা পাইপ, ধীরে উপরের দিকে গেছে।

এখন কেউ উপর থেকে ওদের দেখবে না, নিশ্চিন্তে ডাইভ টর্চ জ্বালল রানা। এগুতে শুরু করল ওরা। সামনে গিয়ে পড়ছে গোলাকার আলোর আভা।

হঠাৎ রানার দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এল একটা ছায়া। জিনিসটা মাঝারি আকৃতির। প্রায় অন্ধের মত টর্চ দিয়ে গুঁতো লাগিয়ে দিল রানা। পরক্ষণে স্যাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছায়া। পলকের জন্য চোখে পড়ল ত্রিকোণ পাখনাটা।

হাঙর!

'কপাল ভাল, বড় না,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ফু-চুং। 'আর দুটো বছর পর ওর সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে চাই না।'

ধক্-ধক্ করছে রানার হৃৎপিণ্ড, দু'সেকেণ্ড পর আবার এগুতে শুরু করল। যেন শেষ নেই এ পাইপের। বদ্ধ পরিবেশ।

কিছুক্ষণ পর শেষ হলো পাইপ, সামনে বড়সড় একটা ভালভ। ড্রাই ডক শূন্য থাকলে বন্ধ থাকে এটা। গত তিন দিন ধরে এই ফ্যাসিলিটি দেখছে ওরা। একবারও মনে হয়নি

ইজরায়েলিরা পাম্প চালু করেছে, বা সাব পেন খালি করছে। কয়েক দিন হলো এখানে এসে ঢুকেছে দুটো ট্রাইডেন্ট ইলেভেন সাবমেরিন, সঙ্গে আণবিক বোমাবাহী মিসাইল।

বাটারফ্লাই ভালভ, ওটার ভিতর দিয়ে একে একে পেরিয়ে এল ওরা। সামনে পড়ল প্রকাণ্ড পাম্প। এটাই শুকিয়ে ফেলে সাবমেরিন পেন। পাম্পের হাব থেকে ঝিকঝিক করছে ব্লেডগুলো, ফেরোব্রোঞ্জের।

বল্টু খুলবার যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা। পাখাগুলো ঝালাই করা থাকতে পারে, কাজেই ছোট্ট অ্যাসেটিলিন কাটিং টর্চও এনেছে সঙ্গে। কোমরের পাউচ থেকে অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ বের করল রানা, মনোযোগ দিল বল্টুগুলোর দিকে। বিদঘুটে অ্যাঙ্গেলে রয়েছে প্রতিটি বল্টু। একটা পাখার সঙ্গে রয়েছে বারোটা বল্টু। পাখাগুলো সরিয়ে নিলেই চলবে। নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে নামল রানা। এগারোটা বল্টু ঢিলা করে ফেলল তিন মিনিট পেরুনোর আগেই। কিন্তু শেষেরটা খুলতে চাইল না। রেঞ্চে চাপ বাড়িয়ে দিল রানা। প্রচণ্ড শক্তি ব্যয় করছে, বুঁজে ফেলেছে চোখ। টের পেল চোখের পিছন অংশে লাল-নীল নক্ষত্র ছুটছে। দশ সেকেণ্ড পর হঠাৎ খুলে এল বল্টু। রেঞ্চটা ঝটাং করে গিয়ে পড়ল দূরে। ছিটকে পড়েছে বটে, তবে যাওয়ার আগে কেটে দিয়ে গেছে রানার হাত। টর্চের আলোয় ছড়িয়ে পড়ছে লালচে ধোঁয়া।

'তুই কি চাস রক্তের গন্ধ পেয়ে ফিরে আসুক হাঙরটা?' পরিস্থিতি হালকা করতে চাইল ফু-চুং।

'আমার আপত্তি নেই, আসুক না,' বলল রানা। 'তুই যতক্ষণ আমার পিছনে, আমার ভয় কী?' একে একে বল্টু খুলছে। পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই খুলে ফেলল তিনটে পাখা, নামিয়ে রাখল

পায়ের কাছে। স্কুবা ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢোকা যাবে না, ওটা পিঠ থেকে খুলে ফেলল রানা, পাম্পের হাবের ভিতর ছেঁচড়ে ঢুকে পড়ল। এ পাশে চলে এসে পিঠে ঝুলিয়ে নিল ট্যাঙ্ক, ঘুরে চাইল। দু'মিনিট পর ওর পাশে চলে এল সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি।

'সত্যিই বড় হয়ে গেছে পেট, বস্,' প্রায় নালিশ করল আতাসি। 'আরেকটু হলে পাম্পের ভিতর আটকা পড়তাম!'

'ব্যায়াম শুরু করো,' বলল রানা। সামনে লম্বা পাইপ, নব্বুই ডিগ্রি কোনাকুনি উঠেছে। টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, চোখ অন্ধকারে সয়ে আসতেই এগুতে শুরু করল। সামনের বাঁক থেকে আসছে মৃদু আভা। সাঁতরে চলেছে রানা, সামনে বাঁক। ওখানে থামল, ওদিক দেখবার জন্য চট্ করে উঁকি দিল।

সামনে ড্রাই ডক। উপরের ছাত থেকে আসছে ফ্লুরেসেন্ট বাতির আলো। গার্ডরা টহল দেবে, তাই বোধহয় কিছু আলো জ্বলছে। কোনও টেকনিশিয়ান কাজ করছে না সাবমেরিনের উপর। পেনের বেশিরভাগ টিউব নেভানো। খুশি হয়ে উঠল রানা, বাড়তি গার্ড থাকবার কথা নয়। দু-চারজনকে ঠাণ্ডা করে দেবে ওরা।

পাইপের ভিতর থেকে সাঁতরে বেরিয়ে এল রানা, মেঝের কাছে থাকছে। ওর পিছু নিয়েছে সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি। পাহাড় সমান দরজা. ওটার দিকে চলেছে। গার্ডদের ওদিকে থাকবার কথা নয়। একবার কব্জি উল্টে ডাইভ কম্পিউটার দেখে বলল রানা, 'আমরা এক মিনিটের জন্য দশ ফুট গভীরতায় থামছি।' এতক্ষণ নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ তৈরি হয়েছে রক্তে, সেগুলো মিলিয়ে গেলে আবারও রওনা হবে ওরা।

কুমির যেমন পানি থেকে মাথা তোলার আগে ধৈর্যের সঙ্গে

সন্তর্পণে এগোয় শিকারের দিকে, ঠিক তেমনি ভঙ্গি নিয়েছে চারজনের এই দল। ওদের হেলমেটের সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট পেরিস্কোপ, তাতে দেখছে উপরের দিক। অত্যন্ত শক্তিশালী স্কোপ এগুলো, থার্ড জেনারেশন অপটিকস। নক্ষত্রের দিকে তাক করলে টিমটিমে সেই আলোও মনে হয় দিনের আলোর মত। ডায়াল ঘুরিয়ে দূরে দেখছে ওরা, পানির নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছে সাবধানে। প্রথম কাজ ড্রাই ডক ভাল ভাবে দেখে নেয়া। বুঝে নিতে হবে এখানে কী ধরনের সিকিউরিটির ব্যবস্থা রেখেছে ইজরায়েলিরা।

পাশাপাশি দুটো সাবমেরিন রাখবার পর আরও দুটো রাখার জায়গা আছে এই ড্রাই ডকে। ট্রাইডেন্ট সাবমেরিন দুটো উঁচু কংক্রিট জেটির পাশে ভিড়ানো। দালানের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে জেটি। এখানে-ওখানে ইকুইপমেন্ট, ব্যারেল ভরা লুব্রিকেন্ট, তারপুলিনের নীচে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। বেশ কিছু ছোট আকারের ইলেকট্রিক গলফ কার্ট চোখে পড়ল। দু'দিকে রয়েছে তিনটে ফর্কলিফ্ট। দালানের দক্ষিণ জুড়ে উঁচু এক প্ল্যাটফর্ম। ওখানে কিছু অফিস ঘর, দেয়ালগুলো কাঁচের। বোধহয় অবযার্ভেশন রুম। সেগুলোর উত্তর দিকে স্টোরেজের জন্য জায়গা। এক পাশে একটা ওভারহেড ক্রেন, রেইল দিয়ে চলে। পুরো ডক কাভার করতে পারে ওটা।

পিয়ারের এক ধারে মোটা ম্যানিলা দড়ি দিয়ে বাঁধা কালো রঙের ট্রাইডেন্ট অ্যাটাক সাবমেরিন দুটো। এ জিনিস আমেরিকার সেরা যুদ্ধাস্ত্রগুলোর অন্যতম। যখন ব্যাটারি দিয়ে চলে, ওটা হয়ে ওঠে প্রায় নিঃশব্দ। সফিসটিকেটেড প্যাসিভ সোনার লাগানো জাহাজও টের পায় না হঠাৎ কীভাবে একদম গায়ের কাছে এসে হাজির হয়েছে মৃত্যুদূত। গায়ে ফিট করা ছয়টি টর্পেডো টিউব।

দুই মাসের বেশি সময় ধরে টহল দিতে পারে সাগরের নীচে।

পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক দেখবার পর জানতে চাইল রানা, 'কী মনে হয়?'

'আমি গুনে পেয়েছি ছয়জন,' বলল আতাসি।

'আমিও তা-ই দেখেছি,' বলল ফু-চুং।

'সোহেল?'

'বোধহয় সামান্য ভুল হয়েছে,' বলল সোহেল। 'বামদিকে আরেকটা আছে। ছায়ার ভিতর ঘুমে কাদা। এখান থেকে বস্তার মত লাগছে।'

ওদিকে চাইল সবাই। খুব খেয়াল করলে বোঝা যায় ওখানে শুয়ে আছে মোটা কেউ। মনে মনে সোহেলের তারিফ করল রানা, ফু-চুং ও আতাসি। লোকটা হঠাৎ উঠে বসল। চারপাশ কিছুক্ষণ দেখল, বাম হাতে চুলকে চলেছে ডান বগল। তারপর আবারও শুয়ে পড়ল।

'তোর চোখ ঘাড়-ছেলা শকুনের মত, সোহেল,' বলল ফু-চুং। খানিকটা লজ্জিত।

'দোতলায় চারজন,' বলল রানা। 'পারসোনেল এক্সিট ডোরের সামনে দু'জন। আর রইল ঘুমন্ত রাজপুত্র। আতাসি, ফু-চুং, দোতলা তোমাদের। সোহেল, তুই রাজকুমারকে গভীর ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিবি। দরজার দু'জনকে নেব আমি।' একবার ঘড়ি দেখে নিল রানা। রাত একটা একত্রিশ। মনে হয় না ভোরের আগে বদল হবে ডিউটি। 'আমরা এক ঘণ্টা পর ডিসকভারির কাছে পৌঁছব। রাত দুটোর সময় মার্ভেলের কাজ ধরবে ওরা। কাজেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

আবারও ডুব দিল ওরা, যে যার নির্দিষ্ট জায়গার দিকে চলেছে। কিছুক্ষণ পর জেটির মাঝামাঝি পৌঁছে গেল সোহেল।

একটু দূরেই ঘুমিয়ে থাকা লোকটা। ডকের পারে থামল সোহেল, উঁচু করছে না মাথা। পাশেই কালো রঙের সাবমেরিন।

এদিকে পিয়ারের বামদিক দিয়ে ছায়ার মত চলেছে আতাসি ও ফু-চুং। খানিক দূরে ধাতব সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার বারান্দায়।

আর রানা পৌঁছে গেছে কয়েকটা ক্রেটের কাছে। পানি থেকে উঠে ডকে থামল। ক্রেটগুলো থেকে অন্তত এক শ' গজ দূরে আলোকিত ভেস্টিবিউল। দরজার সামনে বিমর্ষ চেহারা করে বসে রয়েছে দুই গার্ড।

নিঃশব্দে স্কুবা গিয়ার ও ড্রাই সুট খুলে ফেলল রানা। নীচে পরা ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। কমব্যাট রিবনগুলো নিঃশব্দে জানিয়ে চলেছে, ও ব্রিগেডিয়ার। প্রায় সবই ঠিক, তবে পায়ে ডাইভ বুট। এটা মেনে নিয়েছে রানা। কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়েছে হোলস্টার, এবার ক্যাপ পরে নিতেই মনে হলো, ও সত্যিই ইজরায়েল আর্মির অফিসার। দলের সবাইকে আরও এক মিনিট সময় দিল রানা, এতক্ষণে যার যার অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। এবার ক্রেটগুলো ঘুরে রওনা হয়ে গেল ও, নিঃশব্দে চলেছে গার্ডদের লক্ষ্য করে।

দেখতে না দেখতে গার্ডদের বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। ঠিক তখনই গার্ডদের একজন টের পেল, কাছাকাছি রয়েছে অন্য কেউ। ঝট করে চেয়ার ছাড়ল সে, ঘুরে চেয়েই হাঁ হয়ে গেল। দু' সেকেণ্ড পর মনে পড়ল এম ফরটিন রাইফেল ঠেস দিয়ে রেখেছে টেবিলে। এদিকে এগিয়ে আসছে লোকটা! আর দেরি করল না সে, ছোঁ মেরে তুলে নিল রাইফেল, পরক্ষণে তাক করল লোকটার বুকে। চাপা স্বরে সাবধান করল সঙ্গীকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে-ও। হাতে পেতে চাইল অ্যাসল্ট রাইফেল, তবে

বাম হাত পেঁচিয়ে গেল স্লিঙের সঙ্গে।

'চ্যালেঞ্জ করবার মানেটা কী?' কড়া স্বরে বলল রানা। নিখুঁত ইদ্দিশ ভাষা। 'অ্যাই উল্লুক! আমি ইজরায়েল আর্মির ব্রিগেডিয়ার হাউয়াজি পেরন। বেস কমাণ্ডার অ্যাডমিরাল ইতামার পোলার্ডের দাওয়াতে এসেছি। চ্যালেঞ্জ করছ যে?'

রানার দিকে উজবুকের মত চেয়ে রইল দুই গার্ড, ক' সেকেণ্ড পর বামদিকের জন বলে উঠল, 'কে... আপনি... স্যর?'

'ব্রিগেডিয়ার হাউয়াজি পেরন,' ত্যাড়া ভঙ্গিতে বলল রানা। 'হায় নবী মুসা! গত পুরো একটা সপ্তাহ ধরে অন্তত বিশবার এসেছি এই দালানে। দেখোনি আমাকে? অ্যাডমিরাল পোলার্ড ডেকেছেন নতুন সাবমেরিনের ডেমনস্ট্রেশন দেখতে। মুসলিম কুকুরগুলো এবার বুঝবে কাদের সঙ্গে লড়তে চায়!'

রানা জানে, যেভাবে দ্রুত বলেছে, অর্ধেক কথা বুঝতেই পারেনি দুই গার্ড। এদের বিশ্বাস করাতে হবে ও আসলে এখানে থাকতেই পারে, তা যত রাতই হোক। টেবিলের উপর উপচে পড়া অ্যাশট্রের পাশে একটা ওয়াকি-টকি। আরেক দিকে সুপের দুটো বাটি ও পুরনো নিউজ পেপার। লোক দুটো যদি বেস সিকিউরিটির সঙ্গে আলাপ করতে চায়, মুহূর্তে খেলা শেষ।

গার্ডদের চোখে এখনও সন্দেহ, তবে উচ্চপদস্থ অফিসারের উপস্থিতি নাড়িয়ে দিয়েছে তাদের। একবার পরস্পরের দিকে চাইল। কী করবে ভাবতে চাইছে। এম ফরটিনের ব্যারেল নাড়ল তরুণ গার্ড, পরক্ষণে চাইল রানার আইডেন্টিফিকেশন।

প্যাণ্টের পকেট থেকে বিলফোল্ড বের করল রানা, এগিয়ে দিল বয়স্ক গার্ডের দিকে। চোখের কাছে নিয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকটা। এবার রানার বুক পকেট থেকে বেরুল ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার দিয়ে জ্বেলে নিল একটা শলা।

লোক দুটো স্থানীয় সস্তা সিগারেটে অভ্যস্ত, কম বয়স্ক সৈনিকের চোখ আটকে গেছে চ্যাপ্টা প্যাকেটের উপর। বয়স্কজন বিলফোল্ড ঘাঁটছে, এবার হাতে তুলে নিল ওয়াকি-টকি।

একই সময়ে সিগারেট দিতে চাইল রানা।

দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল লোকটা।

পুরো প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়েছে রানা।

'সিকিউরিটি স্টেশনে জানানো উচিত,' বলল তরুণ সৈনিক।

'বটে,' মুখ ভরা ধোঁয়া উগরে দিল রানা। 'সিগারেটের ধোঁয়া গিলে নাও, একটু পর কড়া ধমক মিলবে সিকিউরিটি স্টেশন থেকে। বিলফোল্ডের লেখা তো দেখেইছ।'

লাজুক ভঙ্গি নিল দুই সৈনিক। প্যাকেট নিল তরুণ গার্ড, একটা সিগারেট নিয়ে ঝুলিয়ে নিল ঠোঁটে। তার দেখাদেখি বয়স্ক সৈনিকও। লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল রানা। মাত্র এক টান দিয়েছে লোকদুজন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে রয়েছে নার্কোটিক, কাজ শুরু করল নিমেষের মধ্যে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল লোকদুটোর নার্ভাস সিস্টেম। একটা কথা বলবার সুযোগ পেল না, কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

নিজের সিগারেট ফেলে দিল রানা, বুটের হিল দিয়ে নেভাল। গার্ডদের সিগারেটগুলোও নিভিয়ে তুলে রেখে দিল প্যাকেটে। প্রমাণ রইল না। আগামী পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে দুই গার্ড। তারপর শুনবে তাদের বিরুদ্ধে নেশা করার গুরুতর অভিযোগ এনেছে অফিসাররা।

পরিকল্পনা করবার সময় সবাইকে জানিয়েছে রানা, একান্ত বাধ্য না হলে কাউকে হত্যা করবে না।

দরজার দিকে পিঠ দেবে রানা, এমন সময় হঠাৎ খুলে গেল ধাতব কবাট। দ্রুত ভিতরে ঢুকল এক টেকনিশিয়ান, পিছনে দুই

গার্ড। সবার চোখ গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। টেবিলের পাশে অচেতন দুই গার্ড! তৃতীয় লোকটার ইউনিফর্ম নেভির নয়, আর্মির! এত রাতে এ লোক এখানে কী করছে? সন্দেহ নিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেল তুলল ডানদিকের গার্ড, চ্যালেঞ্জ করবে।

সঙ্গীকে হড়বড় করে বলল দ্বিতীয়জন, 'স্যরকে জানাতে চললাম।' ঘুরেই দৌড়াতে শুরু করল সে।

পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই নরক হয়ে উঠবে এ জায়গা, ভাবল রানা। ব্যারাক থেকে ছুটে আসবে তিন হাজার নৌ সেনা! পিঁপড়ের বাসার মত হয়ে উঠবে গোটা ড্রাই ডক!

চার

দরজার দিকে ছুটছে দ্বিতীয় গার্ড। তবে তার সঙ্গীর বুক সই করছে খুদে এক বিন্দু লাল আলো, চট্ করে সরে গেল অস্ত্রের স্টকের উপর—ছুটে এল নিঃশব্দ বুলেট। ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল এম ফোরটিন। ছিন্নভিন্ন হয়েছে সৈনিকের ডান পাঞ্জা, রক্ত ঝরছে ঝর্নার মত।

দোতলার বারান্দা থেকে গার্ডকে আহত করেছে ফু-চুং বা আতাসি, বোকা বনে যাওয়া টেকনিশিয়ানকে কাভার করবে ওরা, কাজেই সময় নষ্ট করল না রানা, পলায়মান সৈনিকের পিছনে ছুটতে শুরু করল। আগে কখনও এমন দৌড় দিইনি, ভাবছে। লোকটাকে ধরতেই হবে। নইলে, আমরা শেষ! অন্ধকার লক্ষ্য

করে দৌড়ে চলেছে লোকটা। হারিয়ে যেত, কিন্তু বিপত্তি ডেকে এনেছে তার খাকি ইউনিফর্ম।

দু' সেকেণ্ড পর পিছু নিয়েছে রানা। আট কদম ফেলবার পর আকাশে উড়াল দিল ও, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত। পরক্ষণে পেঁচিয়ে ধরল লোকটার দু' হাঁটু। অ্যাসফল্টের উপর ধুপ করে পড়ল দু'জন। রানা পড়েছে লোকটার নিতম্বের উপর, কিন্তু সৈনিকের কপাল মন্দ—পাকার উপর বিশ্রী শব্দ তুলে পড়ল কপালটা, ছেঁচড়ে গেল আধ ফুট। ততক্ষণে ছিঁড়ে গেছে ডান গাল। তবে মন্দের ভাল, জ্ঞান হারিয়েছে ব্যথা পাওয়ার আগেই।

ধড়মড় করে উঠে বসল রানা, চট্ করে চাইল চারদিকে। একটু দূরে দুটো ওয়্যারহাউস, তবে সেখানে আলো জ্বলছে না। কারও থাকবার কথা নয়। বাঁ দিকে বেশ দূরে চারতলা অফিস বিল্ডিং। তিনতলার কয়েকটা জানালা আলোকিত। যা ঘটেছে, মনে হয় না কেউ খেয়াল করেছে। কোমর থেকে ফ্লেক্সিকাফ খুলে নিল রানা, দুই কব্জি আটকে দিল অজ্ঞান সৈনিকের। কাঁধে তুলে নিল্ শিথিল দেহ, তারপর দ্রুত ফিরতে লাগল সাবমেরিন পেন লক্ষ্য করে।

দালানে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা আটকে দিল রানা। ততক্ষণে টেকনিশিয়ানের দুই কব্জি হ্যাণ্ডকাফে আটকে দিয়েছে ফু-চুং, মুখে গুঁজে দিয়েছে ব্যাণ্ডেজ। ছেঁচড়ে নিয়ে চলে গেল দালানের বাঁ কোণে। ফু-চুঙের পিছু নিল রানা, অচেতন দেহগুলোর পাশে নামিয়ে দিল ওর কাঁধের বোঝা। দোতলার গার্ডদের আগেই বেঁধেছে আতাসি, এক মিনিট আগে হাজির হয়েছে নীচতলায়।

'আরেকটু হলে, বস্,...' আর কিছু বলল না ও।

'কেউ দেখেনি তো, রানা?' বলল ফু-চুং।

'অ্যালার্ম বেজে ওঠেনি, কাজেই...' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'উপরতলার কী অবস্থা?'

'একজন রাইফেল ধরতে গেছিল। তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আতাসি। তবে বাঁচবে।'

দরজার দিকে চলেছে ওরা, এমন সময় এল সোহেল। 'সব ঠিক তো?'

'এখন পর্যন্ত,' বলল রানা। 'তোর কী খবর?'

'আমাদের রাজপুত্র গভীর ঘুমে। ছয় ঘণ্টার আগে উঠবে না।'

'তা হলে চল মিসাইল আর সাবমেরিনের ব্যবস্থা করি।'

উঁচু প্ল্যাটফর্মের প্রথম দুটো ঘর বিশাল। একটার ভিতর সাবমেরিনের যন্ত্রাংশ, দ্বিতীয় ঘরে দশটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইউজিএম ওয়ান-থ্রি-থ্রি ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট ইলেভেন ব্যালিস্টিক মিসাইল, একের পর এক কেবিনেট ও কম্পিউটার। মিসাইল ধরনের আধুনিক অস্ত্র রয়েছে মার্ভেল জাহাজেও। যেমন মার্ক-৪৮ অ্যাডক্যাপ টর্পেডো। চোরাই মার্কেটে দাম আঠারো লাখ ডলার। এক আমেরিকান ঘুষখোর ভাইস অ্যাডমিরালকে তেরো লাখ ডলার দিয়ে কিনেছে গগল।

প্রথম ঘরে বেশ কিছু ওঅর্ক বেঞ্চ, টেবিলে ডায়াগনস্টিক কম্পিউটার ও নানা ইলেকট্রনিক গিয়ার। সেসবের ভিতর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বসাতে শুরু করল ফু-চুং ও আতাসি।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা ও সোহেল। দ্বিতীয় ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক নিচু জলচৌকির মত, তার উপর তারপুলিনে ঢাকা রয়েছে কিছু। চারদিকে চাইলে মনে হয় এ স্রেফ কোনও মর্গ, বড়সড় কেবিনেটের ভিতর লাশ। জলচৌকির সামনে গিয়ে থামল রানা ও সোহেল, সরিয়ে দিল তারপুলিন। প্রথম দর্শনে মনে হলো যান্ত্রিক ট্রলির উপর ওগুলো আমেরিকান টেস্ট-৯৭

টর্পেডো। তবে লেজে কোনও প্রপেলার নেই, বদলে ক্রিকোণ পাখা। পরস্পরের দিকে চাইল ওরা। মিসাইলগুলো একেকটা সাড়ে নয় ফুট লম্বা।

'কী বুঝলি?' বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

'ছবিতে যা দেখেছি ঠিক তাই। আগে হলে বিশ্বাস করতাম না, এ জিনিস ইজরায়েলিদের দিয়েছে আমেরিকান সরকার। তার মানে, ভুল তথ্য পাইনি আমরা।'

'আয়, কাজ সেরে ফেলি।'

'তোর কাজ শেষ হওয়ার আগেই দেখবি আমার কাজ শেষ।' একটু দূরে টেবিলে কম্পিউটার টার্মিনাল, ওটার দিকে পা বাড়াল সোহেল।

কোমরের থলে থেকে স্ক্রু ড্রাইভার ও সি-ফোর বের করল রানা। ভাবছে, দেখাই যাক কে আগে শেষ করে! ঠিক করেছে, ডানদিকের মিসাইল থেকে কাজ ধরবে।

কম্পিউটার চালু হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল সোহেল। সঙ্গে এনেছে পাইরেট ড্রাইভ, ওটা দিয়ে সাইফন করা যায় সিস্টেমের সবকিছু। লাল রঙের লগ বুক পেয়ে কপি করতে শুরু করল ও, সেইসঙ্গে পড়ছে। মিসাইল ও সাবমেরিনের উপর যা তথ্য পাবে, সব তুলে নেবে ড্রাইভে।

পনেরো মিনিট পর ঘরে এসে ঢুকল আতাসি, চলে গেল ঘরের এক পাশে। নানা দিকে বসিয়ে দেবে বাড়তি প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ইতিমধ্যে দুই সাবমেরিনে সেট করে এসেছে সি-ফোর। বিস্ফোরণের ফলে দুই সারমেরিন ড্রাই ডকে ডুবে থাকবে বাকি জীবন। কাজের ফাঁকে বলল, 'মিসাইল কি একটা নেবেন, বস্, না দুটো?'

সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানরা ঠিক করেছেন, এ ধরনের অন্তত

একটা মিসাইল সরিয়ে নেয়া হবে, সম্ভব হলে দুটোই। গালফ অভ ওমান থেকে আসছে এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন। সে জাহাজে তুলে দেয়া হবে মিসাইলগুলো। চলে যাবে সুদূর বাংলাদেশে। ইউজিএম-এক শ' তেত্রিশ ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট ইলেভেন মিসাইল নিয়ে গবেষণা করবে বাংলাদেশ, চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও আরবের বিজ্ঞানীরা।

মিসাইলের উপর থেকে এক পলক চোখ তুলল রানা, কাজ বন্ধ করে বলল, 'একটা নেব।'

'তুই বোধহয় জানিস না বাঁ দিকের দুটো পুরো আর্মড,' কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না সোহেল। 'পুরো ফিউয়েল ভরা।'

'তা হলে দুটোই নেব,' বলল রানা। 'ওদুটো রেডি রেখেছে তেহরানে ফেলবে বলে।'

জানতে চাইল আতাসি, 'সাবধানে নিলেই হলো, তাই না, বস্?'

'তা-ই তো মনে হয়।'

দ্রুত হাত চলছে ওদের, ডুবে গেল যে যার কাজে।

কিছুক্ষণ পর খোলা দুটো মিসাইলের ওঅরহেড সরিয়ে নিল রানা, বিস্ফোরক বসিয়ে টাইমার চালু করে দিল। নতুন করে আটকে দিল ওঅরহেডগুলো। মিসাইলগুলো নষ্ট হবে, তবে ড্রাই ডকে যে ফিউল রয়েছে, সে পর্যন্ত পৌঁছবে না আগুন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে না, কাছাকাছি কেউ না গেলে মারা পড়বে না বিস্ফোরণে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, আরও বহু কাজ পড়ে রয়েছে। দোতলায় দেখতে পেল ফু-চুংকে। সে উপর থেকে জানাল, সাগরের দিকের দরজা খুলবার মেকানিজম পেয়ে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল ফু-চুং। ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করছে আতাসির সঙ্গে।

দোতলায় উঠে এসেছে রানা, খানিক দূরে লোহার মই, গিয়ে মিশেছে আরও উঁচু এক ক্যাটওয়াকে। ওখানে ওভারহেড ক্রেনের কন্ট্রোল কেবিন। দ্রুত পায়ে মই বেয়ে উঠল রানা, গিয়ে ঢুকল ধাতব হলুদ কেবিনে। আগেও ব্যবহার করেছে এ ধরনের ক্রেন। দু মিনিটের মধ্যে চালু হয়ে গেল মেশিন। ছাত থেকে নেমে এল ক্রেন, ঘড়ঘড় করে চলেছে ডকের দিকে। কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট ঘরের সামনে পৌঁছে গেল ক্রেন।

ততক্ষণে ঘর থেকে মিসাইল দুটো বের করে এনেছে আতাসি ও ফু-চুং। যান্ত্রিক ট্রলির উপর স্থির হলো রানার ক্রেনের হুক। নীচের ওরা ডানদিকের মিসাইলে আটকে দিল স্লিং কেবলগুলো। কাজ শেষ হতেই উপরে চাইল ফু-চুং, দু'বার হাত নেড়ে সরে গেল আতাসিকে নিয়ে। পরে নিতে যাচ্ছে স্কুবা গিয়ার।

ট্রলি থেকে মিসাইল তুলে নিল রানা, সাবমেরিনগুলোর কাছ থেকে সরিয়ে নিল ক্রেন, তারপর নিয়ে চলল সামনের দিকে। প্রকাণ্ড দরজার বিশ ফুট দূরে থামল ঝুলন্ত মিসাইল। মোটা কেবলগুলো নামছে। কিছুক্ষণ পর পানি স্পর্শ করল মিসাইল। খুব সাবধানে কেবল নামিয়ে চলেছে রানা, কিছুক্ষণ পর ঢিল পড়ল কেবলে। নীচের মেঝে ছুঁয়েছে মিসাইল। কন্ট্রোল নাড়তে শুরু করল রানা। যেই বুঝল একটু টান ধরছে কেবলে, থেমে গেল। জেটির পাশ দিয়ে হেঁটে এল ফু-চুং, পরে নিয়েছে ট্যাঙ্ক, হেলমেট ও রেগুলেটর; এবার ডক থেকে নেমে পড়ল পানিতে। ওখানে কয়েকটা বুদ্বুদ দেখতে পেল রানা। এক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর পানির উপর ভেসে উঠল ফু-চুং, ইশারা করল ডানহাত তুলে।

হুক তুলে নিতে শুরু করল রানা, কাজ শেষ হতেই পিছিয়ে নিল ক্রেন। ট্রলির দিকে চলেছে। থামল গিয়ে দ্বিতীয় মিসাইলের উপর। ওটা নিয়ে অপেক্ষা করছে আতাসি। আবারও নেমে এল হুক। কিছুক্ষণ পর মিসাইল ও কেবলগুলো থেকে সরে গেল আতাসি। রেইল বেয়ে ধীরে চলল ক্রেন। অভযার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে ফু-চুংকে দেখতে পেল রানা। সে ঝুঁকে পড়েছে কম্পিউটারের উপর। আতাসির মাথার অনেক উপরে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলতে শুরু করল সাগর মুখো প্রকাণ্ড দরজা। সঠিক কম্বিনেশন পেয়েছে ফু-চুং। এবার কী করতে হবে উর্বশী জানে, LIDAR সিস্টেম ওকে বলে দেবে মেঝের ঠিক কোথায় রয়েছে মিসাইল। অপেক্ষা করবে ও, রানা যখনই বলবে, কাজে নামবে।

কিছুক্ষণ পর মিসাইল নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল ক্রেন, কেবল নামাতে শুরু করল রানা। এদিকে ফু-চুং ফিরে এসেছে, ওকে সাহায্য করতে হাজির হয়েছে আতাসি। সঙ্গে সবার ডাইভ ইকুইপমেণ্ট। বাদ পড়েনি রানার স্কুবা রিগ ও ড্রাই সুট। ড্রাই ডকের শেষ মাথায় নামিয়ে রাখল ওগুলো। একবার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল রানা, কাজ এখনও শেষ হয়নি সোহেলের। তবে শিগগির ফিরবে ওরা। তার আগে সঠিক পজিশনে ক্রেন রাখতে হবে, পানির নীচে নামিয়ে দিতে হবে মিসাইলটা। কাজ শেষ হলেই ক্রেন ফিরিয়ে নেবে, রওনা হওয়ার আগে কারিগরি করবে খুদে কণ্ট্রোল প্যানেলে। ড্রাই ডক নতুন করে চালু করতে হলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা লাগবে ইজরায়েলিদের। এদিকে বিশাল দুই কবাটের নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার বিস্ফোরিত হবে। ওটার ভিতর সি-ফোর বসিয়েছে ফু-চুং। বেকায়দা ভাবে আটকে থাকবে বিশাল দরজা।

মিসাইল দুটো সরিয়ে দেয়া সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ হতেই সময় নষ্ট করল না রানা, আগের জায়গায় নিয়ে গেল ক্রেন। পটাপট ছিঁড়ে ফেলল কন্ট্রোল প্যানেলের তারগুলো। কষ্ট করে নেমে এল না মই বেয়ে—সোজা চেপে বসল বিশাল আই বিমের উপর। জিনিসটা গেছে দালানের প্রস্থ জুড়ে। এক মিনিট পেরুলো না, তার আগেই কেবল স্পুলের কাছে পৌঁছে গেল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কেবল, তার পর নামতে শুরু করল দ্রুত। একবার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সোহেল, এগিয়ে চলেছে ফু-চুং ও আতাসির দিকে। একইসঙ্গে কাজ শেষ করেছে ওরা, ভাবল রানা। পানি থেকে দশ ফুট উপরে চলে আসতেই হাত ছেড়ে দিল ও, প্রায় নিঃশব্দে ডুবে গেল। ভেসে উঠল দশ সেকেণ্ড পর।

সাহায্য করতে তৈরি আতাসি, সঙ্গে রয়েছে রানার ইকুইপমেণ্ট। দ্রুত হাতে রানার পিঠে ঝুলিয়ে দিল ট্যাঙ্ক, পরিয়ে দিল হেলমেট।

'উর্বশী, শুনছ?' হেলমেটের মাধ্যমে বলল রানা। পানি কেটে ভাসছে। ওর হেলমেটের সঙ্গে এমন ভাবে ডাইভ সুট তৈরি, ওদুটো একসঙ্গে না থাকলে পানির নীচে যোগাযোগ করা অসম্ভব। সেই ড্রাই সুট রয়েছে এখন আতাসির বগলের নীচে।

'শুনছি, রানা,' বলল উর্বশী। 'ভালই ডাইভ দিয়েছ। পানিতে পড়ার শব্দ শুনে মনে হলো, স্কোর করেছ নয় পয়েণ্ট দুই।'

'মাত্র ওইটুকু মনে হলো? রিভার্স ডাবল হাফ টুইস্ট, সঙ্গে ফুল গেইনার,' বিনা দ্বিধায় মিথ্যা বলল রানা। ভাল করেই জানে, নীরব থাকবে আতাসি, ফু-চুং ও সোহেল। 'আমাদের সঙ্গে দুটো মিসাইল, উর্বশী। রিকভারি অপারেশন শুরু করো। দুই দলে এয়ার লকে ঢুকছি আমরা।'

'অ্যাফারমেটিভ।'

ওরা সবাই নেমে পড়েছে পানিতে, দুলে উঠল সবার দেহ। ডিসকভারি নিয়ে সামনে বাড়ছে উর্বশী।

রানার সঙ্গে ডাইভ মাস্ক নেই, কাজেই ওকে হাত ধরে নিয়ে চলল আতাসি, পৌঁছে দিল এয়ার লক পর্যন্ত। প্রথমে ভিতরে ঢুকল রানা, তারপর ওর সাগরেদ। পরে ঢুকেছে, কাজেই হ্যাচ আটকে দিল আতাসি।

ভাবছে রানা, 'বাপু দানব, আমি না চ্যাপ্টা হয়ে মরি!'

তবে কষ্ট করে বাড়তি খানিক জায়গা করে দিল আতাসি। কিছুক্ষণ পর এয়ার লকের দেয়ালে ইণ্ডিকেটার সবুজ হয়ে উঠল। চেম্বার থেকে পানি সরাতে শুরু করেছে ভালভগুলো।

থুতনি পর্যন্ত পানি নেমে আসতেই হেলমেট খুলে ফেলল রানা। ঠাণ্ডা, কনকনে মনে হলো বাতাস। তাও ভাল লাগছে। এক ঘণ্টার বেশি হলো কেমিক্যালের গন্ধওয়ালা ড্রাই ডকে আটকে ছিল। বদ্ধ এয়ার লকে খানিক মোচড়া-মোচড়ি করে পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক নামিয়ে ফেলল রানা। কিছুক্ষণ পর খালি হয়ে গেল চেম্বার, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সাবমারসিবলের ভিতর। ভেজা পোশাক নিয়ে ককপিট সিটে বসে পড়তেই জিজ্ঞেস করল উর্বশী, 'কী অবস্থা? বোধহয় বড় কোনও সমস্যা হয়নি?'

'সামান্যই, তবে সামলে নেয়া গেছে,' বলল রানা।

দু'জনের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে কম্পিউটার মনিটর। মিনি সাবের নীচ হতে আসছে ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনের ছবি। ফ্লো-লাইট ক্যামেরা দেখিয়ে দিল প্রথম মিসাইলের কাছ থেকে সামান্য ডানদিকে রয়েছে সাব। টুকটাক অ্যাডযাস্টমেণ্ট করল উর্বশী, নড়ে উঠল ধাতব বাহু। টাংস্টেন ও স্টিলের আঁকশি দু'দিক দিয়ে ধরল মিসাইলকে। কিছুক্ষণ পর জিনিসটা এসে

মিশে গেল ডিসকভারির পেটের সঙ্গে। হুকগুলো আটকে নিল মিসাইলকে।

উর্বশীকে সাহায্য করছে রানা। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক কিছুটা খালি করতেই আবার নতুন করে ভারসাম্য ফিরে পেল ডিসকভারি।

ডিরেকশনাল থ্রাস্টার দিয়ে সাবকে সরাতে শুরু করেছে উর্বশী, দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে নীচের ঠোঁটের কোনা। সুন্দর মুখটা এখন গম্ভীর। বিড়বিড় করে নিজেকে একটা গালি দিল, দ্বিতীয় মিসাইলের খানিকটা সামনে চলে গেছে। নিচু স্বরে বলল, 'জোয়ার এসেছে।' একটু পিছিয়ে এল রিভার্স পাওয়ারে।

এয়ার লক কন্ট্রোল প্যানেলে টিপটিপ করে জ্বলছে লাল বাতি, হঠাৎ সবুজ হয়ে উঠল। সাবমারসিবলে ঢুকেছে ফু-চুং-আতাসি।

স্রোতের দ্বিতীয় ধাক্কায় আবারও কিছুটা সামনে চলে গেল ডিসকভারি। মিসাইল একটু পিছনে। মোটরের গতি খানিক বাড়াল উর্বশী। ড্রাই ডকের ভিতর ঢুকছে জোয়ারের জোরালো ঢেউ, সেই গতি সামলে নিয়ে সঠিক জায়গায় থাকতে হবে। ছোট্ট সাবমারসিবল নিয়ে খেলছে উল্টোপাল্টা স্রোত।

রানা জানে সামলে নেবে উর্বশী, নইলে আগেই জানিয়ে দিত ড্রাই ডকে ঢোকা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, এখনও সাহায্য চায়নি ও। ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনে চোখ রেখেছে রানা। তৃতীয়বার ভুল হলো না উর্বশীর, খানিকটা ব্যালাস্ট ছেড়ে দিল, সাব স্থির হলো মিসাইলের উপর। আঁকশিগুলো জড়িয়ে নিল গোলাকার মিসাইল, নিয়ে চলে গেল ডিসকভারির পেটে রাখতে। ট্যাঙ্ক থেকে খানিক বাতাস বের করে দিয়ে ভারসাম্য ঠিক করে নিল উর্বশী। নিচু স্বরে বলল, 'তিনবার চেষ্টার পর!'

সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখা বাহু গুটিয়ে নিল রানা, সেটা চলে গেল ডিসকভারির থুতনির কাছে। কাজটা শেষ হতেই

জয়স্টিক নাড়তে শুরু করল উর্বশী। ঘুরছে সাব। লিডার সিস্টেম থেকে তথ্য এল, আংশিক খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল উর্বশী বাইরের সাগরে। ডানদিকে রওনা হলো সাব।

জানতে হবে ব্যাটারির শক্তি, ডিসকভারির গতি এবং পানির গতিবেগ। কম্পিউটারে তথ্য দিতেই জানিয়ে দিল ডিসকভারি কতদূর যেতে পারবে। রানা ও উর্বশীর পিছনে ওয়েট সুট ছাড়ছে ফু-চুং ও আতাসি, ঝটপট পরে নিল শুকনো পোশাক।

ওরা যে হিসাব করেছে তার চেয়ে জোর গতিতে এসেছে জোয়ার। সাবমারসিবলে রয়েছে মাত্র দুই ঘণ্টা চলবার মত ব্যাটারি। মার্ভেলে পৌঁছুনোর পর খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। মন কু ডাকছে রানার। অনুভব করছে, ইজরায়েলিদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে যেতে হবে।

'ডিসকভারি থেকে মার্ভেল,' রেডিও করল রানা।

'গলা শুনে খুশি লাগছে, মাসুদ ভাই,' জানাল বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। 'সব ঠিক মত চলেছে?'

'বাচ্চার হাত থেকে মোয়া কেড়ে নেবার মত। জাহাজের রূপ পাল্টে নেয়ার কাজ চলছে?'

'ঘড়ি ধরে, মাসুদ ভাই। বো'র মাথা থেকে খাপ সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আগের মত হয়ে গেছে চিমনি। কন্টেইনার খোলার কাজ চলছে।'

'গুড। মুর্তোজা, গগলকে জানিয়ে দাও তোমরা আধ ঘণ্টা পর রওনা হবে। তিন নট গতি তুলবে।' ডিসকভারি চলেছে ঘণ্টায় চার নট গতিতে। 'তোমরা বন্দর থেকে বেরিয়ে গেলে দেখা করব আমরা।'

'বন্দরের দিকে আসছে দুটো জাহাজ, আপনাদেরকে তুলে নেয়া কঠিন হবে।'

'তবুও। চলার পথে উঠব আমরা।' মুন পুলে উঠে যাওয়া এমনিতেই কষ্টসাধ্য, তার উপর অনেক বেশি বিপজ্জনক চলন্ত জাহাজে ওঠা।

'এ না করলেই নয়?' দ্বিধা নিয়ে বলল উর্বশী।

কোনও ব্যাখ্যা দিল না রানা।

আগের নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পর মার্ভেলের নীচে হাজির হলো ডিসকভারি। সরে এসেছে ইজরায়েলি উপকূল থেকে। জাহাজের চল্লিশ ফুট নীচে হাঁ হয়েছে মুন পুলের দরজা, মিশে গেছে খোলের সঙ্গে। মার্ভেলের ভিতর জ্বলছে লাল ব্যাটল ল্যাম্প, মুন পুলের পানির উপর পড়ছে রক্তিম আলো। সাব থেকে ওদের মনে হলো দোজখের দরজা লক্ষ্য করে চলেছে।

মার্ভেলের শ্লথ গতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে উর্বশী, দরজার মাঝ দিয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুতি নিল। সাধারণত মুন পুলে নামে ডাইভাররা, কেবল দিয়ে বেঁধে দেয় ডিসকভারিকে। জাহাজে তুলে নেয়া হয় উইঞ্চ দিয়ে। কিন্তু এখন গতি মাত্র তিন নট হলেও, যথেষ্ট জোরে বইছে ঢেউ এবং স্রোত, কাজেই ঘেরা জায়গায় ডাইভিং করা অসম্ভব।

গতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার পর ডায়াল করে ব্যালাস্ট কমিয়ে আনল উর্বশী, ট্যাঙ্কে পাম্প করছে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে শুরু করল ডিসকভারি।

'তাড়াহুড়ো করবেন না, লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার,' কম লিঙ্কে জানাল মুর্তোজা। 'তবে উপরে উঠতে চার মিনিট পাবেন। এরপর সরে যেতে হবে শিপিং লেন থেকে। সামনে থেকে জাহাজ আসছে।'

'একে বলে মানসিক চাপ,' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। চোখ সরছে না কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে। আরও ব্যালাস্ট রিলিজ

করল। আলতো করে ধরেছে জয়স্টিক ও থ্রটল। ছোট ছোট টোকা দিয়ে কারেকশন করে চলেছে।

চোখের সামনে বিশাল হয়ে উঠছে লাল গহ্বর।

'সুন্দর ভাবে চলছে সব,' কো-পাইলটের সিট থেকে বলল রানা।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে মুন পুলের দরজার নীচে এসে থামল ডিসকভারি। শুনতে পেল ওরা জাহাজের অত্যাধুনিক ইঞ্জিনের গুঞ্জন, সঙ্গে ড্রাইভ টিউবে বয়ে চলা পানির শোঁ-শোঁ আওয়াজ। সামান্য গতি কমাল উর্বশী, চাইছে মুন পুলের পিছন দিকে ভেসে উঠতে। এখন সাব-এর ফিন ও প্রপেলারগুলো ইস্পাতের দেয়াল থেকে মাত্র এক ফুট দূরে।

'আমরা চললাম,' নিচু স্বরে বলল উর্বশী। পরক্ষণে টিপে দিল সুইচ। হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল ধাতব সমস্ত ব্যালাস্ট, সাগরের বুকে গিয়ে পড়ল পাঁচ শ' কেজি ওজনের লোহার বল।

হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে উঠতে শুরু করল ডিসকভারি, ভুস করে ভেসে উঠল মুন পুলে। হাঁড়ির ভিতর যেন ফুটছে পানি। মার্ভেল তিন নট গতিতে চলেছে, ফলে দ্রুত নড়ছে পুলের পানি। সামনের দিকে রওনা হয়ে গেল ডিসকভারি। দ্রুত ইমার্জেন্সি রিভার্স থ্রাস্টার চালু করল উর্বশী। দৈর্ঘ্যে ডিসকভারি সুইমিং পুলের ঠিক অর্ধেক, কাজেই মুহূর্তে চলে আসছে সামনের দেয়াল! সংঘর্ষ হতে পারে, তাই ওদিকে রাখা হয়েছে ইনফ্লেটেবল ফেণ্ডার। তবে সামলে নিল উর্বশী, ডিসকভারি শুধু টোকা দিল দেয়ালে।

দু'জোড়া পা উঠে এল সাবের উপর। হার্ডপয়েন্টে লিফটিং লাইন আটকে দিল টেকনিশিয়ানরা। অনেক নীচে এরইমধ্যে বন্ধ হতে শুরু করেছে মুন পুলের দরজা।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল উর্বশী, থ্রটল থেকে সরিয়ে নিল

হাত।

'ওয়াণ্ডারফুল!' নিচু স্বরে বলল রানা।

'থ্যাঙ্কস,' উর্বশীর ক্লান্ত চোখ দুটো রানার দিকে চাইল। 'এখনকার মত যথেষ্ট। চললাম, আমাকে ডাকছে বাথটাব।'

'বিশ্রাম নাও,' সিট থেকে পিছলে বেরিয়ে এল রানা, প্লাস্টিকের মেঝের উপর জমছে পানি। 'পরে দেখা হবে।'

হ্যাচের কাছে দাঁড়াল ওরা। ক্রেডলে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ডিসকভারিকে। উপর থেকে খুলে গেল হ্যাচ। 'চলে আসুন,' বলল এক টেকনিশিয়ান।

'লেডিজ ফার্স্ট,' একটু সরে দাঁড়াল সোহেল।

প্রথমে উঠে গেল উর্বশী, তারপর একে একে ওরা। মেঝেতে নেমে পড়তেই রানার দিকে হেডসেট বাড়িয়ে দিল এক টেকনিশিয়ান।

অপারেশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করল রানা, 'গগল, তুমি কি হেলম্-এ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল গগল।

'মুন পুলের দরজা বন্ধ হলে গতি তোলো আঠারো নট-এ। সরে যেতে চাই ইজরায়েলি উপকূল থেকে। পনেরো ঘণ্টা পর বাংলার গৌরব তাজউদ্দীনের সঙ্গে রন্দেভু।'

'ঠিক আছে।'

নির্দিষ্ট সময়ে মিসাইল সরিয়ে দিতে হবে, নইলে পশ্চিমা স্পাই স্যাটালাইটগুলো তাদের মালিকদের জানিয়ে দেবে কী ঘটেছে।

'মুর্তোজাকে বলো ইজরায়েলি মিলিটারি ওয়েভ লেংথে কান রাখুক। আমি কেবিনে ফিরছি। অস্বাভাবিক কিছু শুনলে যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘুম থেকে তোলে।'

ডিসকভারি থেকে মিসাইল সরিয়ে নেবে ফু-চুং ও অনিল, মটোরাইযড কার্ট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নিরাপদ জায়গায়। এরইমধ্যে কম্পিউটার ড্রাইভ একটা ওয়াটারপ্রুফ হার্ড কেসে রেখেছে সোহেল। ওটা যাবে বাংলাদেশি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে।

'বসের সঙ্গে কথা বলবি না, রানা?' বলল সোহেল। 'হয়তো রাতে ঘুমাতেই পারেননি। একটু পর অফিসে পাবি।'

'তুই কথা বল্। তারপর ঘুমাতে যা।'

কব্জি ঘুরিয়ে চট্ করে ঘড়ি দেখল সোহেল। 'প্রায় পাঁচটা বাজে। আর শোবো না। ক্রুদের সঙ্গে লেগে থাকি, মার্ভেল বদলে নেয়ার কাজ শেষ হতেই আসছে বাবুর্চির গ্র্যাণ্ড নাস্তা।'

'চললাম তা হলে,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

Posh শব্দটা এসেছে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময়কালে। সে সময়ে মুম্বাই ও দিল্লির ইমপিরিয়াল পদ-প্রাপ্ত জাহাজ-যাত্রীরা এ দেশে আসবার সময় জাহাজে বুক করত পোর্টসাইডের কেবিন। ইংল্যাণ্ড ফিরবার সময় পছন্দ ছিল স্টারবোর্ড কেবিন। এর কারণ ছিল তাদের কেবিন সবসময় থাকত ছায়ার ভিতর। বুকিং এজেন্টরা, 'পোর্ট আউট, স্টারবোর্ড হোম'কে সংক্ষেপে বলত পশ। এর ফলে ইংরেজি ভাষায় যোগ হয় ওই নতুন শব্দ।

রানার কেবিন মার্ভেলের স্টারবোর্ড সাইডে, কিন্তু পশ্চিমদিকে রওনা হওয়ায় পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সকালের রোদ। মুখের উপর আলো পড়তে হঠাৎ জেগে গেল রানা। এক সেকেণ্ড বুঝল না কেন ভেঙেছে ঘুম। পরক্ষণে শুনতে পেল টেলিফোনের টিট-টিট।

বিছানা থেকে চোখ পড়ল বিরাট গোল দেয়াল-ঘড়ির উপর। উঠে বসল ও। এখনও সকাল আটটা বাজেনি। হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল। 'হ্যালো, রানা বলছি।'

'আতাসি, বস্। খেল-খতম, পয়সা হজম। ইজরায়েলি মিসাইল, সাবমেরিন সব খতম।'

ভাল সংবাদ, তবুও ভুরু কুঁচকে গেল রানার। চিফকে এতক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে সোহেল, সফল হয়েছে ওদের অ্যাসাইনমেণ্ট। তার মানে, এশিয়ার দেশগুলো থেকে পশ্চিমা দুনিয়াকে এবার জানানো হবে—তোমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা লড়তে তৈরি। কিন্তু তা হলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল কেন আতাসি?

'আতাসি, কোনও সমস্যা?'

'পাঁচ মিনিট আগে শুনলাম অ্যাশকেলন থেকে চেঁচামেচি হচ্ছে। তারপর সব চুপ।'

কী ঘটেছে বুঝতে সময় নিয়েছে বেস কমাণ্ডার, তারপর যোগাযোগ করেছে তেল আবিবের সঙ্গে। নিশ্চয়ই উঁচু পর্যায় থেকে নেভাল বেসকে বলা হয়েছে, তারা যেন রেডিও বা অনিরাপদ টেলিফোন ব্যবহার না করে। যোগাযোগ করতে হলে ল্যাণ্ড ফোনে কথা বলবে তারা।

প্রথম গালফ যুদ্ধে আমেরিকা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে কান পাতা উচিত। স্যাটেলাইট ও গ্রাউণ্ড লিসেনিং স্টেশনগুলো বা এনএসএ প্রায় প্রতিটি মোবাইল টেলিফোন, রেডিও ব্রডকাস্ট, ফ্যাক্স ট্র্যান্সমিটাল ইত্যাদি ধরেছে, এবং সেসব তথ্য নিজেদের কাজে লাগিয়েছে আমেরিকা। তারা আগেই জানত সাদ্দাম হোসেন কী কমাণ্ড দিয়েছেন, কী করতে চলেছে প্রতিটি ফ্যাসিলিটি। তখন প্রতিটি দেশ স্পষ্ট বুঝেছে

আমেরিকানদের শক্তিশালী টেকনোলজি তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যে কারণে দেশগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে মাটির নীচে বসিয়েছে কেবল। সরাসরি ট্যাপ না করলে এখন নিরাপদ থাকবে তাদের বার্তা।

অ্যাশকেলন নেভাল বেসে প্রথম কিছুক্ষণ তারা খোলাখুলি কথা বলেছে, যে কারণে ইণ্টাসেপ্ট করতে পেরেছে মার্ভেল।

'যা শুনেছ তা থেকে কী বুঝলে?' জানতে চাইল রানা।

'বলেছে তাদের ড্রাই ডকে ঢুকে পড়ে একদল কমাণ্ডো। ওখানে বেশ কিছু বিস্ফোরণ ঘটে। বিধ্বস্ত হয়েছে কণ্ট্রোল রুম। তলিয়ে গেছে দুটো সাবমেরিন। পাখিগুলো আর নেই। ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ওরা বোধহয় মিসাইলের নাম দিয়েছে পাখি।'

'তারপর নির্দেশ আসে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে। বলা হয়, নবী মুসার কণ্ঠ অনুসরণ করুন।'

'তার মানে মিলিটারি কমিউনিকেশন লাইনে আলাপ করতে বলেছে।' কর্ডলেস ফোন কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝে গুঁজল রানা, বিছানা ছেড়ে উঠে দ্রুত হাতে পরতে শুরু করেছে পোশাক। 'আর কিছু, আতাসি?'

'না। আর কিছুই না।'

ও নিজে ইজরায়েলি জান্তা হলে কী করত, ভাবতে চাইল রানা। 'ওদের প্রথম কাজ অ্যাশকেলন বন্দর বন্ধ করে দেয়া। তন্নতন্ন করে খুঁজবে প্রতিটি জাহাজ। সম্পূর্ণ সতর্ক রাখবে নেভিকে। উপকূল থেকে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর যত জাহাজ, যে-কোনও মূল্যে থামাবে সেগুলোকে, সার্চ করবে।'

'আমরা কিন্তু সেই বৃত্তের ভিতর, বস্,' বলল আতাসি।

'গগলকে জানিয়ে দাও যত দ্রুত সম্ভব ভাগতে হবে। পাঁচ

মিনিটের মধ্যে অপারেশন্স সেন্টারে আসছি। সিনিয়ার স্টাফদের ওখানে থাকতে বলো।' মাত্র দুই ঘণ্টা আগে আতাসি ছাড়া সবাই ডিউটি শেষ করেছে, কিন্তু রানা চাইছে ইজরায়েলিদের নাগালের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকুক ফু-চুং, সোহেল, অনিল ও উর্বশী। যে-কোনও সময় দরকার পড়তে পারে ওদেরকে।

মার্ভেল জাহাজটা যখন মিস্টার পাপাগোপালার কাছ থেকে নিল রানা, প্রচণ্ড পরিশ্রম দিয়ে বদলে নেয় অপারেশন্স সেন্টারকে। বলা যায় জাহাজের মগজ ওটা। ইঞ্জিন, ওয়েপন্স সিস্টেম, ফায়ার-সাপ্রেশন স্প্রিংলার থেকে শুরু করে কমিউনিকেশন সিস্টেম পর্যন্ত সবই নিয়ন্ত্রণ করা যায় ওখান থেকে। জাহাজের বাইরের অংশ যেমন ধচা-পচা, ঠিক তার উল্টো ভিতরটা—রয়েছে বর্তমান সময়ের প্রতিটি হাই-টেক যন্ত্র। সামনের দেয়ালে রয়েছে প্রকাণ্ড এক ফ্ল্যাট-প্যানেল স্ক্রিন, ওখানে একইসঙ্গে দেখা যায় বারোটা দৃশ্য। জাহাজের ক্যামেরা, সাবমারসিবল, আনম্যান্ড্ রোভ বা রবিনসন আর-৪৪ হেলিকপ্টার থেকেও আসে ছবি।

ফ্ল্যাট প্যানেলের ঠিক নীচে রয়েছে ওয়েপন্স স্টেশন ও হেলম্, পাশে আতাসির কমিউনিকেশন কন্সোল। খানিকটা পিছনে সোহেলের চেয়ার। প্রধান সোনার ওয়াটারফল ডিসপ্লে জ্বলজ্বল করে অন্ধকার ঘরে, ওটার সামনে থাকে উর্বশী। মাঝখানে রয়েছে রানার চেয়ার। নিজের জন্য শখ করে কেনেন ওটা পাপাগোপালা। ওখান থেকে ঘরের সবকিছু নজরে আসে। প্রয়োজন পড়লে যে-কোনও স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিতে পারবে রানা।

অপারেশন্স সেন্টারের ছাত বেশ নিচু, বারোটা কম্পিউটার ডিসপ্লে থেকে আসছে নানান রঙের আলো। দেখলে মনে হয় জায়গাটা নাসার তৈরি মিশন-কন্ট্রোল রুম।

ইতিমধ্যে এসে নিজের চেয়ারে বসেছে পরিশ্রান্ত সোহেল।

রানা আসবার তিরিশ সেকেণ্ড আগে হাজির হয়েছে গগল, অনিল, ফু-চুং ও উর্বশী। নিজের সিটে বসে দাড়ি হাতড়ে চলেছেন পাইলট আলম সিরাজ। কিছু দিন হলো এমআইটি থেকে পিএইচডি নেয়ার চেষ্টা করছেন। সর্বক্ষণ মাথার ভিতর ঘুরছে জটিল সব অঙ্ক।

কম্পিউটারের ডিসপ্লে কাত করে ওটার দিকে চাইল রানা, এমন সময় ওর ডান হাতের পাশে পৌঁছে গেল বাষ্প ওঠা কফি।

নিঃশব্দে হাজির হয়েছে বাবুর্চি মোস্তফা আবুল। 'আপনার জন্য কফি, স্যর।'

'ধন্যবাদ।'

'নাস্তা এখানে দেব?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

নীরবে বিদায় নিল বাবুর্চি। কাপের উপর দিয়ে সামনের দিকে চাইল রানা। চারপাশের সাগর চোখে পড়ছে রেইডার দিয়ে। স্ক্রিনের উপর অংশে ইজরায়েলি উপকূল। সুয়েজ খাল থেকে মেডিটারেনিয়ান সাগরে বেরিয়ে এসেছে দুটো সুপারট্যাঙ্কার। পুবে অনেকটা দূরে বিশাল এক জাহাজ। ওটা সম্ভবত আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।

মার্ভেলের গতি ও দিক লক্ষ করল রানা। এবার দেখে নিল সাগরতল কত নীচে। গভীরতা চার শ' ফুট। সহজে আসতে পারবে ইজরায়েলি সাবমেরিন। হামলা আসতে পারে হেলিকপ্টার বা বিমান থেকেও। চট্ করে একবার স্ক্রিনের দিকে চাইল রানা। ক্যামেরাগুলো ফিড দিয়ে চলেছে। মার্ভেলের বাইরের অংশ স্বাভাবিক। যেমন হওয়া উচিত। মোটা চিমনি দিয়ে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। নাম পাল্টে নেয়া হয়েছে। জ্যাক স্টাফে উড়ছে গ্রিসের পতাকা। মাস্তুলের উপরের ক্যামেরা থেকে একটা ট্যাঙ্কার

দেখা গেল। কিছুক্ষণ আগে ওটাকে পেরিয়ে এসেছে মার্ভেল। পশ্চিম দিকে আধ মাইল দূর দিয়ে চলেছে এক কন্টেইনার জাহাজ।

'সোনারে কিছু, উর্বশী?'

'আশপাশে নয়টা জাহাজ আওয়াজ তুলছে, আর তেমন কিছুই নয়।' আরও কী যেন বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল উর্বশী, কুঁচকে উঠেছে ভুরু।

'ব্যাপারটা যত ছোটই হোক, বলে ফেলো,' বলল রানা।

'এখানে আসবার সময় আতাসির কাছে শুনেছি অ্যাশকেলন-এ থেমে যায় আলাপ। তার আগে ট্র্যান্সমিট করা হয়। বন্দর থেকে অনেক দূর সাগরে যোগাযোগ করে।'

'তারপর আর যোগাযোগ করেনি?' আতাসির দিকে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেদুঈন। 'মাত্র ওই একবার।'

এ তথ্য কী প্রমাণ করে, নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'কোনও জঙ্গি বিমান বা হেলিকপ্টার?'

'আমাদের পুবে একটা এএসডাব্লিউ প্লেন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে ওঠে,' বলল আতাসি। 'একঘণ্টা আগে আমাদের মাথার উপর চক্কর কেটেছে। তবে ইজরায়েল থেকে কিছু নয়।'

তবে বিপদ নাও হতে পারে, ভাবল রানা।

পরক্ষণে উর্বশীর উঁচু কণ্ঠ শুনতে পেল: 'সোনার কন্ট্যাক্ট! সাত হাজার গজ! টর্পেডো আসছে! আমাদের অ্যাম্বুশ করেছে ওরা! বো ডোর খোলা, টিউব ভরে গেছে পানিতে।'

টর্পেডো থেকে এখনও পাঁচ মাইল দূরে মার্ভেল, রানা জানে ওরা বিপদ এড়াতে পারবে। শান্ত স্বরে বলল, 'ট্র্যাক করো। আগে দেখো ওটা কোনদিক দিয়ে আসছে। পরে ঠিক করা যাবে কী

করা যায়।'

'সোনার কণ্ট্যাক্ট!' আবারও বলে উঠল উর্বশী। 'পানিতে আরেকটা টর্পেডো! মোটামুটি সঠিক টার্গেট দিল কম্পিউটার। প্রথম মাছ কণ্টেইনার শিপের দিকে চলেছে। জাহাজটার নাম এক্সপ্লোরেশন। সুয়েজ থেকে বেরিয়ে চলেছে সাইপ্রাসের দিকে।'

ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি।

'আমেরিকান ফ্লিট থেকে সতর্ক করা হলো,' বলে উঠল আতাসি। 'ওরা টর্পেডো রওনা হওয়ার আওয়াজ পেয়েছে। আকাশে বিমান তুলছে।'

'কপাল মন্দ, দু'দলের মাঝে আটকা পড়ছি,' বলল অনিল।

থমথম করছে অপারেশন্স সেন্টারের ভিতর। তারপর চাপা স্বরে বলল উর্বশী, 'নতুন কণ্ট্যাক্ট! তৃতীয় টর্পেডো রওনা হয়েছে! অর্ধ-চন্দ্রের মত ঘিরতে চাইছে আমাদের। পিছনে কণ্টেইনারশিপ আর সুপারট্যাঙ্কার।'

একটা টর্পেডো এলে সহজে সামলে নিত রানা। দুটো হলেও পাশ কাটাতে চাইত। কিন্তু তিনটে টর্পেডো উদয় হওয়ায় উদ্ধার পাবে সে-সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। ওরা দ্রুতগতি তুলে কণ্টেইনার শিপ ও ট্যাঙ্কারকে মাঝখানে রাখতে পারে। কিন্তু সরাসরি ও-দুটোর উপর হামলে পড়বে টর্পেডো। সুপারট্যাঙ্কারের হোল্ড ভরা ক্রুড অয়েলে, কাজেই যে করে হোক রক্ষা করতে হবে ওটাকে।

'চার নম্বর লঞ্চ করেছে,' প্রায় অবিশ্বাস নিয়ে বলল উর্বশী। 'চারটে! কণ্টেইনার শিপ থেকে প্রথম টর্পেডো ছয় হাজার গজ দূরে। অন্যগুলোর চেয়ে ধীরে আসছে শেষ মাছটা।'

'অপেক্ষা করছে, অন্যগুলো ফস্কে গেলেও ভুল যেন না হয়,' বলল সোহেল।

প্রথম তিন টর্পেডো টার্গেটে না পৌঁছলে, বা যদি ডেটোনেট

না হয়, হাতে থাকবে আরেকটা। ওই টর্পেডো প্রস্তুত থাকবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে।

এ ধরনের ট্যাকটিক সম্বন্ধে পড়েছে রানা। কিন্তু ওর হাতে এমন কোনও অস্ত্র নেই, যা দিয়ে রক্ষা করবে নিজেদের।

ইজরায়েলি টর্পেডো ডুবিয়ে দেবে মার্ভেলকে, উপায় নেই কোনও!

পাঁচ

ভূমধ্যসাগর।

প্রমোদ-তরী এমভি গোল্ড অভ মার্স।

ভয়ঙ্কর এক দানব খামচে ধরেছে হেলেন জিলের নাক-মুখ। যতই চেষ্টা করুক, শ্বাস নিতে পারছে না সে। চোখে আঁধার দেখছে, বুকের উপর যেন চেপে বসেছে দৈত্য। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সে। হঠাৎ নাক দিয়ে টেনে নিতে পারল সামান্য বাতাস। তবে ওটুকু যথেষ্ট নয়। যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে। বামদিকে কাত হলো হেলেন, তারপর ডানে! আর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চেতনা হারাবে। উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী? মন বলছে, পানির নীচে ডুবে মরছে। এ কথা ভাবলে ভীষণ ভয় লাগে। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু কী হতে পারে? শীতল পানি, তার ভিতর শ্বাস নেয়ার উপায় নেই! বুকে ভীষণ কষ্ট! ভাল হতো কেউ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে খুন করলে।

তাই তো করছে এখন!

শেষবারের মত চেষ্টা করল হেলেন জিল। লাফিয়ে উঠে বসতে চাইল।

ফোঁস করে বেরিয়ে এল শ্বাস, হঠাৎ ঘুম ভাঙল হেলেনের। বিন্দু বিন্দু ঘাম ভিজিয়ে দিয়েছে মুখ ও গ্রীবা। বিছানার উপর প্রায় বসে পড়তে চাইল। কিন্তু গায়ের উপর ভারী চাদর ও কম্বল। প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে নাকে ঢুকছে নিখাদ অক্সিজেন। কিন্তু গলা জড়িয়ে ধরেছে পাইপ, সেজন্যই ভেঙেছে ঘুম। ক'দিন ধরে হাঁপানি বেড়েছে তার, বারবার অ্যাটাক হচ্ছে।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবার পর আসছে অ্যাটাক। সাইড টেবিলে চলে গেল হেলেনের হাত। ওখানে ইনহেলার। আবছা ভাবে জানে, ও রয়েছে জাহাজের হাসপাতালে। মাউথপিস তুলে নিল হেলেন, দু'ঠোঁটের ভিতর গুঁজল—দু'বার ওষুধ নেয়ার পর একটু ভাল লাগল।

অস্থির ফুসফুসকে শান্ত করছে ভেন্টোলিন। একটু সহজ হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। আরও দু'বার পাম্প করল ওষুধ। এবার শান্ত হবে মন, মিলিয়ে যাবে অ্যাটাকের সিম্পটমগুলো। তবে এখনও ধড়ফড় করছে বুক। কী ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে! নাক থেকে ক্যানিউলার এক অংশ খুলে গেছে বলেই এই অবস্থা। প্লাস্টিকের টিউব লাগিয়ে নিতেই ঠিক ভাবে এল বাতাস। বিছানার পাশে মনিটর, ওটার দিকে চাইল। সরবরাহ বেড়েছে অক্সিজেনের। দু'হাতে মসৃণ করল চাদর, কাজ শেষে শুয়ে পড়ল গর্ত হয়ে যাওয়া বিছানায়।

আজ তিনদিন ডিসপেনসারির ভিতর বন্দি। এভাবে শুয়ে থেকে মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছে হেলেন। বারবার গাল দিচ্ছে ওর ফুসফুসকে। অবশ্য বান্ধবীরা নিয়মিত দেখা করছে। কিন্তু ও তো

জানে, কেউ খুশি মনে আসে না। নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়! সেজন্য ওদের দোষ দেবে না। কারই বা ভাল লাগবে? ওকে বিশ্রী লাগে অ্যাটাকের সময়ে। ও যেন কোনও মাছ, পানি থেকে তুলে নেয়ায় খাবি খেয়ে চলেছে! নিজের জন্য কষ্ট লাগছে ওর। কীই বা করবে? শরীরে এতটুকু শক্তি নেই! নিঃসঙ্গ নার্সকে একটু সাহায্য করবে, তা-ও পারে না। তিনদিন হলো বদলানো হয়নি চাদর। শরীরে ঘামের গন্ধ!

হেলেন টের পেল না হঠাৎ কখন পর্দা ঠেলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছেন ডক্টর ম্যাক্স কেইন। তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। ছিলেন ইংল্যাণ্ডের নামকরা হার্টের সার্জন। স্ত্রীর সঙ্গে তালাক হওয়ায় হাসপাতাল থেকে অবসর নেন, চাকরি নেন ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইনস-এ। তারপর থেকে রয়েছেন এমভি গোল্ড অভ মার্সে। এখন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে হয় না, সেটাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। হাসপাতালে যা রোজগার করতেন, তার চার ভাগের এক ভাগ পেয়েও তাই খুশি। এ জাহাজে রয়েছে স্বাধীনতা ও মানসিক স্বস্তি।

'চেঁচিয়ে উঠলে মনে হলো?' বললেন ডক্টর কেইন। রোগিণীর উপর চোখ নেই, চেয়ে রয়েছেন মনিটরে। 'কোনও সমস্যা?'

'আবার অ্যাটাক,' ঠোঁটে কষ্টসাধ্য হাসি ফুটিয়ে তুলল হেলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মিষ্টি সুর ওর কণ্ঠে, 'তিনদিন ধরে এ-ই তো চলছে। তবে আগের চেয়ে কষ্ট কম। বোধহয় সুস্থ হয়ে উঠছি?'

'সে সিদ্ধান্ত আমি নেব,' পেশেন্টের দিকে চাইলেন ডাক্তার, চোখে দুশ্চিন্তা। 'তুমি যখন এলে নীল ছিল মুখ। আমার মেয়েরও ক্রনিক অ্যাজমা, তবে তোমার মত এত বেশি নয়।'

'অভ্যেস হয়ে গেছে,' কাঁধ ঝাঁকাল হেলেন। 'আমার প্রথম

অ্যাটাক হয় পাঁচ বছর বয়সে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার জীবনের চার ভাগের তিন ভাগ কাটিয়ে দিয়েছি এই রোগ নিয়ে।'

'আমার জানা দরকার, তোমার পরিবারে হাঁপানি আর কার কার ছিল।'

'আমার ভাই-বোন নেই, বাবা-মার এ-রোগ ছিল না। তবে মা বলতেন আমার নানী ছোট বেলায় খুব ভুগেছেন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন কেইন। 'পরিবার থেকে পেয়েছ। সাগরে তুমি বাজে পরিবেশ থেকে অনেক দূরে, কাজেই কমে আসবে সিম্পটম।'

'তাই মনে করতাম,' বলল হেলেন, 'সাগরে যেতে পারব জেনেই জাহাজের ওয়েট্রেস হই। শুনেছি সাগরে মুক্তি মেলে হাঁপানি থেকে। তা ছাড়া, আমাদের শহরও এতই ছোট, কোনও কাজ ছিল না ওখানে। শুধু বন্দরের দিকে চেয়ে থাকা, আর একটা-দুটো নৌকা দেখা।'

'তোমার বাবা-মার কথা খুব মনে পড়ে, তা-ই না?'

'দু'বছর আগে মারা গেছেন তাঁরা,' হেলেনের কালো চোখে ছায়া ঘনাল। 'সড়ক দুর্ঘটনা।'

'সত্যিই দুঃখিত।' প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন কেইন, 'তোমার ত্বকের রং ফিরছে। শ্বাস নেয়া সহজ হয়ে উঠছে।'

'তা হলে আমাকে এবার ছেড়ে দেবেন?' জানতে চাইল হেলেন।

'ঠিক এখনই নয়। তোমার অক্সিজেন নেয়ার মাত্রা এখনও অনেক কম। আরেকটু সুস্থ না হলে ছাড়া যাবে না।'

'আপনার বোধহয় ক্রু সোশ্যাল সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই,' হতাশ হয়ে বলল হেলেন। দেয়াল-ঘড়ি অনুযায়ী আর তিন ঘণ্টা পর শুরু হবে দারুণ সেই পার্টি।

একুশ দিন আগে ফিলিপিন্স ছেড়েছে জাহাজের হোটেলের স্টাফরা। এতদিনে প্রথমবারের মত নাচবার সুযোগ মিলছে। ওয়েটার, ওয়েট্রেস, মেইড ও অফ ডিউটি ক্রুরা দারুণ ফুর্তি করবে। এ ক্রুজে দুর্দান্ত সুপুরুষ ক'জন নরওয়েজিয়ান ক্রু এসেছে। এদের সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যস্ত হেলেনের বান্ধবীরা। আসছে কমবয়সী অনেক প্যাসেঞ্জার। গত এক সপ্তাহ ধরে আলাপ চলছে পার্টি নিয়ে।

'না, আসলেই কোনও আগ্রহ নেই,' বললেন ডাক্তার কেইন।

খুদে হাসপাতালের ওয়ার্ডে কে যেন ঢুকছে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এক মুহূর্ত পর হেলেনের বিছানার পাশে এসে থামল দুটি মেয়ে। গা থেকে ভুরভুর করে আসছে কড়া পারফিউম। এরা এলেন ও জ্যানিক। গোল্ড অভ মার্স-এ আসবার পর এই দু'জনের সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে হেলেনের। মিউনিকের মানুষ ওরা। এলেনের বয়স একটু বেশি। তিন বছর হলো ক্রুজ লাইনে। আর জ্যানিক এক মাস আগে এসেছে। ও পেস্ট্রি শেফ। ওরা তিনজন একই ডাইনিং রুমে কাজ করে।

ওরা এসব পোশাক পরেছে পুরুষগুলোকে খুন করতে, মনে মনে বলল হেলেন। এলেনের পরনে কালো ড্রেস, সঙ্গে স্প্যাগেটি স্ট্রিপ। বুকের বিশাল অংশ খোলা। জ্যানিক পরেছে ট্যাঙ্ক ড্রেস, কাপড়ের নীচে আঁটোসাঁটো রাখবার লাইন নেই! ভারী মেকআপ নিয়েছে ওরা, হেসে ফেলছে সামান্য কথাতেই।

'তোমার কী অবস্থা?' বিছানার কিনারায় বসল এলেন। পাত্তাই দিল না ডক্টর কেইনকে।

'জ্বলছি হিংসায়।'

'আমাদের সঙ্গে পার্টিতে যাবে না?' ভ্রূকুটি করে ডাক্তারের দিকে চাইল জ্যানিক। সব দোষ যেন ওই লোকের! ডাক্তার যদি

হেলেনের হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে রাখত, তা হলে আজ...

কপালের উপর থেকে ঘাম-ভেজা চুল সরিয়ে দিল হেলেন। 'আমি যদি যেতাম, তাও তো তোমাদের এসব পোশাকের কাছে ড্যাম ডিফিট খেতাম!'

'তোমার কী মনে হয় আমাকে পছন্দ করবে জ্যাকব?' ঠোঁট ফোলাল জ্যানিক।

'বেচারা পুরো পাগল না হয়ে যায়,' বলল এলেন।

'ঠিক জানো তো সে আসছে?' বলল হেলেন। হতাশা কাটাতে চাইছে, এদিকে বুক আঁকড়ে আসছে কষ্টে। ওরা যেসব টেবিলে খাবার সার্ভ করে, সেখানে আসে ওই যুবক। ক্যালিফোর্নিয়ার লোক। ঝলমলে সোনার মত চুল। চোখ দুটো সাগরের মত নীল। পেশিবহুল দেহ, নিয়মিত ব্যায়াম করে। মহিলা স্টাফরা রায় দিয়েছে, ওই জ্যাকব স্মিথ এ জাহাজের সেরা সুপুরুষ। হেলেন জানে, কয়েকবার জ্যানিকের সঙ্গে ডেটও করেছে জ্যাকব।

দু'হাত দিয়ে পোশাক মসৃণ করতে চাইল জ্যানিক। 'আমাকে বলেছে ও আসবেই।'

আলাপে বাধা দিলেন কেইন, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো সে রেসপন্সিভিস্ট?'

কড়া চোখে ডাক্তারের দিকে চাইল জ্যানিক। 'আমি বড় হয়েছি চারটে ভাই আর তিন বোনের সঙ্গে। আমার মনে হয় না বাচ্চা না নেয়া খারাপ কিছু হতে পারে।'

'ওরা কিন্তু বাচ্চা না নেয়ার বাইরেও অনেক কিছু করে,' বললেন কেইন।

ডাক্তারের কথা আপত্তিকর মনে হয়েছে জ্যানিকের। তা ছাড়া ও কি জানে না এই গোষ্ঠী কী বিশ্বাস করে? জোর দিয়ে বলল জ্যানিক, 'নিশ্চয়ই জানেন, ওরা মানুষকে সাহায্য করে? পরিবার

পরিকল্পনা নিতে বলে। তৃতীয় বিশ্বের লাখ লাখ অসহায় মেয়েকে সঠিক পথ দেখায়। দুনিয়া ভরা বাড়তি মানুষের কষ্ট কমিয়ে দিতে চায়। উনিশ শ' সত্তর সালে যখন ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল এই সংস্থা গড়ে তোলেন, তখন দুনিয়া জুড়ে ছিল তিন বিলিয়ন মানুষ। আর আজ? তার দ্বিগুণ। ছয় বিলিয়ন! এবং এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা একটুও কমছে না। গত এক হাজার বছরে যত লোক পৃথিবীতে জন্মেছে বা মরেছে, তাদের সবাইকে ধরলে যা হবে, আজকের পৃথিবীর জনসংখ্যা ঠিক ততই! একথা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?'

'দেখেছি, প্ল্যাকার্ডে এসব লিখেছে,' বললেন ডক্টর কেইন। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা যা করছে সব জেনে বুঝে করছে? জ্ঞান দিতে চায় মানব সমাজকে, যে সমাজ কোটি-কোটি বছর ওদের সাহায্য ছাড়াই গড় গড় করে চলে এসেছে এই বর্তমান পর্যন্ত? ...শুনেছি এদের সঙ্গে চলতে হলে যে-কোনও মেয়েকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, সে বেঁধে নেবে তার ফ্যালোপিয়ান টিউব। সব শুনে আমার মনে হয়েছে এরা অন্ধের মত চলেছে বিপজ্জনক, অন্ধকার পথে। কাল্ট তৈরি করছে আসলে ওরা।'

'জ্যাকবকে এই একই কথা বলেছে অসংখ্য লোক, শুনেছি,' আড়ষ্ট স্বরে বলল জ্যানিক। যেমন করে হোক পছন্দের পুরুষের ধ্যান ধারণাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত। 'আপনি সব তথ্য না জেনেই তো কারও ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিতে পারেন না।'

'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু...' থেমে গেলেন ডাক্তার কেইন। কথা বলে লাভ কী? বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়েকে বোঝাবে কে? রীতিমত খেপে আছে। একে তপ্ত মস্তিষ্ক, তার উপর শরীরে প্রচুর হরমোনের দৌড়ঝাঁপ—এদের কিছু বলে লাভ আছে? 'হ্যাঁ, আসলে কারও বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেয়া... যাই হোক, এবার

তোমরা হেলেনকে বিশ্রাম নিতে দাও। পার্টি শেষে জানিয়ে যেয়ো কী কী ঘটেছে।'

'তুমি ভাল থাকবে তো, সুইট গার্ল?' হেলেনের কাঁধে হাত রাখল এলেন।

'কোনও অসুবিধে নেই। যাও, মজা করোগে। কাল কিন্তু কী কী ঘটল সব খুলে বলতে হবে।'

'ভাল মেয়েরা মুখ ফুটে বলে কেউ তাকে চুমু দিয়েছে?' হেসে ফেলল জ্যানিক।

'তা হলে আমি চাই তোমরা খারাপ মেয়ে হয়েই থাকো।'

দুই বান্ধবী পাশাপাশি রওনা হয়ে গেল, কিন্তু দু'সেকেণ্ড পর ফিরে এল জ্যানিক। 'হেলেন, আমি বোধহয় ওই কাজটা করব।'

জ্যানিক কী বলতে চাইছে, জানে হেলেন। সত্যি জ্যাকবের প্রেমে পড়েছে এ মেয়ে। দু'একবার চুমু নয় ব্যাপারটা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে তারা। নিজের বিশ্বাস নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করেছে যুবক।

'জ্যানিক, ওটা হবে চোখ বাঁধা অবস্থায় উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ার মত। তুমি কিন্তু জ্যাকবকে ভাল করে চেনোই না।'

'আমি আসলে কখনও বাচ্চা চাইনি। টিউব কেটে ফেললেই বা কী যায়-আসে?'

দুর্বল লাগছে, তবুও সাবধান করল হেলেন, 'ওর মিষ্টি কথা শুনে নিজের ক্ষতি কোরো না, ভাই।' ভাল করেই জানে জ্যানিক ভাল মেয়ে, কিন্তু মনের দিক থেকে যথেষ্ট শক্ত নয়।

'জ্যাকব কিন্তু আমাকে পটিয়ে কিছু করাচ্ছে না,' বড় দ্রুত বলল জ্যানিক। 'বহু দিন ধরে এ নিয়ে ভাবছি। আমি তিরিশ বছর বয়সে বুড়ি হতে চাই না। আমার মাকে তো দেখেছি! তার বয়স

এখন পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় সত্তর। আমি ওরকম হতে চাই না। তা ছাড়া...' হাসিতে ঝলমল করে উঠল ওর চোখ। 'তা ছাড়া আমরা গ্রিসে না নামা পর্যন্ত কিছুই ঘটবে না।'

জ্যানিকের হাত শক্ত করে ধরল হেলেন। 'এটা এমন এক সিদ্ধান্ত যেটা তোমার বাকি জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। আরও গভীর করে ভেবো, ঠিক আছে?'

'বেশ,' বলল জ্যানিক। শুনে মনে হলো প্রতিজ্ঞা করছে মা'র কাছে।

'ঠিক আছে, গুড,' হাত চাপড়ে দিল হেলেন। 'এবার ফুর্তি, ঠিক না? আমার হয়ে বাড়তি মজা কোরো?'

'তা-ই করব।'

দুই বান্ধবী চলে যাওয়ার অনেক পরেও বাতাসে ভেসে রইল তাদের কড়া পারফিউম।

চিন্তা করে চলেছে হেলেন, কুঁচকে উঠেছে দুই ভুরু। কয়েক দিন পর জাহাজ ভিড়বে গ্রিসের পায়েরিয়াসে। আশা করা যায় তার আগেই জ্যানিককে বোঝাতে পারবে ওরা। নিশ্চয়ই বুঝবে, হুট করে মাতৃত্বের অধিকার হারানো উচিত নয়? রেসপনসিভিস্ট হওয়ার প্রথম শর্ত, বাবা বা মা হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করা। পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি, মেয়েদের জন্য টিউবাল লিগেশন। তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হয় তারা কখনও সন্তান চাইবে না। এ দলের বক্তব্য: পৃথিবীতে এমনিতেই অনেক বেশি মানুষ, আর জনসংখ্যা বাড়ানো উচিত নয়। তারপরও যদি রেসপনসিভিস্টদের কেউ কেউ সন্তান কামনা করে, সেটা অসম্ভব কিছু নয়, যদিও খুবই জটিল অপারেশন করতে হবে, তাতে খরচ পড়বে লাখ লাখ ডলার। আর বয়স যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, সন্তান পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আসলে জ্যানিকের বয়স এতই কম যে সে

জানেও না সুন্দর চেহারা দেখে পটে গিয়ে সর্বনাশ করতে চলেছে নিজের।

কখন যেন ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল হেলেন। ঘুম ভাঙল কয়েক ঘণ্টা পর। জাহাজের ইঞ্জিনের চাপা গর্জন শুনতে পেল। জাহাজে দুলুনি নেই বললেই চলে। ভাবতে চাইল জ্যানিক ও এলেন এখন কী করছে। নিশ্চয়ই দারুণ জমেছে পার্টি... ভীষণ মজা করছে ওরা।

আরও এক ঘণ্টা পর আবারও ঘুম ভাঙল, চারপাশ দেখল হেলেন। বিশ্রী লাগছে হাসপাতালে থাকতে। নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হলো। একবার ভাবল বিছানা ছেড়ে নেমে পড়বে। কটের নীচে রেখেছে ওর বাসি পোশাক। ওটা পরেই যদি হাজির হয় বলরুমে? না, থাক। দুর্বল লাগছে শরীর। আবার চোখ বুজল হেলেন।

কিছুক্ষণ পর ঘুমের ঘোর কেটে গেল। ভাবছে: না, মোটেই ভাল লাগছে না! গলা পেঁচিয়ে ধরছে প্লাস্টিকের টিউব। আবার হাঁপানির অ্যাটাক শুরু হলো? ইনহেলারের দিকে হাত বাড়াল হেলেন। ঠিক তখনই ডাক্তারের অফিস থেকে উজ্জ্বল আলো এল। দিন হয়ে উঠল ওর কেবিন। হাঁপানির টান বেড়ে যাওয়ায় ঠিক বুঝল না কী দেখছে। টলতে টলতে ঘরে এসে ঢুকেছেন ডাক্তার কেইন। পরনে বাথরোব, খালি পা। মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। চাপ-চাপ রক্ত রোবের বুকে। লোভীর মত ইনহেলার ব্যবহার করল হেলেন। চোখ পিটপিট করে সরাতে চাইল দুঃস্বপ্ন।

ডাক্তার কেইন যেন জবাই করা গরু, ঘড়ঘড় আওয়াজ করছেন। মুখ থেকে ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছে রক্ত। বোকার মত চেয়ে রইল হেলেন। আরও দু'পা সামনে বাড়লেন কেইন, মনে হলো হাত-পা তাঁর রাবারের। মেঝের উপর পিছলে পড়ে গেলেন ধপ করে। কিলবিল করছে সমস্ত পেশি, ত্বকের নীচে যেন

ঘুরছে কেঁচো। কয়েক সেকেণ্ড পর থমকে গেলেন ডাক্তার, পড়ে রইলেন নিজের রক্তের ভিতর—মৃত!

বামহাতে চাদর আঁকড়ে ধরল হেলেন, ইনহেলারে শ্বাস নিচ্ছে। আরেকজন এসে ঢুকল ঘরে। পরনে সেই কালো ছোট্ট পোশাক। এলেন। বারবার কেশে চলেছে, ঝাঁকি লাগছে শরীরে। ঝর্নার মত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের স্রোত। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, এবার চেঁচিয়ে উঠল হেলেন, কাশতে শুরু কবল নিজেও। কী দেখছে এসব!

কী যেন বলতে চাইল এলেন। কিন্তু বদলে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল গরগরার মত আওয়াজ। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল, যেন কারও কাছে নালিশ করছে। রক্তশূন্য আঙুলগুলো এগিয়ে এল হেলেনকে ধরতে। সাহায্য চাইছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছিটকে পিছিয়ে গেল হেলেন। বান্ধবীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে নিজেকে দুষছে। ভীষণ ভয় লাগছে ওর, কিন্তু চোখ সরাতেও পারছে না হেলেন। এলেনের দুই চোখ রক্ত-লাল হয়ে উঠল, দুই গাল ভাসিয়ে নামল রক্ত। মুখ দিয়ে গলগল করে পড়ছে, ভেসে যাচ্ছে বুক।

কয়েক সেকেণ্ড আগে ডাক্তার কেইনের যা ঘটেছে, ঠিক তা-ই হলো এবার ওর। ভারসাম্য রাখতে পারল না এলেন, পড়ে গেল মেঝের উপর। ততক্ষণে চড়চড় করে ফাটতে শুরু করেছে ত্বক। মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

মারা গেল এলেন! যেমন গেছেন ডাক্তার কেইন!

প্রচণ্ড শক পেয়ে থমকে গেল হেলেন জিল। বুঝল, তীব্র ভয় উন্মাদ করে দেবে ওকে! দাঁতে দাঁত চেপে চোখ মুদল।

ছয়

হাতে সময় নেই, তবুও সামনের বাল্কহেডের দিকে চাইল রানা। পরিস্থিতি দেখিয়ে চলেছে ট্যাকটিকাল ডিসপ্লে। ইজরায়েলি সাবমেরিন থেকে ছোঁড়া তিন টর্পেডো ছড়িয়ে পড়েছে, ছুটে আসছে টার্গেট লক্ষ্য করে। এদিকে কম্পিউটার ও সোনার পুরোপুরি নিশ্চিত নয় কোথায় রয়েছে চতুর্থ টর্পেডো।

কন্টেইনার শিপ থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে প্রথম টর্পেডো। দ্বিতীয়টা দুই লাখ টনি সুপারট্যাঙ্কার থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে। এদিকে মার্ভেলের দিকে চল্লিশ নট গতি তুলে ছুটে আসছে তৃতীয় টর্পেডো।

রানা জানে সরাসরি বিস্ফোরণ ঘটলেও সামলে নেবে মার্ভেল। পুরো খোল জুড়ে রয়েছে আর্মার। টর্পেডো এলে ওটা বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হবে। অনেক কমে আসবে ডেটোনেটিং ফোর্স। তবে ক্রিটিকাল সিস্টেমগুলোর ক্ষতি ঠেকানো যাবে না।

আরেক কাজ করা যায়, ওরা প্রচণ্ড গতি তুলতে পারে, দৌড়ে হারাতে পারে টর্পেডোকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কন্টেইনার শিপ বা সুপারট্যাঙ্কারে আঘাত হানবে টর্পেডো। ফলাফল: জাহাজ দুটো ডুবে যাবে। এমন কোনও উপায় রানার জানা নেই, যেটা রক্ষা করবে দুই বাণিজ্য-তরী ও মার্ভেলকে। বিশেষ করে যখন আসছে চতুর্থ আর একটি টর্পেডো!

একটা নিচু কণ্ঠ শুনতে পেল রানা, আতাসি রেডিওতে সাবধান করে দিল দুই জাহাজকে। ওরা জেনেছে টর্পেডো আসছে, কিন্তু কী করবে? বিশেষ করে সুপারট্যাঙ্কার? ওটা ঘুরতে প্রকাণ্ড এলাকা নেয়। যে গতিতে চলেছে, থামতে লাগবে পাঁচ মাইল।

'ইজরায়েলি সাবমেরিন আশির দশকের, তবে টর্পেডোগুলো বোধহয় আধুনিক,' বলল উর্বশী। 'মার্কিন ক্যারিয়ার থেকে দুটো বিমান আকাশে উঠেছে। সম্ভবত এস-থ্রিবি ভাইকিং। অ্যান্টি ওয়ারফেয়ার বিমানে থাকে মার্ক-৪৬, অথবা মার্ক-৫০ টর্পেডো। কিন্তু আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজ মনে হয় না ডুবিয়ে দেবে ইজরায়েলি সাবমেরিনকে।'

'আমাদের হাতে পাঁচ মিনিটও নেই,' বলল অনিল।

'উর্বশী, ওই টর্পেডোর রেঞ্জ কত?' জানতে চাইল রানা।

'ছয় হাজার গজ।'

'সুপারট্যাঙ্কার থেকে কত দূরে?'

'তিন হাজার দুশো গজ।'

দেখাই যাক না কী হয়, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। শান্ত স্বরে বলল, 'গগল, স্পিড বাড়াও। চল্লিশ নটে রাখো। সুপারট্যাঙ্কার আর টর্পেডোর মাঝখানে চলো।'

'ঠিক আছে, রানা।'

'অনিল, সামনের গ্যাটলিং গানের পোর্ট খোল্। মাস্টার সোনার প্লট অনুযায়ী কাজ করুক কম্পিউটার। মাস্তুলের ক্যামেরার মাধ্যমে টার্গেট করতে হবে টর্পেডোকে।'

'এক মিনিট, রানা...'

'হাতে সময় নেই,' একটু আড়ষ্ট শোনাল রানার কণ্ঠ।

কোনও দিকে মনোযোগ নেই অনিলের। কী যেন দেখছে

ল্যাপটপ কম্পিউটারে। এইমাত্র চালু হয়েছে সিস্টেম। 'আয় সোনা, শিখে নে,' চাপা স্বরে বলল।

'তুই কী করছিস?' জানতে চাইল রানা। কাত হয়ে গেল। সাগরে বাঁক নিয়ে চলেছে মার্ভেল।

'হুপারকে নতুন বুদ্ধি শেখাব।'

একটা সিনেমা দেখে মার্ভেলের সুপার কম্পিউটারের নাম দিয়েছে অনিল—হুপার। সেই ছায়াছবিতে তরুণ এক হ্যাকার স্যাক/নর‍্যাড-এর কোড ভেঙে ফেলে। আরেকটু হলে শুরু হতো বিশ্ব-যুদ্ধ।

'আমাদের নতুন কৌশল নয়, অন্য কিছু দরকার,' তিক্ত হাসল গগল।

'গ্যাটলিং গান তৈরি রাখ, অনিল,' বলল সোহেল। চকচক করছে চোখ দুটো।

উর্বশীর দিকে চাইল অনিল। মেয়েটা নিজের কম্পিউটার নিয়ে কী যেন করছে। 'অনিল, আমার মনে হয় না ওতে কাজ হবে।'

'ভরসা রাখুন, উর্বশী,' বলল ভারতীয় এজেন্ট।

'আপনারা কী নিয়ে আলাপ করছেন, জানতে পারি?' বলল আতাসি, উদ্বিগ্ন।

একবার অনিল আরেকবার উর্বশীর দিকে চাইল রানা। 'যা বলার বলে ফেলো, জলদি!'

'হ্যাঁ...এই তো চাই!' হেসে ফেলল উর্বশী।

ওর মাথাটা গেছে, ভাবছে রানা।

'ইয়াহ্হু!' বলে উঠল অনিল। কি-বোর্ডে প্রজাপতির মত উড়ছে দশ আঙুল। 'লগারিদম লাইনে এনেছি, উর্বশী। সরাসরি টার্গেট তাক করব। আমাদের কম্পিউটারগুলো মার্ভেলের

কম্পিউটারের সঙ্গে একই লয়ে কাজ করছে। হাতে পেয়ে গেছি পুরো নিয়ন্ত্রণ।'

'কীসের নিয়ন্ত্রণ?' আন্দাজ করতে চাইছে রানা।

স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না উর্বশী, নিচু স্বরে বলল, 'এবার মজা দেখো।'

ও কী করছে? উর্বশীর দিকে চাইল রানা। পাথরের মূর্তির মত হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

'তোমরা ঠাট্টা করছ?' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। বুঝে ফেলেছে। 'একবার আমেরিকানরা সাধারণ সাবমেরিন থেকে ওই জিনিস ব্যবহার করে, তলিয়ে যায় ডুবো-জাহাজ। মারা পড়ে চৌষট্টিজন নাবিক।'

'আণবিক ওঅরহেড সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' বলল সোহেল। 'বদলে রাখা হয়েছে পাঁচ শ' পাউণ্ড বিস্ফোরকের সমান সি-ফোর।'

'টর্পেডো থেকে এক হাজার গজ দূরে সুপারট্যাঙ্কার,' ঘোষণা দিল উর্বশী।

নিজেদের ভিতর যোগাযোগ করে চলেছে জাহাজগুলো। আমেরিকান ব্যাটল গ্রুপ ও এএসডাব্লিউ বিমান আলাপ করছে। রেডিওর দিকে মনোযোগ দিয়েছে আতাসি।

সোনার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে উর্বশী। নরম স্বরে বলল, 'আমরা তোমাকে আরেকটা অপশন দিলাম।'

'আমাকে না জানিয়ে যা করার...' চোখ পাকিয়ে সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তুইও জুটে গেলি ওদের সঙ্গে?'

'ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি,' বলল সোহেল।

ট্যাকটিকাল ডিসপ্লের দিকে চাইল রানা। পিছু নেয়া টর্পেডো পিছনে পড়তে শুরু করেছে। ওটাকে যদি টার্গেট করতে হয়, ঠিক

সামনে রাখতে হবে মার্ভেলকে। একটু এদিক ওদিক হলেই ফস্কে যাবে টার্গেট। জাহাজ সঠিক পজিশনে পৌঁছলে টর্পেডো থেকে দূরত্ব থাকবে মাত্র পাঁচ শ' গজ। পানির দশ ফুট নীচ দিয়ে আসছে অস্ত্রটা।

ডেরিকের ক্যামেরা থেকে টর্পেডোর ওয়েক লাইন দেখতে পেল রানা। শান্ত-স্বচ্ছ সাগরে সামান্য আলোড়ন। চল্লিশ নটের বেশি গতি তুলে আসছে টর্পেডো।

'অনিল, ওটাকে আগেই থামাতে হবে, নইলে জাহাজের কিলে এসে ঢুকবে।'

'ট্র্যাকিং,' বলল অনিল।

অ্যাথর্টশিপ থ্রাস্টার দিয়ে মার্ভেলকে পজিশনে নিয়ে এল গগল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজ। পুরোপুরি রিভার্সে চলতে শুরু করেছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন। সরাসরি টর্পেডোর সামনে পড়বে এবার মার্ভেল।

'ফায়ার,' বলল অনিল। কি-বোর্ডে কয়েকটা নির্দেশ দিল।

মার্ভেলের সামনের খোল থেকে সরে গেল আর্মার্ড প্লেট, বেরিয়ে এল গ্যাটলিং গান। ছয়টি ব্যারেল তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল। মেকানিজম থেকে ছিটকে পড়ছে একফুটি শেল কেসিং। জাহাজের গা থেকে বেরুল ঘন ধূসর ধোঁয়া ও লেলিহান আগুন। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ এমএম মেশিন ক্যানন থেকে ছুটছে তাজা শেল। সাগরের উপর দিয়ে চলেছে। তারপর ডুব দিল পানির ভিতর। ছুটন্ত টর্পেডোর নাকের কাছে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সাগর। ইউরেনিয়াম শেলগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে পানি।

আমেরিকানদের তৈরি ইজরায়েলি টেস্ট-৯৭ টর্পেডোর ভিতর রয়েছে চার শ' পাউণ্ড বিস্ফোরক, কিন্তু মারণাস্ত্রটা পড়ে গেছে গ্যাটলিং গানের সামনে। সরাসরি টর্পেডোর মাথার ভিতর ঢুকল

চারটে রাউণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো ওঅরহেড। ছিটকে উঠল সাগর। চারদিকে ছড়িয়ে গেল কংকাশন ওয়েভ। যেখানে ছিল টর্পেডো, সেখানে দেখা দিল প্রচণ্ড দুলুনি। পরক্ষণে পানির বিশাল এক স্তম্ভ উঠে গেল আশি ফুট উপরে। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটাকে টেনে নিল মাধ্যাকর্ষণ, পিলারের মত ধড়াস্ করে নেমে এল পানি সাগরের বুকে।

মার্ভেলের ভিতর অংশ ভাল ভাবে ইনসুলেটেড, তারপরও শুনতে পেল ওরা ডেটোনেশনের প্রচণ্ড আওয়াজ। ওটা যেন বজ্রপাতের গর্জন। ঠিক যেন মাথার উপর পড়েছে।

উর্বশীর দিকে ঘুরল রানা। 'ওটার জন্য তিরিশ সেকেণ্ড পাব। এবার কী?'

'ইজরায়েলিদের টর্পেডো ওয়্যার গাইডেড। যদি তারবার্তা সরিয়ে নেয়া যায়, এমনিতেই ডুবে যাবে। ইজরায়েলিরা নিশ্চয়ই এই স্রোত বা ঢেউয়ের ভিতর অন্য কোনওভাবে কণ্ট্রোল করছে না।'

'তো কী করতে বলো তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল উর্বশী। 'স্বাভাবিক চিন্তা, ডুবিয়ে দাও ওই সাবমেরিন।'

আবার ট্যাকটিকাল ডিসপ্লের দিকে চাইল রানা। জ্বলজ্বলে লাল আলো দেখিয়ে চলেছে দুটো আমেরিকান এস-থ্রিবি ভাইকিঙকে। আরেক দিকে অবশিষ্ট তিনটে টর্পেডোর ট্র্যাক লাইন। যেটা রিজার্ভ হিসাবে পিছনে ছিল, সেটা গতি বাড়িয়ে ছুটে আসছে মার্ভেলকে লক্ষ্য করে।

'মিসাইল দিয়ে কিছু করবে?' বলল রানা।

'সেটাই তো আমাদের ইচ্ছে,' বলল উর্বশী। 'আমরা মাঝরাত থেকে লেগেছি ওটার পিছনে। আমাদের এক নম্বর টিউব বদলে

নিয়েছি বাংলাদেশ নেভির ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে। ইউজিএম-১৩৩ ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট এগারো মিসাইল ব্যবহার করব টর্পেডোর মত। সেজন্য সফটওয়্যার তৈরি করেছেন অনিল। কেমন কাজ হয় দেখব এবার। কোনও ভুল না হলে বিজ্ঞাপন দেখানোর মত দৃশ্য হবে, একইসঙ্গে টার্গেট হারাবে তিন টর্পেডো।'

'অনিল? ব্যাটা, সারারাত ধরে এই করেছিস তুই!'

'দেখি হুপারের মত কিছু করা যায় কি না। ওরা যেভাবে কন্ট্রোল করছে, ঠিক সেভাবে রেডিও ওয়েভ সরিয়ে নিতে হবে। মিসাইলের গতি প্রথমে তুলব এক শ' নটে। পরে অনেক বাড়িয়ে তুলব। হাতে বাড়তি সময় থাকবে না।' শ্বাস আটকে ফেলেছে অনিল।

একবার ওর দিকে আরেকবার উর্বশীর দিকে চাইল রানা। একটু পর ওদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হতে পারে, অথবা ওদের সঙ্গে দেখাই হবে না এ জীবনে! মারা পড়বে ওরা সবাই! স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা, 'গগল, ওই সাবমেরিনের দিকে নিয়ে চলো মার্ভেলকে।'

'এক নম্বর টিউবের সামনে থেকে দরজা সরিয়ে নিলাম,' ঘোষণা করল অনিল। 'বেয়ারিং দেখে ফায়ার করছি।'

মার্ভেলকে ঘুরিয়ে নিয়েছে গগল, বো'র সামনে ফেনা তুলছে সাগরের ঢেউ। স্রোতের ভিতর গেঁথে বসছে জাহাজের পিছন অংশ, নাক উঁচু করে ছুটতে শুরু করেছে বো। চলেছে সাবমেরিন লক্ষ্য করে। অনিলকে সুযোগ তৈরি করে দেবে গগল।

'গগল, স্টারবোর্ডে আরও দুই পয়েন্ট সরো,' বলল অনিল।

থ্রাস্টারগুলো নিয়ে কাজ করছে দক্ষ নাবিক, সরাসরি সাবমেরিনের দিকে চলেছে। ওদিক থেকে আসছে তিন টর্পেডো। জানতে চাইল গগল, 'উর্বশী, ওটা নড়েনি, তা-ই না?'

'না, নড়েনি। তারবার্তা দিয়ে চলেছে টর্পেডোগুলোকে।' কান থেকে প্যাসিভ সোনার হেডফোন খসিয়ে ফেলল উর্বশী।

আর কোনও তথ্য প্রয়োজন নেই অনিলের, কি-বোর্ডে উড়ছে ওর আঙুলগুলো। মিসাইল লঞ্চ করছে। প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন সলিড ফিউয়েল থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গোটা জাহাজকে। হাল ডোর খুলে যেতেই মডিফায়েড টিউব দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল মিসাইল। পঞ্চাশ নট গতি তুলে ছুটছে। অস্ত্রটার অন বোর্ড কম্পিউটার জেনে গেছে ওটার নিজের তুলনায় গতি কম টর্পেডোর। হার্ড ফিউল জ্বলছে, প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে চলেছে মিসাইল। দ্রুত পিছনে পড়তে লাগল সাগর। দেখতে না দেখতে গতি উঠে গেল পাঁচ শ' নটে। চারপাশের পানি হয়ে উঠছে বাষ্প।

মিসাইলের টপসাইড ক্যামেরা থেকে ছবি এল। পানির নীচে প্রচণ্ড গতিতে তীরের মত ছুটছে মারণাস্ত্র।

'দেখলে মনে হয় পৃথিবী ধ্বংস করতে তৈরি হয়েছে,' কে যেন বলে উঠল।

'টার্গেটের রেঞ্জ?' জানতে চাইল রানা।

'তিন হাজার পাঁচ শ' গজ,' বলল উর্বশী। 'বাকি থাকল চৌত্রিশ শ' গজ। বত্রিশ শ'... আটাশ শ'।'

'থামাবি কখন, অনিল?'

'সাবমেরিন ডুবিয়ে দেব না?'

'না। ধরা পড়লে আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি হবে। ওটার নাকের সামনে ফাটিয়ে দে। সাবমেরিনের গাইডেড ওয়্যারিং নষ্ট হলেই যথেষ্ট।'

'কতটা কাছে?'

ট্যাকটিকাল ডিসপ্লের দিকে চাইল রানা। টর্পেডোগুলো, সুপারট্যাঙ্কার, কন্টেইনার শিপ ও মার্ভেলের মাঝখানের দূরত্ব

খেয়াল করছে। আর আধমিনিট পর সুপারট্যাঙ্কারের উপর আঘাত হানবে সামনের টর্পেডো। একবার ফ্ল্যাট স্ক্রিনে মিসাইলের দিকে চাইল রানা। এতই দ্রুত চলেছে, প্রতি মুহূর্তে ইমেজ রিসাইকেল করছে কম্পিউটার। ইজরায়েলি সাবমেরিনকে এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে, যেন আবারও টর্পেডো ছাড়তে না পারে। তবে ডুবি.য়ে দেয়া চলবে না।

'টর্পেডো কামিং, ওয়ান থাউজেণ্ড ইয়ার্ড, রানা,' জানাল উর্বশী।

প্রতিটি সংখ্যা স্ক্রিনে দেখছে রানা। বড় দ্রুত পিছিয়ে চলেছে। দেখতে না দেখতে মাত্র দুই হাজার গজ বাকি থাকল মিসাইলের, তার পর ডুবিয়ে দেবে সাবমেরিনকে।

এদিকে একটু পর সুপারট্যাঙ্কারের উপর হামলে পড়বে টর্পেডো।

মিসাঁইলের দিক ও গতির হিসাব অত্যন্ত জটিল। তবে মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে রানা। 'আরেকটু অপেক্ষা কর্, অনিল...' বলল ও। ওরা যদি আগেই মিসাইল ফাটিয়ে দেয়, রেডিও সিগনালের সঙ্কেত থামবে না। তবে বেশি দেরি করলে নাবিক সহ ধ্বংস হয়ে যাবে সাবমেরিন।

'আরেকটু,' দ্বিতীয়বারের মত বলল রানা। মিসাইলের দিকে চেয়ে রইল। শান্ত সাগরের নীচ দিয়ে তীরের মত ছুটে চলেছে মিসাইল। একবার টর্পেডোগুলোর দিকে চাইল। একটা চলে এসেছে টার্গেটের পঞ্চাশ গজ দূরে। আরেকটা তিশ শ' গজ পিছনে। তবে দুটোর গতিবেগ ভিন্ন। একই সময়ে গন্তব্যে পৌঁছবে।

'এবার!'

অটো ডেস্ট্রাকশান বাটন টিপে দিল অনিল। মিসাইলের বুকে

বসে থাকা কম্পিউটার সিগনাল পেয়ে গেল। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো পাঁচ শ' পাউণ্ডের সি-ফোর ও সলিড ফিউল। পানির উপর ছিটকে উঠল বিশাল এক ফোয়ারা। সাগরের মাঝখানে সৃষ্টি হলো বিশাল এক গর্ত। পঞ্চাশ ফুট গভীর সেটা। বৃত্তও একই সমান। বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হলো ভয়ঙ্কর কংকাশন। মার্ভেলের বো-তে এসে লাগল প্রচণ্ড শক ওয়েভ। সুপারট্যাঙ্কারের এক পাশে লাগল শক ওয়েভ, পোর্টের দিকে কাত হয়ে গেল মস্ত জাহাজটা।

বিস্ফোরণের অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট ছড়িয়ে পড়ল সাগরে। ওটার ফলে অসম্ভব হয়ে উঠল প্যাসিভ সোনারের সিগনাল ধরা। টপসাইড ক্যামেরার দিকে চাইল রানা। সুপারট্যাঙ্কারের কিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে চলেছে। দু'সেকেণ্ড পর মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। ওই বিশাল জাহাজে গিয়ে আঘাত হানেনি টর্পেডোগুলো। উর্বশী, অনিল ও সোহেলের বুদ্ধি কাজে লেগেছে। সাবমেরিন থেকে পৌঁছেনি তারবার্তা, ফলে কাটা পড়েছে টর্পেডোর সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে অস্ত্রের মোটর।

'কিছু শুনলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, উর্বশী,' বলল রানা।

'কম্পিউটার এখন কমপেনসেট করছে। কিছুক্ষণ সময় লাগবে কিছু বুঝতে।'

আতাসি সিট থেকে রানার দিকে চাইল। 'বস্, একটা এস-থ্রিবি ভাইকিঙের পাইলট জানতে চাইছে কী ঘটছে।'

'ওর কাছে সময় নাও, বলো বুঝতে চাইছ।' উর্বশীর দিকে মনোযোগ রানার। ডানহাতে সোনার হেডফোন তুলে নিয়েছে উর্বশী, চেয়ে রইল সোনার সিস্টেমের ওয়াটার ডিসপ্লের দিকে। ওখান থেকে আসছে ঝলমলে আলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর রানার দিকে চাইল উর্বশী। 'কোনও প্রপেলার দ্রুতগতি তুলছে না। তার মানে থেমে গেছে তিন টর্পেডো। এখন সাগর-তলের দিকে চলেছে। সাবমেরিন থেকে যন্ত্রপাতির আওয়াজ আসছে। হালের ভিতর বাজছে অ্যালার্ম। এক মিনিট... হ্যাঁ, ওটার পাম্প কাজ করছে। ব্যালাস্ট ছাড়ছে।' রানার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল উর্বশী। 'কাজ হয়েছে! উঠে আসছে ওরা সারফেসে!'

অপারেশন্স সেণ্টারে সবাই হেসে ফেলল। হাততালি দিয়ে উঠল দু'চার জন। বুক থেকে নেমে গেছে বিশাল এক পাথর।

'বুদ্ধিটা মিস্টার অনিলের,' বলল উর্বশী। 'আমরা শুধু নির্দেশ মত কাজ করে গেছি।'

লাজুক হাসল অনিল। 'কৃতিত্ব আমাদের সবার। তোমরা সবাই না থাকলে কিছুই হতো না।'

'দারুণ,' নির্দ্বিধায় বলল রানা, 'সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল!'

'ওদিকে দেখো!' বলে উঠল গগল, আঙুল তুলেছে মেইন ডিসপ্লের দিকে।

ওখানে দেখা গেল সাগর বলকে উঠছে। একটু আগে ওখানে লুকিয়ে ছিল সাবমেরিন, অ্যাম্বুশ করে। এখন বাধ্য হয়েছে ভেসে উঠতে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে স্রোত। তারপর তার ভিতর দিয়ে ভুস করে ভেসে উঠল বিশ্রী চেহারার এক সাবমেরিন।

'কী কুৎসিত!' বলে উঠল উর্বশী।

ইজরায়েলি সাবমেরিন আশির দশকের, আমেরিকার তৈরি। তবে এখন মাথার কাছে তুবড়ে গেছে হাল প্লেট। মনে হলো দেয়ালে বাড়ি খেয়ে এই অবস্থা। ডিমের মত গোল নাকটা গেছে। ওটার মাত্র ষাট গজ সামনে বিস্ফোরিত হয়েছে মিসাইল।

এখনও পুরো ভেসে ওঠেনি সাবমেরিন, ডুবছে-ভাসছে। এক

মিনিট পর স্থির হলো সাগরে। ক্ষতিগ্রস্ত হাল প্লেটের উপর ক্যামেরা তাক করল গগল। সাবমেরিনের নড়াচড়া লক্ষ্য করছে মার্ভেলের কম্পিউটার, পরিষ্কার দেখিয়ে চলেছে ছবি। ক্ষতিগ্রস্ত প্লেটের পাশ থেকে উঠছে বাতাসের বুদ্বুদ। ওটাই প্রমাণ করছে সাবমেরিনের ভিতর পানি ঢুকছে। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খুলে গেল। সামনের ও পিছনের ডেক-হ্যাচ খোলা হলো। সাবমেরিনের ভিতর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে নাবিকরা।

'ওরা কিছু বলছে, আতাসি?' জানতে চাইল রানা।

'জেনারেল ডিসট্রেস কল পাঠাচ্ছে। পাম্পগুলো কোনওমতে ভাসিয়ে রাখছে ওদের। অ্যাশকেলন বেস থেকে সাহায্য চাইছে। সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিয়েছে, জলযান ত্যাগ করতে হবে। সাবমেরিন ডুবে যেতে পারে, কাজেই জানিয়ে দিয়েছে উপরের ডেকে থাকতে হবে ক্রুদের।'

'আশপাশের কোনও জাহাজের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছে?'

'না। চাওয়ার কথা নয়।'

'তা ঠিক। কোনও নির্দেশ না দিয়েই টর্পেডো ছুঁড়েছে বেসামরিক ফ্রেইটার লক্ষ্য করে। এটা প্রায় পঞ্চাশটা আন্তর্জাতিক চুক্তির লঙ্ঘন।'

'আর আমরা যেটা অ্যাশকেলন বেসে করেছি?' ঠাট্টার সুরে বলল উর্বশী।

'স্রেফ উন্মাদের কাজ,' বলল রানা।

'পাগলে কী না করে!' সায় দিল সোহেল।

ঠিক তখনই মার্ভেলের উপর দিয়ে উড়ে গেল আমেরিকান ক্যারিয়ারের জোড়া এস-থ্রিবি বিমান। সাবমেরিনের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। ডেকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইজরায়েলি নাবিকরা। জেট ওয়াশ ছিঁড়ে দিতে চাইল ইউনিফর্ম।

'সামনের ভাইকিং এখনও কথা বলতে চাইছে, বস্,' জানাল আতাসি। 'অফিশিয়াল অনুরোধ পাঠিয়েছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হ্যারি ট্রুম্যান। ওটার বস্ কমাণ্ডার রন পাসম্যান বলেছে, আমরা যেন এখানেই অপেক্ষা করি।'

'আলাপ করব,' বলল রানা। কানের উপর বসিয়ে নিল ইয়ারফোন। মাইক্রোফোনে বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস থেকে বলছি। আপনাদের জন্য কী করতে পারি, কমাণ্ডার?'

'ক্যাপ্টেন রানা, আমরা চাই আপনারা ওখানেই থাকুন। আপনার জাহাজে উঠবে আমাদের কন্টিন্‌জেন্ট। সুপারট্যাঙ্কার এইযির ক্যাপ্টেন ও কন্টেইনার শিপ বেইলির ক্যাপ্টেন সহায়তা করতে রাজি হয়েছেন। বিশ্ মিনিট পর আপনার জাহাজে নামবে আমাদের হেলিকপ্টার। আপনাদের যদি হেলিকপ্টার নামবার ব্যবস্থা না থাকে, দু'ঘণ্টা পর ওখানে পৌঁছবে গাইডেড মিসাইল ক্রুজার স্টার শিপ।'

'আপনার প্রতি সম্মান রেখে বলছি, কমাণ্ডার পাসম্যান, আমি বা আমার ক্রুরা কিছুই দেখিনি। ঘুমিয়ে ছিলাম আমি। ডিউটিতে যে ওয়াচ ছিল, তার বাম চোখ কানা, অন্যটা দিয়ে ঝাপসা দেখে।'

কঠোর হয়ে উঠল কমাণ্ডারের কণ্ঠ, 'ক্যাপ্টেন, আপনি বোধহয় জানেন না আমরা এ সাগরে যে-কোনও জাহাজকে থামানোর অধিকার রাখি। আপনাকে ভদ্রতা করে বলছি, কিন্তু মনে রাখবেন এটা অফিশিয়াল নির্দেশ। আপনারা ওখানে থাকছেন। আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

আমেরিকান নেভি চাপ দিতে শুরু করেছে। কিন্তু নেভিকে উঠতে দেয়া যাবে না মার্ভেলে। ইজরায়েলি নেভির অফিসারদের

বোকা বানানো আর ইউএস মিলিটারিকে ঠকানো এক কথা নয়।

'আপনারা দয়া করে অপেক্ষা করুন,' নরম স্বরে বলল রানা। 'আমরা একটু পর যোগাযোগ করছি।' বামহাতে মাইক ঢেকে নিল ও, নিচু স্বরে বলল আতাসিকে, 'নুমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলতে চায় মাসুদ রানা।'

টানটান পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর লাইনে এলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'হ্যাঁ, রানা, কী ব্যাপার?'

'আমাদের সাহায্য দরকার।'

'কী ব্যাপারে?'

'একটা প্রমোদ-তরী নিয়ে বেরিয়েছি আমি, সঙ্গে আমার ক'জন বন্ধু-বান্ধবী। কিন্তু ইউএস নেভি বলছে সাগরে চুপচাপ বসে থাকতে হবে দু'ঘণ্টা। তারা খুশিমত সময়ে এসে জাহাজ সার্চ করবে। এদিকে আমাদের হাতে বাড়তি সময় নেই।'

'কোথায় রয়েছ তুমি?'

'মেডিটারেনিয়ান সাগরে, ইজরায়েলি উপকূল থেকে একটু দূরে।'

'আমাকে আবছা ভাবে জানিয়েছেন তোমার বস্,' বললেন অ্যাডমিরাল। কণ্ঠ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

লাইন কেটে গেল।

'গগল, তৈরি থাকো,' বলল রানা। 'আঠারো নট গতি তোলো, প্রথম সুযোগে সরে পড়ছি।' মাইক্রোফোনের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা। 'কমাণ্ডার পাসম্যান, আপনি কি ওখানে রয়েছেন? আমাদের ডেকে হেলিকপ্টার নামানো অসম্ভব। আপনি ক্রুজার স্টার শিপকে আসতে বলুন।'

'বেশ, ক্যাপ্টেন। একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পর পৌঁছবে ক্রুজার।'

'আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি,' বলল রানা। রেডিও নীরব হয়ে যেতেই সবার উপর চোখ বোলাল। 'ওরা চাইছে আমরা বসে থাকি।'

'কেউ বিশ ডলার বাজি ধরবে?' জানতে চাইল সোহেল। 'অ্যাডমিরালকে পরিস্থিতি খানিকটা জানিয়েছেন আমাদের চিফ। উনি দশ মিনিটের ভিতর যোগাযোগ করবেন কমাণ্ডারের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, দেরি করবেন না অ্যাডমিরাল,' মনে মনে আশা করল রানা।

কেউ বাজি ধরছে না। তিরিশ সেকেণ্ড পর বলল আতাসি, 'যখন বাজি ধরি, আমি যে মুসলিম সে হুঁশ থাকে না আমার। ঠিক আছে, সোহেল বস্, আমি বলি, যোগাযোগই করবেন না অ্যাডমিরাল। বাজি ধরলাম।'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে খবর হবে,' বলল উর্বশী।

'আমেরিকান নেভি নিজেদের কাজে ব্যস্ত,' বলল গগল। 'আমরা যদি রওনা হই, আধঘণ্টার ভিতর টের পাবে না!' নড়তে শুরু করেছে মার্ভেল।

'আমি উর্বশীর সঙ্গে আছি,' বলল অনিল। 'আতাসির টাকা তিনজন মিলে ভাগ করে নেব।'

'অ্যাডমিরাল এখন কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলছেন,' বলল সোহেল। ভাব দেখে মনে হলো ও শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার!

'ধুশ্‌শা...' চুপ হয়ে গেল আতাসি, পরক্ষণে বলল, 'আপনার কথাই ঠিক। পাসম্যান যোগাযোগ করছে!'

'লাইন দাও,' বলল রানা।

'ক্যাপ্টেন রানা, আপনাকে শেষবারের মত সাবধান করে

দিচ্ছি,' কর্কশ স্বরে বলল কমাণ্ডার পাসম্যান। দাঁতে দাঁত চেপে বলে চলেছে, 'রওনা হলে দায়-দায়িত্ব আপনার। যদি না থামেন, আপনার জাহাজের উপর বোমা ফেলব ভাইকিং দিয়ে।'

ব্যাটা ঠাট্টা করছে না, নিজেও খানিক রেগে উঠল রানা। চাঁছাছোলা স্বরে বলল, 'কমাণ্ডার, একটু আগে সুপারট্যাঙ্কারের দিকে টর্পেডো ছুঁড়েছে ইজরায়েলি সাবমেরিন। আমি এখানে বসে থেকে মরতে চাই না। আপনারা কতক্ষণ পর আসছেন সেজন্য অপেক্ষা করা অসম্ভব। আমরা যে-কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি।'

'আপনাকে যা বলেছি, তাই করতে...' হঠাৎ থেমে গেল কমাণ্ডার। দেড় মিনিট পর আবার কথা বলে উঠল। তবে এবার অনেক নরম স্বরে। রানা ভাবছে, ব্যাটার কণ্ঠে বিরক্তি? ভয়? কারও প্রতি সম্মান? বোধহয় তিনটির মিশ্রণ! 'ক্যাপ্টেন রানা, ওখান থেকে চলে যেতে পারেন। আপনাদেরকে আর প্রয়োজন নেই আমার।'

রানা আন্দাজ করছে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আটলান্টিক সাগরের কমাণ্ডার ইন চিফ ফর নেভাল অপারেশন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। অথবা কথা বলেছেন জয়েন্ট চিফদের কারও সঙ্গে। পরে জেনে নেবে, আপাতত সরে যাওয়া জরুরি। মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'আমাদের দিকটা বুঝেছেন বলে ধন্যবাদ, কমাণ্ডার। ভাল থাকুন, আনন্দে থাকুন। আরেকটা কথা, ওই পুরনো বালতির মত সাবমেরিনটা? ওটার ভিতর পানি ঢুকছে। যদি ভিতরে ঢুকতে চান, জলদি করতে হবে। মার্ভেল আউট।'

ঘুরে চাইল রানা। সোহেল, অনিল ও উর্বশীর হাত হাজির হয়েছে আতাসির থুতনির নীচে।

'বাজি ধরা ধর্মে নিষেধ, জুয়া খেলেছি শুনলে আমাকে খুন করবে মার্সিয়া!' বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেদুঈন কমাণ্ডো। কিন্তু হাতগুলো নড়ল না। নির্দয় পাষণ্ড হয়ে গেছে যেন ওরা। 'জানেন আমার চারটে ছেলে-মেয়ে? এখন তো দেখছি সব টাকা আপনারাই নিয়ে নেবেন! ওদের খাওয়াব কী?' মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। শেষে মানিব্যাগ বের করল সে, বিশ ডলারের নোটে একটা চুমু খেয়ে বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে।

চওড়া হেসে ওটা নিল সোহেল।

'এ টাকা পাওয়া ছিল খুবই সহজ,' খুশি মনে বলল অনিল। 'কচি বাচ্চার কাছ থেকে লজেন্স কেড়ে নেবার মত।'

'আপনারা বোধহয় আগেও এ কাজ করেছেন,' ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল আতাসি। মানিব্যাগ রেখে পেটের উপর হাত রাখল। রানার দিকে করুণ চোখে চাইল। 'খিদেয় মরে গেলাম, বস্!'

'গগল, সবাইকে জানিয়ে দাও রন্দেভু কখন,' বলল রানা। 'তারপর ডাইনিং রুমে নাস্তা।'

'মাঝরাতে রন্দেভু। সুয়েজ খাল থেকে দু' শ' মাইল উত্তর-পশ্চিমে।'

'বেশ, আমি চাই সিনিয়ররা ওই সময়ে অপারেশন্স সেন্টারে থাকুক,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে যে যার কাজ শাফল করে নাও। আমি কেবিনে ফিরছি, ধন্যবাদ জানাব অ্যাডমিরালকে।' সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তুই বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কর। জানিয়ে দে দুটো নয়, একটা নিয়ে ফিরছি।'

সিট ছেড়ে রওনা হয়ে গেল রানা, অপারেশন্স সেন্টার থেকে বেরিয়ে যাবে, তার আগে সোহেলের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল বিশ ডলারের নোটটা। কঠোর কণ্ঠে বলল, 'তোরা তিনজন মিলে একটা মিসাইল নষ্ট করেছিস, কাজেই এটা জরিমানা

করলাম!'

হায়-হায় করে উঠল সোহেল ও অনিল। হাসছে উর্বশী।

'আর আমি কী পেলাম?' আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আতাসি।

সাত

প্রকাণ্ড ঘরের দরজা খুলতেই নোনা জলের গন্ধ পেল ডাক্তার ফারা রাইনার। সামনে অলিম্পিক দৈর্ঘ্যের ল্যাপ সুইমিং পুল। এক শ' চৌষট্টি ফুট দৈর্ঘ্য, তবে প্রস্থ মাত্র দুটো লেনের সমান। জায়গাটা ব্যবহার করা হয় জাহাজের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক হিসাবে। তিনদিকে সরু ক্যাটওয়াক, ফ্যাকাসে নীল টালি বিছানো। তার উপর সাঁটা হয়েছে ননস্কিড অ্যাডহিসিভ টেপ। পুলের ভিতরের চার-দেয়ালে হালকা নীল টাইলস্। লম্বা ঘরে জ্বলছে ফ্লুরেসেন্ট টিউব। জায়গায় জায়গায় ইনক্যানডিসেন্ট বালব, ফলে পানির উপর সূর্যের আলো পড়ছে বলে ভ্রম হয়।

টাইলসে দ্রুত জমে অ্যালজি, তাই সুইমিং পুলে পানি না থাকলে নিয়মিত ঘষা-মাজার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ক্লিনিং ক্রুদের। অবশ্য এ মুহূর্তে তারা কেউ নেই। সামনে টলটলে লোনা পানি।

সাঁতার খুব একটা পছন্দ করে না ডক্টর ফারা, তবে সহজ চারটে স্ট্রোক জানে। দ্রুতগতির জন্য ফ্রিস্টাইল, এনডিউর‍্যান্সের জন্য ব্রেস্ট স্ট্রোক, আরামের সাঁতার ব্যাক স্ট্রোক, আর প্রচুর

শক্তি খরচ করায় বাটারফ্লাই স্ট্রোক। ওটা করতে হলে সাঁতারুকে কোমর-বুক ও দু'হাত পানির উপরে তুলতে হয়, ফলে এগুতে গিয়ে ব্যয় হয় প্রচণ্ড শক্তি। সুইমিং পুলের মাথার কাছে থামল ফারা। পুলে সাঁতার কেটে চলেছে দুই যুবক। সন্দেহ কী, এরা পাত্তা দেয় না পরিশ্রমকে। প্রতিটি স্ট্রোক মাপা, ব্যয় করছে না বাড়তি শক্তি। ডলফিনের মত এগিয়ে চলেছে। বাড়তি পানি ছলকে উঠছে না। যেমন শিখেছে ওরা কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে।

লক্ষ করতেই ফারা দেখল, কোমরে ওয়েট বেল্ট বেঁধে নিয়েছে মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। সাধারণ ব্যায়ামের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খরচ করছে ওরা। মনে মনে বলল ফারা, এ আমার কাজ নয়। ওজন ঠিক রাখতে যোগ ব্যায়াম করি জাহাজের ফিটনেস সেণ্টারে, সেটাই যথেষ্ট।

পুলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে রানা ও সোহেল, উল্টো ডিগবাজি দিয়ে আবারও ফিরছে। গতি বাড়ছে, আসছে ফারার দিকে। চোখে কালো গগলস্, শ্বাস নেয়ার সময় হাঁ করছে। খেয়াল করেছে পুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ফারা। পানির শেষ অংশে এসে আরও দ্রুত এল দুই বন্ধু।

জাহাজের ডাক্তার হিসাবে ক্রুদের মেডিকেল স্ট্যাটাস ফারার মুখস্থ। শপথ করে বলতে পারে, ওই মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ আর লিউ ফু-চুং অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি ফিট।

দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল রানা ও সোহেল, পানির ঢেউ ছলকে উঠল ক্যাটওয়াকে। প্রায় লাফিয়ে পিছিয়ে গেল ফারা, আরেকটু হলে ওর গুচ্চি লোফার ভিজে যেত। খাকি প্যাণ্ট ও অক্সফোর্ড শার্ট পরেছে। তার উপর ল্যাব কোট। ফারা সরে যেতেই দেয়ালের দিকে চাইল দুই বন্ধু। বড়সড় ঘড়িটা জানিয়ে চলেছে সময়।

'কী রে, আমি কি বুড়ো হয়ে গেলাম?' একটু বিরক্তি নিয়ে বলল সোহেল। খুলে ফেলল গগলস্ ও ওয়েট বেল্ট।

'বেশি সিগারেট,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'খারাপ করেনি, সোহেল,' ওদের দিকে দুটো তোয়ালে ছুঁড়ল ফারা।

পুল থেকে উঠে এল দুই বন্ধু। 'একবছর আগেও পনেরোটা ল্যাপ বেশি দিতে পারতাম,' বলল সোহেল।

'হ্যাঁ, রানা যা বলেছে, ওই সিগারেট শেষ করছে তোমার ফুসফুস,' সুযোগ পেয়ে বলল ফারা। 'বারবার বলছি, শুনছ না।'

'এবার বোধহয় ছেড়েই দেব।'

'সুইমিং করতে এসেছ?' ফারার দিকে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়।' উদ্বেগের ছাপ পড়ল ফারার চোখে। 'একটা সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে এসেছি।'

'কী সেটা?'

'ঝামেলাটা আসলে উর্বশীর। তবে আমরা সবাই জড়িত হতে পারি।'

প্রশিক্ষিত সাইকোলজিস্ট নয় ফারা, তবে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউণ্ড ও শান্ত সমাহিত আচরণ ওকে ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাহাজের প্রায় সবাই মন খুলে কথা বলে ওর সঙ্গে।

গা মোছার ফাঁকে ফারার দিকে চাইল রানা। 'একটু খুলে বলো।'

'উর্বশীর মা কিছুক্ষণ আগে ফোন করে...'

বাধা দিল রানা, 'ওর তো তিনটে মা, কোন্ জন?' সুখী ছিলেন না উর্বশীর বাবা, প্রচুর মদ গিলে মারা গেছেন মাঝবয়সে। একা রেখে গেছেন উর্বশীর মাকে। মহিলা বহু কষ্টে মানুষ করেছেন উর্বশীকে।

'আপন মা। যিনি বালি দ্বীপে থাকেন। উনি ফোন করে জানিয়েছেন তাঁর ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

ক'সেকেণ্ড চুপ করে রইল রানা। উর্বশীর আপন ভাই? একটাই আছে। ছেলেটাকে দেখেছে ও। বয়স হবে আঠারোর মত। হাসিখুশি, সরল—যে যা বোঝাবে, তাই বিশ্বাস করবে।

'কোনও মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে?'

'এখনও না। উর্বশীর মা'র ধারণা তিনি জানেন কে কিডন্যাপ করেছে। যোগাযোগ মন্ত্রীর হেরোইন-খোর ছেলে, ক'বার এসেওছে ওঁর বাড়িতে। কিছু দিন আগে সেই ছেলের সঙ্গে হাতাহাতি হয় উর্বশীর ভাইয়ের। সে হুমকি দিয়ে যায় খুন করে ফেলবে ওকে। এরপর দু'দিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় উর্বশীর ভাই। এরপর থেকে কোনও যোগাযোগ নেই। ওর মা থানায় গেছেন, কিন্তু মামলা নিতে রাজি হয়নি পুলিশ। উনি শেষে ধরেছেন উর্বশীকে, "তুই না কী এক গোয়েন্দা এজেন্সির সেক্রেটারি, তুই বড় অফিসারকে ধরলে হয়তো সাহায্য মিলবে।"'

উর্বশীর ভাই একবছর টেকেনি কলেজে, খারাপ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াত। অল্পদিনেই পুরোপুরি বখে যায়। কয়েকবার হেরোইনসহ ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। তিনমাস ছিল রিহ্যাব সেণ্টারে। উর্বশী সময় দিতে পারে না, কিন্তু ছোট ভাইকে খুবই ভালবাসে। অনেক বুঝিয়ে আবার ভর্তি করে দেয় কলেজে। কিন্তু এবারও পড়াশোনা বাদ দিয়েছে সে। আট মাস আগে চলে যায় ফিলিপিন্সে, মিশতে শুরু করে কী যেন এক গোষ্ঠীর সঙ্গে। বাড়ি ফেরে মাসখানেক আগে। ছেলেটা শেষদিকে এড়িয়ে চলত উর্বশীকে।

অথচ ছোট ভাইকে রক্ষা করতে যে-কোনও কাজ করতে পারে উর্বশী, জানে রানা। সোহেলের দিকে চাইল ও। 'ফারা না

বললে বুঝতাম না উর্বশী এখন দেশে ফিরতে চাইবে।'

'এদিকে বাংলাদেশি জাহাজে মিসাইল তুলে দিলেই আমাদের ছুটি,' বলল সোহেল।

তা ঠিক নয়। বিসিআই থেকে আরেকটা কাজ দেয়া হয়েছে ওদের—রানা ও সোহেলকে। ভুলেও কাউকে চাপাচাপি করেনি ওরা, কিন্তু ফু-চুং, অনিল, গগল, উর্বশী ও আতাসি খুশিমনে রাজি হয়েছে ছোট্ট ওই অ্যাসাইনমেন্টেও ওদের সঙ্গে থাকতে।

'তোমরা উর্বশীকে সাহায্য করতে পারো,' বলল ফারা।

'অনিল, ফু-চুং, আতাসি, বা ক্রুদের সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'না। আগে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি। উর্বশী বোধহয় চাইবে না কেউ ওর ঝামেলার সঙ্গে নিজেকে জড়াক। কিছু ব্যাপারে খুব কঠোর ও। নিজের সম্মান রক্ষা করতে জান দিতে পারে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আর আমাকে বলে, *তুমি গোঁয়ার*।'

'তোমাদের কাছে কখনও সহায়তা চাইবে না,' বলল ফারা। 'মরলেও নয়। যা করার নিজে করবে।'

'কোনও পরিকল্পনা করেছে, বলেছে তোমাকে কিছু?' জানতে চাইল সোহেল।

'মিসাইল হস্তান্তর শেষ হলেই রানাকে বলবে কাছাকাছি কোনও দেশে ওকে নামিয়ে দিতে। ওখানকার আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে গিয়ে বিমান ধরবে। সোজা ফিরবে ইন্দোনেশিয়ায়। কী করবে, কীভাবে করবে এখনও ঠিক করেনি।'

ঘড়ির দিকে চাইল রানা। বাংলাদেশি জাহাজের সঙ্গে রন্দেভু আরও দু'ঘণ্টা পর। এ কাজের শেষে মার্ভেল রওনা হতে পারে

পোর্ট সাঈদ লক্ষ্য করে। ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কায়রো ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, আল কুয়াহিরাহ্। বিমানে করাচি, সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া। তার মানে বেশ ক'টা এয়ারপোর্ট পেরুতে হবে। সঙ্গে অস্ত্র নেয়া চলবে না।

বেশ কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে রানার মনে। ঠিক করল পরে কথা বলবে উর্বশীর সঙ্গে।

হঠাৎ সুইমিং পুলের বাতিগুলো বারকয়েক নিভু নিভু হলো, সঙ্কেত জানিয়ে দিল জাহাজের সুপার কম্পিউটার। রানা ও সোহেলকে বলছে, বাছারা, এবার সুইমিং পুল ছেড়ে উঠে পড়ো, কিছুক্ষণ পর রন্দেভু। দুই বন্ধু সুতির রোব পরে নিল, পায়ে ফ্লিপফ্লপ। ওদের পাশে হাঁটছে ফারা, বেরিয়ে এল সুইমিং পুল থেকে। হঠাৎ রানা বলল, 'মিসাইল সরানোর আগেই উর্বশীর সঙ্গে কথা বলব। ওর বোকামি হবে একা কিছু করতে যাওয়া। আমরা তো পাশে থাকতেই পারি।'

'সেটা ভেবেই তোমাদের বলেছি,' বলল ফারা। 'একা যাবে কেন উর্বশী?' ওর কণ্ঠে স্বস্তি ফুটে উঠেছে। এখন নিশ্চিত, বান্ধবীর বিপদে পাশে থাকবে রানা ও সোহেল। এবং ও।

দেড় ঘণ্টা পর অপারেশন্স সেণ্টারে এসে ঢুকল রানা। আগেই চলে এসেছে সোহেল। যে যার সিটে বসে পড়েছে অনিল, উর্বশী, ফু-চুং, আতাসি ও গগল। কমিউনিকেশন নিয়ে ব্যস্ত আতাসি, সোনার কাভার করছে উর্বশী।

এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন কাছে চলে আসছে, কিছুক্ষণ পর পাশাপাশি হবে দু'জাহাজ। তখন সরিয়ে নেয়া হবে আমেরিকান মিসাইল। কোনও জটিলতা হওয়ার কথা নয়। অ্যাশকেলন বন্দরের সেই গুমোট পরিবেশ এখন নেই, কাজের

ফাঁকে চলছে হাসি-ঠাট্টা। তবে রানা ঢুকবার পর শীতল হয়ে উঠল পরিবেশ। ওর বন্ধুরা এরইমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে উর্বশীকে কী বলতে পারে রানা। এবং সে ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন আছে ওদের সবার।

বরাবরের মত সিটে বসল না রানা, থামল উর্বশীর পাশে। 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'আমি শুনতে চাই না,' কম্পিউটার মনিটর থেকে চোখ তুলল না জেদি ইন্দোনেশিয়ান লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। আঁচ করছে, সব বলে দিয়েছে ফারা।

'মিসাইল সরিয়ে দেয়ার পর পোর্ট সাঈদের দিকে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'কায়রোয় রানা এজেন্সিকে জানানো হয়েছে। ওরা পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার টিকেট কাটবে। তুমি আর আমি ভোরে বন্দরে নামছি। তারপর ঠিক করব পরের পদক্ষেপ।'

চোখে আপত্তি নিয়ে রানার দিকে চাইল উর্বশী। কী যেন বলতে চলেছে, কিন্তু হাত তুলে ওকে মানা করল রানা। 'তুমি তো জানো আমাদের পরের কাজটায় আমাকে না হলেও চলবে। ওটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে ফু-চুং ও সোহেল।'

উপমহাদেশীয় মুসলিম জঙ্গিদেরকে বিপুল অস্ত্র উপহার দিতে চলেছে এক সৌদি প্রিন্স। এসব আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করছে মহাবদমাশ এক ইজরায়েলি আর্মস ডিলার। টাকা দেয়া-নেয়া হবে মণ্টি কার্লোয়। রানাদের কাজ শুধু কান পেতে কথাবার্তা শোনা, এবং বিসিআইকে ওদের পরিকল্পনা জানিয়ে দেয়া। সঠিক সময়ে অস্ত্রগুলো দখল করবে বিসিআইয়ের এজেন্টরা।

'তোমরা কেন...' গ্রীবা নাড়ল উর্বশী, ছলছল করছে

দু'চোখ। 'এ আমার একার লড়াই।'

'কে বলেছে তোমাকে?' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'আমাদের কারও পরিবার থেকে কাউকে কিডন্যাপ করা হলে? নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য চাইতাম। তুমি সাহায্য না করে পারতে? কাজেই শুনতে চাই না তোমার কোনও কথা।'

'যা বলেছিস,' বলল অনিল।

'গগল ছাড়া তোদের সবার মধ্যে আমারই বয়স বেশি,' গম্ভীর হয়ে বলল ফু-চুং, 'আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, একা ওর দেশে ফেরা চলবে না।'

ওদের কথাগুলো শেষ হতেই নীরবতা নামল অপারেশন্স সেন্টারে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবল উর্বশী, তারপর মাথা নিচু করে বলল, 'ধন্যবাদ। তোমরা সত্যিকারের বন্ধু। এভাবে যে ভেবেছ, মনটা মস্ত বড় হয়ে গেল আমার। এখন জানি আমি একা নই।'

'কথাটা সবসময় মনে রেখো, মেয়ে,' বলল বেরসিক কট্টর গগল। 'বন্ধুরা সাহায্য করবে না, তো তারা আছে কী করতে?'

'কায়রো যাওয়ার পথে তোমার সঙ্গে আলাপ সেরে নেব,' বলল রানা। নিজের সিটে গিয়ে বসল। 'আতাসি ওরা যোগাযোগ করেছে?'

'হ্যাঁ, বস্, বিশ মিনিট পর পাশাপাশি পৌঁছব।'

'ফু-চুং, তোর কাজ কতদূর?'

'ডেকের উপর স্লিং লাগিয়ে দেয়া হয়েছে মিসাইলে। একজন টেকনিশিয়ান ডেরিকের কন্ট্রোল নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

'আতাসি, রেইডার বা কমিউনিকেশন চ্যানেলে নতুন কিছু?'

'কিছুই নেই। চারপাশ চুপচাপ। গত দু'ঘণ্টার ভিতর এমভি

বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন ছাড়া আর কোনও জাহাজ দেখিনি রেইডারে। কথাও বলছে না কেউ।'

সাধারণ শিপিং লেন থেকে অনেক দূরে ঠিক করা হয়েছে রন্দেভুর জায়গা। এদিকে আসে না ট্যাঙ্কার বা ফ্রেইটার। অত সি-লাইফও নেই যে কমার্শিয়াল ফিশিং হবে। স্যাটালাইটগুলোর কাভারেজের মাঝে সঠিক সময় ও স্থান বেছে নিয়েছে ওরা, কোনও পশ্চিমা দেশ আকাশ থেকে নজর রাখবে না ওদের উপর।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল সাত মিনিট, তারপর বলে উঠল আতাসি, 'ওরা পৌঁছে গেছে। দক্ষিণে এক মাইল পিছনে।'

'গুড।' গগলের দিকে চাইল রানা। 'অপেক্ষা করো।'

আরও দশ মিনিট পেরুল। উর্বশী ও গগলের কম্পিউটার ধরছে সোনার তরঙ্গ। সঙ্গে রয়েছে মার্ভেলের জিপিএস কোঅর্ডিনেট। জাহাজে গুঁতো লাগবে না। রেডিও সম্পূর্ণ নীরব।

কিছুক্ষণ পর বলল উর্বশী, 'ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় নেই। মনে হয় গতি তুলছে না। স্রেফ ভাসতে ভাসতে আসছে স্রোতের টানে।'

'ওটা দেড় শ' গজ পিছনে, খুব ধীরে আসছে,' বলল গগল। 'পোর্ট সাইডের এক শ' ফুট দূরে।'

'থ্রাস্টার দিয়ে পঞ্চাশ ফুট পাশে সরো,' বলল রানা।

বাটন টিপে বো ও স্টার্ন থ্রাস্টার ব্যবহার করল গগল, সাগরে নিঃশব্দে সরতে শুরু করেছে মার্ভেল। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁচেছে। ডাইন্যামিক পজিশনিং সিস্টেম রি-অ্যাকটিভেট করল গগল। সাগরে ওদের স্থির রাখবে কম্পিউটার।

'ওটার ইঞ্জিন স্থির, প্রতি মিনিটে দশ ফুট করে আসছে।'

'গগল, ওরা থামলে পাশে ভিড়তে হবে,' অপারেশন্স সেন্টারের পিছনে পৌঁছল রানা, সোহেলকে নিয়ে উঠল এলিভেটরে। সরাসরি উঠে এল মার্ভেলের ব্রিজে। মেঝের হ্যাচ খুলতেই মুখে লাগল নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া, বয়ে চলেছে ঝিরঝির করে।

নোংরা ব্রিজে কালি-গোলা অন্ধকার। তবে ওরা ভাল করে চেনে এ জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি। ব্রিজের পিছনে চলে গেল দু'জন, আঁধারে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। দু'মিনিট পর পৌঁছে গেল মেইন ডেকে। আকাশে মেঘ নেই, ঝিকমিক করছে হাজারো-কোটি তারা। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠলে ম্লান হবে।

পোর্ট সাইডে চলে আসছে এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন। এবার দায়িত্ব মার্ভেলের, থ্রাস্টার নিয়ন্ত্রণ করবে কম্পিউটার, দুই জাহাজে যাতে ঠোকাঠুকি না হয়।

ব্রিজ থেকে ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে রানা, ওটার মাউথ পিস ঠোঁটের কাছে তুলল। 'গগল, ব্যালাস্ট বাড়িয়ে নাও। ওই জাহাজের ডেকের সমান করো মার্ভেলের ডেক।'

দু'সেকেণ্ড পর চালু হলো পাম্পগুলো, ট্যাঙ্কে ভরতে শুরু করেছে পানি। ধীরে ধীরে সাগরে ডেবে বসছে মার্ভেল।

'ডেক ক্রু, ফেণ্ডার নামিয়ে দাও রেইলিঙের পাশে,' নির্দেশ দিল রানা। ব্যস্ত হয়ে উঠল নাবিকরা, রাবারের পুরু বাম্পার নামিয়ে চলেছে। পুরনো টায়ারের বদলে আধুনিক কুশন ব্যবহার করছে। প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে এগুলো।

বাংলাদেশি জাহাজের ডেকে স্বল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে। নাবিকরা অপেক্ষা করছে, চেয়ে রয়েছে মার্ভেলের ডেকের দিকে। ওখানে ট্রলির উপর রাখা আণবিক মিসাইল। তবে চেহারা দেখা গেল না, রাখা হয়েছে কাঠের বাক্সের ভিতর।

ওয়াকি-টকি ব্যবহার করল রানা। 'গগল, থ্রাস্টার-এ পঁচিশ পার্সেন্ট পাওয়ার দাও।'

'টোয়েন্টি ফাইভ, রানা।'

খুব ধীরে সরছে মার্ভেল।

তাজউদ্দীনের ডেক-রেইলিঙে থেমেছে অফিসাররা।

'গতি কমাও, গগল,' অভ্যস্ত চোখে মাঝের দূরত্ব দেখছে রানা। আর পঁচিশ ফুট দূরে জাহাজ। স্ক্র্যাম্বল্ড চ্যানেলে বলল, 'এখানে থামো।'

মোটা একটা কণ্ঠ বলে উঠল ওই জাহাজ থেকে, 'আপনারা দারুণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন জাহাজ।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনারা মাল নিতে তৈরি?'

'শুনেছি দুটো বাক্স দেবেন?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরি মনোয়ার হোসেন।

'সম্ভব হয়ে উঠল না, একটা ব্যবহার করা হয়েছে ইজরায়েলি উপকূলে।'

'ফাটিয়ে দিয়েছেন? কোথাও তো শুনলাম না আণবিক বোমা পড়েছে ইজরায়েলে...'

'অন্য ভাবে ব্যবহার হয়েছে। আণবিক বিস্ফোরণ হয়নি।'

'মাশ্‌আল্লাহ্‌, ভাল। কোনওদিন যেন আণবিক বোমা ব্যবহার না হয়। ...আমরা তৈরি, ক্যাপ্টেন রানা।'

'আপনাদের জলদি করতে হবে,' বলল রানা। 'বারো মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড পর একটা আমেরিকান স্যাটালাইট আসছে। মিসাইলের সঙ্গে নেবেন আরেকটা ছোট বাক্স।'

'কীসের?'

'আরেকটা ওঅরহেড।'

ডেরিকের কন্ট্রোল নিয়ে অপেক্ষা করছে এক টেকনিশিয়ান,

তার দিকে ফিরল রানা। ওই ক্রেন দেখলে মনে হয় যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে, কিন্তু বাস্তবে অনায়াসে বইতে পারে সত্তর টন। দ্রুত টানটান হলো ঢিলা কেবল, স্লিংগুলো তুলতে শুরু করেছে কাঠের বাক্স। ক'জন নাবিক ধরে রেখেছে গাইড রোপ। বাক্স ঘুরতে শুরু করলে ঠেকাবে। রেইলিং পার করে দিতে হবে মিসাইল। দীর্ঘ বুম ঘুরছে ওটা নিয়ে।

বাংলাদেশি জাহাজের ডেকে তৈরি নাবিকরা। যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে নেবে মিসাইল। ঘড়ির কাঁটার মত করে হাত ঘোরাতে শুরু করেছে এক নাবিক। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমিকরা ব্যবহার করে এই ইশারা। কেবল ঢিল দিতে বলছে। সঙ্গীদের নিয়ে তৈরি, নিজেদের হাতে তুলে নেবে মিসাইল। বাক্স কাছে চলে আসতেই সতর্ক হয়ে উঠল তারা। ওজন নিল আটজন মিলে, দু'জন খুলে দিল স্লিং। মিসাইলের বাক্স দ্রুত ডেক থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বাঙালি নাবিকরা। সরে গেল মার্ভেলের ক্রেন। পরের এক মিনিটে আবার ফিরল বুম, সঙ্গে ছোট একটা বাক্স। ওটাও অদৃশ্য হলো ওই জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারে।

'আপনারা সরলে রওনা হই আমরা,' বললেন ক্যাপ্টেন মনোয়ার।

ক্রুদের আগেই নির্দেশ দিয়েছে রানা, ডেরিক সরিয়ে নাও। এবার হেলম্‌স্‌কে বলল, 'সরে এসো, গগল। পাওয়ার পঁচিশ পার্সেন্ট। পাম্প চালু করে পানি সরিয়ে দাও। মার্ভেলকে ঘুরিয়ে নিয়ে গতি তোলো চল্লিশ নটে। পোর্ট সাঈদে চলেছি।'

খুব ধীরে সরতে শুরু করেছে মার্ভেল।

'রেইডার কন্ট্যাক্ট, বস্,' জানাল আতাসি। 'স্কোপের শেষ মাথায়। আমাদের পিছনে এক শ' মাইল দক্ষিণ-পুবে।'

'ট্র্যাক করো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

রেইলিং থেকে চেঁচিয়ে জানাল রানা, 'ক্যাপ্টেন মনোয়ার, আমরা রেইডারে অন্য কাউকে পেয়েছি। পিছনে, দক্ষিণ-পুবে। অনেক দূরে, তবু মনে হয় রওনা হয়ে যাওয়া উচিত আপনার।'

'তা বলতে। জানিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তবে আসার সময় ওটাকে দেখেছি। প্যাসিভ সোনার বলেছে কোনও আওয়াজ নেই ওখানে। জাহাজটা বোধহয় নোঙর ছিঁড়ে এসেছে পোর্ট সাঈদ থেকে। অটোমেটিক ডিসট্রেস সিগনাল নেই। জাহাজে উঠে যে দেখব, সে-সময় ছিল না। ভিন্ন মিশন নিয়ে এসেছি। তবে আপনারা দেখতে পারেন। স্যালভেজ করলে মোটা মুনাফা পাওয়া যায়।'

'আপনারা আমাদের অনেক পরে ফিরছেন, আমরা হয়তো স্যালভেজের কাজটা নিতে পারি,' বলল রানা। ভাবছে, যোগ্য লোকের অভাব নেই মার্ভেলে, ওই জাহাজ নিয়ে যাওয়া যায় পোর্ট সাঈদে। ক্ষতি কী? ক্রুরা পেতে পারে কয়েক লাখ ডলার।

'ওই জাহাজ প্রায় আপনাদের মার্ভেলের সমানই, বড়জোর পাঁচ শ' পঞ্চাশ ফুট।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। আমরা ওদিক দিয়েই যাব, দেখি ঢুঁ দেব কি না।'

'ভাল থাকুন।' বারকয়েক হাত নেড়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীনের ডেক থেকে সরে গেছে নাবিকরা।

গতি বাড়ছে মার্ভেলের, চলেছে দক্ষিণ-পুব লক্ষ্য করে। ডেকের উপর হু-হু করে বইতে শুরু করেছে শীতল হাওয়া। কিছুক্ষণ পর আরও গতি তুলবে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন, তখন ডেকে থাকলে মনে হবে সামনে থেকে আসছে তীব্র হারিকেন। ক্রেন বুম বেঁধে সুপারস্ট্রাকচারে গিয়ে ঢুকেছে ক্রুরা।

মিসাইলের ট্রলি চলে গেছে টর্পেডো রুমে।

একটা সিঁড়ি-ঘরের পাশে থেমেছে রানা ও সোহেল।

'তুই কী বলিস, সোহেল?'

'কী বিষয়ে, প্রিয় শ্যালক?'

'জাহাজটা ওখানে। আমরা থামতে পারি। এক ঘণ্টার মামলা। তারপর রওনা হয়ে যেতে পারি সুয়েজের দিকে।'

'উর্বশী অস্থির হবে না। তোদের প্লেন-কাল দুপুর বারোটায়। হাতে সময় আছে।'

ওয়াকি-টকি চালু করল রানা। 'গগল?'

'বলো।'

'নতুন কোর্স নাও। সোজা ওই জাহাজ লক্ষ্য করে। তবে ভোরের আগে পৌঁছতে চাই পোর্ট সাঈদে।'

'সহজেই সম্ভব।'

'ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে জানিয়ে দাও, রবিনসন তৈরি রাখুন। ইউএভি-ও। লাগতে পারে। যদি কপ্টার নিই, ইউএভি চালাবে অনিল।'

বিমান বা হেলিকপ্টার চালাতে মোটেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে না অনিল। কিন্তু ফ্লাইট সিমুলেটর গেম্‌স-এর পোকা। আনন্দের সঙ্গে চালায় মার্ভেলের রিমোট অপারেটেড ড্রোন।

'আমরা কখন পৌঁছব, গগল?'

'লাগবে এক ঘণ্টার একটু বেশি। পোর্ট সাঈদে পৌঁছব ভোর ছ'টা দিকে।'

'যথেষ্ট,' বিড়বিড় করে বলল সোহেল।

ইন্দোনেশিয়ান লেফটেন্যান্ট কম্মাণ্ডারের উদ্দেশে বলল রানা, 'ব্যাগেজ গুছিয়ে নাও, উর্বশী। আমরা মিশরে পৌঁছব ভোরে।'

ঝড়ো হাওয়ার মাতম শুরু হয়েছে, যেন হু-হু করে কাঁদছে প্রকৃতি। সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ল রানা ও সোহেল, চলেছে অপারেশন্স সেন্টারে।

আট

চাঁদের আবছা আলোয় ওটা যেন ওয়েডিং কেক, অসংখ্য স্তর সহ অপেক্ষা করছে—কে জানে কয়তলা জাহাজ! তবে কোনও সন্দেহ নেই প্রমোদ-তরী। চারপাশ এখন নিশ্চুপ, থমথম করছে। জাহাজের মাথার উপর উড়ছে মার্ভেলের ড্রোন। অপারেশন্স সেন্টার থেকে খেয়াল করছে রানা ও অন্যরা। চুপ হয়ে গেছে সবাই, মনে অস্বস্তি। ভুতুড়ে লাগছে জাহাজটাকে।

কোনও পোর্টহোলে বাতি নেই। কেউ হাঁটছে না ডেকের উপর। রেইডার বার থেকে কোনও সঙ্কেত নেই। ব্যাপার কী?

শান্ত সাগরের মৃদু ঢেউ মাথা খুঁড়ছে জাহাজের সাদা খোলে, যেন চাপড় দিয়ে সরাতে চাইছে বিশাল এক আইসবার্গ। ড্রোনের আইআর ক্যামেরা থেকে থার্মাল ইমেজিং আসছে। কখন কে জানে ওই জাহাজের ইঞ্জিন ও চিমনি ঠাণ্ডা হয়েছে! মেডিটারেনিয়ান সাগরে শীতল পরিবেশ। ড্রোনের যন্ত্রপাতি এখনও খুঁজছে জীবন্ত দেহের তাপ।

'ওখানে কী ঘটে থাকতে পারে?' বলল উর্বশী। জানে, কারও কাছে জবাব নেই। উত্তর পাবে, সে-আশাও করেনি।

'ডেকের উপর দিয়ে চলুন, মিস্টার সিরাজ,' বলল রানা।

অপারেশন্স সেন্টারের পিছনে ওঅর্ক স্টেশনে বসেছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, কম্পিউটার স্ক্রিনের রঙিন আলো পড়ছে তাঁর মুখে। বার দুয়েক দাড়ি হাতড়ে নিলেন তিনি, সামনের দিকে ঠেললেন জয়স্টিক। ইউএভি বা রেডিও কন্ট্রোল্ড প্লেনটা চিনের তৈরি, সঙ্গে রয়েছে শক্তিশালী ক্যামেরা ও ট্র্যান্সিভার। এ মুহূর্তে ক্রুজ শিপের মাথার উপর চলে এসেছে খুদে বিমান। প্রমোদ-তরীর তিরিশ মাইল উত্তর-পশ্চিম থেকে দ্রুত ছুটে আসছে মার্ভেল।

বিশাল স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল সবাই। ইউএভি উড়ে গেল জাহাজের স্টারবোর্ড রেইলের উপর দিয়ে। ডেক দেখিয়ে চলেছে ক্যামেরা। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, নীরবতা নেমে এসেছে অপারেশন্স সেন্টারে। যা দেখছে, বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ। ঘরের পরিবেশ অস্বস্তিকর। সবার আগে নীরবতা ভাঙল রানা, যোগাযোগ করল কমিউনিকেশন প্যাডে। 'অপারেশন্স সেন্টার থেকে মেডিকেল বে। ডক্টর ফারাকে এক্ষুণি দরকার!'

'যা দেখলাম তা কি সত্যি?' চাপা স্বরে বলল উর্বশী।

'তা-ই মনে হলো,' বলল সোহেল। 'জাহাজের ডেকে ওগুলো লাশই! অসংখ্য!'

ওখানে অন্তত এক শ' মৃতদেহ। কেউ চিত হয়ে, কেউ উপুড়, কেউবা পড়ে রয়েছে গা মুচড়ে। মনে হয় মানুষগুলো মারা গেছে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে। বাতাসে পতপত করে নড়ছে পোশাক। ক্যামেরা জুম করলেন সিরাজ। উপরের ডেকে সুইমিং পুল। চারপাশে অতিথি। যেন একসঙ্গে আছড়ে পড়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে ডিশ ও গ্লাস। ইউএভির গতি কমিয়ে আনলেন সিরাজ,

আরও জুম করলেন ক্যামেরা। এক যাত্রীর মুখ ভেসে উঠল। কমবয়সী মেয়ে, পরনে উৎসবের পোশাক। নিজ রক্তের সাগরে চিরতরে স্থির। প্রায় একই সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে জাহাজের সবাই!

'এ জাহাজের নাম কী?' নিচু স্বরে বলল উর্বশী।

'গোল্ড অভ মার্স,' বলল রানা। মন থেকে উধাও হয়েছে জাহাজ স্যালভেজ করবার ইচ্ছা। তিক্ত হয়ে উঠেছে হৃদয়।

'মঙ্গল গ্রহের সোনা, অমঙ্গল এনেছে ওখানে,' বিড়বিড় করে বলল অনিল। কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ জাহাজ সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করতে চাইছে। অন্যরা স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। দেখছে নারকীয় দৃশ্য।

দ্রুত পায়ে অপারেশন্স সেন্টারে এসে ঢুকল ডক্টর ফারা, পরনে পায়জামা ও বিশাল এক টি-শার্ট। পায়ে চটি। উস্কোখুস্কো চুল। ডানহাতে ঝুলছে মেডিকেল কেস। ওটা সবসময় থাকে ওর স্টেট রুমে। ছুটে আসতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। শ্বাস নেয়ার ফাঁকে বলল, 'কার কী হলো?'

কেউ জবাব দিল না। কয়েক সেকেণ্ড পর স্ক্রিনের উপর স্থির হলো ফারার চোখ। সে দক্ষ ডাক্তার, আফগানিস্তানে যুদ্ধ দেখেছে, মার্কিনি নৃশংসতা দেখেছে, কিন্তু এমন করুণ দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। ডেক ভরা রক্তাক্ত লাশ দেখে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল ফারা। কয়েক মুহূর্ত লাগল মন স্থির করতে, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। চলে গেল স্ক্রিনের কাছে, আরও ভাল করে দেখতে চাইছে। একে স্বল্প আলো, তার উপর থরথর করে নড়ছে ইউএভি, পরিষ্কার নয় ছবি।

'কোনও ধরনের ট্রমা নয়,' কিছুক্ষণ পর মন্তব্য করল ফারা। 'বোধহয় দ্রুতগতি কোনও হেমোরেজিক ভাইরাস।'

'প্রকৃতির সৃষ্টি?' জানতে চাইল সোহেল।

'না। প্রকৃতির কাজের ধরন এরকম নয়। এটা অতর্কিত আক্রমণ মনে হচ্ছে—মানুষের কাজ।'

'ওরা কোনও সুযোগই পায়নি, ডিসট্রেস সিগনাল পর্যন্ত পাঠাতে পারেনি,' বলল রানা।

ওর দিকে ফিরল ফারা। 'ওখানে যেতে চাই। স্যাম্পল নেব। মেডিকেল বে-তে রয়েছে বায়ো-হ্যাজার্ড গিয়ার। ডেকে ডি-কনট্যামিনেশন স্টেশন তৈরি করবে আমার অ্যাসিস্টেন্টরা।'

'বাদ দাও,' বলল রানা। 'ওই জাহাজে উঠে তুমি ভাইরাস বয়ে আনবে সেটা চাই না আমি।' তর্ক করতে চাইছে ফারা, কিন্তু আগেই থামিয়ে দিল রানা। 'আমরা একটা ইনফ্লেটেবল যোডিয়াক নেব। কাজ শেষে ওটা ডুবিয়ে দেব। ...অনিল, তুই ক্যাপ্টেন সিরাজের কাছ থেকে ইউএভি বুঝে নে। ...সিরাজ, আপনি হ্যাঙারে চলে যান, তৈরি রাখুন হেলিকপ্টার। ...সোহেল, ফু-চুং, তোরা পিস্তল নে আর্মারি থেকে। দশ মিনিট পর চলে আসবি হ্যাঙারে। ...ফারা, তোমার কোনও সহকারী দরকার?'

'একজন সাহায্য করলেই চলবে,' বলল ফারা।

'বেশ। সঙ্গে বাড়তি বায়ো-সুট নিয়ো। কেউ বেঁচে থাকতে পারে।' আগেই সিট ছেড়েছে রানা। 'আমরা বিশ মিনিট পর আকাশে উঠছি।'

গগল ভুল বলেনি, গোল্ড অভ মার্স-এর কাছে পৌঁছতে দু-ঘণ্টার খানিক বেশি লাগল মার্ভেলের। ততক্ষণে ইকুইপমেন্ট ও যাত্রী সংখ্যার কারণে ঠিক হয়েছে, দুই ট্রিপ দেবে রবিনসন। গোল্ড অভ মার্স জাহাজটার উপর ঘুরছে ইউএভি। কিছুক্ষণ পর অনিল জানাল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের কারণে ডেকে নামা অসম্ভব। জাহাজে নামতে হলে সেরা জায়গা ব্রিজের ছাত।

অবশ্য সরাসরি নামবে না রবিনসন। আর সবার মত কমলা রঙের বায়ো-হ্যাজার্ড সুট পরে নিয়েছেন সিরাজ। সুটের ভিতর রয়েছে রিব্রিদার। এদিকে হোস পাইপ নিয়ে তৈরি ফারার দুই আর্দালি। মার্ভেলের ডেকের উপর হেলিকপ্টার ফিরলে শক্তিশালী ব্লিচ ছিটিয়ে দেবে ট্যাঙ্ক থেকে। প্রতিটি জিনিস ডিজ-ইনফেক্ট করবে।

বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। যেসব ক্রু টেনে আনবে যোডিয়াক, তাদেরও ব্লিচ দিয়ে ডিজ-ইনফেক্ট করা হবে। যে অণু গোল্ড অভ মার্সের যাত্রীদের মেরে ফেলেছে, সেটা প্রাকৃতিক নয়। ওরা দেখতে চলেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ভয়াবহতা। খুন করা হয়েছে শত শত মানুষকে। শুধু ওই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের কথা ভাবছে না রানা, সেই সঙ্গে ভাবছে এ অপরাধ যারা ঘটালো তাদের কথাও।

দু'হাত উঁচু করে রাখল রানা। সুটের সঙ্গে যেখানে কনুই পর্যন্ত লম্বা গ্লাভস্ মিশেছে, সেখানে রুপালি ডাক্ট-টেপ আটকে চলেছে ফারা। কাজ শেষে পিঠের যিপার আটকে দিল আরও টেপ দিয়ে। ট্যাঙ্ক থেকে সঠিক পরিমাণের বাতাস আসছে। আগেই অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে কার্বন স্ক্রাবার। তিন ঘণ্টা পর সুট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

'ধীরে হাঁটবে, যেদিকে যাও বুঝেশুনে, ধীরস্থির হয়ে,' ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশন নেটে বলল ফারা। ব্যস্ত হাতে কাজ করে চলেছে। 'কিছু করার আগে ভেবেচিন্তে নেবে। ভুলেও দৌড়াবে না। মনে রাখবে এ সুট বাঁচিয়ে রাখবে তোমাদের। যদি বাতাসে প্যাথোজেন থাকে, ঢুকে পড়তে পারে সুটের সামান্য ছেঁড়া জায়গা দিয়েও।'

'আর যদি সুট ছিঁড়ে যায়?' একটু থমকে গিয়ে জানতে চাইল

ফু-চুং। রানা চাইছে ও গোল্ড অভ মার্সের কম্পিউটার ঘেঁটে দেখুক। জানতে হবে জাহাজটা গত কিছুদিন কোথায় ছিল।

'সঙ্গে সঙ্গে মরে ভূত হবি,' মন্তব্য করল সোহেল। 'আমাদের সবাইকে তাড়া করে বেড়াবি সঙ্গে নেবার জন্যে।'

'আমি বাড়তি টেপ আটকে দেব সবার সুটের সঙ্গে,' বলল ফারা। 'সুট যদি ছিঁড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাতে হবে। এসব সুটে রয়েছে পজিটিভ এয়ার প্রেশার, কাজেই তোমরা যদি দ্রুত হাত চালাও, বিপদে পড়বে না। আমি না আসা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করবে। আমার জানতে হবে কী দিয়ে কাটল সুট।'

সোহেলের সুটের কাজ শেষে ফু-চুংকে নিয়ে পড়ল ফারা। রাবারের ফ্যাব্রিকের প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করছে। সেলাই করা অংশে আটকে দিল টেপ। সোহেল, ফু-চুং ও রানার কোমরে ঝুলছে লোডেড পিস্তল। পুরু গ্লাভ্‌স্-এর কারণে ট্রিগার টানা কঠিন হবে, কিন্তু রানা আগেই জানিয়ে দিয়েছে, অস্ত্র ছাড়া যাওয়া চলবে না কারও।

রবিনসনের ককপিট থেকে জানালেন আলম সিরাজ, 'আমি তৈরি, মিস্টার রানা।' তাঁর পিছনের সিটে স্তূপ হয়ে রয়েছে নানা ধরনের গিয়ার।

কাছের এক টেকনিশিয়ানের উদ্দেশে গলা ছাড়ল রানা। তবে হ্যাজম্যাট সুটের কারণে কিছুই শুনল না সে। স্বাভাবিক পায়ে দেয়ালের পাশে চলে গেল রানা, সুইচ টিপে দিল হ্যাঙার এলিভেটরের। মাথার উপর দু'ভাগে সরে গেল ছাত, চারটে হাইড্রোলিক র‍্যাম তুলে নিয়ে চলেছে মেঝেটা। কপ্টারের পিছন দরজা খুলে অপেক্ষা করল রানা। ফারা উঠে পড়তেই নিজে বসে পড়ল কো পাইলটের সিটে।

সোহেল ও ফু-চুং সরে যেতেই ইঞ্জিন চালু করলেন সিরাজ। তিন মিনিটে গরম হয়ে উঠল পিস্টনগুলো, ট্র্যান্সমিশন এনগেজ করলেন পাইলট। ঘুরতে শুরু করেছে মেইন রোটর। নড়ে উঠল রবিনসন, গতি তুলছে পাখাগুলো। কিছুক্ষণ পর যথেষ্ট শক্তি পেল পাখা, বাতাসকে দাবিয়ে দিয়ে ভেসে উঠল যান্ত্রিক ফড়িং।

আধ মিনিট পর দুলুনি কমল, সরাসরি আকাশে উঠতে লাগল কপ্টার। তার কয়েক সেকেণ্ড পর মার্ভেলের উপর থেকে সরে গেল রবিনসন। দুই জাহাজের মাঝখানে আধ মাইল দূরত্ব। নীচে সিল বোট ও পিছনে খুদে যোডিয়াক দেখল রানা, নাচছে ঢেউয়ের মাথায়। গোল্ড অভ মার্সের ওয়াটার লাইনের একটু উপরে বিশাল লোডিং ডোর। ওখান দিয়ে মালামাল তোলা হতো। ওখানে বেঁধে রাখা হবে যোডিয়াক, ফিরবার সময় গোসল করে নেবে ওরা ব্লিচ দিয়ে।

জাহাজের দিকে যাওয়ার পথে ভাবল রানা, দেখতে সত্যিই সুন্দর ক্রুজ শিপটা। দৈর্ঘ্যে মার্ভেলের থেকে সামান্য খাটো হলেও অনেক বেশি উঁচু। সাত তলা। রয়েছে বিলাসবহুল কেবিন ও সুইট। সুদৃশ্য বাঁকের বো আর শ্যাম্পেন-গ্লাসের মত ক্লাসিক ফ্যানটেইল। সুইমিং পুলের পিছনে একমাত্র চিমনি। ওটার কারণে দৃষ্টি ভ্রম হয়, মনে হয় পানি কেটে চলেছে জাহাজ।

গোল্ড অভ মার্সের স্টার্ন পেরুল রবিনসন। ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্স-এর লোগো চোখে পড়ল রানার, চিমনির উপর আঁকা ছবি—দু'হাতে তুলে ধরেছে অসংখ্য হীরার খণ্ড।

রবিনসন নিয়ে হুইল হাউসের উপর স্থির হলেন আলম সিরাজ, চারপাশ দেখে নিলেন—খুব কাছে নেই অ্যান্টেনা ও রেইডার ডিশের জঙ্গল। নামবার জায়গা অপরিসর, কিন্তু দক্ষ পাইলট ধীরে নামতে শুরু করলেন। ডেকের দু'ফুট উপরে থামল

কপ্টার। এখন আর নড়ছে না, যেন গেঁথে দেয়া হয়েছে পেরেক দিয়ে। গলা ফাটিয়ে বললেন সিরাজ, 'মঙ্গল কামনা করছি।'

দরজা খুলে ফেলল রানা। মাথা নিচু করে নেমে পড়ল। নিজের দিকের দরজা খুলেছে ফারা, আরেক হাতে মেডিকেল কেস। রোটরের ঝড়ো হাওয়া ছিঁড়ে ফেলতে চাইল ওর সুট। এগিয়ে এসেছে রানা, একে একে নামাতে শুরু করল বাক্স। ওর কাজ শেষে লাফিয়ে নেমে এল ফারা। দরজাটা আটকে দিল রানা, চাপড়ে দিল কপ্টারের পিছনটা। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করলেন সিরাজ, এবার আনবেন সোহেল ও ফু-চুংকে।

কপ্টারের আওয়াজ কমে যেতেই রেডিওতে বলল ফারা, 'আমি প্রথমে সিক বে দেখব, রানা।'

'এখন নয়,' মানা করে দিল রানা। 'এখানে অপেক্ষা করো। আগে ওরা আসুক। আমি চাই তোমার সঙ্গে থাকুক সোহেল। যে-কেউ হারিয়ে যেতে পারে এসব জাহাজের অলিগলি ও তস্য-গলিতে।'

ঠিকই বলেছে রানা, তর্ক করল না ফারা। জানে, মেয়ে বলে বাড়তি মনোযোগ পায়নি রানার কাছ থেকে। মনোযোগ পেয়েছে, তার কারণ ও জাহাজের একমাত্র ডাক্তার। ওর কিছু হলে শত মাইলের ভিতর মিলবে না চিকিৎসা। যদি এখানে খারাপ কিছু ঘটে, চিকিৎসা সেবা দেয়ার দায়িত্ব ফারার।

দশ মিনিট পেরুনোর আগেই আবারও ফিরল রবিনসন। হোস পাইপ থেকে ছুটে আসা ব্লিচের কারণে ওটার পেট এখনও ভেজা। ফ্লাইং ব্রিজের সিঁড়ি-ঘরে থামল রানা ও ফারা, খালি জায়গা পাওয়ার পর নামতে শুরু করলেন আলম সিরাজ। দু'ফুট বাকি থাকতে নেমে পড়ল সোহেল ও ফু-চুং। দু'সেকেণ্ড পর উঠতে শুরু করল রবিনসন। ওটা ফিরবার পর ব্লিচ দিয়ে ভাল

ভাবে ধোয়া হবে আবার। ওখানেই অপেক্ষা করবে কপ্টার, রানাদের কোনও বিপদ হলে দেরি না করে চলে আসবে।

'আসবার আগে অনিলের কাছ থেকে কী জানলি, ফু-চুং?' কাজের কথায় এল রানা।

'বলেছে এ জাহাজ এসেছে ফিলিপিন্স থেকে,' বলল ফু-চুং। 'তথ্য নিয়েছে ক্রুজ লাইন্সের ডেটাবেস থেকে। চার্টার করা হয়েছে ম্যানিলা থেকে। যাবে এথেন্স। ভাড়া নিয়েছে এক সেলফ-হেল্প গ্রুপ।'

'তুই এ জাহাজের কম্পিউটার মেমোরি ঘেঁটে লগ পরীক্ষা করে দেখ, ফু-চুং,' বলল রানা। 'জানা দরকার আসবার পথে কোথাও থেমেছে কি না। যদি চলার পথে অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকে, লগ বুকে লেখা থাকবে। ...ফারা, তুমি সোহেলের সঙ্গে যাবে। স্যাম্পল নেবে, দেখা যাক কিছু বোঝা যায় কি না।'

'তুই কোথায় চললি?' জানতে চাইল সোহেল।

'সঙ্গে তিন ঘণ্টা চলার মত বাতাস, চাই জাহাজের যত বেশি সম্ভব এলাকা ঘুরে দেখতে।' সুইচ টিপে ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিল রানা। পিঠে ঝুলন্ত থলির ভিতর রয়েছে বাড়তি ব্যাটারি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা উইং ব্রিজে। পিছন দিকে সরু ফুটপাথ, সাগর থেকে আশি ফুট উপরে ঝুলছে। তার উল্টোদিকে কিছু কন্ট্রোল লিভার ও সুইচ। ওগুলো ব্যবহার করে বন্দরে জাহাজ নিয়ে রাখে হার্বার পাইলট। এক পাশে একটা দরজা। ওটা দিয়ে ব্রিজে ঢোকা যায়। নব ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকল রানা। হাই-টেক ব্রিজ। সব ধরনের পাওয়ার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ব্যাটারিগুলো ফুরিয়ে এসেছে। ইমার্জেন্সি বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। ব্রিজের গাঢ় আঁধারে প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। সামনের বিশাল জানালা দিয়ে আসছে

চাঁদ-তারার আবছা আলো।

ঘরের চারপাশে আলো ফেলল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই চোখে পড়ল প্রথম লাশ। ব্রিজে ঢুকেছে ফু-চুং, সোহেল ও ফারা। টর্চের আলোয় রানাকে পাশ কাটাল ফারা। ফু-চুঙের হাতে ভিডিও ক্যামেরা, ভাইজরে চোখ রেখে চারপাশের ছবি তুলছে। লাশের পরনে সাদা ইউনিফর্ম। জাহাজের অফিসার। কুচকুচে কালো চাপ দাড়ি। ঘাড় কাত করে অন্যদিকে চেয়ে। টর্চের স্বল্প আলো পড়েছে তার ঘাড়ের উপর। ফ্যাকাসে সাদা ত্বক ফেটে বেরিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। পাশে বসল ফারা, সোহেলের সাহায্য নিয়ে চিত করল লাশ। লোকটার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ঝরেছে রক্ত। শরীরের ত্বক ফেটে ঝর্নার মত বেরিয়েছে। দ্রুত হাতে পরীক্ষা করছে ফারা। নতুন তথ্য পেলে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে।

ব্রিজে ব্যাকআপ ইলেকট্রিকাল সিস্টেম খুঁজছে রানা। কিছুক্ষণ পর জ্বলে উঠল কয়েকটা বাতি। চালু হলো চারটে কম্পিউটারের মনিটর। ব্রিজে আরও তিনটে লাশ, দু'জনের পরনে ইউটিলিটি ইউনিফর্ম। অন্য মেয়েটি পরেছে ককটেইল ড্রেস। বোধহয় মৃত অফিসারের আমন্ত্রণে দেখতে আসে ব্রিজ। ঠিক তখনই দাবানলের মত আঘাত হানে প্যাথোজেন। অন্য দুই ক্রু ছিল ডিউটিতে: ওয়াচ।

'কী মনে হয়?' ডক্টর ফারার কাজ শেষে জানতে চাইল রানা।

'এমন হতে পারে আক্রমণ করা হয় গ্যাস দিয়ে। তবে ডেকে বহু মানুষ মরেছে, সেই কারণে মনে হয়, ওটা নতুন কোনও ধরনের হেমোরেজিক অসুখ। অবশ্য আগে কখনও এমন কিছুর কথা শুনিনি।'

'সুপার ইবোলা ভাইরাসের মত?' জানতে চাইল সোহেল।

'তার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এতো জনের মধ্যে একজনও বাঁচতে পারেনি। ইবোলার সবচেয়ে খারাপ প্রজাতি ছিল তিনটে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা খারাপ সেটার কারণে এক শ' জনের মধ্যে মারা পড়ত নব্বুই জন। এ লোকের রক্ত যেভাবে ছিটকে বেরিয়েছে এবং রক্ত কালো হয়নি, তা-তে মনে হয় তার স্টমাক এবং ইন্টেস্টাইনে পৌঁছেনি ভাইরাস। একই কথা খাটে ওই মহিলার বেলাতেও। তবে, এখানে অন্য বিষয় আসে...' অফিসারের বাহু তুলে ধরল ফারা। ওটা নরম রাবারের মত, যেন থলথলে মরা সাপ। 'হাড়ের ক্যালসিয়াম এমন ভাবে ক্ষয় হয়েছে, যেন হাড় নেই। মনে হয় আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ডেবে যাবে করোটি।' অফিসারের কপালে হাত রাখল ফারা।

'না দেখালেও চলবে,' বলল সোহেল।

'বলতে পারো, এসব কীসের আলামত?' জানতে চাইল রানা।

উঠে দাঁড়াল ফারা, ডিজ-ইনফেক্টিং তুলা দিয়ে পরিষ্কার করছে গ্লাভস্। 'ওটা যাই হোক, তৈরি করেছে মানুষ।'

'তুমি শিয়োর?'

'হ্যাঁ। শুধু এটুকু বলব, এ ভাইরাস বড় দ্রুত আক্রমণ করে। কিন্তু এমন কখনও করে না প্রকৃতি। এমন কী ইবোলাও কয়েক সপ্তাহ নেয় শিকারকে খুন করতে। ততদিনে তার পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সুযোগ পায় আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হবার। কিন্তু এ ভাইরাস কাউকে কোনও সুযোগ দেয়নি; কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুন করেছে হোস্টকে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে কারও শরীরে বেড়ে উঠে একজনের থেকে

আরেকজনের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ায়নি এ ভাইরাস, একসঙ্গে আক্রমণ করেছে সবাইকে।' শেষ কথা বলবার জন্য রানার চোখের উপর নিষ্পলক দৃষ্টি রাখল ফারা। 'কেউ একজন এ ভাইরাস তৈরি করেছে ল্যাবোরেটরিতে। ছেড়ে দিয়েছে এই জাহাজে।'

মুখের ভিতর তিক্ত অনুভূতি হলো রানার। মেনে নেয়া কঠিন: কারও ইচ্ছে হলো, ব্যস ছড়িয়ে দিল ভাইরাস! হয়তো দেখতে চেয়েছে কী ঘটে, কীভাবে ঘটে। ফলে মারা পড়েছে শত শত মানুষ। মনে মনে বলল রানা, যারা এ কাজ করেছে, তাদের ক্ষমা করা যায় না। ভয়ঙ্কর শাস্তি পাওয়া উচিত তাদের। এয়ারফোনে ভীষণ কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ, 'ফারা, যা খুঁজে বের করা দরকার, করো। এ কাজ যারা করেছে, এবার তাদের খুঁজে বের করব আমরা। নরপিশাচগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব ঠেকাতে হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফারা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে এল ব্রিজ থেকে। সামনে হলওয়ে। ফাঁকা। লাশ নেই। নীচ তলায় একের পর এক কেবিন। কয়েকটা দরজা খুলল রানা। কেউ নেই। ব্রিজে যে মেয়েকে দেখেছে, আনুষ্ঠানিক পোশাক ছিল তার পরনে। জাহাজে চলছিল বড়সড় কোনও পার্টি। ইউএভি ও কপ্টার থেকে তা-ই মনে হয়েছে।

অফিসারদের কেবিন ঘুরে দেখল রানা। ওখান থেকে বেরিয়ে সামনে পড়ল সাদা রঙের এক দরজা। ওপাশে জাহাজের হোটেল সেকশন। আধুনিক প্রমোদ-তরীর এ অংশে প্রচুর পিতল ব্যবহার হয়েছে, মেঝের উপর পুরু কার্পেট। লাল ও সবুজ রঙের ছড়াছড়ি।

চারপাশ থমথম করছে। নিজের শ্বাসের শব্দ পেল রানা। সামনে পড়ল ব্যালকনি। ওখান থেকে চাইলে চারতলা নীচে এইট্রিয়াম। মেঝে সাদা মার্বেল দিয়ে মোড়া। কোনও বাতি নেই, বিশাল ফয়ে যেন কোনও প্রকাণ্ড গুহা। জানালাগুলোকে ঢেকেছে বুটিক পর্দা। ওখানে আলো ফেলল রানা। কী যেন নড়ে উঠল!

ধক্ করে উঠেছে বুক, ধীরে শ্বাস নিল রানা। এইট্রিয়াম জুড়ে লাশ, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা পড়েছে মানুষগুলো। স্টেয়ারকেসে একটা মৃতদেহ। যেন অপেক্ষা করছিল মৃত্যুদূতের জন্য। লাশ এড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। চলে এল ফয়ে-তে। একদিকে সিক্স-পিস অর্কেস্ট্রা। টুক্সেডো পরা পাঁচ বাদ্যযন্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নিজ নিজ যন্ত্রের উপর। ষষ্ঠজন সরে যেতে চেয়েছিল। দশ ফুট এগুনোর সুযোগ দেয়নি ভাইরাস।

এই সব মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই রয়েছে সুখ-দুখের হাজারো কাহিনি। এক দম্পতি পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে মেঝেতে। ওখানেই মারা গেছে। এক ওয়েট্রেস বার থেকে বেরিয়ে আসে, মৃত্যুর আগে ট্রে ভরা ড্রিঙ্ক নামিয়ে রাখে সাইড টেবিলে। দশজন তরুণী বড় কাছাকাছি, বোধহয় ছবি তুলছিল। তবে আশপাশে দেখা গেল না ফটোগ্রাফারকে। দামি ক্যামেরা টুকরো টুকরো হয়েছে মেঝের উপর। একদিকে এলিভেটরের কাঁচের দরজা বন্ধ। তার উপর রক্তের লাল দাগ।

লাশের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা। এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে পিস্তল। হ্যাজম্যাট সুট ও রিসাইকেল করা বাতাস ওকে রক্ষা করবে। কিন্তু মনকে রক্ষা করবে কে? এ ধরনের গণহত্যা মানুষের সুকোমল বৃত্তি ধ্বংস করে। যেদিকে তাকাচ্ছে, চারপাশে শুধু লাশ আর জমাট রক্ত দেখছে রানা। খুন চেপে

যাচ্ছে মাথায়।

'সবার কাজ কেমন চলছে?' কমিউনিকেশন নেটে বলল রানা। নিজের উপর একটু বিরক্ত। রিপোর্ট নেয়ার জন্য নয়, ও যেন মানুষের কণ্ঠ শুনতে চেয়েছে—জীবিত কারও!

'ফারা আর আমি জাহাজের হাসপাতালের দিকে চলেছি,' বলল সোহেল। জাহাজের বিপুল পরিমাণ লোহা বাধা দিচ্ছে রেডিও ওয়েভকে। কথা শোনা গেল ভাঙা ভাঙা ভাবে।

'আমি চলেছি ইঞ্জিন রুমের দিকে,' বলল রানা। 'যদি আধঘণ্টার ভিতর যোগাযোগ না করি, ফু-চুং যেন আসে।'

'বেশ।'

'ফু-চুং?'

'ব্যাকআপ পাওয়ার দিয়ে চলছে কম্পিউটার, নড়ছে না,' বলল চৈনিক গুপ্তচর। 'যা খুঁজছি, পেতে সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে। ...মার্ভেল থেকে শুনতে পাও, আতাসি?'

'হ্যাঁ, বস্। স্ট্যাটিকের কারণে বোঝা কঠিন কোন্‌টা কার গলা।'

'স্কোপে নতুন কিছু?'

'না, বস্। আশপাশে শুধু আমরাই।'

'যদি কিছু ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'ঠিক আছে, বস্।'

রানার সামনে লেবেল দেয়া এক দরজা। লেখা: ক্রু ওনলি। দরজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে ইলেকট্রনিক তালা দিয়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ নেই, খুলে গেছে আপনাআপনি। ভিতর দিকে দরজা ঠেলল রানা, ঢুকে পড়ল করিডোরে। যাত্রীদের এলাকা ছিল বিলাসবহুল, কিন্তু এখানে কাঠের প্যানেলিং উধাও। ঝাড়বাতি বা নকশাদার ফিক্সচার নেই। দেয়াল সাদা, মেঝের উপর

প্লাস্টিকের টাইলস। ছাতে বাক্সের মত ফ্লুরেসেন্ট ফিক্সচার। দেয়ালের পাশে পাইপের রঙিন কণ্ডুইট। স্টুয়ার্ডদের কয়েকটা ছোট ঘর পেরুল রানা। সামনে পড়ল ক্রুদের বড়সড় ডাইনিং হল। এখানে রয়েছে ছ'জন ক্রু। টেবিলের উপর মাথা রেখেছে দু'জন, চারজন পড়েছে মেঝের উপর। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়েছে রক্ত। মরেছে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে।

একটা কিচেন পিছনে ফেলল রানা। ঘরটা ছিল কসাইখানার মত। এরপর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইজের লণ্ড্রি রুম। এখানে বিশটা ওয়াশিং মেশিন, একেকটা সিমেন্ট মিক্সারের মত প্রকাণ্ড। কাজ করছিল চিনা কর্মীরা।

হেঁটে চলেছে রানা, দুটো ঘর পেরুনোর পর সামনে পড়ল 'ইঞ্জিনিয়ারিং/নো আনঅথোরাইজড অ্যাডমিটেন্স' লেখা ভারী এক দরজা। ওটা পেরিয়ে সামনে ভেস্টিবিউল। শেষমাথায় দ্বিতীয় শক্ত নিরোধক হ্যাচ। ঝুঁকে ভিতরে ঢুকল রানা, তিন ধাপ নেমে গেল। এটা ইঞ্জিনরুমের অগ্‌জিলারি-রুম। আলো পড়ল একজোড়া জেনারেটরের উপর। পাশের র‍্যাকে কম্পিউটার কন্ট্রোলগুলো। ঘরের শেষে ইঞ্জিনরুমে ঢুকবার স্লাইডিং দরজা। ভিতরে প্রকাণ্ড দুটো ইঞ্জিন, একেকটা কমার্শিয়াল ট্রাকের সমান। একটার উপর হাত রাখল রানা। মৃত্যুর মত শীতল ইস্পাত। অন্তত সাত-আট ঘণ্টা পাওয়ার বন্ধ, নইলে উষ্ণ থাকত ঘর। ইঞ্জিনের উপর এক্সযস্ট পাইপগুলো মিশেছে প্লেনাম ও ফানেলে। সব শেষে যুক্ত হয়েছে বিশাল চিমনির সঙ্গে।

কোনও জাহাজের ইঞ্জিন-রুমে ঢুকলে মনে হয়, এখানে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও সহিষ্ণুতা। তবে রানার মনে হলো, গোল্ড অভ মার্স সত্যিই মৃত। মেরুদণ্ড বেয়ে নামল শিরশিরে অনুভূতি। সোহেলকে রেডিও করল, তারপর ফু-চুংকে। শেষে মার্ভেলে।

কারও সাড়া নেই। ফিরছে শুধু স্ট্যাটিকের আওয়াজ। হাঁটবার গতি বাড়ল, টর্চের আলো পড়ছে ইকুইপমেন্টের উপর। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। একটা ওয়াটারটাইট দরজা পেরুল। এখানে জাহাজের সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। এ ঘর পেরুনোর পর সামনে আরও দুটো জেনারেটর ও ডিস্যালিনেটর। শেষ মেশিনটি রিভার্স অসমোসিস, ওটাও আর সব মেশিনের মত স্তব্ধ। ওটার কাজ লবণাক্ত পানি শোধন করা, যেন এক বিন্দু লবণ না থাকে খাওয়ার পানিতে। গ্যালি, লণ্ড্রি ও প্রতিটি বাথরুমে পৌঁছে দিত পরিষ্কার পানি। ভাইরাস ছড়ালে জাহাজের প্রতিটি মানুষ আক্রান্ত হবে, এমন দুটো জায়গার কথা জানে রানা। তার একটা এই ডিস্যালিনেটর। দ্বিতীয়টা জাহাজের এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট। ঠিক করেছে, পরে ভাইরাসের চিহ্ন খুঁজবে সেটার ভিতর।

ডিস্যালিনেটরের পিছনে দশ মিনিট ব্যয় করল রানা। কাছের এক ওঅর্কবেঞ্চ থেকে নিয়ে এসেছে টুলস কিট, প্রতিটি বল্টু খুলে পরীক্ষা করল পোর্টগুলো। উঁকি দিল ভিতর অংশে। মনে হলো না মেশিন নিয়ে জোরাজুরি চলেছে। মেইনটেন্যান্সের জন্য সম্প্রতি খোলা হয়নি। বল্টুগুলো আড়ষ্ট, গ্রিজের সঙ্গে ধুলো। এমন কিছু নেই, যা দেখে মনে হতে পারে এ জিনিস থাকবার কথা নয়। সিদ্ধান্ত নিতে হলো: এ প্লান্টের ভিতর রাখা হয়নি ভাইরাস।

প্লান্টের ভিতর থেকে মাথা বের করল রানা, ঠিক তখনই শুনতে পেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। ইঞ্জিনরুমের সামনের দিক থেকে এসেছে। অথবা জাহাজের আরও অভ্যন্তরে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আওয়াজ, কিন্তু পরক্ষণে আবারও ঘটল বিস্ফোরণ। এবার দুলতে শুরু করল গোটা জাহাজ। ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল

রানা, যোগাযোগ করতে চাইল রেডিও নেটে। আবার ঘটল বিস্ফোরণ!

ডিস্যালিনেটর রেখে দৌড়াতে শুরু করল রানা, পৌঁছে গেল ঘরের মাঝ বরাবর। পিঠে গুঁতো দিয়েছে এক বাল্কহেড। তীব্র ব্যথায় ওখানে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। জাহাজের ভিতর আবারও বিস্ফোরিত হয়েছে বোমা। রানা টের পেল, ইঞ্জিন-রুমের ভিতর দিয়ে বইছে ওভার প্রেশার ওয়েভ, যেন পিষে দেবে ওকে। ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ছুটতে শুরু করেছে। দশ গজ দূরে ছিটকে পড়েছে ফ্ল্যাশলাইট, ওটা খামচি দিয়ে তুলে নিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করছে। চরকির মত ঘুরল, কী যেন নড়ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু নিখুঁত কাজ করছে জাহাজের ওয়াটার-টাইট দরজা। হ্যাচের পুরু ধাতব প্লেট নামছে!

আরেকটা আওয়াজ শুনে ঘুরল রানা। ফেটে যাওয়া ডেকের নীচ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সাদা পানির জলোচ্ছ্বাস।

এদিকে দরজা বন্ধ হয়ে আসছে! পানি উঠছে ইঞ্জিন রুমের বিলজ এলাকা থেকে!

চতুর্থ বিস্ফোরণ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গোল্ড অভ মার্সকে!

পানি নিরোধক দরজার দিকে ছুটছে রানা। ভাবছে, নিখুঁত পরিকল্পনা করেছে কেউ! যাত্রী বা ক্রুদের চিহ্ন রাখবে না! ওর মন বলছে, যারা এ কাজ করেছে, ভবিষ্যতে তারা আরও অনেক গণহত্যা করবে পৃথিবী জুড়ে!

বিলজ থেকে হুড়মুড় করে আসছে পানি। এরইমধ্যে গোড়ালি ডুবে গেছে রানার। পাঁচ ফুট বাকি থাকতে প্রথম দরজা পেরুল ও। হ্যাজম্যাট সুটের কারণে দৌড়ানো কঠিন। পরবর্তী ঘরে ঢুকে পড়ল, একবারও চাইল না সিউয়েজ প্লান্টের দিকে।

পানি ছলকে দিয়ে ছুটছে। শ্বাস ফেলছে ফোঁস-ফোঁস, কানের ভিতর বদ্ধ অনুভূতি। এখনও ঠিকঠাক কাজ করছে সুটের ফিল্টার।

পরের দরজা অনেক নেমে এসেছে। পুরো আটকে যেতে দুই ফুট বাকি! উড়ে চলেছে রানা, শেষ পাঁচ ফুট ভেসে গেল ডাইভ দিয়ে। ফেসপ্লেটে লাগছে সাগরের স্রোত। হেলমেটের উপর দিক লাগল দরজার নীচের অংশে। আছড়ে-পাছড়ে ঢুকল রানা। খেয়াল করেছে, ছেঁড়েনি সুট। ইস্পাতের দরজা নামছে! বিড়ালের মত গুড়ি মেরে এগুতে চাইছে রানা। পেরিয়ে গেল বুক, কোমর, এবার হাঁটু! যেন জুয়া খেলছে, ক্রল করে এগুতে চাইছে। আর মাত্র এক ফুট!

কিন্তু দু'সেকেণ্ড পরই ধাতব আওয়াজ উঠল! ধুপ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা! এ ইস্পাতের প্লেটের ওজন কম করে হলেও এক টন!

ব্যথা কই? বুঝতে চাইল রানা। নেই তো! বাম হাতে ভর দিয়ে পায়ের দিকে চাইল। দরজা নেমে এসেছে ওর ডান বুটের হিলের উপর! পা টেনে ছাড়াতে চাইল। সম্ভব হলো না। বুট খুলবে সে-উপায়ও নেই। জিনিসটা সুটের সঙ্গে সেলাই করা।

ডেকে চওড়া ফাটল, হুড়-হুড় করে উঠছে পানি! আটকা পড়েছে ও পরিত্যক্ত ইঞ্জিনরুমে! কমিউনিকেশন নেটে সোহেল-গগল-ফু-চুঙের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। জবাব নেই। কানে আসছে শুধু স্ট্যাটিকের খড় খড় আওয়াজ!

নয়

আতাসি হায়-হায় করে উঠতেই মাথা দোলাল গগল। সবাই শুনতে পেয়েছে গোল্ড অভ মার্স জাহাজের ভিতর থেকে আসা বিস্ফোরণের আওয়াজ। মনিটরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। প্রমোদ-তরীর খোলের ভিতর একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে। ছিটকে সরে আসছে পানির সাদা ফেনা। দেখে মনে হয় জাহাজে ঢুকছে টর্পেডো। কিন্তু তা অসম্ভব। রেইডার স্কোপ পরিষ্কার, আশপাশে কোনও জাহাজ নেই। টর্পেডো থাকলে সেটাও জানিয়ে দিত সোনার ডিসপ্লে।

ধোঁয়া সরে যেতেই ওদিকে লো-লাইট ক্যামেরা তাক করল গগল। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দেখিয়ে চলেছে। জাহাজের খোলে যে গর্ত তৈরি হয়েছে, তা দিয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারবে একজন মানুষ। হুড়োহুড়ি করে ঢুকছে সাগরের পানি। গোল্ড অভ মার্সের ওয়াটার লাইনে তৈরি হয়েছে চারটে গহ্বর। ওখানে পানির নীচে ডুবছে কমপার্টমেণ্টগুলো। জাহাজ রক্ষা করবার উপায় নেই। হয়তো জাহাজ ভাসত, যদি চালু থাকত বিলজ পাম্পগুলো। গগল, অনিল ও উর্বশী জানে, এক ঘণ্টা পেরুনোর আগেই চোখের সামনে তলিয়ে যাবে জাহাজটা।

কমিউনিকেশন কন্সোলে টোকা দিল গগল। 'সিরাজ, আপনি এখুনি হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হোন। নিশ্চয়ই শুনেছেন, এইমাত্র

বোমা ফেটেছে গোল্ড অভ মার্সে। সবাইকে সরিয়ে আনতে হবে ওখান থেকে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলেন সিরাজ। 'সেক্ষেত্রে আমি ওই জাহাজে নামছি?'

'নেগেটিভ। সেটা চাইছি না। ওখানে ভেসে থাকুন। পরবর্তী নির্দেশ জানিয়ে দেব।' চ্যানেল বদলে নিল গগল। 'মার্ভেল থেকে রানা। তোমাদের অবস্থান জানাও।' অপারেশন্স সেন্টার ভরে উঠল স্ট্যাটিকের আওয়াজে। ট্র্যান্সিভার ফাইন-টিউন করল আতাসি। খুঁজছে রানার সিগনাল। এক মিনিট পর হতাশ চোখে চাইল সবার দিকে। আবারও জানতে চাইল গগল, 'ডক্টর ফারা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ফু-চুং? সোহেল?'

'আমি এখানে,' লাউডস্পিকারের আওয়াজে ভরে উঠল ঘর। এ কণ্ঠ লিউ ফু-চুঙের। এখন ও গোল্ড অভ মার্সের হুইলহাউসে, ফলে পাওয়া গেছে ভাল রিসেপশন। 'এইমাত্র কী ঘটল, গগল? মনে হলো বিস্ফোরণ?'

'তা-ই,' বলল গগল। 'কেউ একজন আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ডুবে যাচ্ছে জাহাজ।'

'আমি মাত্র ডাউনলোড শুরু করেছি।'

'যা পেয়েছেন তা নিয়ে তৈরি থাকুন। কপ্টার নিয়ে রওনা হচ্ছেন সিরাজ। আপনাদের সরে আসতে হবে।'

'রানা-সোহেল-ফারা, ওদের কী হবে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'ওদের সঙ্গে রেডিওর মাধ্যমে কথা বলতে পারছেন?'

'না। বিশ মিনিট আগে নীরব হয়েছে রানার রেডিও। শেষবার বলেছে, ইঞ্জিন রুমের দিকে চলেছে।'

বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল গগল। যে-কোনও

জাহাজের ইঞ্জিন-রুমে বিস্ফোরণ মানে ভয়ঙ্কর বিপদ। 'সোহেল আর ফারা? ওদের কী অবস্থা?'

'পনেরো মিনিট আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে রেডিও যোগাযোগ।'

মনিটরের দিকে চাইল গগল। দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে গোল্ড অভ মার্স। নীচের পোর্টহোলগুলো সাগর সমতল থেকে মাত্র তিনফুট উপরে। স্টারবোর্ডে কাত হয়ে যাচ্ছে জাহাজ। এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল গগল। এখন যদি ফু-চুংকে বলে, খুঁজে বের করো রানা, সোহেল ও ফারাকে? সম্ভাবনা খুবই বেশি জাহাজের ভিতর আটকা পড়বে সে-ও। এখন পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় রেখে ডুবছে জাহাজ, কিন্তু যে-কোনও সময়ে কাত হয়ে তলিয়ে যেতে পারে। একবার অনিলের দিকে চাইল গগল। পরক্ষণে উর্বশীর দিকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল—যারা জাহাজের ভিতর, তাদের বেরিয়ে আসতে হবে নিজেদের বুদ্ধিতে।

'ফু-চুং, যত দ্রুত সম্ভব কপ্টারে উঠে পড়ুন। ওখান থেকে নজর রাখুন। কেউ আপার ডেকে উঠে এলে, পৌঁছে দেবেন মার্ভেলে।'

'ঠিক আছে, তবে পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার।'

'আমি জানি, বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা,' নিচু স্বরে বলল অনিল।

আস্তে করে মাথা দোলাল উর্বশী।

এক পলক জাহাজের স্কিম্যাটিক দেখল সোহেল, তারপর ফারাকে সঙ্গে নিয়ে চলল হাসপাতাল লক্ষ্য করে। জাহাজের খুদে হাসপাতাল প্রধান ডেক থেকে নীচে, সি-সি লেভেলে। যাওয়ার পথে সোহেলের সাহায্য নিল ফারা, ভিক্টিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করল রক্ত ও টিশ্যুর স্যাম্পল।

'তুমি ডাক্তার বা নার্স নও, তবে ভাল এইড,' প্রথম লাশের পাশে বসবার সময় বলেছে ফারা।

'আমাকে আফগানিস্তানে প্রচুর অভিজ্ঞতা দিয়েছে আমেরিকান সেনাবাহিনী,' স্বাভাবিক স্বরে বলল সোহেল। 'এরপর কিছুতেই খুব একটা চমকে উঠি না।'

'জানি, প্রায় মেরেই ফেলেছিল,' কাজের ফাঁকে বলেছে ফারা।

ওরা দু'জন বুঝে গেছে করিডোর ধরে এগুলে সামনে পড়বে একের পর এক লাশ। ভাইরাস সংক্রমণ হতেই সবাই ছুটে আসতে শুরু করে হাসপাতালের দিকে। একটা লাশের কাছ থেকে স্যাম্পল ও রক্ত নিল ফারা। ভাবছে, একটু আগে যে লাশ দেখেছে, সেগুলোর থেকে পরে মারা গেছে এগুলো। অন্তত কয়েক মিনিট বাড়তি সময় পেয়েছে ভাইরাসের কাছ থেকে। কিন্তু কেন? এটা হয়তো জরুরি কোনও তথ্য। হয়তো এ থেকে বেরিয়ে আসবে কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় প্যাথোজেন।

তবে আশা ছেড়ে দিয়েছে ফারা, ওর মন বলছে, কেউ বেঁচে নেই জাহাজে।

ওরা হাসপাতালের কাছে পৌঁছে দেখল দরজা খোলা। চৌকাঠের উপর পড়ে রয়েছে টুক্সেডো পরা এক লাশ। ওটাকে টপকে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনে জানালাহীন অ্যান্টিচেম্বার। টর্চের আলোয় চোখে পড়ল দুটো ডেস্ক ও স্টোরেজ কেবিনেট। দেয়ালে ঝুলছে ট্র্যাভেল পোস্টার। একটা পোস্টারে লেখা: *প্রতিটি মানুষের উচিত নিয়মিত হাত ধোয়া।* প্রতিটি পদক্ষেপ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা প্লাকে ডক্টর ম্যাক্স কেইনের মেডিকেল ডিগ্রি। ইউনিভার্সিটি অভ লিডস থেকে পাওয়া।

পাশেই পরীক্ষা ঘর, ওখানে কেউ নেই। অফিসের আরেক

প্রান্তে একটা দরজা। ওদিকে রয়েছে রোগীদের ঘর। ঘর বলা উচিত নয়, ওগুলো পর্দা দিয়ে ঘেরা খুপরি। প্রতিটির ভিতর একটা করে বিছানা ও নাইটস্ট্যাণ্ড। সামনে মেঝের উপর আরও দুটো লাশ। কালো পোশাক পরা এক কমবয়সী মেয়ে। অন্য লোকটি মাঝবয়সী, পরনে বাথরোব। আর সবার মতই, রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে মেঝে।

'তোমার কি মনে হয় উনি ডাক্তার ছিলেন?' বলল সোহেল।

'তা-ই মনে হয়। উনি বোধহয় শুয়ে ছিলেন, ভাইরাসের আক্রমণ হতেই ছুটে আসেন এখানে।'

'কিন্তু কিছু করার ছিল না তাঁর।'

'ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কেই বা কী করবে,' গ্রীবা বাঁকাল ফারা। 'ওই আওয়াজটা শুনেছ?'

'এ সুট পরলে নিজের শ্বাস ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।'

'মনে হলো ধুপ করে পড়ল কিছু,' সামনের কিউবিকলের পর্দা সরাল ফারা। ফাঁকা বিছানা, চাদর মসৃণ।

পরের কিউবিকলে চলে এল ফারা। এটার বিছানার পাশে ব্যাটারিচালিত অক্সিজেন মেশিন। শ্বাসের সমস্যা রয়েছে এমন রোগী এ জিনিস ব্যবহার করে। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টিউব চলে গেছে চাদরের নীচে। বিছানার উপর আলো ফেলল ফারা। কেউ একজন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। নড়ছে না।

দ্রুত পায়ে বিছানার পাশে চলে গেল ফারা। 'আমরা বোধহয় কাউকে জীবিত পেলাম!'

কম্বল গুটিয়ে সরিয়ে দিল ও। কমবয়সী এক মেয়ে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে। এয়ার টিউব চলে গেছে নাকের ভিতর। বালিশের উপর ছড়িয়ে রয়েছে কালো চুলগুলো। বড় ফ্যাকাসে লাগছে

মেয়েটার মুখ। হালকা শরীর, দেহে বাড়তি মেদ নেই। টি-শার্টের তলা দিয়ে চোখে পড়ল কাঁধের হাড়। মেয়েটি ঘুমিয়ে, তবে আন্দাজ করল ফারা, এর উপর দিয়ে মারাত্মক মানসিক অত্যাচার গেছে।

হঠাৎ চোখ মেলল মেয়েটি, পিটপিট করে চাইল। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল ভীষণ ভয়ে। দুটো আকৃতি দেখছে সে, এরা বোধহয় ভিনগ্রহের কিছু! বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আছে ওর দিকে!

'ভয় নেই,' বলল ফারা। 'আমি একজন ডাক্তার। তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

অস্পষ্ট স্বর শান্ত করল না তাকে। নীল দুই চোখে তীব্র ভয়। উঠে বসে পিছিয়ে যেতে চাইল। দু'হাতে জাপ্টে ধরেছে কম্বল। নিজেকে ঢেকে ফেলবে।

'আমার নাম ফারা রাইনার। ইনি সোহেল আহমেদ। আমরা তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। ...তোমার নাম কী?'

'ক্ব-কে আপনারা?'

'আমি এসেছি আরেকটা জাহাজ থেকে। ডাক্তার। বলতে পারো এখানে কী ঘটেছে?'

'গতকাল রাতে, এখানে একটা পার্টি ছিল।'

মেয়েটা আর কিছু বলছে না। নিশ্চয়ই শকের ভিতর, ভাবল ফারা। সোহেলের দিকে চাইল। 'একটা হ্যাজম্যাট সুট খোলো। আগেই থামাতে চাই না অক্সিজেনের সাপ্লিমেন্ট। সুটের ভিতর না যাওয়া পর্যন্ত যে-কোনও কিছু ঘটতে পারে।'

হ্যাজম্যাট সুট খুলছে সোহেল, ছিঁড়ে ফেলল প্লাস্টিকের মোড়ক।

'আমার মনে হয় বেঁচে গেছে শুধু ওই অক্সিজেনের কারণে,' বলল ফারা। 'ভাইরাসটা ছিল বাতাসে। ও সাধারণ বাতাস নেয়নি, পেয়েছে হাসপাতালের ওএইচ সিস্টেমের অক্সিজেন। ট্যাঙ্ক যখন শেষ হয়েছে, বাতাস ব্যবহার করেছে পোর্টেবল ইউনিট থেকে।' তরুণীর দিকে চাইল ফারা। বড়জোর ওর বয়স বিশ বছর। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে আসে, অথবা ক্রুদের কেউ হতে পারে। 'আমাকে বলবে তোমার নাম?'

'হেলেন। হেলেন জিল। বন্ধুরা ডাকত হেলেনা।'

'আমি কি তোমাকে হেলেনা বলতে পারি?' মেয়েটির পাশে বসল ফারা, ফ্ল্যাশলাইট তাক করেছে নিজ সুটের ফেসপ্লেটের উপর। এবার ভয় কমবে হেলেন জিলের। 'দেখলে তো আমি একটা মেয়ে? গুড। আমার নাম ফারা।'

'কোন দেশের মানুষ তুমি?'

'হল্যাণ্ডের।' আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল ফারা। ঘর ভরে উঠেছে ভারী কাঁসার ধাতব শব্দে। 'ওটা কী, সোহেল?'

ওটা যে বিস্ফোরণের আওয়াজ, বলবার সুযোগ পেল না সোহেল। তার আগেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটল। জাহাজের ভিতর ঘুরছে আওয়াজ। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল হেলেন, কম্বল দিয়ে ঝট্ করে ঢেকে ফেলেছে মাথা।

'আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল সোহেল। 'জলদি!'

আরও দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। থরথর করে কাঁপতে লাগল জাহাজ। দ্বিতীয়টা ডেটোনেট হয়েছে ওয়ার্ড থেকে খানিক দূরে। পিছলে ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল সোহেল। হেলেনকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ফারা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছে মেয়েটি। ছাত থেকে ফিক্সচার সহ খসে পড়ল ফ্লুরেসেন্ট বালব, ঝনঝন করে ভাঙল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল 'ফারা, তুমি ওর সঙ্গে থাকো।' এক ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও।

'হেলেনা, কিছু হয়নি,' বলল ফারা। 'তোমাকে বের করে নিয়ে যাব আমরা।'

মুখের উপর থেকে কম্বল সরাল হেলেন, দু'গাল বেয়ে নামছে অশ্রু। থরথর করে কাঁপছে নীচের ঠোঁট। 'জাহাজে কু-কী হয়েছে?'

'আমার বন্ধু দেখতে গেছে। এবার এটা পরে নাও।' হ্যাজম্যাট সুট বাড়িয়ে দিল ফারা। 'আমরা খুব সাবধানে সুট পরব, ঠিক আছে?'

'আমি কি অসুস্থ?'

'মনে হয় না,' বলল ফারা। কিছু টেস্ট না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কী হয়েছে, তবে সেটা বলল না ও।

'আমার হাঁপানি আছে,' বলল হেলেন। 'সেজন্য হাসপাতালে ছিলাম। এমন বাজে অ্যাটাক শুরু হলো, ডাক্তার সামলে রাখতে পারলেন না।'

'এখন অ্যাটাক কেটে গেছে?'

'তাই তো মনে হয়। অনেকক্ষণ হলো ইনহেলার নিইনি...' মিলিয়ে গেল হেলেনের কণ্ঠ।

'তবে অক্সিজেন নিয়েছ, তা-ই না?'

'হ্যাঁ। তখন দেখলাম ডক্টর পাসম্যানের কী হলো। তারপর আমার বান্ধবীর। আমার মনে হয় বাতাসে কিছু ছিল। তাই অক্সিজেন বন্ধ করিনি।'

'সাহসী মেয়ে। তুমি বুদ্ধিমতী। নিজের জীবন রক্ষা করেছ।'

নিজের বিরাট কোনও উপকার করেছে ভেবে খানিক সাহস

ফিরল হেলেনের। মনে ভরসা এল, এ অভিশপ্ত জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে পারবে।

দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল সোহেল। 'বোমা বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে হলওয়ে। বিশ গজ গেলেই আর এগুনো যায় না। যে-পথে এসেছি, সে-পথে যাওয়া চলবে না।'

'অন্য কোনও পথ?'

'আশা করি থাকবে। একটু আগে বুঝলাম জাহাজের নীচের অংশ তলিয়ে যাচ্ছে।'

রানার বুটের হিলকে চেপ্টে দিয়েছে ইস্পাতের দরজা। সামান্য ফাঁক দিয়ে ঢুকছে পানি। এতে ডুববে না ইঞ্জিন-রুম। অন্তত ডুববার কথা নয়। কিন্তু ঘরের ডেক ফেটে যাওয়ায় গেইযারের মত উঠছে পানির স্তম্ভ। দেখতে না দেখতে ঘরে খেলতে লাগল স্রোত। ঠিক ভাবে অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছে হ্যাজম্যাট সুট, নইলে ডুবেই মরতে হতো। দশ সেকেণ্ড হলো হাঁটু গেড়ে বসেছে। ডান বুট ছাড়িয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ভাবছে, শেষকালে হয়তো বুট কেটেই নিজেকে মুক্ত করতে হতে পারে! তা হলে কি আক্রান্ত হবে ও মরণ ভাইরাসে? ঘরে এখন হাঁটু পানি। প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে পানির গভীরতা।

হ্যাঁচকা টানে দরজার তলা থেকে বুট খুলে নিতে চাইছে রানা। তারই ফাঁকে ভাবল, ভাগ্যিস জাহাজের এত গভীরে আসেনি সোহেল, ফারা বা ফু-চুং। সহজে বেরুতে পারবে ওরা।

ইঞ্জিন-রুমে ঢুকে কোনও ভাইরাসের চিহ্ন দেখেনি রানা। বুঝবার উপায় ছিল না এখানে কিছু ঘটেছে। যখন ইঞ্জিন চালু ছিল, ওটা চলেছে অটোমেটেড মোডে। ব্রিজে দরকার পড়েছে মাত্র দু'জন লোককে। পাওয়ার প্লান্টগুলো মনিটর করেনি কেউ।

এখানে কেউ মারাও পড়েনি। সেক্ষেত্রে এ ঘরের বাতাসে কতক্ষণ থাকবে প্যাথোজেন? হয়তো নতুন ওই ভাইরাসের ব্যাপারে বলতে পারত ফারা।

রানার কাঁধ ডুবিয়ে দিল পানি। বসে আছে, ডানহাতে ঝটকা দিয়ে ছাড়াতে চাইছে বুট। হচ্ছে না। এভাবে বেকায়দায় বসে জোর পাওয়াও কঠিন। টানাটানির ফাঁকে ভাবছে, অনেক আগে থেমেছে এয়ার কণ্ডিশনার। মেঝের উপর নেমে এসেছে ধূলিকণা এবং মাইক্রোবগুলো। যথেষ্ট সময় কি কেটেছে? বোধহয়!

আবার ভাবল, ভাইরাসকে অত ভয় পাওয়ার কী আছে জুতো না কেটে উপায় নেই, হ্যাজম্যাট সুট চিরকাল তো আর অক্সিজেন সাপ্লাই দেবে না। কাজেই বুটটা কেটে ফেলে বাঁচার চেষ্টা করে দেখাই উচিত। ভাইরাস যদি ঢোকে ঢুকবে! আর কতক্ষণ, একটু পরেই হাল ছেড়ে দিতে হবে।

শেষ বারের মত নতুন উদ্যমে বুট ছাড়িয়ে নিতে চাইল রানা। ডান কবজি থেকে যেন খসে পড়বে গ্লাভস্। প্রচণ্ড টান খেয়ে ছিঁড়ছে বুটের হিল। এবার ডুবে গেল ওর মাথা। এক সেকেণ্ড থামল রানা, তারপর ডান কাঁধের উপর নিয়ে গেল বামহাত। ডায়াল পেয়েই ঘুরিয়ে দিল। সুটের ভিতর বাড়ছে এয়ারফ্লো। বাতাসের চাপে বেলুন হয়ে উঠতে চাইল সুট। ফুলে উঠছে সেলাইয়ের জায়গা। কোমরের থলের ভিতর লাইটার, কম্পাস ও ফোল্ডিং ছুরি। শেষেরটা বের করে নিল রানা, খুলে ফেলল ফলা। উল্টো হয়ে বসবার উপায় নেই। ডানহাতে ছুরি নিল, কাটতে চাইল হিল ও সোলের মাঝখানের অংশ। সোল থেকে সরিয়ে রাখতে চাইল পা। বুটের উপর দ্রুত চলছে হাত। আগে কেটে ফেলতে হবে বুট।

ছুরির পোচ পড়ছে সোল ও হিলের মাঝে। পায়ে তীক্ষ্ণ ব্যথা

লাগতেই ভুরু কুঁচকে উঠল। ইস্পাতের ফলা খোঁচা দিয়েছে পায়ে। কাজের ফাঁকে চারপাশ দেখতে চাইল রানা। পানির নীচে সব নীল। একটু দূরে জ্বলছিল ফ্ল্যাশলাইট। ওটা হঠাৎ নিভে গেল। চারপাশ গাঢ় অন্ধকার! শান্ত ভঙ্গিতে ছুরি চালিয়ে চলেছে রানা। ভীষণ শক্ত প্লাস্টিকের বুট। এই একই জিনিস দিয়ে তৈরি সুট। জুতো ছাড়ছে না হিলটা। ইতিমধ্যে দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে। একটানা পরিশ্রম করে চলেছে। ভাবছে, দম আটকে মরতে হবে নাকি শেষে? মাথার ভিতর ঝনঝন বাজছে বেসুরো বাদ্যযন্ত্র। বাম পায়ের জোরে উঠতে চাইল রানা। পারল, তবে এক পায়ে নাচতে হলো বেতালা ছন্দে, দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। কাঁধ দিয়ে হেলান দিল দরজার উপর। সুটের ভিতর বাতাসের জোর প্রেশার।

পানির নীচে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা, ডানহাতের জোরে টান দিল বুটজুতো। খানিকটা যেন ছিঁড়েও গেল হিল। তবে জুতো খসে আসেনি। নিজেকে শান্ত করতে চাইল রানা। বুটের পাশে কী যেন! ও, ছুরি। আবার হাতে নিল ওটা রানা। খুব ধীরে কাটছে ছুরি। ওটা ফেলে আবার গায়ের জোরে বুট ধরে টান দিল রানা।

দরজার নীচে ছিঁড়ে রয়ে গেল হিল। হুমড়ি খেয়ে পাশে পড়ল রানা। পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইঞ্জিন-রুমে জমেছে বুক-পানি। ভাইরাসের কথা মনে রেখেছে রানা। ফুসফুসে সামান্য বাতাস টেনে নিল। ওটুকু চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল ঝাপসা আকৃতিগুলোকে। ফাটা মেঝের নীচ থেকে উঠছে পানি। ঢেউ ও স্রোত দুলিয়ে দিতে চাইছে দেহ।

ঘরের ভিতর ঘুটঘুটে আঁধার। একটু এগুতেই হোঁচট খেল। পাশেই ওঅর্কবেঞ্চ। ওটা পেরিয়ে একটা উঁচু কেবিনেট। ওখানে

হেলান দিল রানা, বাঁধতে শুরু করল ছেঁড়া সুট। বুটের ভিতর রাখল না ডান পা, ভরে ফেলেছে প্যান্টে। কষে গিঁঠ দিল গোড়ালির একটু আগে। তার নীচে ঝুলছে ছেঁড়া বুট। ডায়াল করে কমিয়ে আনল এয়ারফ্লো। গিঁঠ দেয়ায় বাতাস বেরুনো বন্ধ হয়েছে, ফুলে উঠল সুট। রানার ধারণা, হিল ও সোলহীন বুটের ভিতর থেকে বেরিয়েছে সামান্য বাতাস। তখন এক্সপোজ্‌ড ছিল ও। তবে সুটের ভিতর রয়েছে পজিটিভ প্রেশার। ঢুকবার কথা নয় ভাইরাস।

পরক্ষণে রানার মনে পড়ল, ও রয়েছে ডুবন্ত জাহাজে। বদ্ধ ইঞ্জিন-রুমে। এখান থেকে বেরুনোর পথ? দলের সঙ্গে কথা বলবে, বা মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ? অসম্ভব!

খোঁড়া মানুষের মত বেকায়দা ভঙ্গিতে হাঁটতে হবে, ক'পা এগিয়ে বুঝল কাজটা প্রায় অসম্ভব। অন্ধের মত দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে দু'দিক। মনে করতে চাইল ঘরের কোথায় কী আছে। খুব ধীরে চলেছে। আরেকটা কেবিনেট পেল। ওখানে থামল। একে একে ড্রয়ার খুলছে। টুলসগুলো কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে চাইছে। দু'মিনিট পর বুঝল, যা চেয়েছে তা পেয়েছে।

রানা যেটা হারিয়েছে সে তুলনায় অনেক কম উজ্জ্বল এই ফ্ল্যাশলাইট, তবে কাজ চলবে। বুক পানির ভিতর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল। পেরিয়ে গেল দুই প্রকাণ্ড ইঞ্জিন। থামল গিয়ে ওয়াটারটাইট দরজার সামনে। পুরোপুরি বন্ধ। ওখানে ডুব দিল, দু'পাশে খুঁজতে চাইল ম্যানুয়াল রিলিজ। লিভার পেলেই খুলবে দরজা। কিন্তু তেমন কোনও মেকানিজম নেই!

মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে শিরশিরে অনুভূতি, রানা টের পেল মনের ভিতর গেড়ে বসতে চাইছে আতঙ্ক। মন বলছে, তুই কি জানিস কী ক্ষতি হয়েছে জাহাজের? একটু পর তলিয়ে যাবে!

রানা বাড়তে দিল না চিন্তাটাকে, চোখ রাঙাল নিজেকে। যুক্তি বলছে, স্থির ভাবে ভাসছে জাহাজ। তলিয়ে যেতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা। তবে স্বস্তি পাওয়ার কারণ নেই। হয়তো পনেরো মিনিট পেরুনোর আগেই তলিয়ে যাবে ইঞ্জিন-রুম। তার আগে বেরুতে হবে।

কথাটা মাত্র ভেবেছে রানা, শুনতে পেল নিচু আওয়াজ। গোঙাচ্ছে জাহাজ। খোলের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে কাতর ধ্বনি। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে জোড়াগুলোর উপর। একটু টলে উঠল রানা। বো'র দিকে হোঁচট খেল গোল্ড অভ মার্স। ইঞ্জিন-রুমের পিছন থেকে এল প্রকাণ্ড ঢেউ। ওটার চাপে আছড়ে পড়তে হবে বাল্কহেডে, দ্রুত পাশের টেবিলে উঠে পড়ল রানা। হাঁটু ধরে টান দিল ঢেউ। তবে সামলে নিতে পারল। অস্থির হয়ে উঠছে পানি। ইঞ্জিন-রুমের ডানদিকে আলো ফেলল। আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ভরে উঠছে ঘর। আরও বিস্তৃত হয়েছে ফাটলগুলো। যেন নতুন শিকারকে গ্রাস করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সাগর!

চারপাশে আলো ফেলল রানা, খুঁজতে চাইছে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। তেমন কিছু নেই। দু'দিকের দরজা বন্ধ। হঠাৎ একটা চিন্তা ভর করল মাথায়। আলো ফেলল বিশাল ইঞ্জিনগুলোর উপর। ওখান থেকে উঠেছে ডাক্ট। ওটার ভিতর আলো ফেলল। এক সেকেণ্ড পর বলে উঠল রানা, 'তা-ই তো!'

হেলেনের দিকে ফিরল ফারা, চেষ্টা করে শান্ত রাখল কণ্ঠ, 'হেলেনা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমরা তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে প্রোটেকটিভ সুট পরতে হবে। ঠিক যেমনটা পরেছি আমরা।'

'জাহাজ কি ডুবছে?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল হেলেন।

'হ্যাঁ, হেলেনা। আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।' সুটের ব্যাটারিচালিত ফ্যান ও স্ক্র্যাবারগুলো চালু করল ফারা। টেনে খুলে ফেলল সুটের পিঠের চেইন। হেলেনকে বলেনি এ সুট ওর নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং মার্ভেলের ক্রুদের নিরাপদ রাখতে। হতে পারে হেলেন ভাইরাসে আক্রান্ত। ওর নাকের টিউব ছাড়িয়ে দিল না ফারা, হাতের ইশারা করল। হ্যাজম্যাট সুটের ভিতর পা ভরল হেলেন। এরপর পুরো দেহ। হেলেনের দীর্ঘ চুল হেলমেটের ভিতর ভরল ফারা, নির্দেশ দিল, 'এবার নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নাও, যতক্ষণ পারো আটকে রাখো।'

ফুসফুস ভরে দম নিল হেলেন, ফুলে উঠল বুক। ওর কানের পিছন থেকে ক্যানিউলার ক্লিপ সরিয়ে নিল ফারা, নাক থেকে খুলল টিউব। এবার সুটের উপরের অংশ দুটো ধরল, ব্যস্ত হাতে চেইন টেনে দিল। এক মিনিট লাগল ডাক্ট টেপ দিয়ে জোড়া জায়গা আটকে দিতে।

মনে মনে সোহেলের প্রশংসা করছে ফারা। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুব জরুরি, কিন্তু একটু অধৈর্য হয়নি মানুষটা। কী করে যেন বুঝেছে ভীষণ ভয়ের ভিতর দিয়ে চলেছে হেলেন জিল। এখন ওকে বাচ্চাদের মত আদর দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ফারা। সত্যি কম সয়নি হেলেন, লাশ ভরা জাহাজে কাটিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! এক মুহূর্তের জন্য অন্য একটা চিন্তা এল। সত্যি, বাবা হিসাবে খুব ভাল হবে সোহেল! পরমুহূর্তে লজ্জা পেল ফারা।

বাইরে থেকে আসবার আগে চাদর দিয়ে লাশ তিনটে ঢেকে দিয়েছে সোহেল। কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চাদর মোড়া লাশের দিকে চাইল হেলেন। টের পেল ফারা, ওর হাতের ভিতর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়েটির হাত। পথ দেখিয়ে চলেছে

ফারা, অন্য হাতে স্যাম্পল কেস। মনে মনে বলল, সাহস আছে এ মেয়ের। চারপাশে এত রক্ত, জ্ঞান হারাত অনেকে!

চলে এল ওরা হলওয়েতে। 'ওদিকের পথ বন্ধ,' যেদিক থেকে এসেছে, সেদিক দেখিয়ে দিল সোহেল। 'হেলেন, মেইন ডেকে উঠতে চাই, এ হলওয়ে ছাড়া অন্য কোনও পথ?'

'আপনি বলেছেন এদিকের হলওয়ে বন্ধ,' সোহেলের ফেসপ্লেটের দিকে চাইল হেলেন। ঠিক করেছে, চাইবে না মেঝের রক্তের দিকে। 'কিন্তু এদিকে একটা লোহার দরজা আছে। ঠিক মনে নেই, কিন্তু ক্রুদের কাছে শুনেছি, নীচে কী যেন আছে। হয়তো ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়।'

'গুড,' বলল সোহেল। 'ওখানে বোধহয় অগজিলারি হ্যাচ।'

এদিকের হলওয়ের দেয়ালে আলো ফেলল ও। তিনজন হাঁটতে শুরু করল করিডোর ধরে। ঠিকই বলেছে হেলেন, তিরিশ ফুট যেতেই সামনে পড়ল ডিম্বাকৃতির ধাতব হ্যাচ। হুইল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল সোহেল, উঁকি দিল ভিতরে। ওদিকে রয়েছে পাইপের এক জটিল জঙ্গল। কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল সোহেল, তারপর পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে বলল, 'এটা সুইমিং পুলের পাম্প রুম। এখানে ফিলটার হতো পানি, ফিরত সুইমিং পুলে।'

হঠাৎ মড়মড় করে উঠল জাহাজের জোড়াগুলো। মনে হলো ফেটে পড়ছে খোল। বো'র দিকে ঝুঁকল জাহাজ। হেলেন পা পিছলে পড়ে যেত, চট্ করে ধরে ফেলল ফারা। একবার চাইল সোহেলের দিকে। বুঝতে পারছে, ওদের হাতে সময় নেই।

খোলা হ্যাচ গলে ঢুকে পড়ল সোহেল, উপরের ডেকে উঠবার পথ খুঁজতে হবে। ঘরে অন্য কোনও দরজা নেই। তবে মেঝের উপর আরেকটা হ্যাচ। দু'পাশে ধাতব রেইলিং। হাঁটু গেড়ে বসল সোহেল, সরিয়ে দিল লক। তুলতে চাইল হ্যাচ।

ক্যাঁচক্যাঁচ করছে কব্জাগুলো। হ্যাচ উঠতেই চোখে পড়ল সামনে লোহার মই, নেমে গেছে মিশমিশে আঁধারে। নামতে শুরু করল সোহেল। হ্যাজম্যাট সুটের কারণে গতি শ্লথ। মেঝের উপর পা রেখে বুঝল, এটা আরেকটা মেকানিক্যাল রুম। চার-দেয়ালে ইলেকট্রনিকসের কেবিনেট। জাহাজের সমস্ত বৈদ্যুতিক পাওয়ার যোগান যেত এখান থেকে। এ মুহূর্তে গুঞ্জন করছে না যন্ত্রপাতি। থমথম করছে ঘর। একদিকের দেয়ালে খোলা এক দরজা। ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় আঁধার এক হলওয়েতে।

'তোমরা নেমে এসো,' তাড়া দিল সোহেল। ফিরে এসে থামল মইয়ের সামনে। মেঝের উপর নামতে সাহায্য করবে ফারা ও হেলেনকে। এক মিনিট পর এল হেলেন। শীর্ণ হাত ধরে টের পেল সোহেল, কব্জি বড় চিকন।

হেলেনের পর এল ফারা। আলো ফেলে পথ দেখাল সোহেল। হেলেনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলতে পারো জাহাজের কোথায় আছি?'

'ঠিক জানি না,' আবছা আলোয় চারপাশে চাইল হেলেন। 'এ জাহাজে হোটেল স্টাফদের সব জায়গায় যাওয়ার নিয়ম নেই। ...তা ছাড়া, বেশি দিন হয়নি আমি চাকরি নিয়েছি।'

'কোনও অসুবিধে নেই,' বলল সোহেল। চাইছে না মেয়েটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ুক।

গোল্ড অভ মার্সের নাক ঝুঁকছে। ঠিক করেছে সোহেল, এগুবে স্টার্নের দিকে। হাঁটতে শুরু করে টের পেল, মৃদু টান পড়ছে উরুর পেশিতে। উপরের দিকে চলেছে। মনে মনে জানে, নতুন কম্পার্টমেন্ট তলিয়ে গেলে, খাড়া হয়ে উঠবে সামনের পথ।

সুটের কারণে টের পেল না, হঠাৎ সামনে থেকে ভেসে

এসেছে শীতল হাওয়া। ডেকের প্লেটগুলো থরথর করে কাঁপছে। পায়ের নীচে কাঁপুনি, কেন যেন ঘুরে চাইল সোহেল। ঠিক তখনই হলওয়ে থেকে ছিটকে বেরুল পানির সবুজ এক দেয়াল। মুহূর্তে ডুবে গেল ওর উরু। ফারা বা হেলেনকে সতর্ক করা হলো না। জোর ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সোহেল। পরক্ষণে গলা ডুবিয়ে দিল পানির দেয়াল। অসহায় ভাবে ভেসে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পর কমে এল ঢেউয়ের তাণ্ডব। টের পেল সোহেল, জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে ডেকের উপর।

আগে উঠল ও। হাত ধরে টেনে তুলল হেলেনকে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ফারা, তোমার কি অবস্থা?'

'একটু চমকে গেছি। আর কিছু না। কী ঘটল, সোহেল?'

'বো'র কাছে ধসে পড়েছে কোনও বাল্কহেড। হাতে এখনও খানিকটা সময় রয়েছে।'

সামনের হলওয়ের দিকে টর্চ তাক করল সোহেল। আবার এগুতে শুরু করল। মেঝের উপর গোড়ালি পানি। দু'পাশের দরজা পরীক্ষা করে চলেছে। একবারও ভুল করছে না স্টেনসিল পড়তে। আশা করছে, সামনে কোনও স্টেয়ারওয়েল পাবে। কিন্তু ওদের কপাল অত ভাল নয়। নীচের এ ঘরগুলো শুকনো মালামাল ও স্পেয়ার পার্টস দিয়ে ভরা। সিলিঙের সঙ্গে রয়েছে আই-বিম। ওটা দিয়ে উইঞ্চ চলত, ক্রুরা সরাত ভারী জিনিসপত্র। খানিক দূর যাওয়ার পর এলিভেটর। সোহেল ঠিক করল, সিঁড়ি যদি না পায়, ব্যবহার করবে ওই এলিভেটর শাফট। বেয়ে ওঠা ভীষণ কঠিন, কিন্তু পারবে। বোধহয় ফারাও। সমস্যা হবে হেলেনকে নিয়ে। ওর এত শক্তি নেই যে কায়িক পরিশ্রম

করবে। যদি এ ভারী সুট না থাকত, হেলেনকে পিঠে তুলে শাফট বেয়ে উঠতে চাইত সোহেল।

কী করবে ভাবতে গিয়ে একটা দরজা পাশ কাটাল ও, পরক্ষণে থমকে গেল। আলো ঘুরিয়ে স্টেনসিলে ফেলল। ওখানে লেখা: *ওয়াটারক্রাফট স্টোরেজ।*

'এই তো চাই!'

'ওখানে কী, মিস্টার আহমেদ?' জানতে চাইল হেলেন।

'আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার টিকেট,' বলল সোহেল, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরে।

টর্চের আলো পড়ল একসারি ক্রেডলের উপর। ওখানে চকচক করছে অনেকগুলো জেট স্কি ও রান্যাবাউট বোট। ছাতে বিশাল এক গোলাকার ফোকর, ওদিক দিয়ে তুলে নেয়া হয় বোট ও জেট স্কি। মেঝে থেকে পরের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁচেছে ঘোরানো সিঁড়ি। সোহেলকে অনুসরণ করল ফারা ও হেলেন, চলে এল উপর তলায়।

এ ঘর দোকানের মত, একদিকের দেয়ালে লম্বা কাউন্টার। বন্দরে জাহাজ দু'চারদিন থাকলে বোট বা জেট স্কি ভাড়া নেয় যাত্রীরা। চার দেয়ালে অসংখ্য পোস্টার, পানিতে না পড়বার জন্য সাবধান করা হয়েছে। মেঝের উপর ননস্কিড ইনডোর/আউটডোর কার্পেট। বাইরের দিকের বাল্কহেডে বিশাল এক দরজা, দেখলে মনে হয় গ্যারাজের। ওটার সঙ্গে রয়েছে হাইড্রোলিক্যালি নিয়ন্ত্রণ করা র‍্যাম্প। দরজা খুললে ওই র‍্যাম্প হয়ে ওঠে ছোটখাটো ডক।

ফ্ল্যাশলাইটের পিছন দিক দিয়ে দরজার উপর ঠুকল সোহেল। ভোঁতা আওয়াজ এল। দরজার উপরের অংশ থেকেও একই আওয়াজ। 'সাগরের নীচে তলিয়ে গেছে দরজা,' বলল

সোহেল। 'যদি খুলি, পানির নীচে চলে যাবে ঘর।'

'আমরা বেরুতে পারব, না...' কথা শেষ করল না হেলেন। হাঁপাতে শুরু করেছে।

'ভয়ের কিছু নেই,' মৃদু হাসল সোহেল। 'বাইরের এবং ভিতরের প্রেশার সমান হলেই পারব। আমাদের ভাসিয়ে রাখবে এই সুট।'

'আমি নীচের দরজা বন্ধ করে আসি,' বলল ফারা। জানে, কী করতে চাইছে সোহেল। জাহাজের এ অংশের দরজা বন্ধ না করলে আসতেই থাকবে পানি।

'যাও, জলদি এসো,' বলল সোহেল। দরজার কাছ থেকে সরিয়ে নিল হেলেনকে। বুঝিয়ে দিল, একটু পর জলোচ্ছ্বাসের মত আসবে পানি। তখন পিছনের রেলিং ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

ছোট একটা ইলেকট্রিক উইঞ্চ খোলে দরজা, কিন্তু পাশেই মেকানিক্যাল হাতল। বিদ্যুৎ না থাকলে ওটা দিয়ে খোলা যায় দরজা।

পাঁচ মিনিট পর ফিরল ফারা, হেলেনের পাশে রেলিঙ ধরে অপেক্ষা করছে। এবার হাতলের উপর একহাতে চাপ দিল সোহেল। প্রথমে নড়তে চাইল না ওটা, তারপর সিন্থেটিক হাতটা যোগ হতেই হার মেনে নিল। সিকি ইঞ্চি খুলে গেল দরজা। ঘরের ভিতর প্রচণ্ড গতিতে ঢুকছে পানি। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে টের পেল সোহেল, গোড়ালি ভিজছে পানির স্রোতে। হাতলের উপর চাপ বাড়াল ও। আরেকটু খুলল দরজা।

দরজা উপড়ে নিতে চাইল পানির চাপ। ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে জলোচ্ছ্বাসের মত। মনে হলো দূরে বজ্রপাত চলছে।

দরজার চার ভাগের এক ভাগ খুলে ফেলেছে সোহেল।

এরপর আটকে গেল হাতল। গায়ের জোরে নামাতে চাইল, কিন্তু নড়ল না ওটা। একবার দরজার দিকে চাইল। বুঝতে চাইছে কীসে আটকেছে দরজা। পানির প্রবল চাপ মুচড়ে দিয়েছে দরজার নীচের অংশ। ঠিক তখনই ট্র্যাক থেকে ছিটকে খুলে গেল গাইড হুইল। চেয়ে রইল সোহেল, ওর চোখের সামনে বাঁকা হয়ে গেল দরজা। যেন বিশাল দৈত্য চাপ দিচ্ছে ওখানে, ফুলে উঠল মাঝখানটা।

সোহেল চেঁচিয়ে উঠল, 'ফারা, হেলেন, সাবধান!' পানির প্রচণ্ড গর্জনে হারিয়ে গেল ওর কণ্ঠ। কোথায় যেন ছিটকে গেল দরজা! প্রচণ্ড বেগে ঘরের ভিতর ঢুকল পানি। চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো যেন গোটা সাগর। ঘরে ঢুকল সবুজ রঙের বিশাল পানির দেয়াল।

দরজার সরাসরি সামনে নেই ফারা ও হেলেন, প্রবল স্রোত ও ঢেউ ওদের ছিটকে নিল না। কিন্তু মুহূর্তে ভরে গেল ঘর। পরক্ষণে এল উল্টো ঢেউ। হেলেনকে একহাতে শক্ত করে ধরেছে ফারা, নইলে হারিয়ে যেত মেয়েটা।

পানির ভিতর চলছে শক ওয়েভ, গর্জে উঠছে ঢেউ। চারদিকে ছিটকে পড়ছে হাজারো জিনিস। ফারা-হেলেনের মাথার পাশ দিয়ে গেল একটা উড়ন্ত জেট স্কি। আরেকটু হলে মাথা দুটো নিয়ে যেত সঙ্গে। পুরো এক মিনিট চলল পানির তাণ্ডব, তারপর শান্ত হয়ে এল ঘর।

দরজার হাতল শক্ত করে ধরেছে সোহেল। ওটা ছেড়ে দিতেই ছাতের দিকে ভেসে যেতে চাইল। যেভাবে পিছিয়ে যায় বিড়াল, সেই ভঙ্গিতে পিছাতে চাইল ও। পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এল মেঝের উপর। এখনও হাতে জ্বলন্ত টর্চ। ওটা মেঝের উপর রাখল, পরক্ষণে কমিয়ে আনল হ্যাজম্যাট সুটের

বাতাসের ফ্লো। আর ছাতে গিয়ে আটকা পড়তে হবে না। প্রেশার কমে আসতেই ফিরে পেল ও ভারসাম্য।

যেখানে থাকবার কথা ফারা-হেলেনের, সেদিকের রেলিঙে আলো ফেলল সোহেল। ওরা আছে, তবে পাগুলো উঠতে চাইছে ছাতের দিকে। বেলুন হয়ে উঠেছে সুট। ওদের কাছে চলে গেল সোহেল, ফারার উরু খামচে ধরে ইশারা করল: হাত ছেড়ে দাও, ভাসতে দাও নিজেকে। ফারার সুটের এয়ার ফ্লো কমিয়ে দিল ও, এরপর হেলেনেরটা। সঠিক পরিমাণে বাতাস আসছে এখন ট্যাঙ্ক থেকে। হাতের ইশারা করে দরজার দিকে ক্রল শুরু করল সোহেল। কিন্তু ওর হাত টেনে ধরেছে ফারা। ঘুরে চাইল সোহেল। ওর ভাইজরের মুখোমুখি হলো ফারার ভাইজর। চেঁচিয়ে কী যেন বলছে।

দ্বিতীয়বার বলবার পর বুঝল সোহেল।

'আমার স্যাম্পল কেস! হারিয়ে গেছে! ওটা লাগবে!'

চারপাশে একবার চাইল সোহেল। গ্যারাজের ভিতর অসংখ্য জিনিস ভাসছে। তোয়ালে, লাইফ জ্যাকেট, নোটবুক, পানির ও সানস্ক্রিনের বোতল, কুলার—জিনিসের অভাব নেই। ওই কেস খুঁজতে গেলে লাগবে অন্তত একটি ঘণ্টা। আর উল্টো ঢেউয়ের সময় যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, স্যাম্পল কেস এখন চলেছে সাগরের মেঝের দিকে।

'সময় নেই,' পাল্টা চেঁচাল সোহেল।

'কিন্তু, সোহেল, ওই টিশ্যুর স্যাম্পলগুলো দরকার!'

খপ্ করে ফারার হাত ধরল সোহেল, দেখিয়ে দিল দরজার দিক।

বোট গ্যারাজে পানি ঢুকবার ফলে ভারসাম্য হারিয়েছে গোল্ড অভ মার্স, কাত হয়ে এসেছে অনেক। খোলের উপর প্রচণ্ড চাপ

পড়ছে, যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে কীল শুরু হয়েছে নানা ধরনের ধাতব আওয়াজ। ছিঁড়ছে ইস্পাতের পাত। বেশিক্ষণ টিকবে না এ জাহাজ। গুঙিয়ে চলেছে সর্বক্ষণ।

দু'পাশ থেকে হেলেনের দু'হাত ধরে দরজার দিকে এগোল সোহেল ও ফারা। বেরিয়ে এল ওরা জাহাজ থেকে, সরে যেতে চাইল সাঁতার কেটে। তারই ফাঁকে সবার এয়ার ফ্লো বাড়িয়ে দিল সোহেল। ট্যাঙ্ক থেকে সুটের ভিতর হুড়মুড় করে ঢুকছে বাতাস। সদ্য ছোঁড়া তীরের মত সাগর-সমতলের দিকে উঠতে শুরু করল ওরা।

খানিক দূরে এসে থেমেছে মার্ভেল। সাগর ও গোল্ড অভ মার্সের উপর ফেলা হয়েছে আলো। আঁধার চিরে দিয়েছে সার্চলাইটগুলো। বিশেষ করে মনোযোগ দেয়া হয়েছে ডেক ও ওয়াটারলাইনের উপর। গ্যারাজ ডোরের পাশে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা যোডিয়াক। ওটার বো ডুবতে শুরু করেছে জাহাজের সঙ্গে। জাহাজের আইবোল্ট থেকে যোডিয়াকের দড়ি খুলে নিল সোহেল। ক্রুরা মার্ভেল থেকে দেখেছে ওদের। একটা সার্চলাইট এসে স্থির হলো ওদের উপর। দু'হাত নাড়তে শুরু করল ফারা ও হেলেন।

ক্রুজ শিপের আরেক দিকে ছিল কপ্টার, দেখতে না দেখতে হাজির হলো ওটা। সোহেল, ফারা ও হেলেনের উপর স্থির হলো। ওরা সুস্থ তা নিশ্চিত হয়ে, আবারও কপ্টার নিয়ে চলে গেলেন সিরাজ। গোল্ড অভ মার্সের ডেকের উপর ভাসছে রবিনসন।

প্রচণ্ড বাতাস সরে যেতেই যোডিয়াক বেয়ে উঠল সোহেল, একে একে তুলে নিল ফারা ও হেলেনকে। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগে চালু হয়ে গেল মোটর, চলেছে ওরা মার্ভেলের

দিকে। ফ্রেইটারের মাঝখানে হাঁ হয়েছে দরজা। ওদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করছে একটা দল। পরনে হ্যাজম্যাট সুট, হাতে ট্যাঙ্ক। কনসেন্ট্রেটেড ব্লিচের সলিউশন সোহেল-ফারা ও হেলেনের সুট ডিকনট্যামিনেট করবে।

জাহাজের কাছে এসে মোটর থামিয়ে দিল সোহেল। রেডিও ভিজে যাওয়ায় সম্ভব নয় যোগাযোগ করা, তবে আর্দালিরা যে যার কাজ করে চলেছে। তারা তিনটে স্ক্রাব ব্রাশ ছুঁড়ে দিল যোডিয়াকে। ব্লিচের শক্তিশালী জেট এসে পড়ল সোহেলদের উপর। প্রথমে ব্রাশ দিয়ে হেলেনকে পরিষ্কার করল সোহেল ও ফারা। হ্যাজম্যাট সুটের এক ইঞ্চি বাদ পড়ল না। ফারা নিশ্চিত হলো মেয়েটির সুট ডিকনট্যামিনেট হয়েছে। এরপর নিজেদের ভাসিয়ে দিল ব্লিচ দিয়ে। যোডিয়াকের মেঝের উপর জমল ছয় ইঞ্চি পুরু ব্লিচ-গোলা পানি।

পাঁচ মিনিট পর ফারা নিশ্চিত হলো, সুটের সঙ্গে ভাইরাস নেই। এবার সন্তুষ্ট হয়ে ছিঁড়তে শুরু করল ডাক্ট টেপ্। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল সুট থেকে। সাগরে বইছে নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া। ওর মনে হলো, জীবনে এত চমৎকার হাওয়ায় শ্বাস নেয়নি আর।

'দারুণ লাগছে তো!'

'আমারও,' মৃদু হাসল সোহেল। খুলে ফেলেছে হ্যাজম্যাট সুট।

এখনও খোলা হয়নি হেলেনের সুট। তার হাত ধরে র‍্যাম্পে উঠল সোহেল, তুলে দিল মার্ভেলে। এবার মেয়েটির দায়িত্ব নিল ফারা। ওকে নিয়ে চলল মেডিকেল বে-তে। সবার সঙ্গে মিশবার অনুমতি দেয়ার আগে, নানা ধরনের পরীক্ষা করতে হবে। আপাতত রাখা হবে আইসোলেশন চেম্বারে। হতে পারে, হেলেন

ভাইরাসে আক্রান্ত।

কাজ শেষ হয়নি সোহেলের, এবার ডুবিয়ে দিতে হবে যোডিয়াক। ঠিক তখন গ্যারাজে এসে ঢুকল অনিল ও উর্বশী। থমথম করছে মুখ।

'কী হয়েছে?' চট্ করে জানতে চাইল সোহেল।

'ক'টারের কেবিনে ফু-চুং নিরাপদ,' বলল উর্বশী। 'তবে রানার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল না সোহেল, 'আমি এখুনি ফিরছি ওই জাহাজে।'

'একবার তাকিয়ে দেখ্,' ডুবন্ত জাহাজ দেখিয়ে দিল অনিল। 'কীল ফেটে গেছে। জাহাজের ভিতর ঢুকেছে প্রচুর পানি। ফু-চুং আর উর্বশী যেতে চেয়েছে। আমিও। গগল না থামালে যেতাম। কিন্তু কী করতে পারতাম? আর পাঁচ মিনিটও টিকবে না ওটা।'

'কিন্তু রানা ওটার ভেতর...' যোডিয়াকে নেমে পড়ল সোহেল। 'আমি চললাম।'

'দাঁড়ান!' তীক্ষ্ণ শোনাল উর্বশীর কণ্ঠ। 'আপনার সুট নেই। আপনি ফেরার পর আক্রান্ত হতে পারে সবাই।'

গাল কুঁচকে গেল সোহেলের। সামলাতে চাইছে আবেগ। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল যোডিয়াকের মেঝেতে। জানে, মিথ্যা বলেনি অনিল বা উর্বশী। চোখ থেকে টপ টপ করে ঝরতে শুরু করেছে পানি, নামছে গাল বেয়ে। চেয়ে রইল গোল্ড অভ মার্সের দিকে।

সত্যিই, ওই জাহাজের শেষসময় ঘনিয়ে এসেছে। সাগরে তলিয়ে গেছে উপরের সারির পোর্টহোলগুলো। সাগর থেকে দুই ফুট উপরে এখন মেইন ডেক। কীল্ ভেঙে যাওয়ায় মাঝখানটা ডেবে গেছে, মাথা উঁচু করছে বো ও স্টার্ন। প্রচণ্ড চাপ খেয়ে

বেরিয়ে আসছে খোলের ভিতরের বাতাস, আবার শুরু হয়েছে একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। বিকট শব্দে ছিঁড়ছে কবজা, ভেঙে পড়ছে জানালা-দরজা। রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকল সাগর। ডেকের উপর তৈরি হলো অসংখ্য ফোয়ারা। সোহেল যেখান থেকে দেখছে, ওর মনে হলো, গোল্ড অভ মার্সের চারপাশে ফুটতে শুরু করেছে পানি।

মুহূর্তে ডুবে গেল জাহাজের ব্রিজ। সাগরের চাপে চুরচুর হয়ে গেল টেম্পার দেয়া কাঁচ। ভেসে উঠল আবর্জনা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল ডেক চেয়ার। একটা লাইফবোট খুলে গেছে ডেভিট থেকে, ভাসতে লাগল উল্টো হয়ে।

হঠাৎ তলিয়ে গেল ব্রিজের ছাত। বারবার চোখ মুছছে সোহেল, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছে না। পানির উপর রইল শুধু জাহাজের কমিউনিকেশন মাস্তুল ও চিমনি। বিশাল জাহাজকে মুহূর্তে গ্রাস করল সাগর, পানির নীচ থেকে ছিটকে উঠল বিশাল সব বুদ্বুদ।

অপারেশন সেন্টার থেকে সাগরে আলো ফেলেছে গগল। সবচেয়ে শক্তিশালী সার্চলাইট তাক করেছে চিমনির উপর। চোখে পড়ল আঁকা ছবি—দু'হাতে তুলে ধরেছে কেউ অসংখ্য হীরার খণ্ড!

চারপাশের সাগর বলকে উঠছে! আকাশে স্থির রবিনসন কপ্টার।

'রানা... আর... নেই!' ফুঁপিয়ে উঠল উর্বশী। দুই চোখ থেকে অঝোরে ঝরছে অশ্রু।

আস্তে করে মাথা নাড়ল অনিল, চাপতে চাইল দীর্ঘশ্বাস। 'রানা রইল আমাদের সবার হৃদয়ে।'

তারপর ওদের চোখের সামনে তলিয়ে গেল অতবড়

চিমনিটা। ওখান থেকে বেরুল বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা। সেইসঙ্গে এল হলুদ কী যেন! মনে হলো কামানের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে ওটা! বিশ ফুট উপরে উঠল, যেন উড়তে চাওয়া ডানা-ভাঙা পাখি।

'ওইরে... হই-তো!' হুঙ্কার ছাড়ল সোহেল। 'ও-ও-ওই যে!'

উর্বশী ও অনিল চেয়ে রইল, বুঝল না নিজ চোখকে বিশ্বাস করবে কি না! হলুদ জিনিসটা সত্যিই হ্যাজম্যাট সুট। চিমনি থেকে ছিটকে বেরিয়েছে, উড়তে উড়তে পেরিয়েছে রেলিং!

দুই হাত ও এক পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সাগরে এসে নামল ওদের প্রাণের বন্ধু শ্রীমান মাসুদ রানা চৌধুরি!

হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সবাই।

পানিতে পড়ে সামলে নিয়েছে রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর সাঁতরাতে লাগল। নিমজ্জমান জাহাজ থেকে সরছে।

ওর উপর আলো ফেলেছে গগল। উল্টে থাকা লাইফ বোটে হাছড়ে-পাছড়ে উঠল রানা। উজ্জ্বল আলোর ভিতর ঝুঁকে বসে পড়ল, ডানহাত চলে গেল বুকের কাছে—ভাব দেখে মনে হলো দারুণ এক জাদু দেখিয়ে, বাউ করছে দর্শকদের উদ্দেশে!

ওকে বিশেষ জাহাজী স্যালিউট জানাল গগল, বিকট আওয়াজে সাগর কাঁপিয়ে বারম্বার বেজে উঠল মার্ভেলের ভেঁপু, তারপর একটানা অনেকক্ষণ!

দশ

ল্যাবোরেটরির পাশের মেডিকেল বে-তে, এসে ঢুকেছে কমাণ্ডো জলিল খান ও কাশেম বক্স। কিন্তু কোনও আওয়াজ পেল না ডক্টর ফারা রাইনার। মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। একবার চাইছে মাইক্রোস্কোপের দিকে, আবার কম্পিউটারের স্ক্রিনে। জলিল খান খুক-খুক করে কেশে উঠতেই মুখ তুলল ফারা, কুঁচকে উঠল ভুরু।

বিস্তৃত হাসছে দুই বন্ধু, কারণটা বোঝা গেল না।

ওদের পিছনে কাঁচের ঘরে রাখা হয়েছে হেলেন জিলকে, জাহাজের সবার কাছ থেকে আলাদা। সফিস্টিকেটেড পিউরিফায়ার দিয়ে নিয়মিত পাম্প করা হচ্ছে বাতাস। সে বাতাস জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাপমাত্রা তৈরি করা হচ্ছে এক হাজার ডিগ্রি। ওই তাপে টিকবে না কোনও ভাইরাস। হেলেনের কটের পাশে চেয়ার টেনে বসেছে রানা, পরনে এখনও হলুদ হ্যাজম্যাট সুট। ডক্টর ফারার নির্দেশ, ও কতটুকু এক্সপোজ হয়েছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওকে ওই ঘরেই থাকতে হবে। ধরেই নিয়েছে সবাই মেয়েটা ওই ভাইরাসের ক্যারিয়ার। ওর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে রোগ। একটু আগে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে স্যাম্পল দেখছিল ফারা। ওই ঘরে যদি ঢুকতে হয়, ঢুকবে ও হ্যাজম্যাট সুট পরে।

'কী কাজে এসেছেন?' জানতে চাইল ফারা।

'আমরা কম্পিউটার দিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি,' বলল কাশেম বক্স। 'সিনিয়ররা আলাপ করছেন। আমাদের ধারণা, মাসুদ ভাই বা ওই মেয়ে ইনফেক্টেড নয়।'

এবার বিরক্তি লুকিয়ে রাখল না ফারা: 'কীসের আলাপ? আমরা কীসের বিরুদ্ধে লড়ছি, আপনারা জানেন?'

প্রথমবারের মত হেলেন জিলের উপর চোখ পড়েছে দুই বন্ধুর। 'সর্বনাশ!' চোখ বিস্ফারিত হলো কাশেম বক্সের। কালো চুলগুলো এলিয়ে শুয়েছে মেয়েটি। ঘুমন্ত। মনে হলো ফুটফুটে রাজকন্যা। বলেই ফেলল সে, 'ও দেখতে দারুণ তো!'

'ভুলে যা ওর কথা,' কঠোর স্বরে জানিয়ে দিল জলিল খান। 'আমি আগে দেখেছি ওকে।'

'আমি ওর হাত ধরে এনেছি,' আপত্তি তুলল কাশেম বক্স।

'হ্যাজম্যাট সুট ধরেছিস, হাত পাবি কই,' বলল জলিল। 'ওই হাত শুধু আমার। আমিই দেব প্রথম প্রস্তাব।'

'যথেষ্ট হয়েছে, এখানে তর্ক নয়,' ইংরেজিতে বলল ফারা। চেপে গেল যে ও বাংলা ভাষা পরিষ্কার বোঝে। দুই বন্ধু শিশুর মত পরস্পরকে হারাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দুজনেই উৎসাহী মেয়েটির ব্যাপারে। এই দুই কমাণ্ডোকে যতটুকু চিনেছে ফারা, এরা কখনও কোনও মেয়ের ক্ষতি করবে না। 'বলে ফেলুন কেন এসেছেন।'

'হ্যাঁ, দুঃখিত, ডক্টর,' বলল কাশেম। চট্ করে চাইল হেলেনের দিকে। 'মিস্টার ফু-চুং ও মিস্টার অনিল—আসলে আমরা সবাই, বুঝতে চাইছিলাম সেই ভয়াবহ পরিবেশ। কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে জানা গেছে, ভাইরাস ধরেনি মাসুদ ভাই বা ওই মেয়েকে। মিস্টার অনিল পাঁচ মিনিট আগে

কম্পিউটার দেখে বললেন, এঁরা রোগাক্রান্ত হতেই পারেন না।'

'এটা সায়েন্স, বিশেষ করে বায়োলজি,' বলল ফারা, 'অনিল ও ফু-চুঙের কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নয়, বুঝেছেন?' কাশেমের চোখে চাইল ফারা। 'আপনাদের সঙ্গে জুটেছে সোহেল আহমেদ?'

'না... ঠিক... তা নয়...' থতমত খেল কাশেম।

গম্ভীর চেহারা দেখে মনে হলো আহত হয়েছে দুই বন্ধু। ওদের মাসুদ ভাই বা সোহেল ভাইকে নিয়ে কথা উঠলে তাদেরও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। বাক্যবাণের প্রস্তুতি শুরু করল ওরা।

'আসল কথা কী...' কাশেমের কথার খেই ধরল জলিল, 'সায়েন্সের সবই তো গণিত। আর বায়োলজি তো জীবন্ত কেমিস্ট্রি। এই কেমিস্ট্রিকে আবার বলা যায় অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স। শক্তিশালী ও দুর্বল নিউক্লিয়ার তৈরি করছে অ্যাটম। সেই ফিজিক্স আবার সত্যিকারের পৃথিবী-সংক্রান্ত গণিত।'

'তো?' ভুরু উঁচু করল ফারা। বুঝতে চাইছে এদের উদ্দেশ্য।

'সেই গণিতের মাধ্যমে কী দেখলেন আপনি? কোনও ভাইরাস বা টক্সিন পেলেন স্যাম্পলগুলোর ভিতর?'

'না, তা পাইনি,' বলল ফারা।

'সেটাই তো কথা!' উৎসাহিত হয়ে উঠল জলিল। 'পাবেন না খুঁজে। গোটা জাহাজ জুড়ে একসঙ্গে মরল মানুষ। এ সম্ভব শুধু খাবারে বিষ দিলে।'

'জলিল ঠিক বলেছে,' সায় দিল কাশেম।

ফারার ধারণা হয়েছে, এরা সবাই মিলে যুক্তি করে এসেছে। এবং এদের পিছনে রয়েছে ওই সোহেল, ফু-চুং, অনিল ও গগল—বুদ্ধির ঢেঁকি একেকটা।

দুই কমাণ্ডোর উদ্দেশে হাত তুলল ফারা। 'কাজেই আপনারা

ভাবছেন মানুষগুলোর মৃত্যুর কারণ খাবারে বিষ দেয়া।' ও নিজে জানে, ওদের যুক্তি ভুল নয়।

'এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মাসুদ ভাই ওই জাহাজে থাকবার সময় কিছু খাননি। বাজি ধরতে পারি, রাতের খাবার খায়নি হেলেন জিল।' কাঁচের ওপাশের ঘর দেখিয়ে দিল কাশেম।

'তারপরও, সাবধান হয়েছি আমরা,' বলল জলিল। 'ইঞ্জিন-রুমের বাতাস নিয়ে ভেবেছি। মাসুদ ভাই সুট ছিঁড়ে ফেললেন, তখন যদি বাতাসে কিছু থাকত, তার মাত্রা এতই কম, শত বিলিয়নের এক ভাগ সম্ভাবনা ছিল আক্রান্ত হওয়ার।'

দু'হাত বুকের উপর বেঁধেছে কাশেম। 'তা ছাড়া, পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়েছে, মাসুদ ভাই এখনও সুস্থ। সোহেল ভাইয়ের কাছে শুনেছি আপনার রোগিণীর কাছে এসেছিল তার বান্ধবীরা। সেটা পার্টির আগে। তারপর বিষ খেয়ে মরেছে তারা। কিন্তু মাসুদ ভাই বা হেলেন জিল কিছু খাননি, ফলে কিছুই হয়নি তাদের।'

'এবার মাসুদ ভাইকে ছেড়ে দেয়া যায়-না?' খানিকটা করুণ হয়ে উঠল জলিলের কণ্ঠ।

'আপনাদেরকে পাঠিয়েছে সিনিয়ররা, এই তো?' বলল ফারা। এরা যা ভাবছে ঠিক একই কথা ভেবেছে ও নিজেও। মাসুদ রানাকে ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু হেলেন জিলকে নয়। ওর উপর আরও পরীক্ষা করতে হবে। অসংখ্য ল্যাব রেজাল্ট খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মেয়েটির রক্তে, স্পাইনাল ফ্লুইডে, থুতু বা প্রস্রাবে ভাইরাস নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্য কোথাও থাকবে না। হয়তো রয়েছে কিডনির ভিতর, বা অন্য কোনও টিশ্যুর ভিতর। আরও বিশদ ভাবে টেস্ট করতে হবে। এমন হতে পারে, মেয়েটির ইমিউন সিস্টেমকে শীঘ্রি হারিয়ে দেবে

ভয়ঙ্কর ভাইরাস, তারপর ধরবে পরের মানুষটাকে। আক্রান্ত হবে মার্ভেলের সবাই।

'শপথ করে বলতে পারি, কেউ আমাদের পাঠায়নি,' বড় দ্রুত বলল জলিল। 'কেউ না!'

মৃদু হেসে ফেলল ফারা। 'সরি, কিন্তু আপনাদের কথা মানা সম্ভব হলো না। রানার ব্যাপারে ঠিকই বলেছেন, কিন্তু হেলেনকে আলাদা ভাবে রাখতে হবে। এক শ' ভাগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেব, ও ইনফেক্টেড। ...আরেকটা কথা, আপনারা ভাল করে মিথ্যা বলতে শেখেননি।'

'তা-ই?' লালচে হয়ে গেল জলিলের গাল।

উল্টো দিকের দেয়াল দেখছে কাশেম। অতি বিনয় করে বলল, 'আপনি ডাক্তার, যা বলবেন তা-ই মানব। তবে সবাই ভাবছে খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে, আসলে মাসুদ ভাইয়ের ভিতর ভাইরাস নেই।'

'আপনার বন্ধু বলেছে কেউ পাঠায়নি,' বলল ফারা। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'আমি তো বলব, ওরা বন্ধুকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক?'

চুপ রইল কাশেম ও জলিল।

'যদি পরীক্ষা করতে গিয়ে অহেতুক সময় যায়, যাবে আমার,' বলল ফারা। ল্যাব স্টুল ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেয়াল থেকে খুলে নিল ইন্টারকমের রিসিভার, পটাপট টিপল বাটন। 'রানা, কথা শুনছ?'

মনের ভিতর কোনও দুশ্চিন্তা রাখেনি রানা। ভাবেইনি ওর শরীরে থাকতে পারে ভয়ঙ্কর ভাইরাস, মরতে হতে পারে। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল। হাত তুলে ফারার দিকে নাড়ল। আরেক হাতে স্পেয়ার ব্যাটারি। ওগুলোর

কারণে এখন পর্যন্ত শ্বাস নিতে পারছে।

'আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি,' বলল ফারা। 'এয়ার লকের ভিতর ঢুকবে, ডিকনট্যামিনেশন শাওয়ার নেবে। ওখানে ছেড়ে আসবে সুট। পরে ওটা পুড়িয়ে ফেলব আমি।'

কথাটা শুনে খুশি হয়ে উঠল জলিল ও কাশেম।

ইন্টারকমে সোহেল ভাইকে জানিয়ে দিল জলিল, ছাড়া পাবেন মাসুদ ভাই।

আইসোলেশন ওয়ার্ডের বাতাস রিসাইকেল করতে পনেরো মিনিট লাগল এয়ার লকের। এ সময় গোসল করতে হলো রানাকে। ওর উপর বজ্রপাতের মত নামল ব্লিচ ও অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট। শাওয়ার শেষে ল্যাবে এসে ঢুকল রানা।

'ছিহ্, তোমার গায়ে বিশ্রী গন্ধ!' নাক কুঁচকে ফেলল ফারা।

'তোমারও হতো, যদি ওই সুটের ভিতর অতক্ষণ থাকতে,' বলল রানা।

'আমার কক্ষনো এমন হতো না,' বলতে গিয়ে থেমে গেল ফারা।

ল্যাবোরেটরির ভিতর ঢুকেছে সোহেল ও ফু-চুং। বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল, নিচু স্বরে বলল, 'বাঘিনীর কবল থেকে বেঁচে গেলি?'

মুখ বাঁকাল ফারা।

'তোদের সবার দোয়ায়,' বলল রানা। একবার ফারাকে দেখে নিয়ে ফু-চুঙের দিকে চাইল। 'ওই জাহাজের কম্পিউটারে কিছু পেলি?'

'আর্কাইভের তিরিশ পার্সেন্ট ডাউনলোড করেছি,' বলল ফু-চুং। 'শেষ দিকের সবই পাব।' রানার পরের প্রশ্নের আগেই হাত তুলল সে। 'অনিল এখনও সব ঘেঁটে দেখেনি। আমরা অন্য

কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'ওরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিল, তুমি ভাইরাস অ্যাফেক্টেড নও,' তথ্য যোগান দিল ফারা।

'ওদের মঙ্গল হোক!' দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'এবার লগ বুক নিয়ে কাজে নেমে পড়তে হবে,' বলল ফু-চুং।

'যখন থেকে রওনা হয়েছে, তারপর শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে, সব জানা দরকার।'

সবার প্রসঙ্গ পাল্টে দিল ফারা, 'দেখলাম চেম্বারে ঢুকে হেলেনের সঙ্গে আলাপ করছ? এখন কেমন আছে ও?'

'ক্লান্ত ও ভীত। জানে না কী ঘটেছে। বেশি কিছু বলিনি। গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না। তবে একটা কথা বলেছে, ওটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ওই জাহাজ ভাড়া নেয় এক গোষ্ঠী। নিজেদের বলে রেসপন্সিভিস্ট।'

'কী বলে? রেসপন্সিভিস্ট?' জানতে চাইল উর্বশী। এইমাত্র ল্যাবোরেটরিতে এসে ঢুকেছে। একবার রানার দিকে চাইল। 'জাহাজে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, এবারের মত মাফ করে দিয়েছে তোমাকে ফারা। ...এখন কী অবস্থা?'

'বেঁচে আছি সেজন্য খুশি,' বলল রানা। চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখল: ভোর সাতটা।

কী করে যেন সব তথ্য পেয়ে যায় ক্রুরা। এর মূলে রয়েছে বোধহয় বাবুর্চি মোস্তফা আবুল।

হেসে ফেলল উর্বশী। 'এমনটা কখনও দেখিনি। ফানেলের ভিতর থেকে যেভাবে ছিটকে বেরিয়ে এলে, মনে হলো যেন সস্তা শ্যাম্পেন বোতলের কর্ক!'

হেসে উঠল সবাই।

'একটু খুলে বল্ তো,' বলল সোহেল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'প্রায় পুরো চিমনি বেয়ে উঠেছি। তারপর আটকা পড়ে গেলাম, উঠতে পারলাম না। পানি বাড়ছে, এয়ার ফ্লো না কমিয়ে উল্টো বাড়িয়ে দিলাম। সুট দিয়ে ঢাকা পড়ল চিমনি। এরপর ইঞ্জিনরুমের বন্যা আর চিমনির পানির চাপ তোপের মত উড়িয়ে দিল আমাকে।'

'তোমার বেরিয়ে আসাটা ছিল দেখার মত,' বলল উর্বশী।

'আন্দাজ কত উপরে ছিটকে ওঠে?' জানতে চাইল ফারা।

'বিশ ফুট তো হবেই,' বলল উর্বশী। 'তারপর রেলিং টপকে উড়ে গিয়ে পড়ল সাগরে—জাহাজ থেকে অন্তত পনেরো ফুট দূরে।'

ও থেমে যেতেই নীরবতা নামল ঘরে। পরস্পরের দিকে চাইল সবাই। পরিবেশ কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। কখনও কখনও এমন হয়। তারপর মনে পড়ে যেতেই জিজ্ঞেস করল উর্বশী, 'তোমরা রেসপন্সিভিস্টদের ব্যাপারে কী যেন বলছিলে?'

'হেলেনের কাছে শুনেছি ওরা ফিলিপিন্স থেকে গ্রিসের পাইরিয়াসে আসতে চেয়েছিল,' বলল রানা।

'তা-ই?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল উর্বশী। 'গ্রিসে বিশাল এলাকা কিনে নিয়েছে রেসপন্সিভিস্টরা। শেষ খবর অনুযায়ী আমার ভাই ওখানে আছে ওই দলের সঙ্গে। পেলোপনেশিয়ান পেনিনসুলায়।'

'তোমার মা এ খবর জানিয়েছেন?' বলল ফারা।

'হ্যাঁ। আমার ভাইকে কিডন্যাপ করা হয়নি। শুনছি, স্বেচ্ছায় গেছে। সবসময় কাউকে না কাউকে অনুকরণ করত। হাইস্কুলে উঠে খারাপ বন্ধুদেরকে গুরু মেনেছিল। শেষে তো ড্রাগই নেয়া শুরু করল। ওর রিহ্যাব কাউন্সেলার বলেছে, অমলের

অ্যাডিকশন প্রবলেম নেই, ওর সমস্যা—ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে না। মা'র কাছে শুনলাম এক ইউরোলজিস্টের কাছে গিয়েছিল। ভ্যাসাকটমি করাবে।'

'ভ্যাসেকটমি? করেছে?' নাক কুঁচকে ফেলল ফারা। 'ওর বয়স তো মাত্র আঠারো! কোনও লোকের তিরিশ বছর না হলে, বা তার স্ত্রী-সন্তান না থাকলে, বেশিরভাগ ডাক্তার এ অপারেশন করে না।'

'আমার ভাই উনিশে পা দিয়েছে। আর রেসপন্সিভিস্টদের নিজেদের ডাক্তার আছে। তাদের সারাদিনের কাজ ভ্যাসেকটমি ও টিউবাল লিগেশন করা। ...ভেঙে পড়েছেন মা। বংশের একমাত্র বাতি অমল।'

'আজই এই গোষ্ঠীর কথা শুনেছি হেলেনের কাছে,' বলল রানা।

'ওদের ব্যাপারে আমি নিজেও বেশি কিছু জানি না,' বলল উর্বশী। 'যতটুকু শুনেছি, মা'র কাছে।'

'তোমাদের উচিত নিয়মিত হলিউডি গসিপ পড়া,' বলল ফারা। 'নায়িকা পার্লা মোনার নাম শুনেছ?'

'বিখ্যাত নায়িকা?' বলল জলিল খান। চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছে যে। সেই পার্লা মোনা কিন্তু রেসপন্সিভিস্ট। ছায়াছবির জগতের অনেকে ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশছে। হলিউডের নতুন ক্রেজ ওটা।'

ফারার দিকে চাইল রানা। 'ওটা কি চার্চ, কাল্ট বা ওই ধরনের কিছু?'

'নিশ্চিত নয় কেউ,' বলল ফারা। 'অন্তত গোষ্ঠীর বাইরের কেউ কিছু জানে না। সত্তর সালের দিকে ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল এই

মতবাদ প্রচার শুরু করে। অথচ তার প্রথম কাজ ছিল ম্যালেরিয়া ও স্মলপক্সের বিরুদ্ধে কম দামি ওষুধ আবিষ্কার করা। লাখ লাখ মানুষকে রক্ষা করেছে তার তৈরি ওষুধ। তারপর বদলে গেল সে, ভাবতে লাগল: ঠেকাতে হবে পৃথিবীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে। তার বক্তব্য: পৃথিবীতে এত মানুষের প্রয়োজন নেই। কঠিন রোগগুলো ঠেকাতে গিয়ে আসলে প্রকৃতির ভারসাম্যই নষ্ট করেছে সে। মানুষ যে শুধু অসংখ্য সন্তান জন্ম দিয়েছে, তা নয়, তারা অনেক বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকছে। ফলে আরও বেশি সন্তান জন্ম নিচ্ছে। লিঙ্ক চ্যাপেল প্রচার শুরু করল, মানুষ যদি মহামারি হয়ে না মরে, অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে পৃথিবী ধ্বংস হবে।

'এই বিষয়ের উপর একটা বই লিখল সে। বিশ্ব জুড়ে ক্রুসেড শুরু করল ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের উপর। তার মত অনেককে নিয়ে তৈরি করল এক সংগঠন। এই সংঘের সবাইকে নাম দেয়া হলো রেসপন্সিভিস্ট, যারা সব বিষয়ে দায়িত্বশীল। ধীরে ধীরে চারদিকে এই সংগঠনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। লিঙ্ক চ্যাপেলের এই মতবাদের নাম দেয়া হলো: রেসপন্সিভিজম। অনেকেই আকৃষ্ট হলো। রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়, অভিনেতা, অভিনেত্রী—মানে, সব ধরনের লোক। দশ বছর পর মারা গেল লিঙ্ক চ্যাপেল, কিন্তু এই সংগঠনকে পরিচালনার দায়িত্ব নিল এক দম্পতি। তাদের নাম এই মুহূর্তে মনে নেই আমার।'

'এই গোষ্ঠী এখন কী করছে?' জানতে চাইল রানা।

'সারা দুনিয়া জুড়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের প্রচার করছে। বিনা পয়সায় কণ্ডোম বিতরণ করছে, অ্যাবোর্শন করাচ্ছে, তাদের ডাক্তাররা ইচ্ছুক পুরুষ ও নারীদের ভ্যাসেকটমি ও লিগেশনের অস্ত্রোপচার করে। এই দলের সঙ্গে বহুদিন ধরে লড়ছে

ক্যাথোলিক চার্চ ও ডানপন্থী রাজনীতিকরা।'

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'জাহাজ ভরা মানুষকে খুন করা হয়েছে। তারা রেসপন্সিভিস্ট হোক বা যা-ই হোক, আমাদের বোধহয় জানা উচিত কারা লেগেছে ওদের বিরুদ্ধে, কারা ঘটালো এই হত্যাকাণ্ড।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। 'আমি তোর সঙ্গে আছি।'

'আমিও!' একইসঙ্গে বলে উঠল ফু-চুং, উর্বশী ও ফারা।

'আমরাও,' বলল কাশেম। জলিলের দিকে চাইতেই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে। এই মুহূর্তে কোনও প্রতিযোগিতা নেই ওদের মধ্যে।

সবাই একমত।

যদিও কেউ জানে না, কারা করল কাজটা, এবং কেন।

এগারো

ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস।

ম্যানিকিউর করা কচি সবুজ ঘাসের উপর ধবধবে সাদা বিশাল তাঁবু। তার উপর ঘুরছে পাপারাজিদের হেলিকপ্টার।

এ এলাকা বেভারলি হিলসের একটা এস্টেট। খানিক দূরে অলিম্পিক সাইজের দুই সুইমিং পুল, তার চেয়েও প্রকাণ্ড ওই

তাঁবু।

নীল আকাশে কাউন্টি শেরিফের বেল জেটরেঞ্জার উদয় হতেই সতর্ক হয়ে উঠল পাপারাজিরা। ভাড়া নেয়া দুই কপ্টার আরেক দিকে রওনা হলো লেজ তুলে, লুকাতে চাইছে টেইল নম্বর। আগেই এই এস্টেটের উপর নো-ফ্লাই জোন জারি করেছে শেরিফ। যদি কোনও পাইলট কপ্টার নিয়ে আসে, গ্রেফতার করা হবে তাকে। বড় অঙ্কের ঘুষ দিতে চেয়েছে ফটোগ্রাফাররা, কিন্তু শাস্তির ভয়ে ফিরতি পথ ধরেছে দুই পাইলট।

বিশাল তাঁবুর নীচে যাঁরা জড় হয়েছেন, তাঁরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত, সবাই নামকরা মানুষ। কপ্টার বা পাপারাজিদের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেননি। এয়ারক্রাফটের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই স্বাভাবিক স্বরে আবার আলাপ শুরু হলো। এক প্রান্তে কাঠের উঁচু মঞ্চ, সেখানে ধীর লয়ে চলেছে ব্যাণ্ড। সুইমিং পুলের তীরে আবার নাচ শুরু করেছে অপরূপ ছয় তরুণী, পরনে সংক্ষিপ্ত ঝলমলে বিকিনি। হলিউডি পার্টিতে এদের ডাক পড়ে।

একদিকে প্রকাণ্ড সাদা বাড়ি, বলা উচিত রাজপ্রাসাদ। চল্লিশ হাজার বর্গফুট নিয়ে তৈরি ভিলা। অতিথিদের রাখবার জন্য দু'পাশে দুটো উইং, সাধারণ আমেরিকান বাড়ির ছয় গুণ বড়। বাড়ির নীচে বিশাল গ্যারাজ, রাখা যায় আশিটা গাড়ি। মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলে এমন আরেকটি কম্পাউণ্ড রয়েছে এ দম্পতির। যেন শেষ নেই এঁদের বিত্তের। বিশাল জমি ঘিরতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছে রাজমিস্ত্রীরা। শুধু দেয়াল তৈরি করতে লেগেছে পুরো দু'বছর। যখন এস্টেটের কাজ শেষ হলো, এই দম্পতির জাঁকজমক দেখে চুপ হয়ে গেলেন মস্ত সব বড়লোক।

এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক ডিয়েটস্ কেসলার ও তাঁর স্ত্রী বার্থা কেসলার। এঁরা অভিনেতা বা অভিনেত্রী নন, মোগল নন

ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির। একসময় ছোট এক স্টুডিয়োতে সামান্য বেতনে কাজ করতেন ডিয়েটস। তারপর হঠাৎ একদিন পেয়ে গেলেন সবই। রেসপন্সিভিজমের প্রণেতা ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল উইল করে দিয়ে গেলেন এই বিপুল সম্পত্তি। শুধু তাই নয়, দ্রুত বেড়ে ওঠা এই সংগঠনের দায়িত্ব পড়ল এই দম্পতির উপর। এরপর বাড়তে লাগল সদস্য। দুনিয়ার চারপাশ থেকে হুড়মুড় করে আসতে লাগল ডোনেশন। কিছুদিন পর ক্যালিফোর্নিয়ার উঁচু শ্রেণীর ক্লাব স্বীকার করে নিল, সত্যি অভিজাত বটে এই দম্পতি।

ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেলের বই যখন প্রকাশ হলো—*নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে;* ডিয়েটস বুঝতে পারেন, পাশে থাকতে হবে এই লেখকের। ডক্টর লিঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি, মুগ্ধ হন ভদ্রলোকের কথায়। এরপর জোরেশোরে শুরু করেন প্রচারের কাজ। এর কিছুদিন পর দুর্বল হয়ে পড়েন ডক্টরের মেয়ের প্রতি। বার্থা চ্যাপেলও আগ্রহ দেখান। দু'মাস প্রেম করবার পর বিয়ে করেন তাঁরা। দু'জন যেন পরস্পরকে পেয়ে অদ্ভুত এক শক্তি আবিষ্কার করেন, সমস্ত শক্তি ঢেলে দিলেন রেসপন্সিভিজ্‌ম প্রতিষ্ঠায়। আজকের এই শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে শুধু এই দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল এটাই চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যেন এরা দু'জন টিকিয়ে রাখেন তাঁর মতবাদ। সত্যিই কারিশমা দেখিয়েছেন ডিয়েটস ও বার্থা, টেনে নিয়েছেন এণ্টারটেইনমেণ্টের মস্ত সব মানুষদেরকে। তাদের সঙ্গে এসেছে ভক্তরা। এরপর যখন পার্লা মোনা অস্কার পেল, সে খোলাখুলি ভাবে খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিল: তার সফল হওয়ার মূলে

রেসপন্সিভিজ্‌ম। হলিউডে তোলপাড় শুরু হলো, এই সংগঠনে যোগ দিল হাজার হাজার লোক।

ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, শক্তপোক্ত ডিয়েটস কেসলার দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুইমিং পুলের পাশে। খুব খেয়াল না করলে বোঝা যায় না অস্ত্রোপচার করে নিজের চেহারা একটু বদলে নিয়েছেন তিনি। এখন তাঁকে দেখলে মনে হয়, এই মানুষটাকে সম্রাট হলে খুব মানাত। চেহারায় আলাদা একটা জ্যোতি ঝলমল করে সবসময়। বয়স তাঁর সাতান্ন বছর, চুলের দু'পাশে রুপালি ছোপ পড়েছে। তাতে আরও অনেক বেশি ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। দুই চোখের ঝিকমিকে দৃষ্টি যে-কাউকে আকর্ষণ করে। শরীরের তুলনায় খানিক বড় মাখন-রঙা লিনেন জ্যাকেট পরেছেন। পেশিবহুল নন, কিন্তু লাগছে তেমন। এতক্ষণ আশপাশের সবাইকে গল্পেসল্পে জমিয়ে রেখেছেন। হেসেছেন, হাসিয়েছেন। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর মানিয়েছে।

কেসলারের বাম পাশেই রয়েছেন বার্থা। স্বামীর চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট তিনি। তবে দেখে মনে হয় বয়স বড়জোর তিরিশ। ক্যালিফোর্নিয়ার রাণী বলা হয় তাঁকে। হাঁটু সমান সোনালী চুল, চোখদুটো সাগর-নীল। অ্যাথলেটদের মত ছিপছিপে দেহ। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ হরিণী গ্রীবা। পরেছেন লো কাট টপস্‌, কণ্ঠে নিখুঁত হীরার ঝলমলে নেকলেস।

ডিয়েটস ও বার্থা দু'জনই আকৃষ্ট করতে পারেন মানুষকে। একসঙ্গে দু'জন যেন সহজেই মনোযোগ কেড়ে নেন সবার, হয়ে ওঠেন যে কোনও পার্টির কেন্দ্রবিন্দু। আর সেই পার্টি যদি হয় রেসপন্সিভিস্টদের, তাঁরা হয়ে ওঠেন দেব-দেবী। আজ এ দম্পতি উদ্বোধন করবেন নতুন এই হেডকোয়ার্টার।

ভীড় একটু কমে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন এক

প্রতিভাবান সিনেমা পরিচালক। 'কংগ্র্যাচুলেশনস, ডিয়েট্স।' ঝুঁকে এসে চুমু দিলেন বার্থার গালে। আশপাশের সবাই জানে তিনি এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'কংগ্র্যাচুলেশনস, বার্থা। আজ দারুণ দিন তোমাদের। যা করেছ সেজন্য গর্বিত হওয়া উচিত। ডক্টর চ্যাপেল বেঁচে থাকলে খুশি হতেন।' শেষ কথাটা এমন ভাবে বললেন, মনে হলো কথা বলছেন এক মস্তবড় পীরের সম্বন্ধে। 'একদিন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে এখানে শুরু হয় জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী। ঠেকিয়ে দেয়া হয় মানব জাতির ধ্বংস।'

'পৃথিবীর জন্য নতুন আলো হয়ে এসেছে রেসপন্সিভিজম,' বললেন বার্থা। 'আমার বাবা সবসময় বলতেন, কোনও কাজ শুরু করা সবসময় কঠিন। বিশেষ করে যদি এতবড় কাজ হাতে নেয়া হয়। তবে মানুষ ছড়িয়ে দেবে এই সত্যিকারের আলো। জানবে, বুঝবে, মানবে। মনে মনে তো সবাই জানে, এই পথ গ্রহণ না করলে সবই হারাবে গোটা মানব-জাতি।'

'আমাদের পেপারে পড়লাম সিয়েরা লিয়োনের গ্রামগুলোতে কমে এসেছে জন্মগ্রহণের হার,' বললেন পরিচালক। 'এ সম্ভব হয়েছে শুধু আমাদের ক্লিনিকগুলোর জন্য।' এই সংগঠন নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে 'জন্মগ্রহণ হার' নামে একটি পত্রিকা।

নড করলেন ডিয়েটস। 'খ্রিস্টান ও মুসলিম মোল্লাদের কাছ থেকে, ধর্ম-মিথ্যা-নোংরামি থেকে বহু দূরে সরে মানুষের ভাল করছি আমরা। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বোঝাতে পারছি, বাচ্চা না নেয়ার উপায় রয়েছে। বাচ্চা না নিলে পেট ভরে খেতে পাবে। ওরা জানে চার্চের দেয়া ধর্মের উপদেশ বা সামান্য পয়সা বেঁচে থাকার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।'

'তবে ওই আর্টিকেলে লেখা হয়নি কীভাবে সবার জীবন

বদলে চলেছে। জানানো হয়নি সৌরজগতের ওদিকের অচেনা জগতের ওরা কীভাবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এ-ও বলা হয়নি কীভাবে পাল্টা জবাব দেব আমরা।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন ডিয়েট্স। 'ঠিকই বলেছেন, বলা হয়নি। আমাদের সৌরজগতের বাইরে যে ভিনগ্রহের বাসিন্দারা প্যারালাল ইউনিভার্সের, এ তথ্য জানাইনি অশিক্ষিতদের। জানতে চাইলেও যে বুঝবে, তা নয়। পরে আমাদের দর্শন ওদের জানানো হবে। আপাতত আমরা চাইছি কমে আসুক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।'

কথাগুলো মেনে নিলেন পরিচালক, সফল এই দম্পতির উদ্দেশে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে রওনা হয়ে গেলেন আরেক দিকে। একের পর এক বিখ্যাত লোক আসছে কেসলার দম্পতির দিকে, জানাতে চাইছে শুভেচ্ছা।

ফিসফিস করে স্বামীকে বললেন বার্থা, 'স্টিভ কিন্তু সত্যি ভাল মানুষ।'

'ওর শেষ ছায়াছবি থেকে এসেছে দুই শ' মিলিয়ন, তবে আমাদের ফাণ্ডে জমা পড়েছে মাত্র দুই লাখ ডলার।'

'আমি তাতিয়ানার সঙ্গে কথা বলব।' পরিচালকের নতুন স্ত্রী তাতিয়ানা, সে বার্থা কেসলারের ভক্ত।

কথা যেন শুনতেই পাননি ডিয়েটস, জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল সেল ফোন, ওটা থরথর করে কাঁপছে। ভাঁজ খুলে ডিসপ্লের দিকে চাইলেন, তারপর কথা শুনতে লাগলেন। পুরো এক মিনিট নিস্পৃহ রইল তাঁর গালের পেশি। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' ফোন রেখে স্ত্রীর দিকে চাইলেন। বার্থার নীল চোখদুটো হাসছে। কণ্ঠের এগারো ক্যারেটের হীরার চেয়েও উজ্জ্বল হাসি। 'জ্যারোন ফোন করেছে,' নিচু স্বরে বললেন

ডিয়েটস। বাইরের কেউ শুনতে পেল না। 'একটু আগে একটা ফ্রেইটার রিপোর্ট করেছে, ওরা দেখেছে ওই ধ্বংসাবশেষ।'

'হায়, ঈশ্বর!'

'ওটাই যে গোল্ড অভ মার্স, ওরা নিশ্চিত হয়েছে একটা লাইফ বোট দেখে।'

বার্থার ডানহাত চলে গেল হীরার নেকলেসের উপর, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুখ।

'কেউ বেঁচে নেই।'

বার্থার মুখে আবার ফুটে উঠল হাসি। চাপা স্বরে বলল, 'এ তো ভাল খবর। খুবই, খুবই ভাল খবর।'

যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছে ডিয়েটস কেসলার, কাঁধ থেকে নেমে গেছে বিশাল এক পাথর। 'ডার্লিং, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ, তারপর ঘটতে চলেছে সব। তোমার বাবা এবং আমরা যত কাজ করেছি, তার ফল মিলতে চলেছে। নতুন করে জন্ম নেবে এই পৃথিবী। এবার কোনও ভুল করব না আমরা।'

'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সম্পর্কে বলবে: পৃথিবীর সবচেয়ে মহান দুই মানুষ,' বলল বার্থা, নিজ হাতে তুলে নিল ডিয়েটসের বামহাত। একবারও ভাবল না, গোল্ড অভ মার্স জাহাজে ছিল সাত শ' অষ্টাশিজন নারী-শিশু ও পুরুষ। তাদের বেশিরভাগ ছিল তাদের সংগঠনের সদস্য, ছিল এই দম্পতির অন্ধ ভক্ত।

মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য, তাদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে, সেটা সফল করতে হলে কিছু লোককে তো আত্মবিসর্জন দিতেই হবে। সাত-আট শ' জনের মৃত্যু তো সেই তুলনায় ধরতে গেলে কিছুই নয়!

বারো

গোল্ড অভ মার্স তলিয়ে যাওয়ার পর ষোলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে রানার। যা ভেবেছিল, ঠিক তা-ই; বিসিআই চিফ ঘটনার কথা শুনেই বলেছেন রানা, তুমি আর সোহেল যদি কিছুদিনের ছুটি চাও, আমি গ্র্যান্ট করব। তোমরা চাইলে আমি পাপাগোপালাকে জানাতে পারি, আরও কিছুদিন জাহাজটা লাগবে তোমাদের।

যাক, অনুমতি পাওয়া গেছে, এখন সবার সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেবে রানা।

ডাইনিং রুমে সবাই এসে পৌঁছুলে ঘোষণা দিয়েছে রানা, মিশন ইজরায়েল শেষ, এখন যে-কেউ চাইলেই দেশে ফিরে যেতে পারে। তাকে নামিয়ে দেয়া হবে কাছাকাছি বড় কোনও বন্দরে, সেখান থেকে বিমান যোগে ফিরতে পারবে সে নিজ দেশে। কিন্তু রাজি হলো না কেউই।

সবাই নিজ নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছে, তাই নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিল তাদের মতামত আমরা থাকছি। এতগুলো মানুষকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমরা খুঁজে বের করব সেই পিশাচগুলো কারা। মাফ নেই। এখন যদি দেশে ফিরি, নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকব বাকি জীবন।

বিভিন্ন দেশের এজেন্টরা অবশ্য একটা কথাও বলেনি।

জুনিয়াররা বুঝে নিয়েছে, ওঁরা মাসুদ ভাইয়ের পাশে থাকবেন। দরকার পড়লে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করা হবে ওই খুনিদের।

দুপুরে খাওয়ার পর রানা বলেছে, 'আমরা কোনও দেশের হয়ে কাজ করছি না। ধরে নাও, এখন থেকে যা করব, সব মানবতার খাতিরে। টাকার লোভে নয়, এ কাজ করব আমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য।'

সবার মতামত জেনে নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, চলে এসেছে উপরের নকল ব্রিজে। বামদিকে বহু দূরে দেখা যাচ্ছে মিশরের উপকূল। পশ্চিমের আকাশে বালি-ঝড়ের আলামত স্পষ্ট। তাপমাত্রা উঠেছে আশি ডিগ্রির বেশি। তবে হালকা বাতাস বইছে সাগরে। কোনাকুনি উত্তর দিকে রওনা হয়েছে মার্ভেল। জাহাজ নিয়ে গ্রিসের দিকে চলেছে গগল।

তারও অনেক পরে ব্রিজে এসে ঢুকল ডক্টর ফারা, মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'তোমাকে খুঁজছি,' বলল। 'এখানে বসে কী করছ?'

মন ভারী হয়ে আছে, জবাব দিল না রানা। পাল্টা জানতে চাইল, 'বোধহয় হেলেনের ব্যাপারে কিছু বলবে?'

'ও ভালই আছে,' ধপ করে পাশের চেয়ারে বসল ফারা। 'যদি কাল সকালে সুস্থ দেখি, ওকে ছেড়ে দেব। তোমার কী অবস্থা?'

'ভালই তো। আরেকবার শাওয়ার নিলে পুরোপুরি তরতাজা হয়ে উঠব।' সামনের ফাটা টেবিলের উপর অতি পুরনো এক চার্ট, ছুতোরের সি-ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে রেখেছে রানা। মার্ভেলে এসব রেখেছে এ জাহাজ বহু পুরনো সেটা প্রমাণের জন্য। কোনও বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্ করে সন্দেহ করবে না মার্ভেল নতুন জাহাজ, ভিতরে রয়েছে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট বা অস্ত্র। 'ওর

কাছ থেকে নতুন কিছু জানলে?'

'তেমন কিছু না। আমরা এখন পর্যন্ত যা জেনেছি, সেগুলো লিখছে উর্বশী। বলেছে, কাজ শেষ হবে একটু পর।'

রিস্টওয়াচের দিকে চাইল রানা, তবে খেয়াল করল না সময়। 'আমার মনে হয় না আপাতত জরুরি কোনও তথ্য পাব।'

'অনিল ও ফু-চুঙের কাজে সাহায্য করছে জলিল আর কাশেম, মনে হলো অতি উৎসাহী।'

'কারণটা আন্দাজ করছি। ওরা নিজেদের গোয়েন্দাগিরি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চাইছে হেলেনকে।'

'তাতে ক্ষতি নেই।'

'তা নেই। বাচ্চাদের মত করছে দুজন এক্সপার্ট কমাণ্ডো।'

প্রাচীন একটা ইন্টারকম রয়েছে বাল্কহেডের উপর, বেজে উঠল ওটা। ঠিক যেন যক্ষ্মা রোগীর কাশি: হওফ্-হওফ্-হউউফ্!

'রানা, উর্বশী বলছি।'

থাবা দিয়ে টক বাটন দাবাল রানা। 'বলো, উর্বশী।'

'বোর্ডরুমে মিটিঙের জন্য আমরা তৈরি। গগল, ফু-চুং, অনিল আর আতাসি পৌঁচেছে। সোহেল আসছে। ফারাকে পেলাম না। চলে এসো তুমি।'

'ফারা আমার সঙ্গে। আসছি।'

ছোট হাত দুটো ল্যাব কোটের ভিতর ঢোকাল ফারা, তারপর ঢুকে পড়ল এলিভেটরে। সরাসরি নামবে অপারেশন্স সেন্টারে, সেখান থেকে সহজে বোর্ডরুমে। ও অপেক্ষা করছে রানা এলিভেটরে এসে ঢুকবে।

'তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি,' বলল রানা। ব্রিজ উইঙে গিয়ে দাঁড়াল, হাওয়ার জোর বেড়েছে, উড়িয়ে নিতে চাইছে হালকা সুতির শার্ট। ডুবে গেছে সূর্য। আকাশে একে

একে ফুটছে লাল-নীল তারা। বড় করে শ্বাস নিল রানা, চাইল সাগরের দিকে। চেপে রেখেছে তিক্ত অনুভূতি। সবসময় ওকে টেনেছে সাগর-পাহাড়-মরুভূমি। সামনের মস্ত ঢেউ বা বালির উঁচু ঢিবির ওপারে কী, জানতে চেয়েছে। সবসময় এগিয়ে যাওয়ার এক নেশা, যেতে যেতে দূর থেকে দূরে অসংখ্য রহস্য টেনে নিয়েছে ওকে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এখন টানছে সাত শ' মানুষের হত্যারহস্য।

রানা জানে না কেন গোল্ড অভ মার্সে মরতে হলো এতগুলো মানুষকে। ও শুধু জানে, ভয়ানক অন্যায় হয়েছে তাদের উপর। এই অবিচারকে রুখতে হবে। উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে অপরাধীদের। মার্ভেলের ক্রু থেকে শুরু করে সবাই এটা অনুভব করছে। সোহেল-অনিল-ফু-চুং-গগল-উর্বশী-আতাসি-স্বর্ণা-জলিল-কাশেম—সবাই ওরা ওই প্রমোদ-তরী ও ওটার হতভাগা যাত্রীদের বিষয়ে যে যেভাবে পারে জোগাড় করছে তথ্য-উপাত্ত। কিছুক্ষণ পর তৈরি হবে পরিকল্পনা। তারপর কাজে নামবে ওরা, সামরিক অভিযানের মত হবে ওটা। এ কাজে দুনিয়ার সেরাদের অন্যতম ওরা। শীতল রেলিঙে দু'হাত রাখল রানা। মনের ভিতর গুছিয়ে নিল অগোছালো ভাবনা একটু পর ব্রিফিং। সবাই পরিষ্কার ভাবে নিজেদের বক্তব্য জানাবে। এরপর মন থেকে বিদায় নেবে রাগ ও ঘৃণা, থাকবে শুধু কর্তব্যবোধ। যারা শত শত মানুষ হত্যা করল, খুঁজে বের করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে ওরা।

একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, তারপর ঘুরে রওনা হলো এলিভেটরের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'এর বেশি আর কী করতে পারি আমরা। তোমাদের জীবন তো আর ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। যারা এখনও ওদের শিকারে পরিণত হয়নি, হয়তো

তারা বাঁচবে।'

কনফারেন্স রুমে ঢুকে ওর জন্য নির্দিষ্ট একটা চেয়ারে গিয়ে বসল ও। বাতাসে ভাসছে ঝাল-ঝাল সুঘ্রাণ। বাবুর্চি মোস্তফা আবুল হাজির করেছে ইথিয়োপিয়ান ডিশ। ইনজেরা—টক দই ও ময়দার রুটি, সঙ্গে ডজনখানেক নানা পদের সস্। কোনওটা ঠাণ্ডা, আবার কোনওটা আগুনের মত গরম, আর তেমনি ঝাল। টেবিলের মাঝে রেখেছে মুরগি, গরু ও খাসির মাংসের স্টু। সঙ্গে শাক-সব্জি ও চির্কি। শেষে ঝাল দেয়া দই। এগুলো খাওয়ার নিয়ম, চট্ করে ছিঁড়ে নিতে হবে রুটি, তার উপর ঢালতে হবে স্টু, এবার চুরুটের মত রুটি মুড়িয়ে নিয়ে কয়েক কামড়ে শেষ করতে হবে। দ্রুত না খেলে এবং সতর্ক না থাকলে নষ্ট হবে খাদকের জামাকাপড়। খাওয়া শেষে দেয়া হয় হলুদ বোতল থেকে ইথিয়োপিয়ান তেজ। এই ওয়াইন তৈরি করা হয় মধু দিয়ে। মিষ্টি সুবাস, ওই তেজ মেরে দেয় মুখের ঝালকে।

খেতে বসে টেবিলের চার পাশ দেখে নিল রানা।

সোহেল-গগল-ফু-চুং-অনিল-উর্বশী-ফারা—সবাই আছে।

হাজির জুনিয়ররাও। যে যার কাজ ভাগ করে নেবে।

মাত্র এক টুকরো রুটি নিল রানা। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। রুটি শেষ হলে বোতল থেকে ঢেলে নিল তেজ। একটু একটু করে চুমুক দিল।

পনেরো মিনিট পর শেষ হলো সবার খাওয়া। এবার মিটিং শুরু করল রানা।

'তোমরা সবাই জানো, দুটো কাজ এখন আমাদের সামনে। একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত। আমাদের প্রথম কাজ উর্বশীর ভাইকে রেসপন্সিভিস্টদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা। স্যাটালাইট ইমেজ ও অন্যান্য তথ্য যোগাড় করেছে অনিল ও ফু-

চুং। কমাণ্ডো স্বর্ণা, জলিল ও কাশেম নিজেদের দলকে নিয়ে তৈরি করছে ট্যাকটিকাল অ্যাসল্ট প্ল্যান। ওদের পরিকল্পনা শেষে আমরা বুঝে নেব, কোথাও কোনও ভুল রইল কি না। এবার নিজেদের ঠিক করে নিতে হবে অমলকে হাতে পাওয়ার পর কী করব।'

'ওকে কি ডিপ্রোগ্রাম করতে হবে?' জানতে চাইল ফারা। ভাবছে, সত্যিই বিশেষজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে ছেলেটাকে? হতেও পারে! হয়তো রেসপন্সিভিজমের খপ্পর থেকে বের করতে হবে ওকে।

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হয়,' বলল অনিল।

'তা হলে ওরা কি সত্যি কোনও কাল্ট?' ভারী শোনাল উর্বশীর কণ্ঠ। নিজের একমাত্র ভাই সঠিক নির্দেশনাহীন এক বখাটে, ভাবতে গিয়ে টনটন করে উঠল ওর বুক।

'যে-কোনও কাল্ট যা করে, তার সবই করছে ওরা,' বলল ফু-চুং। 'ওদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে কারিশম্যাটিক নেতা-নেত্রীরা। যারা এই সংগঠনের নয়, তাদেরকে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করছে সংঘের সদস্যরা। এমন কী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদেরও। কঠোর কিছু নিয়ম মেনে চলছে তারা। লিঙ্ক চ্যাপেলের জারি করা নির্দেশ রয়েছে কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাকে জোর করে হলেও ফিরিয়ে নিয়ে আসবে অন্য সদস্যরা।'

'ফিরিয়ে নিয়ে যায় কী করে?' জানতে চাইল রানা। 'মানসিক ভাবে চাপ সৃষ্টি করে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল অনিল। 'এমনও ঘটেছে কেউ সরে যেতে চেয়েছে, কিন্তু তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে বাড়ি থেকে। অন্য সদস্যরা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ফ্যাসিলিটিতে। নতুন করে দীক্ষা দেয়া হয়েছে আবার।'

'গ্রিসের ওই ফ্যাসিলিটির কথা আমরা জানি,' টেবিলের চারপাশের সবার দিকে একবার চেয়ে নিল রানা 'এদের হেডকোয়ার্টার ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। তারপর সরিয়ে আনা হয় গ্রিসে। বিকেলে ওই দুই হেডকোয়ার্টারের ছবি আমাকে দেখিয়েছে অনিল। এদের অন্য ফ্যাসিলিটিগুলোতে কী আছে?'

'ওদের আছে পঞ্চাশটার বেশি ক্লিনিক,' বলল অনিল। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে খুলেছে একটা করে। সিয়েরা লিয়োন, টোগো, আলবেনিয়া, হাইতি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স... এমন কী চিনেও রয়েছে এদের ক্লিনিক। এসব দেশের সরকারের কাছ থেকেও পর্যাপ্ত সহায়তা পেয়ে আসছে।'

'জেনে অবাক হয়েছি,' বলল ফু-চুং। 'আমি জানি চিনের সরকার মন থেকে ঘৃণা করে কাল্ট। সরকারী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো সর্বক্ষণ লড়ে চলেছে ফালুং গঙের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন সরকারের কেন্দ্র থেকে অনুমতি দেয়া হয়েছে রেসপন্সিভিস্টদের। ভাবছে ওরা হয়তো জনসংখ্যা কমিয়ে আনার কাজ করবে।'

'এবার দেখা যাক কীভাবে অমলকে সাহায্য করা যায়,' বলল রানা। 'আমরা কোনও ডিপ্রোগ্রামারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি?'

'হ্যাঁ,' বলল গগল। মৃদু হাসল উর্বশীর দিকে চেয়ে।

'বলতে গেলে কিডন্যাপ করতে চলেছি আমরা অমলকে,' বলল অনিল। 'কাজেই যতদ্রুত সম্ভব ওকে গ্রিস থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আমরা চাই না স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কোনও বিবাদে জড়াতে।' গগলের দিকে চাইল অনিল।

'একজন কাউন্সেলার রোমে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন,'

শুরু করল গগল। 'তোমরা জানো একটা গালফ-স্ট্রিম জেট প্লেন তৈরি থাকবে। ওটা রিভিয়েরা থেকে নামবে এথেন্স এয়ারপোর্টে। তারপর অমলকে নিয়ে যাবে ইতালিতে। কলোসিয়ামের কাছে একটা হোটেলে সুইট বুক করেছি। ওই ডিপ্রোগ্রামারের নাম লিয়োনার্দো চার্চ। তিনি বিশেষ করে রেসপন্সিভিস্টদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তাঁর কারণে মোহমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছে অনেকে। এই বিষয়ে তিনিই বর্তমান দুনিয়ার সেরা কাউন্সেলার।'

'নিজে আগে রেসপন্সিভিস্ট ছিলেন?' জানতে চাইল রানা। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা আগে কোনও কাল্টের সঙ্গে ছিলেন। পরে হয়ে উঠেছেন ডিপ্রোগ্রামার। এখন উল্টো লড়াই করছেন ওই কাল্টের বিরুদ্ধে। প্রায়ই এমন হয়: নেশাখোর মাদক ছেড়ে দিয়ে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মাদকাসক্তদের নেশা ছাড়াতে। এরাই হয় দক্ষ কাউন্সেলার।

'তা ছিলেন না,' বলল অনিল। 'তবে এঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ওই গোষ্ঠীকে বিলীন করা। উনি আড়াই শ'র বেশি লোককে চিকিৎসা দিয়েছেন। এরা গত দশ বছরে রেসপন্সিভিজম থেকে সরে গেছে।'

'উনি তার আগে কী ছিলেন?'

'ছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। ফী দেখে চমকে উঠবে বেশিরভাগ মানুষ। বিশ হাজার ডলার ফী, সঙ্গে অন্যান্য খরচপাতি তো আছেই। তবে আশা করা যায়, তাঁর কাজ শেষে স্বাভাবিক-সুস্থ জীবনে ফিরবে অমল।'

'ভাল হলেই ভাল, নইলে জবাব দিতে হবে তার আমার কাছে,' ভুরু কুঁচকে উঠল উর্বশীর।

'এক লোক জীবিকা নির্বাহ করছে মানুষকে ডিপ্রোগ্রামিং

করে, তার মানে ওই গোষ্ঠী যথেষ্ট বড়,' বলল আতাসি। 'ওদের সদস্য কত?'

'অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের বক্তব্য অনুযায়ী ওদের সদস্য এক লাখের বেশি,' বলল অনিল। 'এদিকে লিয়োনার্দো চার্চের সাইটে লিখেছে, ওই সংগঠনের সদস্য-সংখ্যা আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার মত। যাই হোক, ওদের আছে হাজারে হাজারে সদস্য। সঙ্গে রয়েছে নামীদামি কিছু হলিউডি সেলিব্রেটি। এসব তারকাদের কারণে হুড়মুড় করে রেসপন্সিভিস্টদের সংগঠনে ভিড় করছে সাধারণ মানুষ।'

'ধর্, চার্চের সঙ্গে দেখা করলাম, কী হবে আমার কাভার স্টোরি?' জানতে চাইল রানা।

'আমার রিপোর্টে সব লিখেছি,' বাইণ্ডার তুলে দেখাল সোহেল। 'উর্বশী রিয়াল-এস্টেট ডেভেলাপার, লস এঞ্জেলেস থেকে এসেছে। ওর ভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমরা একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি। উর্বশী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, কাজেই সঙ্গে গেছে ফু-চুং, সব ধরনের কোঅর্ডিনেট করবে। আমি যখন চার্চের অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, মনে হলো না অবাক হয়েছে। আগেও এ ধরনের কাজ নিয়েছে তারা।'

'বেশ, আমাদের কাজ অমলকে ছিনিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া। গালফ-স্ট্রিম জেট তৈরি থাকবে, নিয়ে যাবে ওকে রোমে।' চট্ করে আরেকটা কথা মনে পড়ল রানার। 'অমলের পাসপোর্ট বোধহয় নিয়ে নিয়েছে রেপন্সিভিস্টরা, ওর নতুন একটা দরকার পড়বে।'

'ওটা কোনও সমস্যা নয়,' বলল সোহেল। 'উর্বশীর মা ই-মেইলে অমলের ছবি পাঠিয়েছেন। আমাদের কাছে খালি

পাসপোর্ট আছে, নতুন একটা তৈরি করে দেবে মোফিজ বিল্লাহ।'

'এবার আসা যাক দুই নম্বর সমস্যায়,' বলল রানা। 'গোল্ড অভ মার্সে কী ঘটেছে? এবং কেন? আমরা এ বিষয়ে কতটুকু জেনেছি?'

ল্যাপটপের চাবি টিপতে শুরু করেছে অনিল, স্ক্রিনে ফুটে উঠল তথ্য। 'গোল্ড অভ মার্সের সিস্টার শিপ রয়েছে। ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্সের আরও দুটো জাহাজঃ পার্ল অভ মুন ও ডায়মণ্ড অভ নেপচুন। এই কোম্পানির অফিস ডেনমার্কে। ব্যবসা করছে আশির দশক থেকে। আর সব ক্রুজ লাইন্সের মত এদের রয়েছে ক্যারিবিয়ান, মেডিটারেনিয়ান ও দক্ষিণ সাগরে প্রমোদতরী। কোনও দল বিশেষ কোনও উৎসবে ভাড়া নেয় জাহাজ।

'চার মাস আগে এই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয় রেসপন্সিভিস্ট সংগঠনের। ঠিক হয় ফিলিপিন্স থেকে পাঁচ শ' চব্বিশজন রেসপন্সিভিস্টকে পৌঁছে দিতে হবে গ্রিসে। সেই সময় একটা মাত্র জাহাজ পাওয়া যায়, সেটা গোল্ড অভ মার্স।'

'মনে হয় বহু লোক লাগে ওসব ক্লিনিকে,' মন্তব্য করল রানা।

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' বলল অনিল। 'কাজেই কাদা খুঁড়তে শুরু করেছি। রেসপন্সিভিস্টদের ওয়েব সাইটে ওই ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু নেই। ওই সংগঠন থেকে জানানো হয়নি এত লোক সরিয়ে নেয়া হবে ফিলিপিন্স থেকে। ...আরও আছে...'

'বলতে থাক,' বলল রানা।

'ফু-চুঙের নিয়ে আসা লগ অনুযায়ী এরা ম্যানিলা ছেড়েছে সতেরো তারিখে। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। সব ছিল স্বাভাবিক।'

'মানুষগুলো সব মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত,' বলল সোহেল।

কাঁধ ঝাঁকাল অনিল। 'সবাই মরেনি। ইউএভির কম্পিউটারের ডিস্ক খুঁজে দেখেছি। যখন জাহাজের উপর ঘুরছে খুদে বিমান, তখন অন্য কিছু দেখেছে। গোল্ড অভ মার্সের একটা লাইফ বোট কম ছিল।' রানার দিকে চাইল অনিল, মুখটা আরক্তিম। 'গতকাল এটা খেয়াল করিনি।'

'হতেই পারে, আপনারা ব্যস্ত ছিলেন হাসপাতাল থেকে মানুষ উদ্ধার করার কাজে,' সান্ত্বনা দিল আতাসি।

ফারা গম্ভীর হয়ে অন্য দিকে চাইল।

'জাহাজের কম্পিউটারের লগ অনুযায়ী, আমরা ওখানে পৌঁছুবার আট ঘণ্টা আগে সাগরে নামানো হয় ওই লাইফ বোট।'

'তার মানে খুনি বা খুনিরা ক্রুজে পুরো সময় জুড়ে ছিল?'

'তাই তো মনে হয়। ফু-চুং আর আমি ক্রুজ লাইন্সের কম্পিউটার হ্যাক করেছি। ওদের যাত্রী ম্যানিফেস্ট ও ক্রুদের লিস্ট পেয়েছি। কিন্তু জানার উপায় নেই ওই জাহাজে কতজন মারা গেছে। জাহাজ তলিয়ে না গেলে জানা যেত কারা খুনি।' সবার পরের প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দিল অনিল, 'পুরো লিস্ট খুঁজে দেখেছি। এ যাত্রায় কোনও ক্রুকে সরিয়ে দেয়া হয়নি। নতুন কেউ যোগও দেয়নি। নতুন করে বাদ পড়েনি বা যোগ হয়নি কোনও যাত্রী। সব ছিল স্বাভাবিক। যাদের থাকবার কথা, তারাই ছিল জাহাজে।'

'তা হলে মানুষগুলোকে খুন করল কে?' জানতে চাইল ফারা।

'যদি আন্দাজ করতে হয়, আমি বলব, নিজেরাই নিজেদের শেষ করেছে রেসপন্সিভিস্টরা। তবে এরা জিম জোন্সের

জনগণের মন্দির, বা জাপানের ওউম শিনরিকিয়োর কাল্টের মত নয়। অনেকে বলে অতিরিক্ত রেসপন্সিভিজম দেখাতে গিয়ে মরেছে লিঙ্ক চ্যাপেল। তবে এই দল আত্মহত্যাকে সমর্থন করে না। এরা বলে, যেহেতু তুমি পৃথিবীতে চলে এসেছ, তোমার দায়িত্ব এই বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেয়া, নিজেকে শেষ না করা। ...অন্য কিছুও হতে পারে, হয়তো তাদের ভিতর ঢুকে পড়ে শত্রুরা।'

'কাউকে সন্দেহ হয়?'

উর্বশী বলল, 'ওরা যেহেতু জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সন্তান ফেলে দেয়ার ব্যাপারে অবস্থান নিয়েছে, সেহেতু কয়েক বছর ধরেই ভ্যাটিকানের সঙ্গে লড়ছে। বেশ কিছু খ্রিস্টান অর্গানাইজেশন রেসপন্সিভিস্টদের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এক উন্মাদ খুন করল কোনও অ্যাবোর্শন ডাক্তারকে, এটা হতে পারে। কিন্তু এত মানুষকে খুন করা... এটা হাইলি অর্গানাইযড এবং ওয়েল ফাণ্ডেড টিমের কাজ। কয়েকজন পাদ্রী বা নান ঢুকে পড়বে শক্তিশালী কোনও কাল্টে, খুন করবে শত শত মানুষকে, এটা হয়?'

'এরা বোধহয় একদল যিলট*,' বলল আতাসি। 'রেসপন্সিভিস্টদের কাউন্টার কাল্ট। হয়তো আগে এ সংগঠনের সদস্য ছিল। ...রেসপন্সিভিস্টরা কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণ না, আমার ধারণা আরও গূঢ় কোনও ব্যাপারে জড়িত!'

'বলতে থাকো, আতাসি,' উৎসাহ দিল রানা।

---

* zealots. এরা একদল বিদ্রোহী ইহুদি, লড়াই করে প্রাচীন রোমানদের বিরুদ্ধে।

লেবানিজ ইন্টেলিজেন্সের এই এজেন্ট পারতপক্ষে মুখ খোলে না, কিন্তু মাথায় রাখে তুখোড় বুদ্ধি। হয়তো বেরিয়ে আসবে নতুন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি। 'বস্, কখনও মেমব্রেন থিওরির কথা শুনেছেন?'

'না শোনার মতই।'

'জিনিসটা বিদঘুটে। ঠিক বোঝাতে পারব না।' অন্যদের দিকে চাইল আতাসি। 'আপনারা কেউ বোঝাতে পারেন?'

মাথা দোলাল ফু-চুং। 'আইনস্টাইন ইউনিভার্সের যে চারটি শক্তিকে গুছিয়ে বলতে পারেননি, সেটা এক কথায়—আমাদের চারমাত্রিক বিশ্ব। এটাতে রয়েছে একটি মাত্র মেমব্রেন। কিন্তু এই ইউনিভার্সেরই অন্য ডাইমেনশনে আরও কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলো আমাদের এতই কাছে যে যিরো-পয়েন্ট ম্যাটার ও এনার্জি সেগুলোর ভিতর দিয়ে বইছে। এবং আমাদের এই ইউনিভার্সের মাধ্যাকর্ষণের শক্তি সেই ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। খুবই প্যাঁচালো ব্যাপার। এর ফলাফল নিয়ে ভাবছে মস্ত সব পদার্থ বিজ্ঞানী।'

'তোর সব কথা মেনে নিলাম,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা।

'তা ছাড়া উপায় কী?' খুকখুক করে কাশল সোহেল। 'কে-ই বা বুঝবে এই মাল! ফু-চুং ওর চৈনিক মগজ দিয়ে বোম-বোম জিনিস ঝাড়ছে!'

এই দুই বন্ধুর বিমর্ষ চেহারা দেখে হেসে ফেলল ফারা।

'আরও কিছু বলবি?' করুণ স্বরে জানতে চাইল সোহেল। ভাব দেখে মনে হয় মাস্টারের পড়া তৈরি না করে শাস্তি পেয়েছে।

'আমি কিন্তু এখনও শুরু করিনি,' বলল ফু-চুং। 'এই মেমব্রেন থিওরি নব্বুই দশকে টেনেছে থিওরেটিকাল

ফিযিসিস্টদের। আর ওই রেসপন্সিভিজমের প্রণেতা লিঙ্ক চ্যাপেল ব্যাপারটাকে আরও এগিয়ে নিল। তার ধারণা, আমাদের এই ইউনিভার্স থেকে শুধু কোয়ান্টাম পার্টিকেলই আসা-যাওয়া করছে না, আরও বেশি কিছু ঘটছে। ফোর্থ ডাইমেনশন থেকে সেই ফাঁক গলে চলে আসছে অপার্থিব ইন্টেলিজেন্স: ভিন্ন ইউনিভার্সের অচিন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন। প্রতিনিয়ত আমাদেরকে তাদের ইচ্ছেমত চালাবার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু আমরা টের পাই না। আমাদের সব কষ্ট-যাতনার মূলে ওই বিজাতীয় প্রাণী। ভদ্রলোক মারা যাওয়ার কিছু দিন আগে শিষ্যদের শেখাতে লাগল, কী করে কমিয়ে আনা যায় তাদের প্রভাব, কীভাবে উদ্ধার মিলবে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর কবল থেকে।'

'আর ওই বস্তা-পচা মাল বেমালুম গিলল কেউ?' তিক্ত হাসল উর্বশী। রেগে গেছে। ওর ভাইটা আস্ত গাধা, না কী?

'হ্যাঁ, মানুষ ওই থিওরি লুফে নিল। যারা দুর্বল, বিশ্বাস রাখল ওটার উপর। বিশ্বাস রাখলে নিজের মনের জোর বাড়ে, অনেক লাভ হয়। ধরা যাক, এক লোকের কপাল খুলছে না, মন খারাপ, একের পর ভুল করছে, কষ্টেসৃষ্টে জীবন চলছে—তার মানে এসব ঘটছে শুধু ওই অনেক দূরের এক মেমব্রেনের কারণে। আমি প্রমোশন পেলাম না ওই ভিনগ্রহের প্রাণীর কারণে! প্রেমের সম্পর্ক ভাঙল, ওই কসমিক শক্তি বারোটা বাজিয়েছে আমার প্রেমের! ...আসল কথা, আমার নিজের দোষে কিছু ঘটছে না। যদি এভাবে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া যায়, নিজের কোনও দায়-দায়িত্ব থাকে না। রেসপন্সিভিজম জুগিয়ে দিয়েছে জুতসই, এই শক্তিশালী যুক্তি—এই

দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রা ভাল চলছে না, এ আমার নিজের কারণে নয়. এই সব ঘটছে শুধু নিয়তি বা ওই মেমব্রেনের শয়তানির জন্য।'

'ফাস্ট-ফুডের কোম্পানিগুলোর নামে আদালতে মামলা করছে মানুষ, কারণ তারা ওদের বেশি বেশি খাইয়ে মোটা করে তুলছে,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, 'এখানে মোটিভেশনটা বুঝতে পারি। ভাবছে, মামলায় জিতলে অনেক টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু কোনও লোক একটা জাহাজ তলিয়ে দিল, তার আগে খুন করল শত শত মানুষকে, কীসের মোটিভেশন?'

'এমনও হতে পারে এই মানুষগুলো কাল্ট থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে,' বলল ফু-চুং। 'কাজেই উল্টোপাল্টা করলে কী ঘটবে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে গোষ্ঠীর নেতারা। অনিল তো আগেই বলেছে, এরা এমন কী কিডন্যাপও করতে পারে। তার পরের ধাপ কিন্তু খুন, হয়তো ঠিক তা-ই করেছে ওরা!'

ভাইয়ের কথা ভেবে একটু চমকে গেল উর্বশী।

'হতে পারে,' বলল অনিল। একবার উর্বশীর দিকে চাইল। 'অমল ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে, ওদের কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে না। কিন্তু ওকে সরিয়ে আনতে গেলে কী ঘটতে পারে, সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। ...তোমার সামনে এ নিয়ে আলাপ করতে চাইনি, উর্বশী, তবে...'

'উর্বশী, তুমি এই মিটিং বাদ দিয়ে কেবিনে ফিরতে পারো,' নরম স্বরে বলল রানা।

'না, আমি থাকব,' জেদ প্রকাশ পেল উর্বশীর কণ্ঠে। 'আমার ভাইয়ের বিষয়টা আমাকে বিব্রত করছে, সেই সঙ্গে কষ্টও লাগছে। ওর সঙ্গে জড়িত যে-কোনও বিষয় আমার জানা উচিত। ...কী বলব... মন বলছে, উচিত ছিল ওকে অনেক বেশি সময়

দেয়া। তা পারিনি আমি। নইলে এমন বখাটে হতো না। যদি আরও অনেক ভাল বোন হতাম, ও চলে যেত না ভুল পথে।'

উর্বশীর কথাগুলো হাহাকারের মত মিলিয়ে গেল বাতাসে, ঘরের পরিবেশ থমথম করছে। গগল কঠোর মানুষ, যা বলে সরাসরি বলে। কাউকে ছাড় দেয় না। আধ মিনিট পর মুখ খুলল সে. 'উর্বশী. আমি বড় হয়েছি খুব বিশ্রী পরিবেশে আমার বাবা ছিল মাতাল। প্রায় রাতেই পেটাত আমাকে, আমার মাকে। লোকটা যখনই ভোদকার বোতল কিনতে পারত, বেহেড মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে পেটাত আমাদের। কচি বয়সে কত দুঃসহ হতে পারে জীবন, আমি দেখেছি। আমার মা একরাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। আমি বেরিয়ে এলাম ওই বস্তি থেকে। আর কখনও ফিরিনি। এরপর একদিন শুনলাম ওই লোকের গলা ফাঁক করে দিয়েছে এক পতিতা। সে তো মরল, কিন্তু আমার মনে কোনও কষ্ট রইল না। রাস্তায় রাস্তায় থেকেছি। নিউজ পেপারের হকার হয়েছি। মানুষের জুতো কালি করেছি। আরও কত কী—কিন্তু লেখাপড়া চালিয়ে গেছি। বড় হতে হবে আমাকে! ...একটা কথা উর্বশী. মানুষের পারিবারিক জীবন আসল, ওটা নিয়ন্ত্রণ করে সবার জীবনকে। তুমি নিজেকে গড়ে তুলেছ, চাইলে যেতে পারতে খারাপ পথে—তা যাওনি। তুমি যদি বাড়িতে বেশি সময় দিতে, হয়তো তোমার ভাই অনেক কিছু শিখত। কিন্তু, তা না-ও হতে পারত। কী হতো বা কী হতো না, নিশ্চিত হয়ে বলবে কে? এ হিসাব কারও মেলে না। মূল কথা: অমল যা চেয়েছে, ও তা-ই হয়েছে। ...এ নিয়ে নিজেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

গগল সম্বন্ধে এ তথ্য রানা ছাড়া কেউ জানত না, চোখ নিচু করে হাতের দিকে চেয়ে রইল উর্বশী।

কিছুক্ষণ পর গগল বলল, 'ফু-চুঙের থিওরি নিয়ে অন্য কারও মতামত?' আর্মস ডিলার চাইছে ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক হোক।

'আমরা রেসপন্সিভিস্টদের কম্পিউটার সিস্টেমে হ্যাক করতে পারি,' বলল অনিল। 'নতুন কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। তবে খুব একটা এগুতে পারব না সদস্য লিস্ট পেলে। তাদের কে ভাল আর কে মন্দ, নিশ্চয়ই লিখে রাখেনি।'

'তবুও চেষ্টা করে দ্যাখ,' বলল রানা। আলোচনা শুরু হওয়ায় মনে মনে হাঁফ ছেড়েছে। 'এরা যা করছে সেসবের সঙ্গে ক্রস রেফারেন্স কর্ যাত্রীদের ম্যানিফেস্টকে। বেরিয়ে আসতে পারে জরুরি তথ্য। ওই লোকগুলো যদি কাল্ট থেকে বেরিয়ে না গিয়ে থাকে, তো অন্য কিছু ঘটেছে।' ঘড়ি দেখল রানা। 'একটা ব্যাপার জানা দরকার—ফিলিপিন্স-এ রেসপন্সিভিস্টদের এত লোক কেন ছিল? এর জবাব পেলে হয়তো মিলবে জোরালো ক্লু।'

মুখে বলল না মিটিং শেষ, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপাতত আমার ছুটি। গগল, কারও সন্দেহ না জাগিয়ে এগুতে থাকো গ্রিসের দিকে। পানিতে ভরে নাও ট্যাঙ্ক। কালো ধোঁয়া তোলো চিমনি দিয়ে। ডেকে অস্বাভাবিক কিছু না থাকলেই হলো। সবার বিশ্রাম শেষ হলে জলিলদের সঙ্গে আলাপ সারব। অমলকে বের করে আনার প্ল্যান চূড়ান্ত হবে তখন।'

ঠিক করেছে রানা, আগামী দু'দিনের ভিতর ছেলেটাকে তুলে দেবে ডিপ্রোগ্রামারের হাতে। এরপর সোজা রিভিয়েরা। কান-পাতার কাজ শেষে, ওদের সত্যিকারের ছুটি। সেই ছুটির ভিতর খুঁজে বের করতে হবে হতভাগ্য মানুষগুলোর হত্যাকারীদের!

কানের ভিতর রেডিও ইয়ারবাড ভাল করে গুঁজে নিল রানা, টোকা দিল থ্রোট মাইকে। সবাই বুঝে নেবে, ও পৌঁছে গেছে ঠিক জায়গায়। নীচের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছড়ানো-ছিটানো দালানগুলো সিমেন্টের ব্লক দিয়ে তৈরি সাদা রঙ করা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কম্পাউণ্ডের পিছনে পাথুরে সৈকত। ওখান থেকে এক শ' ফুট গেছে কাঠের জেটি গালফ অভ কোরিন্থ-এ। ঝিরঝিরে বাতাসে নোনা পানির সোঁদা গন্ধ। জোয়ার আসছে।

দালানগুলোর দিকে চাইল রানা। স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে জমি-ছোঁয়া নিচু দালান। থার্ড জেনারেশন নাইট ভিশন গগলসের কারণে ছাতের ব্যারেল টাইলস লাগছে কুচকুচে কালো। শেষ ব্রিফিঙে দেখেছে রানা, আসলে ওগুলো লাল টালি। খরার কারণে মারা পড়েছে লনের বাদামি ঘাস আর এদিক-ওদিকে দাঁড়ানো বাঁকাচোরা জলপাই গাছ।

রাত তিনটে।

সামান্য আলো আসছে স্ট্র্যাটিজিক্যালি বসানো কিছু ল্যাম্পপোস্ট থেকে। দেয়ালের উপর মনোযোগ ফেরাল রানা। ওটা দশ ফুট উঁচু। দুই স্তরে সিমেন্টের ব্লক, বেশ পুরু। কম্পাউণ্ডের এদিকটা দৈর্ঘ্যে আট শ' ফুটের মত। ইউরোপে

অনুপ্রবেশকারীকে ঠেকাতে দেয়ালের উপর বসানো হয় চোখা কাঁচ। কিন্তু গতকাল কাছের কোরিন্থ শহরে একমাত্র সিকিউরিটি কোম্পানিতে ঢুঁ দিয়েছে উর্বশী ও রানা। পরিচয় দিয়েছে, ওরা আমেরিকান দম্পতি, কিছুদিন আগে বাড়ি কিনেছে সাগর-তীরে। ওদের ইচ্ছে: বাড়িতে বসাবে অ্যালার্ম সিস্টেম। ওই দোকানের মালিক জানিয়েছে, রেসপন্সিভিস্টদের বিশাল এক কম্পাউণ্ডের সমস্ত সিকিউরিটি সিস্টেম সে নিজে বসিয়েছে। গর্ব করে দেখিয়েছে আট বাই দশ ইঞ্চির ঝলমলে এক ছবি। ওটা প্রমাণ করে, সে ওই কম্পাউণ্ডে কাজ করেছে। অটোগ্রাফ দিয়েছে স্বয়ং অভিনেত্রী পার্লা মোনা।

এখানে এসেই প্রথমে রানার চোখে পড়েছে দেয়ালের উপর ট্রিপ ওয়ায়ার। এ ছাড়া রয়েছে অনেকগুলো ক্যামেরা। মার্ভেলের টিম চারপাশ দেখে জানিয়েছে, শুধু বাইরেই রয়েছে তেরোটা ক্যামেরা। দালানগুলোর ভিতর আরও বেশি থাকতে পারে।

পাথরের প্রধান ড্রাইভওয়েকে থামিয়ে দিয়েছে সিঙ্গল রোলিং গেট। ফ্যাসিলিটির পিছন দিকে ছোট আরেকটা গেট, ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় জেটিতে। কম্পাউণ্ডের দেয়াল থেকে বেরিয়েছে এক জোড়া চেইন লিঙ্কের বেড়া, সৈকতের দু'পাশ থেকে কেউ এলে তাকে ঠেকাবে।

কোথাও লেখা নেই: *অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ।* তবে যে-কেউ বুঝবে বেড়া ডিঙানো চলবে না। বোধহয় নিজেদের সদস্যদেরই সাবধান করা হচ্ছে এভাবে, ভাবল রানা। বেরিয়ে যাওয়া চলবে না, থাকতে হবে কম্পাউণ্ডের ভিতর!

চারপাশের বিশাল উঠান দেখে নিল রানা। প্রধান দালানের সামনে পার্ক করা তিনটে জিপ। থার্মাল স্ক্যান জানিয়ে দিল ইঞ্জিনগুলো ঠাণ্ডা। গোটা কম্পাউণ্ডে অজস্র ফুটপাথ, সেখানে

টহল দিচ্ছে না গার্ডরা। কোনও কুকুর নেই। ছাতের পাশে বা ল্যাম্প পোস্টের উপর নড়ছে না কোনও ক্যামেরা। বোধহয় দালানের ভিতর সিকিউরিটি স্টেশন, সেখানে রয়েছে কিছু মনিটর, ওগুলোর উপর চোখ রাখছে কোনও গার্ড। এটা হতেই পারে, তাই সোহেলের নেতৃত্বে স্বর্ণা ও কাশেমকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে রানা। ওরা মার্ভেল থেকে কপ্টারে উঠে আগেই পৌঁছে গেছে এথেন্সে। এখানে এসেছে ভাড়া গাড়িতে করে।

সোহেল ও স্বর্ণা উপকূলীয় সড়কের ওপাশে এক জলপাই বাগানে ঢুকেছে। ওখান থেকে নজর রেখেছে ফ্যাসিলিটির উপর। একটা মানচিত্র তৈরি করেছে ওরা, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটি ক্যামেরা কোথায় এবং ঠিক কোনদিকে রয়েছে ব্লাইণ্ড স্পট। সর্বক্ষণ মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রেডিওতে। ওরা আন্দাজ করেছে, রেসপন্সিভিস্ট কম্পাউণ্ডে এখন কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশজন সদস্য রয়েছে। অবশ্য সব দালানে মানুষ থাকলে, লোকসংখ্যা এর দ্বিগুণও হতে পারে।

পরিকল্পনা তৈরি হতেই চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়েছে কৌশল। এদিকে সোহেলের নেতৃত্বে শোর টিম অন্যান্য কাজ সেরেছে। ভাড়া নেয়া হয়েছে গাড়ি, ঠিক করা হয়েছে পালানোর সময় কোন পথে যাবে। খুব কাছেই জায়গা খুঁজে বের করেছে সোহেল। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ সহজে নামাতে পারবেন কপ্টার। অমলকে তুলে দেয়া হবে কপ্টারে, পরিয়ে দেয়া হবে এভিয়েশন অ্যাপ্রন, এরপর সোজা এথেন্স এলফথেরিয়োস ভেনিযেলোস ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এদিকে গালফ-স্ট্রিম একযিকিউটিভ জেট নিয়ে মণ্টিকার্লো থেকে পৌঁচেছে রানার পরিচিত এক বাঙালি ক্যাপ্টেন। অমলকে পৌঁছে দেবে সে রোমে। পেপার ওঅর্ক আগেই শেষ। রোমে তৈরি থাকবে একটা

লিমাযিন।

কিন্তু যদি সব ঠিক ভাবে না ঘটে? তারও ব্যবস্থা রয়েছে। একপলকে বদলে নেবে ওরা পরিকল্পনা। খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ে এমন ভাবে আলাপ হয়েছে, একটু চমকেই গেছে জুনিয়ররা—এত রকম বিষয় মাথায় রাখেন সিনিয়ররা? যেমন ওই মিস্টার গগল, উনি দেখেছেন টাইডাল চার্ট, জানিয়ে দিয়েছেন ঠিক কোন্ সময়ে ছিনিয়ে নিতে হবে অমলকে।

নিজের কাঁধে এ কাজ নিয়েছে রানা। তবে সোহেলের নির্দেশে চলবে শোর টিম, ওরা ঠিক সময়ে ঢুকে পড়বে রেসপন্সিভিস্টদের কম্পাউণ্ডে, শুরু হবে সাঁড়াশি আক্রমণ। কে কী করছে তা বুঝে নিয়ে নির্দেশ দেবে সোহেল।

'কাজ থেকে এক মিনিট দূরে,' কানের ভিতর ফিসফিস শুনতে পেল রানা। 'আর আধ মিনিট, রানা।'

ট্র্যান্সমিট বাটন টিপে জানিয়ে দিল রানা, ও শুনেছে। ওর দু'কোমরে ঝুলছে হোলস্টার, দ্রুত হাতে গ্লক ১৯এস পরীক্ষা করে নিল। একটানে উঠে আসছে। বাধ্য না হলে ব্যবহার করবে না। এটা কোনও কিলিং মিশন নয়। মার্ভেলের আর্মারি থেকে ওরা নিয়েছে হালকা গ্লক নাইন এমএম রাউণ্ড। ভিতরে রয়েছে শুধু অর্ধেক চার্জ। সীসার বদলে প্লাস্টিকের বুলেট। খুব কাছের রেঞ্জে ওই বুলেট যে কাউকে হত্যা করবে। তবে পনেরো ফুটের বেশি দূরের কাউকে শুধু জোর ধাক্কায় বিহ্বল করবে, অচল করে দেবে দশ মিনিটের জন্য।

এক এক করে মুহূর্ত পেরিয়ে চলেছে, তারপর যেন কারও ইঙ্গিত পেয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সরু চাঁদ। রাত হয়ে উঠল জমাট কালো। খুব অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেল রানা। রবিনসন আর-৪৪ নিয়ে পজিশন নিয়েছেন আলম সিরাজ।

'তুমি তৈরি?' আতাসির দিকে চাইল রানা। ওরা আছে রাস্তার পাশে শুকনো এক ডোবার ভিতর।

পাশেই উঁবু হয়ে বসেছে আতাসি, মুখে ক্যামোফ্লেজ রং। নিচু স্বরে বলল, 'তিনদিনে দুটো মিশন, বস্, আমি আবার তরুণ হয়ে উঠছি!'

'নতুন কিছু শিখছ। এই প্রথম কম্পিউটার হ্যাক করবে।'

নিজের ডান আস্তিনের দিকে চাইল রানা। ওখানে সেলাই করে আটকে দেয়া খুব ছোট একটা ফ্লেক্সিব্‌ল্ কম্পিউটার স্ক্রিন। ই-পেপারের রেযোলিউশন ঠিক স্ফটিকের মত পরিষ্কার। ওটার স্ক্রিনে হাজার ফুট উপর থেকে দেখানো হচ্ছে রেসপন্সিভিস্টদের কম্পাউণ্ড। দূরে একটা ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছে উর্বশী, ও রয়েছে ইউএভি-র কন্ট্রোলে। ক্যামেরা জুম করা হয়েছে, ফলে ফ্যাসিলিটির চারপাশের সব চোখে পড়ছে। তবে তার চেয়েও জরুরি, রানা দেখতে পাবে উঠানে কে কোথায় কী অবস্থানে রয়েছে। ডক্টর শামশের আলীর এই এক্সপেরিমেণ্টাল স্ক্রিন বড় বেশি আলো ছিটিয়ে চলেছে। খুদে নব ঘুরিয়ে আলো কিছুটা কমিয়ে নিল রানা। জিনিসটার ব্যাটারি ও কম্পিউটার সেলাই করে আটকে দেয়া হয়েছে কমব্যাট ভেস্টের পিছনে।

'চলো!' সোহেলের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। আতাসির কাঁধে টোকা দিল ও। একই সঙ্গে ডোবার ভিতর থেকে উঠে এল ওরা, পেরিয়ে গেল রাস্তা। বুটের নরম সোলের কারণে সামান্যতম আওয়াজ নেই।

সিমেণ্ট-ব্লকের দেয়ালের কাছে পৌঁছে পিছন ফিরল আতাসি, তারপর একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। একসঙ্গে পেতে দিল দু'হাত। সেগুলোর উপর পা রেখে উঠল রানা, তারপর কাঁধে। এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল আতাসি।

দেয়ালের মাথার উপর হাত রাখল না রানা, দু'সেকেণ্ড লাগল ভারসাম্য ঠিক করে নিতে। আগে থেকে না জানলে হাত দিত দেয়ালের মোনোফিলামেণ্ট সিকিউরিটি ট্রিপ ওয়ায়ারের উপর। ওটা প্রায় চোখেই পড়ে না। কম্পাউণ্ডের চার দেয়ালের উপর এ জিনিস. বাইরের দিকে আধ ইঞ্চি স্ট্রিপ। সঙ্গে ডজন খানেক অতি ক্ষুদ্র ইনসুলেটর। আন্দাজ করল রানা, দশ পাউণ্ডের কম ওজন কেটে দেবে স্ট্রিপ, মুহূর্তে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। কোমরের থলি থেকে ভোল্টমিটার বের করল ও, পরীক্ষা করে নিল পলকা স্ট্রিপ। কাজ শেষে বেছে নিল তার দিয়ে জোড়া দুটো অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প। তিন ফুট দূরত্বে এঁটে বসল ওগুলো ওয়ায়ারের সঙ্গে। বাইপাস হয়ে যেতেই কেটে দিল ওয়ায়ার। কান পাতল। পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল, হৈ-চৈ নেই, বাজতে শুরু করেনি ক্ল্যাক্সন, বাতি জ্বলে ওঠেনি কোনও দালানে।

আতাসির দেহ নড়ছে না, কিন্তু উপরে উঠে গেছে ডানহাত। ওর কাছ থেকে কার্বন-ফাইবার কাপড় নিল রানা, বিছিয়ে দিল দেয়ালের উপর, তারপর উঠে পড়ল। ক্ষুরের মত ধারাল কাঁচের টুকরো বিঁধল না বুটের ভিতর। কিছুদিন হলো এই হাই-টেক কাপড় আবিষ্কার করেছে বিসিআইয়ের গবেষকরা। প্রায় নিঃশব্দে আঙিনার ভিতর নামল রানা, একটু সরে দাঁড়াল। আধ মিনিট পর বাইরে থেকে এল ধস্তাধস্তির আওয়াজ। তারপর দেয়ালের উপর আছড়ে-পাছড়ে উঠল আতাসি, ধুপ করে নেমে এল এদিকের মাটিতে।

ওর ধস্তাধস্তি দেখে মুচকি হাসল রানা। থ্রোট মাইকে জানিয়ে দিল, 'আমরা ভিতরে।'

কম্পাউণ্ডের উল্টোদিকে রয়েছে ভিডিও ক্যামেরার একটা

ব্লাইণ্ড স্পট, সেখান দিয়ে ঢুকেছে সোহেল ও কাশেম।

'আমরাও, রানা,' জানাল সোহেল।

আতাসিকে হাতের ইশারা করল রানা, সরতে শুরু করেছে দেয়াল থেকে। ক্যামেরাগুলোকে ফাঁকি দিয়ে এগুতে হবে। প্রধান দালানের ছাতে বেশ কিছু স্যাটালাইট ডিশ ও রেডিও ট্র্যান্সমিশন টাওয়ার। সেদিকে চলেছে রানা ও আতাসি। ওখানে ক্রল করে পৌঁছতে লেগে গেল বেশ কিছু সময়।

চোখ থেকে গগলস খুলে ফেলল রানা, দু'হাতের আঙুলগুলো গোল করে বিনকিউলার বানিয়ে উঁকি দিল কাঁচের জানালা দিয়ে। ঘরের পিছন দেয়াল থেকে আবছা আলো আসছে। ওখানে রয়েছে স্ট্যাণ্ডবাই মোডে কোনও কম্পিউটার। নিশ্চিত হয়ে গেল রানা ওই অফিস-ঘরটাই ক্যাম্পের ডিরেক্টরের।

জানালার ফ্রেমের সঙ্গে রয়েছে অ্যালার্ম পড, কেউ জানালা খুললেই বেজে উঠবে। কমব্যাট ভেস্টের ভিতর থেকে একটা যন্ত্র বের করল রানা, ওটা তাক করল অ্যালার্মের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ইনডিকেটরে জ্বলে উঠল লাল বাতি। কাঁচের চারপাশে ফ্রেমের উপর ডিভাইস বোলাতে শুরু করল রানা। দুই কাঁচের সঙ্গে তার রয়েছে কি না দেখতে চাইছে। না, নেই। জ্বলে ওঠেনি আলো। এই যদি হয় কোরিন্থের সেরা সিকিউরিটি কোম্পানির কাজ, ভাবল রানা, তো এত দিন ধরে বসে আছি কেন আমি? এসপিয়োনাজ ছেড়ে চুরির পেশায় নামলে ফতুর হয়ে যাবে গ্রিক ব্যবসায়ীরা!

কাঁচের সঙ্গে দুটো সাকশান কাপ আটকে দিল রানা। এবার কাটার দিয়ে কাটতে শুরু করল জানালা। খুব ধীরে কাজ করে চলেছে। সামান্য খ্যাস-খ্যাস আওয়াজ উঠছে। কিছুক্ষণ পর ভ্যাকুয়ামের ভিতর দুই ইনসুলেটেড কাঁচ চলে আসতেই আস্তে

করে শ্বাস ফেলল। এবার কাপদুটো আতাসির হাতে ধরিয়ে দিল। ফ্রেম থেকে সাবধানে সরিয়ে নিল জানালার কাঁচ। একই কাজ করল ভিতরের কাঁচে। কাজ শেষে ঘরের ভিতরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল কাঁচটা।

এবার জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। ওর পর পর এল আতাসি। জানালার উপর নামিয়ে দিল শেড।

'আমরা অফিসে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল।

কম্পিউটার দেখিয়ে দিল রানা। 'যা করবে জলদি, আতাসি।'

মুট্-মুট্ করে আঙুল ফোটাল বেদুঈন, এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল ডেস্কের পিছনে। সিস্টেম চালু করবার আগে বন্ধ করে দিল স্ক্রিন সেভার। কোমরের থলি থেকে বেরুল ছোট এক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট। উপরে কয়েকটা স্টিকার, তার উপর থকথক করছে শুকনো আঠা। জিনিসটা কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে গুঁজে দিল আতাসি। কয়েক সেকেণ্ড পেরুল, তারপর স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা হাসি-মুখ। ওটা মিলিয়ে যেতেই একহাতে কি-বোর্ড টিপতে লাগল ও। আরেক হাতে দ্রুত নাড়ছে মাউস। ভাব দেখে মনে হলো ছোট্ট কোনও ছেলে খেলনা ট্রাক নিয়ে খেলছে।

ওকে কাজ করতে দিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে গেল রানা। খুদে পেন-লাইট দিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। জানালা থেকে দূরে থাকছে, ছায়া পড়ছে না শেডের উপর। রেসপন্সিভিস্ট ওয়েব সাইট থেকে ওরা জেনেছে, এই ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টর এক ক্যালিফোর্নিয়ান, নাম ক্রিস ক্রিংগল। একটু খোঁজ নিতেই বেরিয়ে এসেছে, এ লোক এই গোষ্ঠীতে যোগ দেয়ার আগে

বেভারলি হিলসে বিক্রি করত দামি গাড়ি। বেশ কয়েকবার তদন্ত হয় তার বিরুদ্ধে। ধারণা করা হয় সে চোরাই গাড়ি বিক্রি করছে। তবে কখনও অভিযোগ আনা হয়নি। তার বিরুদ্ধে তদন্ত করবার সময় বেমালুম হারিয়ে যায় কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

ঘরের আসবাবপত্র কেমন হতে পারে, আগেই আন্দাজ করেছে রানা। ডেস্ক, নিচু ক্যাবিনেট, কয়েকটা চেয়ার, এক দেয়ালের পাশে সোফা, তার পাশে কফি টেবিল। প্রতিটি জিনিস দামি। কফি টেবিলের নীচে প্রাচ্যের কার্পেট। ওটা বোধহয় অ্যান্টিক, তোলা যেতে পারে নিলামে। দেয়ালে রয়েছে বেশ কিছু ফ্রেম বাঁধানো ছবি। লোকটা বোধহয় ছবিগুলোকে পূজা করে। এদের বেশির ভাগকে চেনে না রানা। সবার সঙ্গে হাসিমুখে আছে ক্রিস ক্রিংগল। কিছু ছবির মানুষকে অবশ্য চিনতে পারল। কয়েকটা ছবি পার্লা মোনার। অদ্ভুত সুন্দরী ওই অভিনেত্রী। ব্রোঞ্জের দেবী যেন। ঝিকমিক করছে কালো চুল, চোখদুটো বাদামি, চোয়ালের গঠন চমৎকার। সবমিলে যেন অপরূপ এক রাজকুমারী।

আনমনে ভাবল রানা, মেয়েটার জীবনে কীসের এত কষ্ট যে এমন এক কাল্টের সঙ্গে মিশতে হলো!

আরেকটা ছবি মনোযোগ কেড়ে নিল রানার। ওটা বেশ পুরনো। এক লোকের সঙ্গে ক্রিংগল, দাঁড়িয়েছে একটা সেইলবোটের ডেকে। ছবির এক পাশে সই করা। 'সবসময় বিশ্বাস রাখো। লিঙ্ক চ্যাপেল।"

লিঙ্ক চ্যাপেল সাগরে হারিয়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে এ ছবি তোলা হয়। কোস্টগার্ডদের রিপোর্ট ঘেঁটে দেখেছে রানা। এক আকস্মিক ঝড়ের সময় ডুবে যায় ওই বোট। ওটা ছাড়াও পাঁচটি বোট ডোবে। মারা পড়ে তিনজন মানুষ।

এই বিজ্ঞানী শেষদিকে ঘোষণা দেন তিনিই শেষ নবী। তাঁর কাজ মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া। ছবির দিকে দ্বিতীয়বার চাইল রানা। মানুষটার মুখে অজাগতিক কোনও ছাপ নেই। তবে চেহারা সমাহিত, যেন অদ্ভুত এক শান্তি বিরাজ করছে মনে। মাথার খুলি ডিম্বাকৃতির। চোখে চশমা। মাথার চুল পিছাতে শুরু করেছে। চোখ বাদামি। দাড়ি-গোঁফও। গজিয়েছে সামান্য ভুঁড়ি। বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। হতে পারতেন অবসর নেয়া কোনও সফল গবেষক। এ লোক নিজের পথে কীভাবে হাজার মানুষকে টেনেছেন, বুঝে পেল না রানা। আগে যদি দেয়ালে লিঙ্ক চ্যাপেলের ছবি না দেখত, ও আন্দাজ করত ক্রিস ক্রিংগলের সঙ্গে ছবি তুলেছে তার অ্যাকাউন্টেন্ট।

'পেয়েছি!' হঠাৎ একটু জোরে বলে উঠল আতাসি। ঘুরে চাইল রানার দিকে। চেহারায় দোষী বাচ্চাদের ছাপ। 'দুঃখিত, বস্। সিস্টেমের ভিতর ঢুকে পড়েছি। এবার বাকি সব সহজ।'

ঘরের দূর প্রান্ত থেকে চলে এল রানা। 'বলতে পারো অমল কোন্ ঘরে?'

'এরা সব ক্রস রেফারেন্স করেছে। অমল আছে সি দালানে। ওটা নতুন তৈরি করা হয়েছে। যেখানে দেয়াল টপকেছেন সোহেল বস্ আর কাশেম, সেখান থেকে ওটা খুব কাছে। অমল দাশার ঘরের নম্বর এক-ষোলো। তবে একা নেই সে।' স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বলল আতাসি, 'তার রুম-মেট মাইকেল ডাহ্ল।'

'গুড, আতাসি,' বলল রানা। সোহেল ও কাশেমকে এ তথ্য নিচু স্বরে জানিয়ে দিল। 'ঠিক আছে, এবার কম্পিউটার থেকে যা পাও, ডাউনলোড করে নাও।'

ট্যাকটিক্যাল নেটে উর্বশীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'রানা, তোমার স্ক্রিন খেয়াল করো। লোক আসছে।'

ডান আস্তিনের দিকে চাইল রানা। মেইনটেনেন্স ওভারঅল পরা দুই লোক, সঙ্গে টুলবক্স। আঙিনা পেরিয়ে এ দালানের দিকে আসছে। যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফরা তলব করত, গলার আওয়াজ শুনতে পেত ওরা। যাই ঘটে থাকুক, মনে কু ডাকছে রানার।

'আতাসি, বাদ দাও ডাউনলোড। বেরিয়ে যেতে হবে।'

জানালার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা, ডেস্ক পাশ কাটানোর সময় ল্যাম্পের নীচে রাখল একটা ছারপোকা। ওরা যে এ ঘরে ঢুকেছে, বুঝতে দেরি হবে না রেসপন্সিভিস্টদের। জানালার অবস্থা দেখেই আবিষ্কার করে ফেলবে ছারপোকা, তবে ক্রিংগলের অফিসে প্রথম কিছুক্ষণ কী কথাবার্তা হয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জানালার পাশে থামল রানা। স্ক্রিন সামান্য ফাঁক করে বাইরে চাইল। সামনের দিক থেকে দরজার দিকে আসছে মেইনটেনেন্স কর্মীরা। কাজেই বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

খুব ধীরে শেড সরাল রানা, জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল এপাশে। হাতে বেরিয়ে এসেছে গ্লক পিস্তল। এক সেকেণ্ডে মনে করে নিল এ কম্পাউণ্ডের মানচিত্র। পাশে চলে এসেছে আতাসি। স্বাভাবিক পায়ে চলল ওরা সি দালানের দিকে। ওদের বুটের নীচে মসমস আওয়াজ তুলছে শুকনো ঘাস। রেসপন্সিভিস্ট কম্পাউণ্ডের অন্যান্য দালানের মতই সি দালান, একতলা। দেয়ালগুলো সাদা রঙের। ছাতে ব্যারেল টাইলস।

সি দালানের দরজার পাশে সোহেল ও কাশেম, দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। ওদের ঠিক মাথার উপর ক্যামেরা। কিছুই দেখবে না ওটা। দরজার ডানদিকে একটা সিকিউরিটি কি-প্যাড। তবে এখন ওটার ফেসপ্লেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কি-

প্যাড থেকে বেরিয়ে এসেছে এক দঙ্গল তার। সোহেল এরইমধ্যে বাইপাস করে ফেলেছে। কয়েকটি দেশের আর্মি অফিসারদের ভিতর শুধু রানা ও সোহেল স্যাণ্ডফোর্ড থেকে পাশ করেছিল লকপিক টেস্ট। প্রশিক্ষক বলেন, এই দুজনের হাত ব্রেইন সার্জনদের মত! খুদে একটা পিক দিয়ে টর্শন রড ঠিক জায়গায় নিয়ে এল সোহেল, তালা ধরে মোচড় দিল বামদিকে। প্রায় নিঃশব্দে খুলল দরজা।

'চোদ্দ সেকেণ্ড,' ফিসফিস করে বলল কাশেম। 'সোহেল ভাই, আপনি জাদুকর মাইস্ট্রো!' আস্তে করে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। সামনে লম্বা এক করিডোর। দালানের শেষে গিয়ে থেমেছে।

দু'পাশে চব্বিশটা দরজা। করিডোরের ছাত থেকে ঝুলছে ফ্লুরেসেণ্ট ফিক্সচার। একটু পর পর মৃদু আলোর বৃত্ত। মেঝের উপর ধূসর কার্পেট, সিমেণ্টের এই দালানের মতই কঠিন। চারপাশ দেখলে মনে হয় এটা অফিস-বাড়ি। ওরা চারজন পাশাপাশি এগুলো করিডোর ধরে। বামে পড়ল মস্ত এক কিচেন। এর পরের ঘর বড়সড় লণ্ড্রি। দু'দেয়াল ঘেঁষে কমার্শিয়াল ওয়াশিং মেশিন। কোনও ড্রায়ার চোখে পড়ল না রানার। এরা বোধহয় দালানের পিছনে শুকাতে দেয় কাপড়। রেসপন্সিভিস্টদের শেখানো হয়, যান্ত্রিক কিছু চাপিয়ে দিয়ো না প্রকৃতির উপর। কাজেই ড্রায়ার নেই। ওরা অসংখ্য সোলার প্যানেল দেখেছে এক দালানের ছাতে।

দু'মিনিট পেরুনোর আগেই ওরা পেয়ে গেল এক-ষোলো রুমটা। গোড়ালি উঁচু করে কাছের বাতির ফিক্সচার ধরল আতাসি, ওটা খুলে ব্র্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে নিল ফ্লুরেসেণ্ট টিউব। আবছা আঁধারে নাইট ভিশন গগলস পরে নিল

ওরা। দরজার নব ঘোরাল রানা। সামনের ঘরটা যে-কোনও সাধারণ ডরমেটরি-রুমের মত। দু'পাশে দুটো লোহা দিয়ে তৈরি কট্। মাথার কাছে ডেস্ক ও ওয়ার্ড্রোব। এক পাশে টাইলস লাগানো ছোট একটা বাথরুম। মেঝের একপাশে অগভীর ড্রেন। গোসলের পানি ওদিক দিয়ে বের হয়। গগলসের কারণে সব আবছা সবুজ মত লাগছে। ঘরে আর কালো বলে কিছু নেই। পরিষ্কার চোখে পড়ল দুই কট। ঘুমিয়ে রয়েছে দু'জন। নাক ডেকে চলেছে জোরেশোরে।

প্যান্টের পকেট থেকে ছোট প্লাস্টিকের কেস বের করল রানা। ভিতর থেকে বেরুল চারটে হাইপোডারমিক নিডল। সিরিঞ্জের ভিতর শক্তিশালী নার্কোটিক। ছ'ফুটি লোককে বিশ সেকেণ্ডে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। অমল যেহেতু ইচ্ছা করে এই কাল্টের সঙ্গে জড়িয়েছে, ওকে নিয়ে যেতে চাইলে ঝামেলা করাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে ডিপ্রোগ্রামার লিয়োনার্দো চার্চের সঙ্গে কথা বলেছে উর্বশী। সে জানিয়েছে অমলকে ড্রাগ দিয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল। অবশ্য সে না বললেও একই কাজ করত রানা। আতাসির হাতে একটা সিরিঞ্জ দিল ও।

বাম দিকের কটের পাশে চলে গেল বেদুঈন। মানুষটার চেহারা দেখা গেল না। দেয়ালের দিকে মুখ। উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। বাম হাতে তার মুখ চেপে ধরল আতাসি, ঘাড়ের পিছনে গুঁজে দিল নিডল। বুড়ো আঙুলের চাপ পড়তেই দাবতে লাগল প্লাঞ্জার।

ঘরের ওদিকে একই ঘটনা ঘটছে। বিছানার উপর লাফিয়ে উঠতে চাইল রানার শিকার, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ। কিন্তু নাক-মুখ থেকে হাত সরালো না রানা, জোর করে শুইয়ে রাখল। ছোকরা ব্যস্ত হয়ে দু'পা ছুঁড়তে চাইল। এক এক করে সেকেণ্ড

গুনছে রানা। দশ সেকেণ্ড যেতেই ঝট্‌কা-ঝট্‌কি কমে এল। আরও চার সেকেণ্ড পর নিথর হয়ে গেল। পেন-লাইট জ্বালল রানা, আলো ফেলল মুখের উপর। অমল দাশা বোনের মত দেখতে নয়, তবে মিল রয়েছে চোখের আদল ও ভুরুতে।

'মাল আমাদের হাতে,' বলল সোহেল।

ওর কাছ থেকে দুটো ফ্লেক্সি কাফ নিল রানা, অমলের দুই কব্জি ও গোড়ালি আটকে দিল। নিজের কাজ শেষ করে ফিরেছে আতাসি। অনায়াসে অচেতন বন্দিকে তুলে নিল কাঁধে।

'তোমার কোনও অসুবিধে নেই তো?' জানতে চাইল রানা।

চওড়া হাসল আতাসি। 'বস্, মনে পড়ে তিনবছর আগে আহত হন? আপনাকে কাঁধে নিয়ে ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে এলাম। দৌড়াতে হলো আট মাইল। কাজেই বুঝে নেন—আপনার তুলনায় এ ছোকরা তো চড়ুই পাখি!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। আস্তিনের ই-পেপার স্ক্রিনের উপর চোখ। বিশাল কম্পাউণ্ডে কেউ হাঁটছে না। নীরব নিশুতি রাত। কনফার্মেশনের জন্য রেডিও করল ও।

'ওই লোকগুলো এখনও সেই দালানের ভিতর,' জানাল উর্বশী। 'কম্পাউণ্ডের আরেক দিকে আলো জ্বলেছে, তবে এক মিনিট আট সেকেণ্ড পর নিভে গেছে।'

'ঠিক আছে।'

'তোমরা বেরিয়ে আসতে পারো।'

'আসছি।' সঙ্গীদের দিকে চাইল রানা। 'চলো।'

করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা। দরজার দিকে চলেছে, ঠিক তখনই ঢং-ঢং করে বেজে উঠল ঘণ্টি! আওয়াজটা যেন ফায়ার অ্যালার্ম। তীক্ষ্ণ! মুহূর্তে মাথা ধরিয়ে দেয়। যেন কানের ভিতর খুঁচিয়ে চলেছে ছোরা দিয়ে। এই আওয়াজের উপর দিয়ে কথা

বলা অসম্ভব। তবে রানা, সোহেল, আতাসি ও কাশেম জানে এবার কী ঘটতে পারে। ওরা মানসিক ভাবে তৈরি।

আতাসি ও কাশেমের সামনে ছুটছে সোহেল। ওরা জানে আর লুকিয়ে থাকা চলবে না, এবার এখান থেকে বেরুতে হবে। অমলকে সহজে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর নেই। এখন ওদের ঝেড়ে দৌড় দিয়ে পৌঁছুতে হবে দেয়ালের কাছে। ওখানে রেখেছে একটা লিমপেট মাইন। ওটা উড়িয়ে দেবে দেয়ালের ব্লকগুলো। কাছেই থাকবে উর্বশী, শুনেছে ক্ল্যাক্সনের আওয়াজ। এতক্ষণে আলম সিরাজকে রেডিও করা হয়ে গেছে। উনি রবিনসন নিয়ে হাজির হবেন, নেমে আসবেন কম্পাউণ্ডের বাইরের সড়কে। গার্ডরা কিছু বুঝবার আগেই ভাঙা দেয়াল দিয়ে বেরুবে সোহেল ও আতাসি। অমলকে নিয়ে উঠে পড়বে কপ্টারে, সরে পড়বে এখান থেকে।

রানার পাশের একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল। পায়জামা পরা এক লোক চোখে ঘুম নিয়ে বেরুল করিডোরে। তার চোয়ালের উপর পড়ল রানার ভাঁজ করা বাম কনুই। হাড়ে হাড়ে খটাস্ করে লাগল। লোকটা ঘুরেই ছিটকে গিয়ে পড়ল কার্পেটের উপর। গোঙানির ফাঁকে করুণ চিৎকার ছাড়ল, 'ওরে বাপরে, মেরে ফেলল!'

সামনে আরেক লোক ঘর থেকে উঁকি দিয়েছে করিডোরে। অমলের শিথিল দেহ কাঁধের উপর, কিন্তু ছুটবার ফাঁকে খানিক ডানে সরল আতাসি, ওর বিশাল থাবা গিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে। প্রচণ্ড চাপড় খেয়ে ছিটকে গিয়ে ইস্পাতের ডোরফ্রেমের উপর পড়ল রেসপন্সিভিস্ট, সেখান থেকে মুখ থুবড়ে ঘরের মেঝেতে। ওকে পাশ কাটানোর সময় খেয়াল করল রানা, জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

সামনের দরজার আগে ব্রেক কষল সোহেল। স্ক্রিনে ভিডিও ফিড দেখে নিল রানা। বোধহয় আলম সিরাজের সঙ্গে আলাপ করছে উর্বশী। ক্যামেরা নিয়ে আঁধার সাগরের উপর ঘুরছে ড্রোন। ইয়ারবাডে উর্বশীর কথা শুনতে পেল রানা। তবে বোঝা গেল না কিছু। বড় বেশি জোরে বাজছে অ্যালার্ম।

আর দেরি করল না রানা, খুলে ফেলল দরজা। গ্লক পিস্তল হাতে চারপাশে চাইল। তীক্ষ্ণ আওয়াজে চেঁচিয়ে চলেছে অ্যালার্ম। তবে বিশাল কম্পাউণ্ড শান্ত, ছুটে আসছে না গার্ডরা। কোনও কিছুর নড়াচড়া নেই। এমন কী বাড়তি আলো জ্বেলে দেয়া হয়নি।

ডরমেটরির ভিতর কান ঝনঝন করছে ওদের। বামহাতে কান চাপা দিল রানা, বুঝতে চাইল উর্বশী কী বলতে চাইছে।

'ও-ও... ওখান থেকে! সামনের দিক থেকে আসছে গার্ডরা! চলে আসছেন সিরাজ! বেরোও, জলদি!'

নাইট ভিশন গগলস ঠিক ভাবে পরে নিতে চাইল রানা। তার ফাঁকে দেখল, পাশের দালানের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসেছে ধূসর ইউনিফর্ম পরা তিন গার্ড। এক সেকেণ্ড দেরি করল রানা, বুঝতে চাইল তাদের কাছে অস্ত্র আছে কি না। এদের একজনের হাতে ছোটখাটো এক সাবমেশিন-গান। গুলিবর্ষণ শুরু করল সে। ক্ষত-বিক্ষত হলো দালানের সামনের প্লাস্টার। চারপাশে ছিটকে গেল সিমেণ্টের টুকরো। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, পরক্ষণে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্য, গার্ডের বুকে বিঁধল বুলেট। তবে পড়ে গেল না, শুধু পিছিয়ে গেল এক পা।

'সবাই ভেতরে ঢোকো!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা। অমলকে নিয়ে করিডোরে ক্রল করে ঢুকে পড়ল আতাসি। পিছনে সোহেল-কাশেম। পা দিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল

রানা, অ্যালার্মের উপর দিয়ে বলল, 'ওদের সঙ্গে অটোমেটিক অস্ত্র, পরনে কেভলার ভেস্ট। আমাদের প্লাস্টিক বুলেট দিয়ে কিছুই করা যাবে না।'

সামনের পুরু দরজা ভেদ করতে চাইছে অজস্র বুলেট। শব্দ শুনে মনে হলো থরথর করে কাঁপছে গোটা দালান।

এক পাশ থেকে চেয়ার নিল কাশেম, ঠেসে দিল দরজার হ্যাণ্ডেলের নীচে। আপাতত বাইরে থেকে দরজা খুলবে না। ডানদিকে সরে গেল সে, দেয়ালের মাউণ্ট থেকে ছিঁড়ে নিল হর্ন। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল অ্যালার্মের আওয়াজ। 'আহ্ কী যে শান্তি,' স্বস্তি নিয়ে বলল। 'যেন আর্টিলারির ব্লো গানের লড়াই থামল!'

চোদ্দ

ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড লাগল রানার পরিকল্পনা ঠিক করতে। 'অমলের ঘরের জানালা দালানের পাশে! বাইরের দেয়াল থেকে অনেক কাছে! চলো!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল করিডোর ধরে। দু'পাশের ঘর থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছে রেসপন্সিভিস্টরা। তবে পিস্তল তাক করলেই সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ছে ঘরে, ধুপ-ধাপ বন্ধ হচ্ছে কপাট।

এত আওয়াজের ভিতরও ড্রাগের নেশায় অচেতন অমলের রুম-মেট, কোনও সাড়া নেই। ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল রানা,

পর পর ক'বার গুলি ছুঁড়ল বিশাল জানালা লক্ষ্য করে। প্লাস্টিকের বুলেট থরথর করে কাঁপিয়ে দিল পিকচার উইণ্ডোকে। আলগা হয়ে এসেছে কাঁচ। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রানা, না থেমে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁচের উপর। চারপাশে ছিটকে গেল কাঁচ হাজারো টুকরো হয়ে। সবকিছুর ভিতর দিয়ে উড়ে গেল রানা, লনে পড়েই গড়িয়ে দিল নিজেকে। টের পেল ঘাড়ের পিছনদিক ও দু'হাত চিরে দিয়েছে তীক্ষ্ণ কিছু কাঁচ।

ডরমেটরির ঘরগুলো থেকে আসছে জোরালো বাতি। সে আলো ওকে দেখিয়ে দিল পনেরো গজ দূরে সিমেন্ট ব্লক দেয়াল। ওদিকে দরজা লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি করছে গার্ডরা। দালান ঘুরে এদিকে এলে বিপদ। পিছনে আঁতাসি-সোহেল-কাশেমের পদশব্দ। এইমাত্র ভাঙা জানালা পেরিয়ে লনে নেমেছে।

রানার দুঃসাহস ওদের সামান্য বাড়তি সময় এনে দিয়েছে।

অনেক দূরের দেয়াল এবং এই দালানের মাঝে বিস্ফোরক রেখেছে সোহেল-কাশেম। ক্যামেরা থেকে দূরে ওদিকের দেয়াল ছিল সেরা ট্যাকটিকাল লোকেশন। তবে সেখানে পৌঁছতে হলে এখন পেরুতে হবে এক শ' গজ ফাঁকা জমি। সে সুযোগ মিলবে না, ডালে বসা পাখির মত ওদের গুলি করে ফেলে দেবে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা অনায়াসে।

'উর্বশী, পরিস্থিতি জানাও,' বলল রানা। খুদে ই-পেপার দিয়ে চলবে না, এখন প্রয়োজন পরিষ্কার মতামত ও বিশ্লেষণ।

'তোমরাই কি জানালা ভেঙে বেরিয়েছ?'

'হ্যাঁ। চারপাশের অবস্থা কী?'

'ডরমেটরির দরজার কাছে তিন গার্ড। এদিকে পুরো কম্পাউণ্ড ঘিরে আসছে বারোজন গার্ড। সবার সঙ্গে ভারী অস্ত্র।

দু'জন আসছে জিপ গাড়ি নিয়ে। সিরাজ আসছেন। নিশ্চয়ই শুনছ কপ্টারের আওয়াজ?'

রাতের আকাশে ধুপ-ধুপ আওয়াজ তুলছে রবিনসনের পাখা। 'অনিল আর গগলকে জানিয়ে দাও, বোধহয় সি প্ল্যান ধরে এগুতে হবে।'

'আমি নেটে আছি, রানা,' রেডিও থেকে বেরিয়ে এল গগলের কণ্ঠ। 'আমরা রওনা হয়ে গেছি। পেয়েছ উর্বশীর ভাইকে?'

'হ্যাঁ। ভাল আছে।'

দ্রুত কাছে চলে আসছে কপ্টার, বাতাসে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলছে রোটর। দেয়ালের উপর দিয়ে ছুটে এল রবিনসন। ঘাড় ফিরিয়ে প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল রানা। কথার প্রয়োজন হলো না। ওরা জানে কী করতে হবে। ওদের 'এ' প্ল্যান ভেস্তে গেছে। এবার 'বি' প্ল্যান ধরে কাজ করতে হবে। সোহেলের হাতে বিস্ফোরকের ডেটোনেটর। একটু অপেক্ষা করল। ওদিক থেকে অল টেরেইন এটিভি নিয়ে আসছে এক গার্ড। বোমার কাছাকাছি পৌঁচেছে। ধীর ভঙ্গিতে ডেটোনেট করল সোহেল।

দেয়ালের এক অংশ বিস্ফোরিত হলো। চার দিকে ছিটকে গেছে কংক্রিটের হাজারো টুকরো। বলকে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মত ধুলো। তার ভিতর দিয়ে আকাশে উঠল আগুনের লেলিহান জিভ। মেঘের মত চার দিকে ছড়িয়ে গেল সাদা ঘন ধুলো। কানে এল বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ। তার ফাঁকে চোখে পড়ল এটিভির উপর থেকে আকাশে উঠেছে গার্ড। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে নামল গিয়ে বিশ ফুট দূরে। কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো, আর নড়ছে না। কাত হয়ে পড়েছে তার এটিভি। বেলুনের মত টায়ারগুলো ঘুরছে বনবন করে।

মরিয়া দৌড় লাগাল মার্ভেল টিম। বাম কাঁধে অমলকে নিয়ে অনায়াসে সবার সঙ্গে তাল রাখছে আতাসি। দালানের কোণে পৌঁছে গেল ওরা। ওদিকে উঁকি দিল রানা। যে গার্ড প্রথমে গুলি শুরু করে, এখন তার মুখ-মাথা রক্তাক্ত। সিমেন্টের চাপড়া লেগেছে, গভীর ভাবে কেটে গেছে মাথার পাশ। তাকে দু'পাশ থেকে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে দু'জন গার্ড।

রানা আগেই জানে গার্ডদের কোমর বা বুকে তাক করে কিছুই করতে পারবে না ওরা। প্লাস্টিকের বুলেট এনেছে খুন করবার ইচ্ছে নেই বলেই। খুব সতর্ক হয়ে বাকি চারটে বুলেট খরচ করল রানা। সুস্থ দুই গার্ডের জন্য দুটো করে। ওর উদ্দেশ্য তাদেরকে আপাতত অচল করে দেয়া। আগামী কয়েক সপ্তাহ ফুলে থাকুক না ওদের বিচি! ওর তাতে কী?

প্রিয় সম্পত্তি দু'হাতে খামচে ধরল লোকদুটো, আকাশ ফাটানো বিকট চিৎকার দিয়ে উবু হয়ে গেছে। তারপর মাঝের আহত গার্ডের সঙ্গে তারাও ধপ্ করে পড়ল মাটিতে। গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

'আরে!' খেপে ওঠার ভান করল সোহেল। 'এত আহাজারি কীসের? তোরা তো ওই জিনিস চাস-ই না!' রানার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে সে এ-কান ও-কান।

দেরি না করে সংগ্রহ করে নিল ওরা মিনি-উজিগুলো। কাছের টার্গেটে এ জিনিস দারুণ কাজের, কিন্তু একটু দূরের কাউকে লাগানো প্রায় অসম্ভব।

কালো রবিনসন আর-৪৪ হঠাৎ চলে এল ওদের মাথার উপর। এত কাছে নেমে এসেছে যে ছাতের টাইলস থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপরে রইল স্কিডগুলো। আসবার সময় আঙিনার উপর কপ্টার পাগলের মত নাচিয়েছেন সিরাজ, তৈরি হয়েছে

জোরালো বালি-ঝড়। ধুলো ও পাথরের কণা আড়াল দিয়েছে রানাদের। এই মুহূর্তে এগুতে পারছে না গার্ডরা।

কান ফাটানো আওয়াজ তুলছে পাখাগুলো, সেইসঙ্গে চারপাশে হৈ-চৈ হুলুস্থুল, গুলি। রানারা বুঝল না হঠাৎ কোথা থেকে আসছে এত গুলি। হঠাৎ মাকড়সার সাদা জালের মত কী যেন দেখা গেল কপ্টারের উইণ্ডশিল্ড ও পাইলটের জানালার উপর। উত্তপ্ত বুলেটগুলো হামলে পড়ল এয়ার-ক্রাফটের উপর। ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে ঢুকছে বুলেট ককপিটে। সামনে ঝুঁকে গেলেন সিরাজ, দ্রুত সরাতে চাইলেন কপ্টার। মনে হলো রিঙের ভিতর ওটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়। তবে ট্রেসার বুলেটগুলো লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। অসংখ্য বুলেট ঠকা-ঠক লাগছে কপ্টারে। হঠাৎ ইঞ্জিনের কাউলিং থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে এল ধূসর ধোঁয়া।

ব্যস্ত হাতে রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টে নিল রানা, প্রচণ্ড আওয়াজের ভিতর গলা ফাটিয়ে বলল, 'এখান থেকে সরে যান, সিরাজ! পালান! এখুনি!'

'যেতেই হবে, আমি কিছুই করতে পারলাম না, দুঃখিত,' বললেন ক্যাপ্টেন। ড্রাগন-ফ্লাইয়ের মত কপ্টার ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, দেয়ালের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে রইল শুধু রাতের চেয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

'এবার, বস্?' জানতে চাইল আতাসি।

সামনে পঁচাত্তর গজ ফাঁকা জমিন। এদিকে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে রেসপন্সিভিস্টরা। অগভীর এক নালার ভিতর আশ্রয় নিয়েছে রানারা। তবে এখানে বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। এরইমধ্যে সার্চ পার্টি তৈরি করছে গার্ডরা। রাতের আঁধারে জ্বলে উঠছে তাদের ফ্ল্যাশলাইট।

'তুমি কোথায়, উর্বশী,' জানতে চাইল রানা।

'দেয়ালের পাশেই। দেয়াল যেখানে উড়িয়ে দিয়েছ, তার একটু দূরে। আসতে পারবে আমার ভ্যান পর্যন্ত?'

'উঁহুঁ, সম্ভব না। চারপাশে অনেক বেশি গার্ড। কাভার নেই।'

'জায়গাটা মিলিটারি ব্যারাকের মত,' বলল সোহেল।

'তা হলে ডাইভার্শান দরকার,' বলল উর্বশী।

'ভাল কিছু হতে হবে।' রেডিওতে একটা আওয়াজ শুনছে রানা। দ্রুত চলছে ইঞ্জিন। আর সাড়া দিল না উর্বশী।

তিরিশ সেকেণ্ড পর কব্জা ছিঁড়ে ধসে পড়ল কম্পাউণ্ডের মেইন গেট। দেখা গেল একটা ভ্যান, হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছে। খসে পড়েছে ভাড়া নেয়া গাড়ির পিছন বাম্পার। বারো-চোদ্দোজন গার্ড ব্যস্ত ফ্যাসিলিটি ঘিরতে, একইসঙ্গে ঘুরে চাইল তারা ভ্যানের দিকে। কয়েকজন নতুন এই হুমকি মোকাবিলা করতে ছুটতে শুরু করেছে। কেউ খেয়াল করল না কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো কিছু ছায়া। ছুটে চলেছে দেয়াল লক্ষ্য করে।

উর্বশীর ভ্যানের দিকে গুলি করছে গার্ডরা। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই বডিতে তৈরি হলো চল্লিশটা ফুটো। ইস্পাতের পাতের আড়ালে বসেছে ইন্দোনেশিয়ান লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার, কসরৎ করছে ট্র্যান্সমিশন নিয়ে। ফিরে যেতে চাইছে ড্রাইভওয়ের উপর। চাকাগুলো বনবন করে ঘুরতে লাগল, তারপর ট্র্যাকশন পেল নুড়ি পাথরের উপর। বিধ্বস্ত গেটের উপর দিয়ে ছুটল ভ্যান, সরে গেল গোলাগুলির সামনে থেকে।

দেয়াল লক্ষ্য করে ছুটছে মার্ভেল টিম। মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'সোহেল, আতাসি, প্ল্যান সি! তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে!'

'আপনি কোথায় চললেন, মাসুদ ভাই?' দৌড়ের ফাঁকে

জানতে চাইল কাশেম।

'ওরা উর্বশীর একটা চাকা ফুটো করে দিয়েছে। মেইন বিল্ডিঙের সামনে জিপ দেখেছি। আধ মাইল যাওয়ার আগেই ধরা পড়বে উর্বশী। আমি ওদের দেরি করিয়ে দেব। এদিকে তোমরা সোজা পেরিয়ে যাবে সেতু।'

'এ কাজ আমাকে দে,' প্রায় অনুরোধ ঝরল সোহেলের কণ্ঠে।

'না। খামোকা তর্ক করিস না। তোর দায়িত্ব আতাসি, অমল আর কাশেমকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এবার রওনা হ' তুই।'

ধোঁয়া-ওঠা বিধ্বস্ত দেয়াল থেকে সরে গেল রানা, আরেক দিকে বাঁক নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। একটু সামনে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে এটিভি, সাইলেন্সার পাইপ থেকে বেরুচ্ছে সাদা ধোঁয়া। একবার ঘুরে চাইল রানা, ভাঙা দেয়ালের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওর দলের সবাই। এবার এটিভির হ্যাণ্ডলবার ধরল রানা, সোজা করে নিল। ছ' শ' পাউণ্ডের ফোর-হুইলারকে মোটর সাইকেলের মত গায়ের জোরে সোজা করতে চাইল না, থ্রটল মুচড়ে কাজে লাগাল চাকাগুলোর শক্তি। বিদঘুটে যান রাবারের ফোলা চাকাগুলোর উপর লাফিয়ে স্থির হলো। বাম পা সিটের উপর দিয়ে পার করে দিল রানা, বসে পড়ল ধপ্ করে। তার আগেই রওনা হয়ে গেছে।

সাত শ' পঞ্চাশ সিসির ইঞ্জিন নিচু গর্জন ছাড়ছে। আড়াআড়ি ভাবে পেরুচ্ছে উঠান। কয়েকজন গার্ড একই দিকে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছাত-খোলা জিপ। অন্যরা দেয়ালের কাছাকাছি, ধাওয়া করতে চাইছে সোহেলদের।

এতক্ষণ নাইট-ভিশন গগলসের বাড়তি সুযোগ পেয়েছে রানা, কিন্তু সেটা হারাতে হলো। কম্পাউণ্ডের চারপাশে জ্বলে

উঠছে আলো। ল্যাম্প-পোস্টের ইনক্যানডিসেণ্ট বালব শুরু করল তীব্র বিকিরণ। আর বড়জোর এক মিনিট, তারপর রেসপন্সিভিস্টরা বুঝে ফেলবে যে লোক এটিভি চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সে তাদের কেউ নয়। রানা এমন ভাব নিয়েছে যেন অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের খুঁজছে। আসলে খুঁজছে আলো থেকে দূরের কোনও গার্ডকে। একজনকে দেখল, লোকটা দেয়ালের কোণে প্রায়-মৃত গাছগুলোর আড়াল নিয়েছে। গতি বাড়িয়ে সেদিকে চলেছে রানা, চোখ থেকে খুলে ফেলল গগলস। ছায়ার ভিতর দিয়ে ছুটছে, কেউ চট্ করে বুঝবে না ও বাইরের লোক। তবে গার্ড কোন্ ভাষায় কথা বলবে কে জানে! মুখ বন্ধ রাখল রানা, ফোর-হুইলার থামিয়ে হাতের ইশারা করল। ভাব দেখে মনে হলো বলবে, 'এখানে দেরি করছ কেন, এখুনি এসো!'

দ্বিধা করল না গার্ড, দৌড়ে এসে লাফিয়ে বসল রানার পিছনে। একহাত রেখেছে রানার কাঁধের উপর। আরেক হাতে মেশিন পিস্তল।

'বাছা, আজকের দিন তোমার ভাল কাটবে না,' মনে মনে বলল রানা। মুচড়ে ধরল থ্রটল।

'রানা ছাড়া সবাই ভ্যানে উঠেছে,' রেডিওতে জানাল উর্বশী। 'বড় রাস্তা ধরে চলেছি।'

একটু আগে জেনেছে বুলেট আঁচড় কেটেছে পাইলটের কাফ মাসলে। শুনেই বলেছে, এইসব ঘটছে শুধু ওর কারণে। মেনে নেয়া কঠিন, সবাই এতবড় ঝুঁকি নিয়েছে ওরই জন্য। এখন ওদের মিশন ভেস্তে যেতে চলেছে। পিছনে রয়ে গেল রানা, ট্যাকটিক্যাল নেট থেকে হারিয়ে গেছে! মার্ভেল থেকে ওকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা চলবে। যদি না পাওয়া যায়? নিজেকে মাফ করতে পারছে না উর্বশী। অবশ্য সোহেল ও আতাসি এককথায়

বলেছে, এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। ওর দায়িত্ব শুধু ভ্যান নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। তবে ছোট হয়ে গেছে ওর মন, বারবার ভাবছে, ওরা যদি প্লাস্টিকের বুলেট সঙ্গে না নিত... ওরা কেউ কেন বুঝতে পারল না ওই কম্পাউণ্ডে আর্মড্ গার্ড থাকতে পারে! কেন কোনও কাল্টের লোক এত অস্ত্র রাখবে? রেসপন্সিভিস্টদের ব্যাপারে যতটুকু জেনেছে, মা'র কাছ থেকে শুনেছে: এরা নাকি শান্তি-প্রিয়! কোনও ধরনের হিংস্রতা পছন্দ করে না।

এদের সঙ্গে গোল্ড অভ মার্সের গণহত্যার কী সম্পর্ক? অন্য কোনও কাল্ট এদের সঙ্গে লড়ছে? এমন কোনও কাল্ট, যাদের নাম এখন পর্যন্ত কেউ জানে না? এমন এক দল, যারা অনায়াসে খুন করে মানুষ? কিন্তু রেসপন্সিভিস্টদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবার ইচ্ছার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক?

বুট দিয়ে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল উর্বশী, মনে মনে বলল, 'রানা, আমরা শহরের দিকে চললাম। তুমি ওই কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসো।'

প্রধান দালানের দিকে যাওয়ার পথে জিপ গাড়িগুলোর দিকে চাইল রানা। গার্ডদের নিয়ে তৈরি প্রথম জিপ, অনুপ্রবেশকারীদের ধাওয়া করবে। ড্রাইভার ছাড়া পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে এক গার্ড। পিছনে আরও দুই সঙ্গী, লোহার উঁচু রোল বার শক্ত করে ধরেছে। রানা জানে উর্বশীর ভ্যানের এক চাকা ফুটো, তারপরও ভেলকি দেখাতে চাইবে সে। তবে পঞ্চাশ মাইলের বেশি গতি তুলতে পারবে না। তা ছাড়া উপযুক্ত অস্ত্রের অভাবে শেষে হার মানতে হবে। আর জিপ তো মাত্র একটি নয়, ওটার পিছু নেবে আরও কয়েকটা।

কাজেই এখনই সঠিক সময় কিছু করবার।

রানার কাঁধে টোকা দিল গার্ড। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল ওদের উচিত ডরমিটরির পিছনে যাওয়া। রানার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, কথা মেনে নিয়েছে। শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে মসৃণ ভাবে চলেছে ফোর-হুইলার। ওদের দিকে চেয়ে রইল অন্য গার্ডরা। তাদের পিছনে ফেলল রানা, অপেক্ষা করছে, তারপর আরও খানিক গিয়ে সুযোগ নিল—হঠাৎ ডানদিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডলবার। বেলুন টায়ারগুলো ছিঁড়ে দিতে চাইল শুষ্ক জমিন। ধড়াস্ করে উল্টে যেত ফোর-হুইলার, কিন্তু বামদিকে সমস্ত ওজন নিয়ে কাত হয়েছে রানা। লাফিয়ে উঠে আবারও চার চাকার উপর স্থির হলো ফোর-হুইল, সোজা ঘুরে গেছে দেয়ালের দিকে। পুরো থ্রটল খুলে দিল রানা। তারই ফাঁকে লোকটার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মিনি-উজি, গুঁজে নিল নিজের বেল্টে। দু'সেকেণ্ড দ্বিধার ভিতর পড়ল গার্ড, তবে কাটিয়ে উঠল। এক হাতে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরল সে। বাইসেপ যেন দড়ির মত টানটান, প্রচণ্ড শক্তিতে ভেঙে দিতে চাইল রানার ল্যারিংক্স ও শ্বাসনালী।

চমকে গেল রানা, মুহূর্তে আটকে গেছে শ্বাস। একটু বাতাস পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ফুসফুস। তারই ফাঁকে তীব্র গতি তুলল এটিভির। চলেছে ভাঙা দেয়ালের দিকে। এবড়োখেবড়ো বৃত্তাকার ফোকর মাত্র ছ'ফুট। সামনের মাটিতে জমেছে ভাঙাচোরা সিমেণ্টের ব্লক ও ধুলো-বালি। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ফোর-হুইলার। আর মাত্র পনেরো গজ দূরে দেয়াল। তবে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা ধারণা করে নিয়েছে এটিভির ওই দুই লোক বাইরের। গাড়িটা লক্ষ্য করে আসতে লাগল গুলি। দেয়ালে লেগে ওড়াতে লাগল সিমেণ্টের চল্টা ও বালি। ছিটকে লাগছে এটিভিতে।

আশপাশে বুলেটের শিস শুনল রানা। একটা বুলেট ওর বাম আস্তিন ছিঁড়ে নিয়ে গেল। ওদিকে মনোযোগ দিল না, পুরো খেয়াল দেয়ালের ফোকরের উপর। এদিকে বাতাস নিতে পাগল হয়ে উঠেছে ফুসফুস। শ্বাস-নালীর উপর দ্বিগুণ চাপ বাড়িয়ে দিল গার্ড। যেন গলা টিপেই শেষ করবে রানাকে।

'শুধু একবার ঠিক করে গুলি কর্, হারামজাদারা! মাত্র একবার!' ভাবল রানা। চোখে আর কিছু দেখছে না। যেন চারপাশে কালো গহ্বর। গভীর এক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটছে।

'একবার!' রানা বুঝতে পারছে জ্ঞান হারাতে চলেছে। ওর শেষ ইচ্ছা, লোকটা ছেড়ে দিক ওর গলা। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। মনে হলো হাতুড়ি মেরেছে কেউ মেরুদণ্ডের উপর। গলা থেকে সরে গেল গার্ডের হাত, ঢলে পড়ল লোকটা ওর গায়ের উপর। গরগরা করবার মত আওয়াজ এল। ফুটো হয়ে গেছে ফুসফুস, মুখ থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত। কাঁধ ভেসে গেল রানার। রেসপন্সিভিস্টদের গুলি লেগেছে তাদেরই লোকের পিঠে। কাত হয়ে সিট থেকে খসে পড়ল গার্ড। ঠিক তখনই উঁচু জঞ্জালের উপর চড়ে বসল এটিভি। পেট-ফোলা চাকা সহজে ডিঙিয়ে চলেছে ময়লার স্তূপ। মুহূর্তে ঢাল পেরুল এটিভি, ঢুকে পড়ল ফোকরের ভিতর। আগেই ঝুঁকেছে রানা, নইলে মাথা ছিঁড়ে নিত দেয়ালের উপরের অংশ। পরক্ষণে দেয়ালের এপাশে চলে এল। ফোকর পেরিয়ে দু'পায়ের জোরে সিট ছাড়ল রানা। নিতম্ব উঁচু করে অপেক্ষা করল, কয়েক সেকেণ্ড পর এল জোর ঝাঁকি। ধুপ করে মাটিতে নামল এটিভি।

সাসপেনশনের উপর এলোপাথাড়ি নাচতে নাচতে চলেছে বড়সড় কাওয়াসাকি। যে-কোন সময় হাত থেকে হ্যাণ্ডলবার ছুটে

গিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়তে পারে রানা। কান থেকে খুলে গেছে ইয়ারবাড, বুকের উপর ঝুলছে তার। তিক্ত চেহারায় দম নিতে চাইল রানা। ফুসফুস স্বস্তি পেল, কিন্তু জ্বলছে ক্ষতিগ্রস্ত শ্বাস-নালী। এটিভির দুলুনি থেমে আসতেই হ্যাণ্ডলবার ঘুরিয়ে নিল রানা, এগুতে হবে উপকূলীয় সড়ক ধরে। এ রাস্তা গেছে গেটের সামনে দিয়ে বারো মাইল দূরের কোরিন্থে।

পাকা রাস্তায় উঠে এল রানা। ঠিক তখনই বিধ্বস্ত গেটের বাইরে নাক বের করল প্রথম জিপ। মাত্র আধ মাইল দূরে উর্বশী। ধরা পড়ে যাবে, জিপের জন্য এই দূরত্ব কিছুই নয়। কিছু একটা করা দরকার। হ্যাণ্ডলবারের একটা সুইচ টিপে ডিজএনগেজ করল রানা এটিভির সামনের দুই চাকা। ফলে বুলেটের গতি পেল গাড়িটা। কম্পাউণ্ডের দেয়ালের পাশ দিয়ে ছুটছে।

গেট আর বিশ গজ দূরে, এমন সময়ে দ্বিতীয় জিপ বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়, চার পাশে ছড়িয়ে দিল ধুলো। চাকাগুলো উঠে এল সড়কে, ছুটছে প্রথম জিপের পিছনে। দ্বিতীয় জিপে ড্রাইভার ছাড়া দু'জন গার্ড। একজন প্যাসেঞ্জার সিটে, অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে খোলা জিপের পিছনে। হাতে একে-৪৭।

এটিভির বাড়তি গতি কাজে লাগাল রানা, ছুটে চলল জিপের পিছনে। কাছাকাছি গিয়েই উঠে দাঁড়াল স্যাডল সিটের উপর। হু-হু করে সামনে থেকে আসছে হাওয়া, সেই সঙ্গে জিপের ওড়ানো ধুলো। সরু হয়ে গেল ওর চোখ। স্পিড কমাল, জিপের চেয়ে সামান্য বেশি গতিতে ছুটছে। সোজা গিয়ে গুঁতো দিল এটিভি জিপের পিছনের বাম্পারে।

এ ধাক্কা কাওয়াসাকি থেকে আকাশে তুলে দিল রানাকে, বাম হাঁটু ঠেকিয়ে নামল ও পিছনের গার্ডের পিঠে। এক হাতে

পেঁচিয়ে ধরতে চেয়েছিল লোকটার গলা, কিন্তু তার আগেই রোল বারের সঙ্গে ছেঁচে গেল ওর নাক-মুখ। থ্যাচ্ করে আওয়াজ উঠল। পিছনে বাঁকা হয়ে গেল লোকটা, তারপর ধসে পড়ল জিপের মেঝেতে। রানা নেমে দাঁড়িয়েছে আগেই। বুঝল, আর কিছু করতে হবে না; যদি মরে না থাকে, এ লোক লড়বার সাধ্য হারিয়েছে। বিদ্যুদ্বেগে ডান পা চালাল ও এবার। প্যাসেঞ্জার সিটের গার্ড কিছু বুঝবার আগেই মাথার পাশে লাথি খেল। জিপের দু'পাশে দরজা নেই, কিছু ধরবার সুযোগ পেল না লোকটা, ভাঙা পুতুলের মত গিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। দেখতে না দেখতে পিছিয়ে গেল দেহটা।

ঘাড় ফেরালো চালক। চমকে উঠল রানার মারমূর্তি দেখে। কোমরে গোঁজা মিনি-উজি একটানে বের করে ফেলেছে রানা, মাযল ঠেকাল ড্রাইভারের মাথায়।

'লাফিয়ে পড়ো, বাছা, নইলে খুন হয়ে যাবে!'

দুটোর কোনওটাই করল না ড্রাইভার, প্রাণপণে ব্রেক কষল। জমে গেল চাকাগুলো। বিশ্রী আওয়াজ তুলল পোড়া রাবার। রাস্তা ছেড়ে প্রায় আকাশে উঠল জিপের পিছন দিক। ছিটকে গিয়ে উইণ্ডশিল্ডের উপর পড়ল রানা। অসংখ্য কাঁচ নিয়ে দু'ভাঁজ হয়ে গেছে। হুডের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। তারপর পড়ে গেল জিপের নাকের ডগা থেকে। সব এত দ্রুত ঘটল যে ধরতে পারল না ইঞ্জিনের গ্রিল।

রানা অদৃশ্য হতেই ব্রেক ছেড়ে দিল ড্রাইভার, টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। জানে, যে লোক তাদের আক্রমণ করেছিল, সে এখন অসহায়ভাবে পড়ে আছে রাস্তার উপর।

পনেরো

আইয়োনিয়ান সাগর। কুচকুচে কালো ঢেউ কেটে চলেছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। ওটার ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনগুলো চালু করে ওরা কোরিন্থের পশ্চিমে, পেলোপোনেজিয়ান পেনিনসুলা ঘুরে ছুটে চলেছে পুবে। আশপাশে মেরিটাইম ট্রাফিক নেই বললেই চলে। রেইডারস্কোপে শুধু কয়েকটা জেলে-নৌকা। রাতে খাবারের সন্ধানে সাগর সমতলে উঠে আসা স্কুইড ধরছে।

অপারেশন্স সেন্টারে একটা কম্পিউটার মনিটরে ব্যস্ত অনিল। ইউএভি নিয়ে ঘুরছে রেসপন্সিভিস্ট কমপ্লেক্সের উপর। কিছুক্ষণ আগে উর্বশীর কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়েছে। একটু পর রবিনসন আর-৪৪ নিয়ে ফিরবেন আলম সিরাজ, তখন বুঝে নেবেন ড্রোন। এদিকে তীরের কাছে চলে এসেছে মার্ভেল, কাজেই জাহাজের দায়িত্ব নিয়েছে গগল।

'মার্ভেল, আমি সিরাজ বলছি।' অন্য এক কমিউনিকেশন ক্লার্ক বসেছে আতাসির সিটে। ওভারহেড স্পিকার চালু করে দিল সে। কপ্টারের চ্যানেল ধরল। 'আমি আপনাদের দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, সিরাজ, চলে আসুন,' বলল গগল। 'আমরা এগুব পাঁচ নট গতি তুলে।' কয়েকটা কি টিপল সে। মার্ভেলের

ড্রাইভ টিউবের ভিতর কমে গেল পানির স্রোত। পাম্পগুলো রিভার্স করতেই নির্ধারিত হলো জাহাজের গতি। স্রোত ও ঢেউ সরিয়ে নিতে চাইছে। আরও কয়েকটা কি টিপে সন্তুষ্ট হলো গগল। এবার সহজে জাহাজে নামতে পারবেন সিরাজ। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল গগল। ঘরের পিছনে ড্যামেজ-কন্ট্রোল অফিসার নিজ স্টেশনে। 'ফায়ার টিম রেডি?'

পাথরের মত বসে আছে বাঙালি অফিসার। 'জী, স্যর। ওয়াটার ক্যাননের উপর আঙুল রেখে অপেক্ষা করছি।'

'গুড। কম ক্লার্ক, সিরাজকে জানিয়ে দাও, আমরা তৈরি। উনি আসতে পারেন।' ইণ্টারকম টিপল গগল। ডক্টর রাইনার রয়েছে হ্যাঙারে। 'ফারা, এখুনি আসছেন সিরাজ।'

একটু আগে ওরা জেনেছে বুলেট আঁচড় কেটেছে পাইলটের কাফ মাসলে। বিশাল স্ক্রিনে চেয়ে রইল গগল। মার্ভেলের প্রধান মাস্তুলের উপর শক্তিশালী ক্যামেরা, ওটা দেখিয়ে চলেছে পিছন দিকের কার্গো হ্যাচ। ওটার নীচ থেকে উপরে উঠে এসেছে হেলিপ্যাড। চাঁদের আভায় নামতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত রবিনসন আর-৪৪কে। স্টার্ন রেলিঙের উপর দিয়ে এলেন আলম সিরাজ। ইঞ্জিন কাউলিঙ থেকে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া।

সাধারণ পাইলট যা করবে না, বিনা দ্বিধায় তা-ই করতে পারেন দুঃসাহসী সিরাজ। আঁধার সাগরের উপর দিয়ে বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন ভাঙাচোরা কপ্টার নিয়ে। অন্য কেউ হলে নেমে পড়ত কোনও খামার-মালিকের মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে উঠত মানুষ। হাজারো প্রশ্ন তুলত গ্রিক কর্তৃপক্ষ। তার চেয়েও বড় কথা, মাসুদ রানার প্ল্যান সি অনুযায়ী জাহাজে থাকতে হবে সবাইকে। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ নিয়ে সরে যেতে হবে গ্রিস থেকে বারো মাইল দূরে, আন্তর্জাতিক সাগরে।

ডেকের কয়েক ফুট উপর ভাসছেন সিরাজ, খুব ধীরে নামাতে লাগলেন কপ্টার। স্কিডগুলো ডেক স্পর্শ করবার এক সেকেণ্ড আগে কপ্টারের একযস্ট থেকে বেরুল বিপুল ধোঁয়া। ইঞ্জিন সিয করেছে, ল্যাণ্ডিং প্যাডে ধপ করে নেমে এল রবিনসন। মড়াৎ করে ভেঙে গেল একটা স্ট্রাট। স্ক্রিনে আলম সিরাজকে দেখতে পেল গগল, শান্ত ভঙ্গিতে একে একে বন্ধ করছেন কপ্টারের সিস্টেম। তারপর সিট বেল্ট খুলে ফেললেন, হ্যাঙারের এলিভেটর নামতে শুরু হওয়ায় নেমে এলেন মেঝের উপর। সরাসরি চাইলেন ক্যামেরার দিকে। ঠোঁটে তিক্ত হাসি।

জাহাজে একজন ফিরল, ভাবল গগল। বাকি রইল আরও ছয়জন।

ভাড়া করা ভ্যান নিয়ে ছুটছে উর্বশী, এক চাকা ফুটো। বাঁক নিলে রাস্তা থেকে নেমে যেতে চাইছে গাড়ি। পেলোপোনিজের নতুন জাতীয় সড়কের দিকে চলেছে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে ভাবছে, পিছনে কেউ নেই। তবে বেশিক্ষণ সহায়তা করবে না ভাগ্য। ভ্যানের ভিতর দড়িদড়া ঠিক করছে আতাসি ও কাশেম। যারা পিছু নিয়েছে তাদের গতি কমাতে হবে, কাজেই এমন কিছু খুঁজছে সোহেল, যেটা কাজে লাগবে। ল্যাপটপ দিয়ে ইউএভি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে উর্বশী। তবে ওটা দিয়ে কিছু করা কঠিন। সোহেলের জন্য ভ্যানের ভিতর রোলিং চেয়ার ও ছোট ডেস্ক বসিয়েছে উর্বশী। হয়তো ওগুলো কাজে লাগবে। দরজা দিয়ে ফেলা যায় পিছনে। সবার অস্ত্র ও গুলি জমা নিয়েছে সোহেল। ওদের সঙ্গে তিনটে পিস্তল ও ছয়টা বাড়তি ম্যাগাজিন। কিন্তু সেগুলোর ভিতর আবার প্লাস্টিকের বুলেট। এ দিয়ে হয়তো ফুটো হবে উইণ্ডশিল্ড, কিন্তু চাকায় গুলি করলে

ছিটকে চলে যাবে আরেক দিকে।

সড়কের পাশে ছোট ছোট গ্রাম পিছনে পড়ছে। সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া বাড়িঘর। পিছিয়ে গেল আঙুরের মাচার নীচে চেয়ার-টেবিল পাতা টাভার্না—গ্রিক রেস্তোরাঁ। এত রাতে বন্ধ। পিছিয়ে গেল এক পাল ছাগল। উপকূলীয় সড়কের পাশে ইদানীং জায়গা কিনে বাগানবাড়ি করছে বিদেশিরা। কিন্তু মাত্র দুই-এক মাইল দূরেই পাওয়া যায় সত্যিকারের গ্রামাঞ্চল, সেখানে জীবন-যাত্রা এখনও এক শ' বছর আগের আমলের।

হঠাৎ রিয়ার-মিররে আলোর ছটা দেখল উর্বশী। এত রাতে ওরা ছাড়া কেউ ছিল না সড়কে। বুঝে নিতে দেরি হলো না ওই বাতি রেসপন্সিভিস্টদের জিপ গাড়ির।

'আমাদের সঙ্গী জুটেছে,' বলল। মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর। ভারসাম্য রাখতে চাইছে তীব্র গতি ও ছিঁড়ে যাওয়া চাকার ভিতর।

'ওদেরকে কাছে আসতে দাও,' ভ্যানের পিছন থেকে জানাল সোহেল। হাত রেখেছে পিছন দরজার হ্যাণ্ডেলে, ওটা খুলে দিয়েই হাতে তুলে নেবে পিস্তল। ওর কণ্ঠ হাস্যকর শোনাল। ফাটা চাকার কারণে নাচতে নাচতে চলেছে গাড়ি।

আশি মাইল গতি তুলে আসছে জিপ। দেখতে না দেখতে দুই গাড়ির মধ্যকার দূরত্ব অনেক কমে এল। পিছনের জানালা দিয়ে দেখছে সোহেল। একটু পরেই বুঝল, ভ্যানের পিছনে থাকবে না জিপ, চলে আসবে পাশে।

'সোহেল!' তীক্ষ্ণ শোনাল উর্বশীর কণ্ঠ।

'দেখেছি।'

মাত্র দশ গজ দূরে জিপ। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলল সোহেল, হাতে উঠে এল গ্লক পিস্তল। যন্ত্রের মত টিপতে শুরু করেছে

ট্রিগার। ওর প্রথম বুলেট জিপের গ্রিল ও হুডের উপর দিয়ে পিছলে গেল। পরের কয়েকটা লাগল উইণ্ডশিল্ডে। তিনটে গুলি ফুটো করল কাঁচ। ড্রাইভার ভয়ে একপাশে সরতে চাইল। দ্রুত কমে গেল গতি। বিশ্রী আওয়াজ তুলেছে চাকাগুলো। মনে হলো সড়ক থেকে ছিটকে পড়বে জিপ। তবে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং-হুইল ঘোরাল ড্রাইভার। গাড়ি যেদিকে পিছলে গেছে, তার উল্টোদিকে বনবন করে ঘুরছে হুইল। ছেঁচড়ে চলেছে জিপ, তারপর বামদিকের চাকা ফিরে এল পেভমেণ্টে।

আবার ধাওয়া শুরু করল জিপ। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল প্যাসেঞ্জার সিটের গার্ড, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

'আতাসি, কাশেম, শুয়ে পড়ো!' তাড়া দিল সোহেল। 'উর্বশী, সোজা রাখো গাড়ি, মাথা নিচু!'

কর্কশ আওয়াজ ছাড়ল গার্ডের রাইফেল। ভ্যানের ভিতর তীক্ষ্ণ শিস তুলে ঢুকছে বুলেট। প্রচণ্ড তাপে হিসহিস আওয়াজ তুলছে ফুটো হয়ে যাওয়া ধাতব প্লেট। পিছনের জানালা বিস্ফোরিত হলো। চারপাশে হীরার টুকরোর মত ছিটকে পড়ল কাঁচ। ভ্যানের ভিতর নানাদিকে ছুটল একটা বুলেট, তারপর বিঁধল গিয়ে উর্বশীর সিটের পিছনে।

উইণ্ডো ফ্রেমের উপর দ্বিতীয় পিস্তল তুলল সোহেল, পাল্টা গুলি শুরু করল। আতাসি ও কাশেম দেহ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে অচেতন অমলকে।

'লাগল কী করে!' ড্রাইভিং সিট থেকে বলল উর্বশী। হুইলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তারই ফাঁকে দেখছে রিয়ারভিউ মিরর। 'সোহেল, ওই লোকের বুকে গুলি লেগেছে।'

'কপাল গুণে। ব্যাটার কী অবস্থা?' পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরল সোহেল।

'তা জানি না। রাইফেল নিয়েছে পিছনের লোকটা। এক মিনিট!'

সরে গিয়ে জিপের গতি-পথে পৌঁছল উর্বশী, দেরি না করে কড়া ব্রেক কষল। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো দুই গাড়ির ভিতর। ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল ভ্যান, থামতে চাইছে। এদিকে তুবড়ে গেল জিপের বাম্পার। মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে গেল ড্রাইভার। পরক্ষণে গতি বাড়িয়ে আবার গুঁতো দিল ভ্যানের পিছনে। জিপ থেকে ছিটকে পড়ল আহত গার্ড। তার সঙ্গী আছড়ে পড়ল রোল বারের উপর।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার চেপে ধরেছে উর্বশী। পিছনে পড়ল জিপ। দেখতে না দেখতে এক শ' গজ এগিয়ে গেল ভ্যান। নিজেকে সামলে নিয়েছে গার্ড। আবারও ধাওয়া শুরু করল জিপের ড্রাইভার।

'মার্ভেল, আমরা কত দূরে?' জানতে চাইল উর্বশী।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অনিল, 'ইউএভি দিয়ে তোমাদের দেখছি। আরও ছয় মাইল যেতে হবে।'

কপালকে অভিশাপ দিল উর্বশী।

'আরও খারাপ খবর,' বলল অনিল। 'প্রথমটার পিছনে আসছে আরও দুটো জিপ। একটা সিকি মাইল। আরেকটা আরও খানিক পিছনে।'

আবার কাছাকাছি হয়েছে পিছনের জিপ। তবে বেশি কাছে আসছে না। ভ্যানের চাকা লক্ষ্য করে গুলি করছে গার্ড। এঁকেবেঁকে এগুতে শুরু করল উর্বশী। জানে, এভাবে বেশিক্ষণ চলা সম্ভব নয়। 'কেউ পরামর্শ দেবেন?' জানতে চাইল।

'আমার পরামর্শের ঝুলি শেষ,' বলল সোহেল। পরক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। মাইক্রোফোনে টোকা দিল। 'অনিল,

জিপের উপর ইউএভি নামিয়ে আনলে?'

'কী?'

'ওই ড্রোন। মনে কর্ ওটা ক্রুজ মিসাইল। প্যাসেঞ্জার সিটের উপর নেমে এলে? ওটার ভিতর ফিউয়েল আছে, আছড়ে পড়লে বিস্ফোরিত হবে।'

'কিন্তু ওটা না থাকলে খুঁজে পাব রানাকে?'

'পাঁচ মিনিটের ভিতর ওর সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'না।'

'তা হলে ওই ইউএভি ওর দরকার নেই। যা করার তাড়াতাড়ি কর্।'

'ঠিক আছে।'

জিপের সামনে পেভমেন্টের উপর পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল ড্রাইভার। দেহ সোজা করে নিতে মাত্র এক সেকেণ্ড পেল রানা, তারই ফাঁকে খপ্ করে ধরল অগ্রসরমান ফ্রন্ট বাম্পার। ভাল করেই ধরেছে, কিন্তু ওকে ছেঁচড়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল জিপ। দু'হাতের জোরে পিঠ ও কোমর উঁচু করল রানা, তবে বুটের হিলদুটো খেয়ে নিতে চাইল কর্কশ পেভমেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ড ওভাবে রইল রানা, স্বাভাবিক করে নিল শ্বাস। মিনি-উজি হারিয়েছে, তবে গ্লক পিস্তল কোমরের হোলস্টারে। বাম্পারে বামহাতের জোর বাড়াল ও, ইয়ারবাড কানে গুঁজে নিল ডানহাতে। সোহেল ও অনিলের শেষ ক'টা কথা শুনতে পেল।

'নেগেটিভ, ওটা লাগবে আমাদের,' বলল থ্রোট মাইকে।

মুখের কাছে গর্জন করছে জিপের ইঞ্জিন।

'রানা, কোথায় তুমি?' ভেসে এল উর্বশীর কণ্ঠ।

'বাদুড়ের মত ঝুলছি একটা জিপের নীচে,' ঘাড় কাত করে রাস্তার দিকে চাইল রানা। চিত হয়ে থাকবার ফলে সব উল্টো লাগছে। গাড়ির দুটো টেইল-লাইট দেখতে পেল। ওগুলোর উপর ঝিকিয়ে উঠছে রাইফেলের লালচে আগুন। 'একটু অপেক্ষা করো। ভ্যানের পিছু নেবে না কেউ।'

'বড়জোর আধ মিনিট সময় পাব।'

'এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।' দু'কাঁধের জোরে নিজেকে বাম্পারের সামনে আনতে চাইল রানা। ইঞ্জিনের গ্রিল বেয়ে উঠতে হবে, কিন্তু জানতে দেয়া চলবে না ড্রাইভারকে। বামহাতে বাম্পার ধরে রইল রানা, ডানহাতে শক্ত করে ধরেছে গ্রিল। পরক্ষণে দুই হাতের জোরে ধরল ইস্পাতের জাল, ভাঁজ করে নিল পাদুটো। বাম্পারে উঠে পরমুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে উঠল হুডের উপর। হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এল গ্লক।

দ্বিতীয় সেকেণ্ড ব্যয় করল না রানা, পরপর দু'বার গুলি করল ড্রাইভারের বুকে। এত কাছের রেঞ্জে প্লাস্টিকের বুলেট যে কাউকে খুন করবে, তবে লোকটার পরনে কেভলার ভেস্ট। দুই বুলেটের ধাক্কা যেন খচ্চরের দুই জোরালো লাথি। ফুসফুস মুচড়ে গেল তার, শ্বাস আটকে খাবি খেতে শুরু করল ড্রাইভার।

হুড বেয়ে উঠে এল রানা, উইণ্ডশিল্ড পেরিয়ে নেমে পড়ল সিটে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ড্রাইভারকে। লোকটার চেহারা ফ্যাকাসে, বিকট হাঁ করে বাতাস নেয়ার চেষ্টা করছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে জিপ, তবে সেদিকে খেয়াল দিল না রানা। ড্রাইভারের ডান পা এখনও চেপে রেখেছে অ্যাক্সেলারেটার।

ঝট করে পিস্তল তুলল রানা, গুলি করল লোকটার উরুর

উপর। ড্যাশবোর্ডে ছিটকে লাগল রক্ত। ড্রাইভারের পা সরে গেল গ্যাস পেডাল থেকে। কমে আসতে শুরু করেছে গাড়ির গতি। বিশ মাইলের নীচে নেমে আসতেই লোকটার কপালে পিস্তল তাক করল রানা। 'বেরিয়ে যাও।'

অলস ভঙ্গিতে লাফ দিল লোকটা, ধুপ করে নামল সড়কের পাশে। নুড়ি-পাথরে পিছলে ধড়াস্ করে পড়ল, গড়াতে শুরু করেছে থামল কয়েক গড়ান দিয়ে। দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে আহত উরু। সারা দেহ ফেটে বেরুচ্ছে রক্ত।

ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল রানা, রওনা হয়ে গেল প্রথম জিপ লক্ষ্য করে। রিয়ারভিউ মিররে হেডলাইট দেখল। আসছে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডদের তৃতীয় জিপ। লোকগুলোর ধাওয়া করবার ভঙ্গি সতর্ক করে তুলছে রানাকে। তবে আপাতত এ নিয়ে ভাববার সময় নেই।

যারা উর্বশীর ভ্যানের দিকে গুলি করছে, তারা জানে না ও পিছন থেকে আসছে। এ-ও জানে না তৃতীয় জিপ কাছাকাছি পৌঁচেছে। গতি আরও তুলল রানা। পেরুল একটা সাইনবোর্ড। তাতে গ্রিক ও ইংরেজিতে লেখা: সামনে নতুন জাতীয় সড়কের সঙ্গে মিশেছে এই সড়কের র‍্যাম্প। সামনে কোরিন্থের খাল ও সেতু।

সঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে, বুঝতে পারছে রানা। তার আগে খসিয়ে দিতে হবে লোকগুলোকে। ডানদিকে চোখে পড়ল র‍্যাম্প। পঞ্চাশ গজ পিছনে চলে এসেছে তৃতীয় জিপ। ভ্যানের পিছনে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে লাগছে বুলেট।

সামনের জিপের দিকে চাইল রানা। এদিকে ওর পিছনটা শুঁকছে এসে তৃতীয় জিপ। 'উর্বশী,' তাড়া দিল ও। 'গতি বাড়াও। চাকা খসে পড়লে পড়ুক।'

প্রথম জিপের কাছ থেকে সরতে শুরু করেছে ভ্যান। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার দাবাল ড্রাইভার, কমিয়ে আনল দূরত্ব। ততক্ষণে তার পিছনে হাজির হয়েছে রানা। ও যা করতে চলেছে তাকে পুলিশ অফিসাররা বলে 'পিট'—প্রেসিশন ইম্মোবিলাইযেশন টেকনিক। সঠিক ভাবে ধাক্কা দিতে হয়। সামনের জিপের পিছনে জোরে গুঁতো দিল না রানা, এর বেশি দরকারও পড়ল না। এক পাশে ধাক্কা দিতেই চরকির মত ঘুরে গেল গাড়িটা।

রানা যেন স্টক-কার ড্রাইভার, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। পাশ থেকে আরেকবার ধাক্কা দিল। প্রথম গুঁতো সামলে নিতে চেষ্টা করছে ড্রাইভার, এমনি সময় দ্বিতীয় ধাক্কা একেবারে বেসামাল করে দিল তাকে। স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে জিপের উপর চড়াও হয়েছে রানা। আর কিছু করবার রইল না ড্রাইভারের, বনবন করে ঘুরল গাড়ি। গতি থামল না, সড়কের মাঝখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল আরেক পাশে। বামদিকের চাকা আকাশে উঠল, পরক্ষণে ডিগবাজি শুরু করল জিপ। তিনবার গড়িয়ে থামল ছাতের উপর ভর করে। ততক্ষণে হয়ে গেছে মুড়ির টিন। ভিতরে আটকা পড়েছে ড্রাইভার ও গার্ড।

থ্রুওয়েতে ওঠার সিঙ্গেল লেনের মুখটা আটকে দিয়েছে জিপ। পিছন ফিরে চাইল রানা। এখন আর উর্বশীর পিছনে ধাওয়া করবে না তৃতীয় জিপ। ভ্যান নিয়ে পৌঁছে যাবে সোহেলরা সেতু পর্যন্ত। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখেছে রানা, দেখতে পেল তৃতীয় জিপ। মন্থর গতিতে আসছে ওটা র‍্যাম্পের দিকে। লোকগুলো জানে, উড়ে গেছে পাখি। র‍্যাম্পে না থেমে আবার গতি তুলল ড্রাইভার, ধাওয়া শুরু করল রানাকে।

কোরিন্থের দিকে চলেছে রানা।

ভ্যান ও জিপগুলোর উপর ঘুরছে ড্রোন, ওটার ক্যামেরার ছবি দেখে অবাক হয়ে গেছে অপারেশন্স সেন্টারের সবাই। অনিল যোগাযোগ করতে চাইল রানার সঙ্গে। 'দ্বিতীয় জিপে কী তুই, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'দারুণ দেখালি!'

'থ্যাঙ্কস। চারপাশের অবস্থা কী?'

'উর্বশী সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কেউ ধাওয়া করছে না। রেসপন্সিভিস্টদের আখড়া থেকে নতুন কোনও গাড়িও রওনা হয়নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনও জানে না গোলাগুলির কথা। আর দুই মিনিটের মধ্যেই খালের ভিতর ঢুকছি আমরা। এইমাত্র হ্যাঙার থেকে এলেন সিরাজ, ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছি ইউএভি।'

'আমি শহরে ঢুকছি,' বলল রানা। 'সামনের পথ খোলা?'

'গতবার যখন দেখলাম, সব পরিষ্কার। উর্বশীরা সেতুর উপর উঠলে তোর দিকে মনোযোগ দেয়া হবে। তখন থেকে এরিয়াল কাভারেজ পাবি।'

'ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।'

ফ্লাইট সুট পরে অপারেশন্স সেন্টারে এসে ঢুকেছেন আলম সিরাজ, ডান পা'র প্যান্ট ছেঁড়া, কাফ মাসলের উপর বড় এক ব্যাণ্ডেজ। কম্পিউটারের সামনে বসে পড়লেন। পা ভাঁজ করতে পারছেন না।

'আপনার কী অবস্থা?' জানতে চাইল অনিল।

'বউ থাকলে গর্ব করে বলতাম, যুদ্ধ করেছি।'

'কয়টা স্টিচ?'

'আট। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না, কিন্তু আমাদের

রবিনসনের অবস্থা করুণ। পনিরের মত সারা গায়ে ফুটো হয়েছে। ক্যানোপির ভিতর ঢুকেছে এগারোটা বুলেট। ...ঠিক আছে, মিস্টার অনিল, আমি তৈরি।'

ইউএভির কন্ট্রোল সিরাজের হাতে ছেড়ে দিল অনিল। চাইল বিশাল স্ক্রিনের দিকে। ফ্রেইটার নিয়ে কোরিন্থ ক্যানেলের ভিতর দিয়ে চলেছে গগল।

প্রথমবার রোমানদের স্বর্ণযুগে প্রস্তাব করা হয়, কঠিন হয়ে উঠছে সরু ইস্থ্মুস দিয়ে চলাচল, কাজেই খনন করা উচিত কোনও ক্যানেল। কিন্তু খাল তৈরি হলো না. সম্রাটের সেরা ইঞ্জিনিয়ার দল গড়ে তুলল নতুন এক পথ। তার নাম দিল গ্রিকরা, দাইওকোস। তখন থেকে অন্য নিয়ম শুরু হলো। রোমানদের জাহাজ থেকে মালামাল নামাল ক্রীতদাসরা, কাঠের চাকা লাগিয়ে ঠেলে জাহাজ নিয়ে গেল পরের টার্মিনাসে। ওখানে আবার ভাসানো হলো জাহাজ, নতুন করে তোলা হলো মালামাল। এই চলল উনিশ শতকের শেষ তক, তারপর মানুষ শিখল নতুন প্রযুক্তি। হাতে চলে এসেছে নতুন খনন যন্ত্র। দায়িত্ব পেল একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানি। কিন্তু খাল খনন করতে ব্যর্থ হলো ওরা। এবার দায়িত্ব নিল এক গ্রিক কোম্পানি। তাদের কাজ শেষ হলো আঠারো শ' তিরানব্বুই সালে। ক্যানেল খনন শেষ হলে, আধুনিক জাহাজগুলোকে আর পেলোপোনিজ ঘুরিয়ে এক শ' ষাট মাইল বয়ে নেয়ার প্রয়োজন রইল না।

এই ক্যানেলের দৈর্ঘ্য চার মাইলেরও কম, পাশে বিরাশি ফুট। দেখবার মত তেমন কিছু নেই ক্যানেলে, তবে রয়েছে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এই ক্যানেল তৈরি করা হয় পানির নীচে-উপরে নিখাদ পাথর কেটে। কাটার পর মাথার উপর এখনও রয়ে গেছে দুই শ' পঞ্চাশ ফুট পুরু পাথুরে পাহাড়। তার নীচ

দিয়ে চলে জাহাজ। দেখলে মনে হয় কোনও দৈত্য কুঠার দিয়ে পাথর কেটে সরু এক পথ তৈরি করেছে। এই ক্যানেলের সেতুগুলো টুরিস্টদের পছন্দের জায়গা, ওখান থেকে নীচে চাইলে দেখা যায় সমুদ্রগামী জাহাজ।

খুদে পসিডোনিয়া শহরের আলো চোখে না পড়লে স্ক্রিনে মনে হতো ছুটে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা দেবে বুঝি জাহাজ। এই ক্যানেল এতই সরু যে সাগর থেকে চোখেই পড়ে না। তবে বোঝা যায়, সামনে কালচে পাথুরে উপকূল। এক মাইল দূরে এক সেতুর উপর ঘুরছে শক্তিশালী একটা ঝকঝকে আলো।

'কোনও ভুল হবে না তো, গগল?' জানতে চাইল অনিল।

'জোয়ার চলছে। আমাদের দু'পাশের উইং ব্রিজ থেকে চার ফুট দূরে থাকবে তীর। বলা যায় না, কোথাও চল্টে যেতে পারে রং। তবে বেরিয়ে যাব।'

'চালিয়ে যান,' বলল ফু-চুং। 'আমি স্ক্রিনে দেখতে রাজি নই। লাইভ শো দেখব। ব্রিজে উঠছি।'

'তবে বাইরে বেরুবেন না।' সাবধান করে দিল গগল। 'এদিক-ওদিক হলে মুস্কিল হবে।'

'আপনার কথাই রাখব।' মনে মনে হাসল ফু-চুং। এলিভেটরে উঠে পড়ল, এক মিনিটের ভিতর পৌঁছে গেল পাইলট হাউসে। একবার পিছনে চাইল। ডেকের উপর ক্রুরা প্রস্তুত। তাদের কাজ পরীক্ষা করছে জলিল খান ও সানজিদা স্বর্ণা। প্রত্যেকে সশস্ত্র। বো'র দিকে কয়েকজন কমাণ্ডো।

সরু ক্যানেল ধরে বিশ নট গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল। আজকাল এই ক্যানেল ব্যবহার করে শুধু প্লেযার বোট ও সাইটসিইং ক্রাফট। বড় জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে যায় টাগ বোট। সঙ্কীর্ণ পথ, কাজেই গতি তোলা হয় দুই থেকে চার নট।

তবে মার্ভেলের সবাই জানে ক্যাপ্টেন হিসাবে অস্ত্র-ব্যবসায়ী গগল তুলনাহীন, তারপরও বুকের ভিতর কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করছে ফু-চুং।

স্টারবোর্ডে দীর্ঘ ব্রেকওয়াটার পেরুল মার্ভেল। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে বাজতে লাগল কলিশন অ্যালার্ম। কী ঘটতে পারে, জানে সবাই। প্রত্যেকে কিছু না কিছু ধরে দাঁড়িয়েছে।

খালের দু'পাশকে যুক্ত করেছে ছোট ছোট কয়েকটা সেতু। এগুলো উঁচু ট্রাস ব্রিজ নয়, দুই লেনের, সাগর-সমতল থেকে কিছুটা উপরে। কোনও জাহাজ আসবার সময় এই সেতুগুলো যন্ত্রের সাহায্যে নামিয়ে দেয়া হয় সাগরের মেঝেতে। তার উপর দিয়ে পেরিয়ে যায় জাহাজ। তারপর আবার চাকা ঘুরিয়ে তুলে আনা হয় সেতু। আবার শুরু হয় গাড়ি চলাচল।

বো'র দিকে চাইল ফু-চুং। ওটা রিইনফোর্সড্, সাগরের বরফ কেটে এগুতে পারে। সামনের সেতুকে ধাক্কা দিল মার্ভেল, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষে কান ফাটানো আওয়াজ হলো। সেতুটা ভাঙল না, মার্ভেলের প্রচণ্ড ওজন ছুটিয়ে দিল লক, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নীচে তলিয়ে গেল সেতু। মনে হলো চমকে উঠল মার্ভেল, তারপর বিপুল পানি ছলকে দিয়ে এগুতে শুরু করল। খালের দু'পাশের তীর ভেসে গেল পানিতে। টলতে শুরু করল মার্ভেল, তারপর উচ্ছল পানির ভিতর দিয়ে এগুতে লাগল।

দু'পাশে চাইল ফু-চুং, দু'দিকে বৈশিষ্ট্যহীন কালো পাথুরে তীর। তবে সামনের দু'পাশ উঠে গেছে আকাশের দিকে। ওই পাহাড় যেন বামন করে দিয়েছে মার্ভেলকে। খানিক দূরে গাড়ি ও রেলরোড সেতু। দেখে মনে হয় ছোট ছেলেদের খেলনা লোগো সেট।

খালের ভিতর দিয়ে দ্রুত গতিতে চলেছে মার্ভেল, কোনও ভুল করেনি গগল। খালের মাঝখান দিয়ে ছুটছে। এমনই সচ্ছন্দে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে আথর্টশিপ থ্রাস্টার, অন্য কেউ হলে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত। একবারও ফ্লাইং ব্রিজগুলো স্পর্শ করল না মার্ভেল। পাইলট হাউস থেকে বেরুল ফু-চুং, চলে গেল পিছনে। এ কাজ বোকামি, এবং বিপজ্জনক। এখন যদি কোনও ভুল করে গগল, এই তীব্র গতির কারণে সুপারস্ট্রাকচার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু মনে লোভ জেগে উঠেছে ফু-চুঙের, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে দেখল পাথর—শীতল, রুক্ষ। ক্যানেলের এত গভীরে দিনের বেশির ভাগ সময় ছায়া থাকে, পাহাড়কে উত্তপ্ত করতে পারে না সূর্য—তাই ঠাণ্ডা।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার ব্রিজে ঢুকল ফু-চুং, ঠিক তখনই মার্ভেলের রেলিং ঘষা দিল ক্যানেলের দেয়ালকে। জাহাজটা সামান্য সরিয়ে নিল গগল। আবার ফিরে এল খালের মাঝখানে।

'উর্বশীর ভ্যান নিউ ন্যাশনাল রোড ব্রিজের মুখে,' ইণ্টারকমে শোনা গেল সিরাজের কণ্ঠ। 'আমি মিস্টার রানাকে দেখতে পেয়েছি। উনি এখনও এগিয়ে আছেন। পিছনে চলছে আরেকটা জিপ।'

'আমরা সবাই তৈরি,' মনে মনে বলল ফু-চুং।

ক্ষত-বিক্ষত টায়ার শেষে ছিঁড়েই গেল। সেতু এখনও সিকি মাইল দূরে। বাকি পথ এগুতে হবে রিমের উপর দিয়ে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে চলেছে উর্বশীর ভ্যান। আওয়াজটা সহ্য করবার মত নয়। মনে হলো চকবোর্ডের উপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে কেউ। দাঁতে দাঁত টিপে বসে আছে উর্বশী। তবে সেতুর

মাঝখানের স্প্যানে পৌঁছে যেতেই ভাবল, 'স্রষ্টা, তোমাকে ধন্যবাদ, বাড়ি পৌঁছে গেছি।' ভ্যান থামিয়ে বিরাট শ্বাস ফেলল।

পাশের দরজা খুলে ফেলল আতাসি, দেখতে পেল দ্রুত এগিয়ে আসছে মার্ভেল। সেতুর উপর থেকে মোটা চারটে ক্লাইম্বিং নাইলন দড়ি ফেলল। দড়িগুলো বেঁধে দেয়া হয়েছে ভ্যানের সিটগুলোর ফ্রেমে। গোল করে পেঁচিয়ে থাকা দড়ি দ্রুত নীচের দিকে রওনা হলো, থামল গিয়ে পানির দশ ফুট উপরে।

সিট থেকে নেমে এল উর্বশী, দ্রুত হাতে আটকে নিল র‍্যাপেলিং গিয়ার—হার্নেস, হেলমেট ও গ্লাভস। ওদের দু শ' ফুট নীচে মার্ভেলের স্টার্ন থেকে বিপুল পানি পিছন দিকে ছুটছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো থ্রাস্টার দিয়ে গতি কমিয়ে আনছে। দেখতে না দেখতে একদম থেমে গেল জাহাজ।

ট্যানডেম প্যারাশুট জাম্পারদের মত নিজেকে হার্নেসের সঙ্গে আটকে নিয়েছে আতাসি। কাশেম ও সোহেল সাহায্য করছে ওকে। আতাসির হার্নেসের সঙ্গে ওরা আটকে দিল অচেতন অমলকে। এবার নিজেরা আটকে নিল হার্নেস। নীচের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল।

মার্ভেলের ডেকে দড়িগুলো খপ্ করে ধরল ক্রুরা, রওনা হয়ে গেল জাহাজের পিছনের দিকে। যখন বুঝল সুপারস্ট্রাকচার, কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা বা আর কিছুর সঙ্গে দড়ি জড়িয়ে যাবে না, ইশারা করল। পাল্টা ইশারা করল ফু-চুং।

ওরা তৈরি।

উচ্চতার কথা মনেই রাখল না উর্বশী, গার্ডরেইল ডিঙিয়ে নামতে শুরু করল। ওর পাশে নামছে সোহেল। ওর হার্নেসে রয়েছে বিশেষ আঙটা, সঠিক সময়ে ওটার সুইচ গতি কমিয়ে দেবে। অমলকে নিয়ে কাশেমের পাশে নামছে আতাসি।

গার্ডারগুলো পেরিয়ে যেতেই রইল শুধু মার্ভেলের ডেক। দুই শ' ফুট নীচে। ওদের ওজন রাখছে শুধু পৌনে এক ইঞ্চি দড়ি।

নামছে উর্বশী। ওর পর পর সোহেল, কাশেম ও আতাসি। তীব্র গতিতে নেমে চলেছে। কিছুক্ষণ পর র‍্যাপেলিং হার্নেস ব্যবহার করে কমিয়ে আনল ওরা নামার গতি। প্রায় একই সময়ে ডেকের উপর নামল ওরা, অপেক্ষা করল। হার্নেস থেকে ওদের মুক্তি দিল ক্রুরা। লাইনগুলো সরিয়ে নিয়ে আটকে দেয়া হলো কাস্ট-আয়রন বোলার্ডগুলোর সঙ্গে।

দ্রুত নেমে এসেছে ওরা, রক্তের ভিতর নাচছে অ্যাড্রেনালিন। উর্বশী বলল, 'এবার খেলা শেষ করুন, গগল।'

ক্লোজ্‌ড্-সার্কিট টেলিভিশনে ডেকের সবই দেখছে গগল, এবার টি হ্যাণ্ডেল থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল। রওনা হয়ে গেল মার্ভেল। মুহূর্তে বিদায় নিল দড়ির ঢিলা ভাব, থরথর করে উঠল। ভাড়া নেয়া ভ্যানকে প্রচণ্ড টান দিল জাহাজের থ্রাস্টার। সেতুর গার্ডরেইল পেরুল ভ্যান, পাথরের মত নামতে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড পর এসে পড়ল পানির ভিতর। ভিজে গেল মার্ভেলের ফ্যানটেইল। পিঠ দিয়ে পড়েছে ভ্যান। চেপ্টে গেল ছাত, বিস্ফোরিত হলো জানালাগুলো। মার্ভেলের ইঞ্জিনগুলো উপুড় করে দিল ভ্যানটাকে। দেখে মনে হলো ওটা হাঁস, মাছের আশায় ডুব দিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে মার্ভেল, ভ্যানের জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছে পানি। দেখতে না দেখতে ডুবে গেল গাড়ি। ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে মার্ভেল। ঈজিয়ান্ সাগরে বেরিয়ে কেটে দেয়া হবে দড়িগুলো, হারিয়ে যাবে ভ্যান।

ওটা ভাড়া নেয়া হয় ছদ্ম-পরিচয়ে, কাউকে খুঁজে পাবে না কর্তৃপক্ষ। মার্ভেলের কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওই

ভ্যানের। কেউ জানবে না একদল দক্ষ এসপিয়োনাজ এজেন্ট একটা মিশন নিয়ে এসেছিল। এবং তারা বাধ্য হয়ে তাদের 'সি' প্ল্যান ব্যবহার করে। আর মাত্র একজন বাকি রইল, যে জাহাজে ফিরলে সফল বলা যায় এই মিশনটাকে।

কোরিন্থ ক্যানেলের দিকে ছুটে চলেছে মাসুদ রানা। দু'পাশে স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করে পিছনে পড়ছে একের পর এক গ্রাম ও খামার। চাঁদের আলোয় সাইপ্রেস গাছগুলো যেন আর্মির সেন্ট্রি, পাহারা দিচ্ছে মাঠগুলোকে।

রানা তীব্র গতিতে সড়কের বাঁক নিচ্ছে, ট্র্যান্সমিশনের কাছ থেকে আরও গতি আদায় করতে চাইছে। কিন্তু পিছনে লেগেই রয়েছে লেজ। যেন নিজেদের কিডন্যাপ্‌ড্ সদস্যকে হারিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা। প্রচণ্ড গতি তুলছে ড্রাইভার, বারবার দুই লেন ব্যবহার করছে। ধাওয়া করতে গিয়ে পিছলে চলে যাচ্ছে নুড়ি-পাথরের উপর। বারকয়েক রানাকে লক্ষ্য করে গুলিও করেছে তারা। তবে যে গতি তুলে ছুটছে তাতে লক্ষ্য-ভেদ প্রায় অসম্ভব। এটা বুঝতে পেরেই গুলি বন্ধ করেছে, এখন চেষ্টা করছে কাছে পৌঁছুতে।

উইণ্ডস্ক্রিন ভাঙা না থাকলে ভাল হতো, ভাবছে রানা। আশি মাইল গতির বাতাস এসে উড়িয়ে নিতে চাইছে ওকে। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল সামনে থেকে বাতাস শুরু হওয়ায়। সড়কের বালু ও পাথরের কণাগুলো ছিটকে এসে লাগছে চোখে। মুহূর্তে পিছনে পড়ে গেল প্রাচীন ইস্থমিয়া। ওটা গ্রিসের অন্য সব ছোট ধ্বংসস্তূপের মত নয়। নীচু টিলার মত অংশে দেখবার মত কিছু নেই। নেই কোনও মন্দির বা কলাম, বদলে একটা সাইন। তাতে লেখা খুদে এক জাদুঘরের পরিচয়। আরেকটু

এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বড় নোটিস বোর্ড। সামনে দুই কিলোমিটার দূরে আধুনিক শহর ইস্‌থমিয়া। মার্ভেল যদি ঠিক সময়ে হাজির না হয়, মস্ত বিপদে পড়বে, ভাবছে রানা। জিপের গ্যাস গজ জানিয়ে চলেছে, ট্যাঙ্ক প্রায় খালি।

কানের ভিতর ইয়ারব্যাডে নিজের নাম শুনতে পেল রানা। অ্যাডজাস্ট করে নিল রেডিও। 'রানা বলছি।'

'মিস্টার রানা, আমি সিরাজ। মিস্টার সোহেল সবাইকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে গেছেন। আপনাকে ড্রোন দিয়ে দেখছি। মিস্টার গগল হিসাব কষছেন এখন। তবে মনে হয় আপনার উচিত গতি কমানো।'

'নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন পিছনে কী?'

'তা দেখেছি। কিন্তু আপনি যদি ঠিক সময়ে না আসেন, হঠাৎ দেখবেন আকাশে উড়াল দিয়েছেন। আর তারপর কী ঘটবে তা তো বুঝতেই পারছেন। লোহার দেয়ালে চেপ্টে যাবেন। মাছি যেমন থাবড়া খেয়ে মরে।'

'চোখের সামনে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়ে দেয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ,' তিক্ত মনে বিড় বিড় করল রানা।

সামনে উপকূলীয় সড়ক নীচের দিকে গেছে। রানা ফিউল নষ্ট না করতে টিপে ধরল ক্লাচ। মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচের দিকে ছুটে চলেছে জিপ। ড্রাইভ করছে, সেই সঙ্গে এক চোখ রেখেছে সাইড গ্লাসের উপর। পাঁচ সেকেণ্ড পর দেখল রেসপন্সিভিস্টদের হেডলাইটগুলো। আবার গিয়ার এনগেজ করল রানা।

ফটফট আওয়াজ শুরু করল ইঞ্জিন। পর মুহূর্তে শক্তি ফিরে পেল। তবে তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুর্বল কাশির আওয়াজ। পুরনো মালটানা গাড়ির ড্রাইভার যে বুদ্ধি কাজে লাগায়, ঠিক তাই করতে চাইল

রানা। সাপের মত এঁকেবেঁকে চলল কিছুক্ষণ, তাতে যদি ছলকে উঠে ট্যাঙ্ক থেকে কিছু গ্যাসোলিন যায় লাইনে। মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা ভাল, নতুন উদ্যমে চলতে শুরু করেছে ইঞ্জিন।

'মিস্টার রানা, মিস্টার গগলের হিসাব নেয়া শেষ,' জানালেন সিরাজ। 'আপনি সেতু থেকে আট শ' ষাট মিটার দূরে। তার মানে আপনি বড় দ্রুত চলছেন। গতি কমাতে হবে। পঞ্চাশ মাইল গতিতে এগিয়ে আসুন, নইলে কিন্তু...'

পিছনের জিপ আশি গজ পিছনে। দ্রুত এগিয়ে আসছে। সামনের সড়ক সোজা লাইনের মত। এদিক-ওদিক বেঁকে রেসপন্সিভিস্ট জিপ ঠেকানো অসম্ভব। পুরো রাস্তা জুড়ে এগুতে চাইছে রানা। জবাবে পিছন থেকে এল গুলি। হিসহিস আওয়াজ শুরু করল ইঞ্জিন, বেঁকে বসছে। কপাল খারাপ। 'আমি পুরো গতি নিয়ে আসছি,' বলল রানা। 'গগলকেই বলুন গতি বাড়ানো-কমানো যা খুশি করুক।'

ইস্‌থমিয়া শহরে ঢুকে পড়েছে রানা। কীসের শহর, ওটা বড় জোর উপকূলীয় একটা গ্রাম। সাগরের নোনা হাওয়া নাকে এল। চারপাশে আইয়োডিন দেয়া শুঁটকি ও জালের আঁশটে গন্ধ। বাড়িঘরগুলো হোয়াইট-ওয়াশ করা। ছাতের উপর লাল টাইলস। বেশিরভাগ ছাতে স্যাটালাইট ডিশ, ঠিক যেন হাই-টেক ব্যাঙের ছাতা। গ্রামের মাঝে বড়সড় এক স্কয়্যার। ওটা পেরুল রানা, খানিক দূরে সরু সেতু নামানো-ওঠানোর স্ট্যানশন।

'ঠিক আছে, রানা,' ভেসে এল গগলের কণ্ঠ। 'এবার গতি কমাতেই হবে। ঠিক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গতি তুলে এসো, নইলে মস্ত বিপদ হবে।'

'কোনও ভুল হয়নি তো?'

'এ তো সহজ অঙ্ক। হাই স্কুলের ফিফিক্স।' ভাব দেখে মনে

হলো বেশ নাখোশ হয়েছে গগল। 'আমার কথার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

পিছন থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল। রানা জানে না বুলেট কোথায় গেছে। জেনেই বা কী করবে? রাইফেলের কথা ভুলে যেতে চাইল। ওর কাজ শুধু এগিয়ে যাওয়া। তবে গতি কমাতে হবে। একে-৪৭ থেকে ব্রাশ ফায়ার করা হলো বুলেট খটাখট লাগছে জিপের পিছনে। একটা বুলেট ওর মাথার উপর দিয়ে হুইশ্ শব্দে বেরিয়ে গেল।

সেতু আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। বড় জোর পঞ্চাশ গজ পিছনে রেসপন্সিভিস্ট জিপ। সামনের দিকে চাইল রানা। এখন গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু মগজ বলে চলেছেঃ ওরে ব্যাটা, গতি তোল্, পালা! মেঝের সঙ্গে পিষে ফ্যাল অ্যাক্সেলারেটার।

হঠাৎ এক বিশাল মূর্তির মত উদয় হলো মার্ভেলের বো। পিছনে চারতলা সুপারস্ট্রাকচার। ওটার কারণে হারিয়ে গেল খালের দৃশ্য। সামনে শুধু লোহার বিরাট দালান। রানার মনে হলো, এত সুন্দর দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি।

হঠাৎ ঝাঁকি খেল মার্ভেল, যেন পিছুবে। বিকট আওয়াজ শুরু হলো। সেতুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বো'র। প্রথম যখন মার্ভেল এই খালের ভিতর ঢুকল, তখনও এমনই ঘটেছে। মনে হলো দেখতে না দেখতে আরও উঁচু হয়ে গেল মার্ভেল। তারপর সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে চাইল। যেন বরফ কাটতে শুরু করেছে বো। 'ক্লিঙ্ক' শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। যে মেকানিকাল সিস্টেম সেতু পরিচালনা করে, সেটা বিপুল ওজনের চাপে খুলে গেল। ধাতব আওয়াজ তুলে হারিয়ে গেল সেতুর দু'পাশের দুই অংশ। ঝপাস্ করে খালের উপর নেমে এল মার্ভেল। মনে হলো সামান্যতম কমেনি গতি।

গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে রানা। ওর মনে হলো জাহাজের পাশে গিয়ে বিধ্বস্ত হবে। পিছনের জিপ থেকে লোকগুলো বোধহয় ধরে নিয়েছে, সামনের লোকটা উন্মাদ, আত্মহত্যা করতে চলেছে।

আর পনেরো গজ, প্রতি ফুট লক্ষ করছে রানা। মাথার ভিতর ঝনঝন করছে সতর্ক ঘণ্টি। গগল বোধহয় ভুল হিসাব কষেছে! জাহাজের আর্মার্ড প্লেটে গিয়ে গুঁতো দেবে ও। সেখান থেকে পড়বে খালের ভিতর। ক্ষত-বিক্ষত লাশ নিয়ে ডুবে যাবে জিপ! পিছন থেকে এল গুলির আওয়াজ। মার্ভেলের উপর থেকে জবাব দিল কয়েকটা রাইফেল। অন্ধকার রেলিঙের ওপাশে কারা যেন!

আর কয়েক সেকেণ্ড! সবই গতি, অঙ্কের হিসাব ও গতিপথ। কিন্তু জুয়ায় হেরে গেছে রানা! শেষ মুহূর্তে ও ঠিক করল, ঘুরিয়ে দেবে স্টিয়ারিং হুইল। কিন্তু ঠিক তখনই সামনে বিকট এক হাঁ দেখল। খুলে গেছে বোট গ্যারাজ। ভিতরে জ্বলছে লাল ব্যাটল বাতি। নিখুঁত ভাবে রাস্তার পাশে মার্ভেলকে নিয়ে এসেছে গগল। ওই খোলা গ্যারাজের র‍্যাম্প দিয়ে নেমে যায় যোডিয়াক। রাস্তার এক ফুট দূর দিয়ে চলেছে ওটা, রাস্তা থেকে দু' ইঞ্চি নীচে।

সেতুর মুখে ঠিক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গতি নিয়ে রাস্তা ছাড়ল রানা। মাঝখানের এক ফুট দূরত্ব উড়ে পেরুল জিপ, সোজা গিয়ে ঢুকল মার্ভেলের ভিতর। দেরি না করে ব্রেক কষেছে রানা, তবে মুহূর্তে গতি থামিয়ে দিল রিইনফোর্সড নেটিং। ওটা ব্যবহার করা হয় হাই-স্পিড বোট ম্যান্যুভারিঙের সময়। হঠাৎ গতি থেমে যাওয়ায় ফুলে উঠেছে জিপের এয়ার ব্যাগ, ধাক্কা থেকে বাঁচাবার জন্য চেপে ধরেছে রানাকে।

বাইরে থেকে ভেসে এল কড়া ব্রেক কষবার আওয়াজ।

চাকাগুলো পেভমেন্ট ছিঁড়ে নিতে চাইল। বদলে নিজেরা ক্ষয় হলো। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছে ড্রাইভার, থামতে চেয়ে ধাক্কা দিল জাহাজের খোলে। ধাতব বিশ্রী আওয়াজ হলো। মার্ভেল এগিয়ে চলেছে, ওটার পাশে কাত হয়ে রইল জিপ। জাহাজ দ্রুত সরছে। থ্রাস্টার সামান্য নাড়ল গগল. একটু সরেই চ্যাপ্টা করে দিল ওটাকে পাড়ের পাথরের সঙ্গে পিষে। দু'সেকেণ্ড শূন্যে ভেসে রইল ওটা, তারপর থেঁতলে যাওয়া লোকগুলোকে নিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল ক্যানেলের ভিতর।

রানার জিপের পাশে চলে এল উর্বশী, দু'হাতে টেনে সরিয়ে দিল ডিফ্লেটেড এয়ারব্যাগ। যেন খেয়ালই করল না অন্য কেউ থাকতে পারে, চট্ করে চুমু দিল রানার গালে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি সত্যিই পাগল!' লজ্জা পেয়ে সরে গেল নিজেই। খেয়াল করেছে ওর দিকে চেয়ে হাসছে ফারা ও সোহেল।

'সি' প্ল্যান শেষ পর্যন্ত তা হলে কাজে লাগল।' জিপ থেকে নেমে এল রানা। 'অমল কেমন আছে?'

'ফারার দায়িত্বে, ঘুমে কাতর।'

'ঠিক হয়ে যাবে।'

'জানি,' বলল উর্বশী। সরাসরি চাইল রানার চোখে। তারপর আস্তে করে চোখ নামিয়ে নিল। 'তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোট করব না।'

'আমরা এমনিতেই যথেষ্ট ছোট, তাই তো?' হেসে ফেলল রানা। 'চলো দেখে আসি অমলকে।'

'চলো যাই,' সোহেল, ফারা ও রানার পাশে রওনা হয়ে গেল উর্বশী। কয়েক পা গিয়ে বলল, 'এ-ই তোমার "সি" প্ল্যান? কেউ এমন পাগলামি করতে পারে?'

'ওর একটা "ডি" প্ল্যানও ছিল,' তথ্য যোগান দিল সোহেল।

'তবে ওটা এর চেয়ে সামান্য বিপজ্জনক ছিল।'

ফারার দিকে চাইল উর্বশী, তারপর আস্তে করে মাথা নেড়ে হাসল। নীরবে যেন বলতে চাইল, এ দুই বন্ধু কখন যে কী করবে শুধু তারাই জানে!

ষোলো

ডিমের কুসুমের মত সূর্যটা উঠতে শুরু করেছে আকাশে, এমন সময় এল হেলেনিক কোস্ট গার্ডদের প্যাট্রল ক্রাফট। তরতর করে চলেছে মার্ভেলের পাশে। ওটার কমাণ্ডার জানে না মার্ভেল প্রচণ্ড গতি তুলে পিছনে ফেলেছে কোরিন্থ ক্যানেল, চলে এসেছে ষাট মাইল দূরে। আপাতত চোদ্দ নট গতি তুলে ছুটছে। যে-কেউ বলবে এই পুরনো জাহাজ বহু কষ্টে এই গতি তুলেছে। চিমনি দিয়ে ভক-ভক করে বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া, বোঝা যায় অতিরিক্ত ডিজেল খরচ করছে ইঞ্জিন। চল্লিশ ফুটি প্যাট্রল বোটের কমাণ্ডার রেডিও করল মার্ভেলকে। তবে তার জানা, এই জং-ধরা জাহাজ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। অপরাধ যেখানে সংগঠিত হয়, সে এলাকা থেকে অনেক দূরে এই জাহাজ। নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে, তাই যোগাযোগ করছে।

'কই, না তো, ক্যাপ্টেন,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা কোরিন্থের আশপাশেও ছিলাম না। পাইরিয়াসের দিকে যাচ্ছিলাম, আমাদের এজেন্ট রেডিও করে জানাল, বাতিল হয়ে

গেছে কন্ট্রাক্ট। জলপাই তেল পৌঁছে দিতে হবে না মিশরে। এখন চলেছি ইস্তাম্বুলের পথে। আপনার কথা শুনে একটু অবাকই হচ্ছি। মনে হয় না আমার জাহাজ ওই ক্যানেলে ঢুকতে পারবে। এ বুড়ির কোমর বেশি মোটা।' অশ্লীল ভঙ্গিতে হেসে উঠল রানা। 'আমরা যদি কোনও ব্রিজে গুঁতো দিতাম, গুঁড়ো হয়ে যেত আমাদের বো। আপনি তো দেখছেন, আস্ত আছে এর বো। তবু যদি জাহাজে উঠতে চান, আপনি সাদরে আমন্ত্রিত।'

'না, তার দরকার পড়বে না,' বলল কমাণ্ডার। 'ওই দুর্ঘটনা ঘটে এখান থেকে এক শ' কিলোমিটার দূরে। কিন্তু ওখান থেকে এখানে আসতে এই জাহাজ লাগাবে কম পক্ষে আট ঘণ্টা।'

'আট ঘণ্টার ভিতর আসতে পারতাম, যদি পিছন থেকে জোর হাওয়া সাহায্য করত,' বলল রানা।

'আপনারা যদি কোনও জাহাজকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেন, বা যদি দেখেন বো ভাঙা, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। ঠিকাছে?'

'নিশ্চয়ই। আশা করি ধরা পড়বে কালপ্রিট। বেস্ট অভ লাক! দ্য গুড গুজ আউট।'

উইং ব্রিজ থেকে কাটারের দিকে হাত নাড়ল রানা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢুকে পড়ল পাইলট হাউসে। হুকে ঝুলিয়ে দিল রেডিও হ্যাণ্ড মাইক। মেঝের উপর পড়ে রইল প্যাঁচানো কর্ড।

'প্রতিবার আমন্ত্রণ জানাতে হয়, মাসুদ ভাই?' আপত্তির সুরে বলল জলিল খান। দাঁড়িয়েছে জাহাজের হুইলের সামনে। এতক্ষণ ভঙ্গি করেছে, যেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজ। 'যদি আসত?'

'আসত না। গ্রিক কর্তৃপক্ষ এমন এক জাহাজ খুঁজছে যেটা কোরিন্থের আশপাশে থাকবে।'

'কিন্তু যারা চাক্ষুষ দেখেছে সব? তারা তো সাক্ষ্য দেবে। ওরা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলবে। জেনে যাবে ঘটনার সময় ওদিকে ছিল একমাত্র এই জাহাজই।'

'ঘাঁটুক, ততক্ষণে আমরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় থাকব। আর খুঁজবে ওরা "দ্য গুড গুজ" নামের জাহাজ। আশপাশ থেকে অন্য জাহাজ সরে গেলেই ফ্যান-টেইল আর ফেয়ারলিডগুলো থেকে সরিয়ে নেব নাম, আবার ফিরবে মার্ভেল।' এক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'আর যদি কেউ দেখে থাকে, সবই মনে রাখতে পারে, তাতেই বা কী? আমরা গ্রিসের ধারে-কাছেই থাকছি না।'

'মাসুদ ভাইয়ের মত সবই মাথার ভিতর রাখতে হয়,' মনে মনে নিজেকে জানান দিল জলিল খান।

'এবার প্রথম ওয়াচ আসবে, গিয়ে বিশ্রাম নাও তুমি। ঘুম থেকে উঠে কাশেমের কাছ থেকে অ্যাকশন-রিপোর্ট নেবে। ওটা বিকেল চারটেয় পৌঁছে দিয়ো আমার ডেস্কে।'

পাইলট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে গেল জলিল। তার পাঁচ সেকেণ্ড পর এসে ঢুকল ফু-চুং। দু'হাতে দুটো বিয়ারের ক্যান। একটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'একেই বলে একেবারে ভীমরুলের চাকে ঢিল দেয়া, তাই না রে?'

বিয়ার নিয়ে খুলল রানা, চুমুক দিয়ে বলল, 'তোরা তো ওদের ওয়েব-সাইট দেখলি। সব তথ্য দিতে পারেনি ডিপ্রোগ্রামার। বোধহয় রেসপন্সিভিস্টরা গোপন কিছু লুকিয়ে রাখছে।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা কী? হয়তো কিছু জানা যাবে। তুই তো রেখে এসেছিস্ ছারপোকা।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ওদের সিকিউরিটি হেডের

প্রথম কাজই হবে চারপাশে লিসেনিং ডিভাইস খোঁজা।'

'সেক্ষেত্রে...'

'হ্যাঁ, ধরে নে ছারপোকা কাজে আসছে না। কাজেই আমাদের নিজেদের কাউকে ঢুকিয়ে দিতে হবে ভিতরে।'

'আমি যাব।'

'মনে হয় না তোকে দিয়ে চলবে। আমাকে দিয়েও না। সে এমন কেউ হবে, যাকে দেখলে মনে হয় জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এমন ভঙ্গি নেবে, অন্ধের মত কাউকে অনুসরণ করতে চাইছে।'

'আমাদের জলিল খান? চলবে?'

'খানিক মেলে। প্রেমে বারবার ব্যর্থ, কিন্তু কই, হাল তো ছাড়েনি। রেসপন্সিভিস্টদের সঙ্গে মানায়? ...না। উপযুক্ত নয় কাশেমও। আমি স্বর্ণার কথা ভাবছি। ভাল অভিনয় জানে। তবে অভিনয় করতে হবে ব্যর্থ-প্রেমিকার। কোনও মেয়ে গেলে সন্দেহ কম হবে।'

'ওর পরিচয়, ব্যাক গ্রাউণ্ড?'

ক্লান্ত হাসল রানা। 'এখন বাদ দে। ঘুমাতে হবে। তুই নিজেও চিন্তা কর্। পরে আমরা যখন ডিনারে বসব, তখন ভাবব কাকে পাঠানো যায়।'

গম্ভীর চেহারা করল ফু-চুং। 'ঠিক আছে। তবে "সি" প্ল্যানের মত কিছু না হলেই ভাল!' হাসি আর চাপতে পারল না।

'তোরা সবাই মিলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে...' আপত্তি তুলল রানা। 'এত হাসির কী আছে? 'সি' প্ল্যান সফল হয়নি?'

বলেই হেসে ফেলল রানা। হো হো করে হেসে উঠল ফু-চুং। মার্ভেলের সবাই জানে ওই জটিল প্ল্যান তৈরি না থাকলে

মিশনের সবাই মস্ত বিপদে পড়ত। কিন্তু তার পরেও ওটাকে প্ল্যান না বলে তাদের ধারণা, জেনে শুনে নরকের আগুনে ঝাঁপ দেয়া। পাইলট হাউস থেকে এলিভেটরে উঠে পড়ল ওরা। রানা ঠিক করেছে কেবিনে ফিরে কমপক্ষে দশ ঘণ্টা ঘুমাবে। তবে তার আগে ঢুঁ দেবে একবার অপারেশন্স সেণ্টারে।

এলিভেটর নেমে আসতেই বেরুল ওরা অপারেশন্স সেণ্টারে।

নিজ ওঅর্ক-স্টেশনে কুঁজো হয়ে বসে কাজে ব্যস্ত আতাসি। ডেস্কের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাগজ, যেন ঝড়ে এলোমেলো। আতাসির মাথাটা চেপে ধরেছে হেডফোন। ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে। রানা পাশে থেমে যেতেই একটু চমকে গেল। হেডফোন খুলে চাইল।

'কী শুনলে?' জানতে চাইল রানা।

'বলতে গেলে তেমন কিছুই না, বস্।' হেডফোন বাড়িয়ে দিল আতাসি।

ওটা নিয়ে পরল রানা। কানে ভেজা অনুভূতি। কম্পিউটারের কয়েকটা কি টিপল আতাসি। স্ট্যাটিকের আওয়াজ পেল রানা। তারই ভিতর দিয়ে কীসের যেন আওয়াজ। কেউ কথা বলছে কি না নিশ্চিত হওয়া গেল না। হেডফোন খুলে আতাসির দিকে চাইল রানা। 'টেপের উপর স্ক্রাবার ব্যবহার করেছ?'

'স্ক্রাবারের পর এটা। দু'বার ব্যবহার করেছি।'

'স্পিকার ব্যবহার করো। প্রথম থেকে শুনি।'

নির্দিষ্ট সুইচ টিপল আতাসি, আবার শুরু হলো রেকর্ড। সন্দেহ নেই অ্যাক্টিভেট হয়েছে ছারপোকা। তারপর কে যেন ঘরের ভিতর ঢুকল।

'ও মাই গড্! না-না-না-না, এ হতেই পারে না।' এ কণ্ঠস্বর

ক্রিস ক্রিংগলের। খানিকটা আতঙ্কিত। তবে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এবার ড্রয়ার টানার শব্দ। ধুপ করে বন্ধ হলো। লোকটা পরীক্ষা করে দেখল কিছু চুরি হয়েছে কি না। ক্যাচ-ক্যাচ আওয়াজ। চেয়ারে বসেছে। 'ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ক্রিস। এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় ক'টা বাজে? তা ভেবেই বা কী হবে?' খুটখাট আওয়াজ তুলল একটা টেলিফোন হ্যাণ্ডসেট। তারপর দুই মিনিট নীরব। আবার কথা শুরু করল ক্রিংগল, 'মিস্টার কেসলার, আমি... ক্রিস ক্রিংগল।'

কেসলার মানে ডিয়েটস কেসলার, রেসপন্সিভিস্টদের সর্বোচ্চ নেতা।

'মিনিট পনেরো আগে একদল লোক আমাদের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়েছিল। কোনও ধরনের রেসকিউ অপারেশন। আমাদের এক সদস্যকে ধরে নিয়ে গেছে তার ঘর থেকে... হ্যাঁ? হ্যাঁ... নাম অমল দাশা। না-না, এখন পর্যন্ত নয়। ক'দিন হলো আমাদের সঙ্গে ছিল... আমার সিকিউরিটি গার্ডরা বলছে বারোজন আসে। হ্যাঁ, পুরোপুরি সশস্ত্র... গার্ডরা জিপ নিয়ে ধাওয়া করেছে। এতক্ষণে বোধহয় ফিরিয়েও আনছে ছেলেটাকে। ...আমি আপনাকে ফোন করেছি ব্যাপারটা জানাতে।' দীর্ঘ বিরতি, স্ট্যাটিক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। তারপর: 'হ্যাঁ, আমার প্রথম কাজ ওকে ফোন করা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ভাল পয়সা খাইয়ে নিয়েছি। ওরা কাদা ঘাঁটবে না, বলবে স্থানীয় পুলিশ অস্ত্র স্মাগলারদের ধরতে চাইছে। বা আল-কায়েদাও বলতে পারে। কিছু একটা বানিয়ে দেবে... হ্যাঁ? আরেকবার বলুন। ...ফলাফল হতে পারে ভয়ঙ্কর... হ্যাঁ। ওরা প্রথমে আমার অফিসে ঢোকে, তারপর হাজির হয় ওই... এক মিনিট...অ্যাঁ?' একটু চড়ে গেল ক্রিংগলের কণ্ঠ, পরক্ষণে নামিয়ে

নিল গলা। 'না-না, ব্রাঙ্কোকে পাঠাতে হবে না। আমরাই এটা সামলে নেব... ছারপোকা? এ পুরো দেশ তো ভরা ছারপোকা দিয়ে। ওহ্! ইলেকট্রনিক বাগ্‌স্? মাই গড! ভাবিনি তো! দুঃখিত।'

ড্রয়ার টেনে খোলা ও বন্ধ করা শুরু হয়েছে। কী যেন খুঁজছে ক্রিস ক্রিংগল। তারপর খুব জোরে শুরু হলো স্ট্যাটিক। লোকটা ব্যবহার করেছে ইলেকট্রনিক জ্যামার। ছারপোকা থাকলেও কাজ করবে না।

রেকর্ডিং বন্ধ করে দিল আতাসি। 'আবার স্ক্রাবার ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু কাজ হবে না বোধহয়।'

'তাই আসলে, তবুও পরে চেষ্টা করে দেখো।' হাই চাপল রানা।

'এবার গিয়ে একটু ঘুমান, বস্,' বলল আতাসি।

'হ্যাঁ, ঘুমাব।' অনিলের দিকে চাইল রানা। 'একটু খুঁজে দেখিস তো কে এই ব্রাঙ্কো।'

'গুগলকে এ কাজের ভার দিয়েছি, তবে কাউকে পাইনি এ নামে। তবুও আবার চেষ্টা করে দেখব।'

'কাশেম কই?'

'মেডিকেলে। শুনলাম জলিল খান ঘুমাতে গেছে, সেই সুযোগে বাবুর্চির কাছ থেকে নাস্তা নিয়ে গেছে ওই মেয়েটার জন্য।'

হেলেন জিলের কথা ভুলে গিয়েছিল রানা। মনে পড়ল মেয়েটির কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নেই। যারা রয়েছে, ধরে নিয়েছে, জাহাজের সবার সঙ্গে ডুবে মরেছে হেলেন। আপাতত তাদের কিছু জানাবে না, ঠিক করেছে রানা। কেন জানে না, সতর্ক করছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ভাল হয়েছে রেডিওতে ওরা জানায়নি

উদ্ধার করেছে মেয়েটিকে। আপাতত এ তথ্য গোপনই থাকুক।

যারা ওই জাহাজে হামলা করেছে, ভেবেছে সবাইকে খুন করেছে। তা-ই ভাবুক। তথ্য সব সময় বাড়তি সুযোগ এনে দেয়। পরে হয়তো সুবিধা মিলবে। মার্ভেলে নিরাপদে থাকুক হেলেন জিল। হেলমসের দিকে চাইল রানা। 'গগল, ইরাকলিয়ন-এ ইটিএ কখন?'

'ধরে নাও বিকেল পাঁচটা।'

ক্রিটের রাজধানীর উদ্দেশে চলেছে মার্ভেল। ওখান থেকে উর্বশী, ফু-চুং ও অমলকে গালফ-স্ট্রিমে তুলে নেবে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান, পৌঁছে দেবে রোমে।

নিজ ওঅর্ক-স্টেশনে থামল রানা, মোফিজ বিল্লাহর জন্য কম্পিউটারে কিছু নোট দিল। ম্যাজিক শপে হেলেনের জন্য তৈরি করতে হবে পাসপোর্ট। যখন-তখন লাগতে পারে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, ওই মেয়ে সম্বন্ধে ফারার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তারপর নেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। হেলেন থাকলে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে ফারা। ফিজিয়োনমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কীভাবে বেঁচেছে মেয়েটা ওই টক্সিন থেকে। এমন হতে পারে ভুল ভেবেছে অনিল ও ফু-চুং, ওই জাহাজের খাবারে বিষ দেয়াই হয়নি।

দশ মিনিট পর নিজ কেবিনে ফিরল রানা, পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল কটে। ঘুমিয়ে পড়ল দু'মিনিট পেরুনোর আগেই।

সতেরো

ডার্কো বোজান খুন করতে ভালবাসে।

আগে জানত না সে। তারপর ইউগোস্লাভিয়া জুড়ে শুরু হলো গৃহযুদ্ধ, যোগ দিতে হলো তাতে। সার্বিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে ছিল কনস্ট্রাকশন কর্মী, শখে খেলত হেভিওয়েট বক্সিং। তবে আর্মিতে এসে নিজের সত্যিকারের পরিচয় খুঁজে পেল সে। জ্বলজ্বলে পাঁচটি বছর নির্বিচারে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, খুন, ধর্ষণ চালিয়ে গেল। ইউনিটের প্রত্যেকে ছিল কঠোর প্রকৃতির মানুষ—ও ছিল তাদের মধ্যে কঠোরতম। পুরো সময়টা আনন্দে খুন করল তারা মুসলিম ক্রোয়েট ও বসনিয়ানদের। বিশেষ করে শিকার হলো কসোভোর মানুষগুলো।

তারপর উনিশ শ' নিরানব্বই-এ ঝামেলা শুরু করল বদের হাড্ডি ন্যাটো, বাধ্য হয়ে নিজের নাম পাল্টে নিতে হলো। শোনা গেল যারা মানবতাবিরোধী কাজ করেছে, তাদের শাস্তি দেয়া হবে। ডার্কো বোজান বুঝে গেল কর্তৃপক্ষ যে লিস্টি করবে, সেটার ভিতর প্রথম সারিতেই থাকবে তার নাম। কাজেই সেনাবাহিনী থেকে উধাও হলো সে। প্রথমে গেল বালগেরিয়া, তারপর সেখান থেকে ঠাঁই নিল গ্রিসে। নাম নিল: জ্যারোন ব্রাঙ্কো।

দৈর্ঘ্যে সে ছ'ফুট নয় ইঞ্চি, দেহের আকৃতি কুস্তিগীরদের মত। এথেন্সের আণ্ডারওয়ার্ল্ড-এ জায়গা করে নিতে দেরি হলো না তার। মস্তানি, মারপিট, ধর্ষণ ও খুন—সব কাজে সে দক্ষ। যে দলের হয়ে কাজ শুরু করল, সেটার বস্ বুঝল এক হীরার টুকরোর সন্ধান পেয়েছে। এলাকা দখল করার কাজ দেয়া হলো তাকে। এর কিছুদিনের মধ্যে এথেন্সের চার ভাগের এক ভাগ দখল করে নিল ওই দল। অর্গানাইযড-ক্রাইমের জগতে অনেক উপরের দিকে উঠে গেল জ্যারোন ব্রাঙ্কো। এরপর আলবেনিয়ানদের একটা ক্রিমিনাল গ্রুপের সবাইকে খুন করে হলো বসের ডেপুটি। এথেন্সের হেরোইন ব্যবসা চলে এল তাদের কব্জায়।

এথেন্সে কয়েক বছর থাকবার পর ইংরেজি বই পড়তে শুরু করল জ্যারোন ব্রাঙ্কো। ইংরেজি জানতে হবে তার, সংগঠন গড়তে হবে ব্রিটেন ও আমেরিকায় গিয়ে। কী পড়ছে তা নিয়ে ভাবতে যায়নি সে, বায়োগ্রাফি থেকে শুরু করে যা পাওয়া গেল হাতের কাছে—ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনি, গল্প-উপন্যাস, পর্নোগ্রাফি—সবই গড় গড় করে পড়তে থাকল সে।

পড়তে পড়তেই একদিন হঠাৎ একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে পেল পোকায় কাটা একটা বই। তার পছন্দ হলো ওটার শিরোনাম: *নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে।* বইয়ের লেখক: *ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল।* ভুল করে জ্যারোন ব্রাঙ্কো ভেবেছিল ওটা সেক্স বিষয়ক বই। ওটা কিনে বাড়ি ফিরল সে।

বইটা পড়তে শুরু করে বুঝতে পারল, গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ও যা ভেবেছে, সব মিলছে বইটির বক্তব্যের সঙ্গে। পৃথিবীতে অতিরিক্ত মানুষ হয়ে গেছে। এখন

তাদের কমিয়ে না রাখলে একসময় ধ্বংস হবে পৃথিবী। ডক্টর চ্যাপেল একবারও কোনও ধর্ম বা জাতিকে ইঙ্গিত করেননি. তবে জাতিবিদ্বেষে অন্ধ জ্যারোন ব্রাঙ্কো ধরেই নিল ডক্টর চ্যাপেল নিচু জাতের মানুষগুলোকে শেষ করে দিতে বলেছেন। যেমন ছিল কসোভোর মুসলিমগুলো। তাদের খুন করে ঠিকই করেছে সে।

বর্তমান পৃথিবীতে শিকারি প্রাণীর মানুষ হত্যার সুযোগ কমে যাওয়ায়. মানুষের রোগবালাই কমে আসায়. ডিএনএ-তে সন্তান উৎপাদনের জোরালো তাগিদ থাকায়. আমরা নিজেদেরকে থামতে দেব না, আমরা শুধু বংশ-বৃদ্ধি করতেই থাকব—ফলে মারা পড়ব সবাই মিলে।

কাজেই বুঝে নিল জ্যারোন ব্রাঙ্কো, মানব-জাতির এখন দরকার শিকারি হিংস্র প্রাণী। যারা দুর্বল তাদের শেষ করে দিতে হবে। এর ফলে সুস্থরা ভাল ভাবে বাঁচবে। ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল একবারও এ কথা লেখেননি, কিন্তু তাঁর লেখা থেকে এটাই বুঝে নিয়েছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো—অতিরিক্ত মানুষ শেষ করে দেয়াই উচিত। এখন মানব-জাতির দরকার নতুন হিংস্র প্রাণী—যাদের কবলে পড়ে কমে আসবে মানুষ। ঠিক করে ফেলল জ্যারোন ব্রাঙ্কো, সে এই হিংস্র প্রাণীদের একজন হতে চায়।

এর কিছুদিন পর যখন জানল কোরিন্থের কাছে এক ফ্যাসিলিটি খুলেছে রেসপন্সিভিস্ট সংগঠন, তার মনে হলো সে সৌভাগ্যবান।

যেদিন সে ওদের কম্পাউণ্ডে এল, সেখানে ছিল স্বয়ং ডিয়েটস কেসলার। জ্যারোন জানাল এই সংগঠনকে সে তার সেবা দিতে চায়। এরপর আড়াই ঘণ্টা আলাপ হয় দু'জনের। কথা হয় ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেলের কর্ম ও সংগঠন নিয়ে। আবছা ভাবে রেসপন্সিভিস্টদের নীতির কথা বলে কেসলার, তবে

একবারও সার্বকে বলেনি: মানুষ নয়, আসলে সে একটা পশু।

'আমরা নিজেরা হিংস্র নই, ব্রাঙ্কো,' বলেছে কেসলার। 'তবে বহু লোক চায় আমাদের ক্ষতি হোক। তারা চায় না ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের মহান নেতার বার্তা। এখন পর্যন্ত শারীরিক ভাবে আমাদের ক্ষতি করেনি কেউ, তবে জানি... এমন সময় আসবে যখন করবে। মানুষ চায় না আমরা বলি *তোমাদের কারণে ক্ষতি হচ্ছে পৃথিবীর*। সময় আসছে, যখন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষ, এবং তখন নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে। আর সেই কাজে সাহায্য করতে পারেন আপনি।'

কথাগুলো ভাল লাগে জ্যারোন ব্রাঙ্কোর। এরপর সরে আসে অপরাধ-সংগঠন থেকে, কাজ নেয় রেসপন্সিভিস্টদের সিকিউরিটি চিফ হিসাবে। নিজেকে মহান মনে হয় তার। এখন আর সে কোনও ড্রাগলর্ডের দোসর নয়, কাজ করছে মানবতার স্বার্থে।

ক্রিস ক্রিংগলের চেহারা চকচক করছে ডেস্কের পিছনে, জ্যারোন ব্রাঙ্কো এসে অফিসে ঢুকতেই ঝিকঝিকে হাসি দিল সে। তবে দ্রুত মিলিয়ে গেল সেই হাসি।

ডিয়েটস কেসলারের সান্নিধ্যে গিয়ে অনেক লাভ হয়েছে ক্রিংগলের। গাড়ি চুরির ব্যবসা ধরা পড়তে চলেছিল, এমন সময়ে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। পুলিশ তো প্রায় ধরেই ফেলেছিল। আর এখন থাকে সে কম্পাউণ্ড থেকে খানিক দূরে, সাগর পারের বিশাল এক বাড়িতে। না চাইলেও বিছানায় উঠতে চায় অসংখ্য মেয়েমানুষ। রেসপন্সিভিস্ট মেয়েরা আবার সবসময় একটু বেশি আগ্রহী। হয়তো এই কারণেই মনে হয়—সত্যি, দুনিয়া জুড়ে অতিরিক্ত মানুষ হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। মানুষ কমলে ভাল,

ঠিক কথাই বলা হয় রেসপন্সিভিজমে। তবে ভিন-গ্রহবাসী নিয়ে যে গল্পটা চালু করা হয়েছে, তা একবিন্দুও বিশ্বাস হয়নি তার। মনেপ্রাণে সত্যিকারের সেলসম্যান সে, কাজে নেমে কোনও কষ্ট হয়নি, সহজেই পটিয়ে ফেলেছে কেসলারকে। তার ভাব দেখে মনে হয়েছে সবার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেছে, রেসপন্সিভিজম গ্রহণ না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা পৃথিবী।

ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রী মাস্টার প্ল্যান বানিয়েছে, সে সেটা কার্যকর করেছে। জাহাজ ভরা একগাদা বড়লোক মারা পড়লে তার কী?

তবে এই জ্যারোন ব্রাঙ্কো সামনে এলেই বুক কাঁপে তার। বিশালদেহী সার্ব সাইকোপ্যাথ, তার চিন্তা শুধু অত্যাচার-ধর্ষণ-খুন নিয়ে। এ লোকের অতীত তার জানা নেই, তবে আন্দাজ করতে পারে। ইউগোস্লাভিয়ায় উনিশ শ' নব্বুই দশকের শেষ দিকে এথনিক ক্লিনজিঙের সময় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্যাটা এখন এখানে এসেছে কেন? অমল দাশাকে আবারও ধরে আনবার চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এই লোকের উপর কাজটার দায়িত্ব দিয়েছে কেসলার? ক্রিংগল জানে, সে নিজেই সব সামলে নিতে পারত। কিন্তু এই লোক এখন ওর ঘাড়ের উপর শ্বাস ফেলবে। প্রতিটা খুঁটিনাটি সবকিছু রিপোর্ট করবে কেসলার ও তার স্ত্রীর কাছে। এ কথা ঠিক যে, ও বুঝে ওঠেনি অফিসে ছারপোকা থাকতে পারে। তাতেই বা কী? জ্যামার চালু করবার আগে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা সে উচ্চারণ করেনি। এমন কিছু ঘটেনি যে এই জানোয়ারটাকে পাঠাতে হবে।

ক্রিস ক্রিংগল কিছু বলবার আগেই নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখল ব্রাঙ্কো। ডেস্কের সামনে চলে এল, বন্ধ করে দিল জ্যামার, কালো লেদার জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে বের

করল একটা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র। ওটা দিয়ে তাক করল ঘরের চারদিকে। লোকটার খুদে দুই চোখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে ইলেকট্রনিক রিডআউট। চলে গেল বুক শেলফের কাছে, দেখল আসবাবপত্র ও কার্পেট। সন্তুষ্ট হয়ে আবার পকেটে রেখে দিল জিনিসটা।

'তার মানে এখানে কোনও...'

অভিযোগের দৃষ্টিতে ক্রিংগলের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। সিটের ভিতর আরেকটু গেঁথে গেল ক্রিংগল।

ডেস্ক ল্যাম্প তুলল ব্রাঙ্কো, ওটার তলা থেকে খুলে নিল লিসেনিং ডিভাইস। এই ব্র্যাণ্ডের জিনিস আগে দেখেনি। নতুন কিছু। ছারপোকাটা খুবই ছোট, কাজেই এক মাইলের ভিতর থাকবে বুস্টার ট্র্যান্সসিভার। ওটা রিট্র্যান্সমিট করবে কোনও স্যাটালাইটকে। তার মাধ্যমে তথ্য পাবে শত্রুপক্ষ।

'অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি,' মাইক্রোফোনে বলল সে। এমন সুরে বলেছে, কেউ বুঝবে না সে কোন্ দেশের লোক। মোটা দুই আঙুলে টিপে ভাঙলো লিসেনিং ডিভাইস, তারপর জুতোর নীচে পিষে ফেলল। জিনিসটা ধূলির কণা হয়ে যাওয়ার পর চাইল ক্রিংগলের চোখে। 'আমরা এবার কথা বলতে পারি।'

'শুধু ওই একটাই ছিল তো?'

কষ্ট করে জবাব দিল না ব্রাঙ্কো। 'ওই লোকগুলো যেখানে যেখানে গেছে, সবখানে দেখতে হবে।' কাজটা কঠিন, তবে জরুরি। 'লোকগুলো কোথায় গেছে তার ম্যাপ এঁকেছে গার্ডরা?'

'নিশ্চয়ই। তবে লাগবে না ওটা। শুধু আমার অফিসে এসেছে, আর ঢুকেছে ডরমিটরির ভিতর।'

মাথার ভিতর ব্যথা শুরু হলো ব্রাঙ্কোর। এই ক্রিংগল লোকটা এত নির্বোধ হয় কী করে! নিজেকে শান্ত করতে চাইল সে।

আবার শুরু করল, তবে ইংরেজিতে জোরালো টান, 'ওরা দেয়াল টপকেছে, পেরিয়েছে উঠান, তারপর ঢুকেছে দালানের ভিতর। এখান থেকে ডরমিটরির ভিতর, তারপর দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গেছে বাইরে। এই পথে যে-কোনও জায়গায় ছারপোকা ফেলতে পারে। ফুটপাথে, ঝোপে, গাছে, দেয়ালের উপর—যে কোনখানে।'

'ও। দুঃখিত, আমি কথাটা বুঝতে পারিনি।'

বাঁকা চোখে ক্রিংগলের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো, মনে হলো নীরবে বুঝিয়ে দিল—ঠিক, তুমি কিছুই বোঝোনি। 'আর কী আছে ওই কম্পিউটারের ভিতর? নতুন মিশনের ব্যাপারে কিছু?'

'না, নেই। ওসব আছে আমার সিন্দুকের ভিতর। প্রথমে ওটা পরীক্ষা করেছি, তারপর যোগাযোগ করেছি মিস্টার কেসলারের সঙ্গে।'

'জিনিসগুলো আমার হাতে তুলে দিন,' সরাসরি নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো।

ক্রিংগল একবার ভাবল মানা করে দেবে, নিজে যোগাযোগ করবে ডিয়েটসের সঙ্গে। কিন্তু জানে সিকিউরিটির ব্যাপারে ব্রাঙ্কোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে লোকটা। এখন তাকে কিছু বলে লাভ হবে না। থাক্, লোকটার ওই প্ল্যানের সঙ্গে নিজেকে না জড়ানোই ভাল। সোজা কথা বুঝতে পারছে সে, সময় হয়েছে এখান থেকে কেটে পড়বার। এই যে ঝামেলা হলো, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে, বাপু ক্রিংগল, কেটে পড়ো, বেরিয়ে যাও টাকা-পয়সা নিয়ে। গ্রিসের এই রিট্রিট থেকে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার সরিয়েছে সে। ওই টাকা দিয়ে বাকি জীবন চলবে না, তবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে। অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে শুরু করবে সব।

ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল ক্রিংগল, দ্রুত চলে গেল সোফার পাশে। ব্রাঙ্কো আসবাবপত্র সরাতে হাত লাগাল না। চেয়ার-টেবিল-সোফা একা সরাল ক্রিংগল, গুটিয়ে রাখল প্রাচ্যের কার্পেট। ওটা সরে যাওয়ায় একটা ট্র্যাপডোর দেখা গেল। তার নীচে মেঝের বুকে মাঝারি আকৃতির এক সিন্দুক।

'আমি যখন অফিসে ঢুকি ঠিক এমনই ছিল টেবিল-চেয়ারগুলো। কাজেই বলতে পারি, কিছুই সরাতে পারেনি। নিশ্চয়ই দেখছেন চাবির ফুটোর উপর মোমের সিল?'

ব্রাঙ্কো বলতে গেল না, যে দক্ষ দল এই কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে, তারা ইচ্ছা করলে সবই আগের মত করে রেখে যেতে পারে। একটু খেয়াল করলে মোমের সিল নকল করা যায়। হাতে সময় পেলে হয়তো তাই করত। তবে সিন্দুক নিয়ে আপাতত চিন্তিত নয় ব্রাঙ্কো। যে ফাইলে অমল দাশার তথ্য রয়েছে, সেটা দরকার তার। ওটা থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার যে মহিলা তার ভাইকে ফিরে পেতে উদ্ধারকারী দলকে ভাড়া নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই আরও কিছু করেছে। ভাড়া করেছে কোনও ডিপ্রোগ্রামারকে। আর সে লোক সম্ভবত হবে লিয়োনার্দো চার্চ।

লোকটার কথা ভাবলেই বুকের ভিতর রাগ অনুভব করে ব্রাঙ্কো। জানে না পাকিয়ে ফেলেছে দুই মুঠো।

'এই যে,' বলল ক্রিংগল। সিন্দুক থেকে বের করে এনেছে স্ট্রংবক্স। ওটার উপর ইলেকট্রনিক কি-প্যাড। কয়েকটা সংখ্যা টাইপ করল সে, প্রায় ভেঙচি কেটে চাইল ব্রাঙ্কোর দিকে। 'বক্সের মেমোরি বলছে চারদিন আগে এটা খোলা হয়েছে। সে সময় মিস্টার কেসলারের কাছ থেকে আপডেট নিই।'

দশ বছরের ছেলেও স্ট্রংবক্সের তালা রিপ্রোগ্রাম করতে

পারবে। লাগবে শুধু ইউএসবি কর্ড আর একটা ল্যাপটপ। তবে কথা বাড়াল না ব্রাঙ্কো, শুধু বলল, 'খুলুন।'

পাস কোড নম্বর দিল ক্রিংগল, কয়েক সেকেণ্ড পর বিপ-বিপ আওয়াজ তুলল বাক্স, তারপর খুলে গেল ঢাকনি। ভিতরে রয়েছে তিন ইঞ্চি পুরু ম্যানিলা ফোল্ডার। ডানহাত বাড়িয়ে দিল ব্রাঙ্কো, যেন নিঃশব্দে বলছে, দাও ওটা।

ফাইল বাড়িয়ে দিল ক্রিংগল। ফোল্ডার নিয়ে পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত পরীক্ষা করতে লাগল সার্ব। ওগুলোতে আছে নামের লিস্ট, জাহাজ, বন্দর, শিডিউল, ইত্যাদির বিবরণ। সঙ্গে জাহাজের ক্রুদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সংশ্লিষ্ট নয় এমন কারও কাছে ওগুলোর কোনও মূল্য নেই। যে তারিখগুলো রয়েছে, সেগুলো আগামী কিছুদিনের।

'সিন্দুক বন্ধ করে দিন,' বলল ব্রাঙ্কো, খানিক অন্যমনস্ক। খুলছে ফাইলের পৃষ্ঠাগুলো, আবার বন্ধ করছে।

লোকটার কথা মেনে নিল ক্রিংগল, স্ট্রংবক্স রেখে দিল ভিতরে, আটকে দিল সিন্দুক। 'পরে আমি আটকে দেব মোম-গালা সিল।'

কড়া চোখে তার দিকে চাইল ব্রাঙ্কো।

'বা, এখন করলেই বা ক্ষতি কী,' তেলতেলে হাসি হাসল ক্রিংগল। মোম রাখে ডেস্কে, আর সিল বলতে ব্যবহার করে তার স্কুলের আঙটি। ওটা যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করেনি, চুরি করেছিল। কয়েক মিনিট পর আবারও মেঝের উপর কার্পেট বিছিয়ে দিল সে। তার উপর রেখে দিল কাউচ, চেয়ার ও কফি টেবিল। সব ঠিকভাবে রাখবার পর সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে চাইল ব্রাঙ্কোর দিকে।

'এই ফাইল সম্পর্কে কিছু জানে অমল দাশা?' ফাইল তুলে

দেখাল ব্রাঙ্কো। তার ভাব দেখে মনে হলো সে বুকের কাছে ধরে রেখেছে পবিত্র বাইবেল।

'না। মিস্টার কেসলারকে আমি জানিয়েছি। মাত্র কয়েক দিন আগে এসেছে সে। ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখেছে, তবে পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।'

কথাগুলো হালকা ভঙ্গিতে বলেছে ক্রিংগল। সন্দেহ জেগে উঠল ব্রাঙ্কোর মনে দু'জন যেন একই সঙ্গে টের পেল, ঘরের ভিতর কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে তাপ। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্রিংগল। ব্রাঙ্কো বেরিয়ে গেলেই বাড়ি ফিরবে সে, জরুরি কিছু জিনিস নিয়েই উঠে পড়বে বিমানে। যাবে সোজা জুরিখে। ওখানে নাম্বার্ড অ্যাকাউন্ট আছে তার।

'তবে ছেলেটা গুজব শুনে থাকতে পারে,' স্বীকার করল ক্রিংগল।

'কী ধরনের গুজব, ক্রিংগল?'

যে ভঙ্গিতে তাকে ডাকছে ব্রাঙ্কো, ভাল লাগছে না ক্রিংগলের। অজান্তে বিশাল ঢোক গিলল। 'এই যেমন, কয়েকটা ছেলে ক্রুজ শিপে ভ্রমণের কথা বলছিল। যেমন ওই গোল্ড অভ মার্স। ওদের ধারণা ওইরকম বিরাট পার্টি হবে।'

প্রথমবারের মত নিজেকে শীতল রাখতে পারল না ব্রাঙ্কো। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'আপনি কি জানেন ওখানে কী ঘটেছে?'

'না। এখানে কাউকে খবরের-কাগজ পড়তে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিই না আমি। নিজেও এ নিয়ম মেনে চলি। কেন, ওখানে কোনও ঝামেলা হয়েছে?'

ব্রাঙ্কোর মনে পড়ল, সকালে যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় ফোন করে, ডিয়েটস কেসলার জানিয়ে দেন: *তোমার যেটা ভাল মনে*

হয়, তাই করতে পারো। ওই কথার মানে এখন বুঝতে পারছে সে। যা বলবার বলে দিয়েছেন রেসপন্সিভিস্টদের নেতা। শীতল চোখে গাড়ি-চোরের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। 'আচ্ছা, ক্রিংগল, তুমি কি জানো তোমাকে বিশ্বাস করেন না মিস্টার কেসলার?'

'কোন্ সাহসে এ কথা বললে!' বুকে ভীষণ ভয় নিয়ে ফুঁসে উঠল ক্রিংগল। গলা চড়িয়ে দিয়েছে। 'উনি আমাকে এই রিট্রিটের দায়িত্ব দিয়েছেন! আমার দায়িত্বে ট্রেইনিং নিচ্ছে সবাই! তোমার চেয়ে আমাকে কম বিশ্বাস করবেন কেন উনি!'

'তুমি ঠিক বললে না, মিস্টার ক্রিংগল। কারণ দু'দিন আগে আমি গোল্ড অভ মার্সে উঠি এক্সপেরিমেন্ট সফল করতে। দারুণ কাজ হয় এক্সপেরিমেন্টে। যেভাবে ধারণা করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে মরল জাহাজের সবাই। কী রকম কষ্ট পেয়ে মরেছিল তা তুমি দুঃস্বপ্নেও দেখবে না কোনদিন।'

'কী বললে?' চমকে গেল ক্রিংগল। জানে না প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পেয়ে মাথার ভিতর কেমন যেন লাগছে তার। মাথা ঘুরতে শুরু করল। এত ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে কথা বলে কী করে লোকটা! যেন প্রিয় কোনও আর্ট বা শিশুদের ঘুম পাড়ানোর গল্প করছে। অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে।

'ওরা সবাই মরেছে। বাঁচতে পারেনি একজনও। জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি। আগে ওটার ব্রিজ দখল করেছি, তারপর ছড়িয়ে দিয়েছি ভাইরাস। এমন কেউ নেই যে দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে কী ঘটেছে ওখানে। আর কী অদ্ভুত ভাইরাস! যেন জাহাজে লেলিহান আগুন ধরল! এক ঘণ্টাও টিকল না মানুষগুলো। শিশু হোক আর বুড়ো—একই সময়ে বিদায় নিয়েছে। আমাকে কে ঠেকাবে, লাশ তো আর বাধা দিতে পারে না।'

ডেস্কের পিছনে চলে গেছে ক্রিংগল, তার ভাব দেখে মনে

হলো মাঝখানের এই ছোট্ট বাধা তাকে রক্ষা করবে। হাত বাড়িয়ে দিল ফোনের দিকে। 'আমি মিস্টার কেসলারের সঙ্গে কথা বলব। তুমি মিথ্যা বলছ।'

'ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

হ্যাণ্ডসেটের উপর ভাসছে ক্রিংগলের হাত। বুঝতে পারছে, ও যদি কেসলারের সঙ্গে কথা বলে, আর সে যদি জানায় এই নৃশংস পশুটা সত্যিই ওই কাজ করেছে... হায় ঈশ্বর! দুটো চিন্তা মাথার ভিতর গুঁতো দিল তার। প্রথম কথা, আমার মাথার অনেক উপর দিয়ে চলছে এসব। দ্বিতীয় কথা, ওই ব্রাঙ্কো এই অফিস থেকে ওকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে দেবে না।

'তোমাকে ওই অপারেশন সম্বন্ধে কতটুকু বলেছেন মিস্টার কেসলার?' জানতে চাইল ব্রাঙ্কো।

প্রাণপণে চাইল ক্রিংগল, লোকটা কথা বলুক। ওর ডেস্কের নীচে একটা সুইচ আছে, ওটা বাইরের অফিস থেকে ডেকে দেবে ওর সেক্রেটারিকে। ব্রাঙ্কো নিশ্চয়ই কারও সামনে খুন করবে না?

'অ্যাঁ... হ্যাঁ... মিস্টার কেসলার জানান আমাদের রিসার্চার টিম ফিলিপিন্সে ছিল। তারা একটা ভাইরাসের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং করে। ওই ভাইরাস মানুষের শিরার ভিতর ভীষণ প্রদাহের সৃষ্টি করে। ফুলে যায় শিরা, আরও কীসব যেন। উনি আরও বলেন ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দশজনের ভিতর তিনজন বন্ধ্যা হয়ে যায়। আর কখনও সন্তান নিতে পারে না। এমন কী ভাইট্রো টেকনিক ব্যবহার করেও না। আমাদের পরিকল্পনা: বেশ কিছু ক্রুজ শিপে ছেড়ে দেব ওই ভাইরাস। ওখানে তারা বদ্ধ এলাকায় ইনফেক্টেড হবে।'

'এটা তো পরিকল্পনার ছোট্ট একটা অংশ,' বলল ব্রাঙ্কো।

'তো বাকি অংশ কী?' *শালী মেয়েলোকটা আসছে না কেন?*

'ওই ভাইরাসের ব্যাপারে যা বললে, সবই ঠিক, তবে আরও বহু কিছু তুমি জানো না।' হাসতে শুরু করেছে ব্রাঙ্কো। 'ভাইরাসটা খুবই ছোঁয়াচে, চারমাস ধরে আশপাশে যাকে পাবে তার বারোটা বাজিয়ে দেবে। ওটার তেমন কোনও সিম্পটমও নেই। তার মানে বেশ কিছু ক্রুজ শিপে ছড়িয়ে দিলে দুনিয়ার চারপাশে ছড়িয়ে যাবে ভাইরাস। কোটি কোটি মানুষ বন্ধ্যা হবে। পুরুষ-নারী এমন কী শিশুরাও। তুমি ভুল জানো, দশজনের ভিতর বন্ধ্যা হবে আটজন। আমরা হাজার হাজার মানুষ নিয়ে ভাবছি না, কয়েক শ' কোটি নিয়ে ভাবছি। পঞ্চাশ বছরের ভিতর পৃথিবীর জনসংখ্যা নেমে আসবে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটিতে। আরও আছে, ক্রিংগল, প্রয়োজন পড়লে আমরা গোল্ড অভ মার্সে যে ভাইরাস ছাড়ি, সেটা ব্যবহার করতে পারি। ওটার টিকা রয়েছে শুধু আমাদের হাতে। চাইলে তিনদিনের ভিতর সাফ করে দিতে পারি সাত বিলিয়ন মানুষকে।'

জানে না কখন নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েছে ক্রিংগল। মুখ নড়ছে তার, তবে জিভ নড়ছে না, একটা কথাও বলতে পারছে না। গত তিনটে মিনিট যেন স্টিমরোলার চালানো হয়েছে তার ওপর দিয়ে। ওই গোল্ড অভ মার্স... অন্তত এক শ' লোককে চিনত সে! না, আরও বেশি! আর এসব কী বলছে এই পিশাচ! দুই বছর ধরে সে নিজে এই লোকগুলোর হয়ে কাজ করেছে! কমপক্ষে বন্ধ্যা হবে চার শ' বিলিয়ন মানুষ!

কয়েকটা ক্রুজ শিপের সমস্ত মানুষ বন্ধ্যা হলে তার কিছুই যেত আসত না, ভাবছে ক্রিংগল। মানুষগুলো জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ত, কিন্তু প্রাণ তো বাঁচত। আর সবকিছুর ভাল-মন্দ দিক থাকে, সেটা ভেবেছে সে, এতিমখানাগুলো ফাঁকা হয়ে যেত। বাচ্চাগুলো পেত নতুন করে কোনও বাবা-মা।

কিন্তু এরা যা করতে চাইছে... আগেই বোঝা উচিত ছিল তার, সব হাতের বাইরে চলে যাবে। ওর মনে পড়ল ডক্টর চ্যাপেলের বইয়ের বক্তব্য:

মানুষ সেইসব সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করেছে, যখন ইউরোপের তিনভাগের এক ভাগ মানুষ প্লেগে মারা গেল। অন্যরা বিপুল জমি নিজেদের ভিতর ভাগ করে নিল। তাদের জীবনযাত্রা অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছুল। শুধু সম্পদের মালিক নয়, তাদের হয়ে যারা কাজ করেছে, খুলে গেল তাদেরও কপাল। কাজের লোকের অভাব, কাজেই তৈরি হলো যন্ত্রপাতি। এ থেকে প্রমাণ হয় প্লেগের কারণে অন্ধকার সময় থেকে বেরিয়ে এল গোটা ইউরোপ, এবং দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করল শ্বেতাঙ্গ-জাতি।

'আমরা অন্ধের মত ডক্টর চ্যাপেলের কথা অনুসরণ করেছি, এবং কাজ করে গেছি,' বলল ব্রাঙ্কো। তার কথাগুলো ক্রিংগলের শূন্য অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলল।

ডেস্কের এপাশে সে নিরাপদ, ভেবেছে ক্রিংগল। কিন্তু তার জানা নেই কত শক্তিশালী ওই বিশালকায় সার্ব। ওর মনে হলো ডেস্ক যেন কার্ডবোর্ডের বাক্স। ওটা তার দিকে ঠেলে দিল ব্রাঙ্কো, চেয়ার সহ দেয়ালে গেঁথে গেল ক্রিংগল। চিৎকার করবার জন্য হাঁ করল, বেটিকে ডাকতে হবে! খুব দ্রুত এগোলো না ব্রাঙ্কো, ফলে গলার ভিতর থেকে ক-ক্! আওয়াজ বেরুল ক্রিংগলের, পরক্ষণে তার কণ্ঠার উপর এসে পড়ল জ্যাব। অক্ষিকোটরের ভিতর বিশাল হয়ে উঠল ক্রিংগলের চোখদুটো। বাতাস টেনে নিতে চাইল, কিন্তু পেল না এক ফোঁটা দম।

অফিসের চারপাশ দেখছে ব্রাঙ্কো। এখানে এমন কিছু নেই যেটা দিয়ে ক্রিংগলের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়া

যায়। তারপর তার চোখ পড়ল দেয়ালের উপর। ওখানে ঝুলছে ছবি। মুখগুলো দেখতে শুরু করল ব্রাঙ্কো। পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল কী ব্যবহার করতে হবে। ক্রিংগলের ফুসফুস ব্যস্ত হয়ে বাতাস চাইছে, খাবি খেয়ে চলেছে সে। তাকে ছেড়ে দেয়ালের সামনে চলে গেল ব্রাঙ্কো, দেখছে পার্লা মোনার ছবি।

তুই বেটি বেশি শুঁটকি, বিছানায় তুই... নাহ্, সিদ্ধান্ত নিল ব্রাঙ্কো। তবে ক্রিংগল বোধহয় পছন্দ করত। কে বলবে সে পার্লা মোনার প্রেমে পড়েনি? এক টানে ছবি খুলে নিল ব্রাঙ্কো, ফ্রেম থেকে সরিয়ে নিল কাঁচ। ডেস্কের উপর আছড়ে ভাঙল ওটা।

একহাতে সিটের সঙ্গে ক্রিংগলকে ঠেসে ধরল সে, অন্য হাতে বড় এক টুকরো কাঁচ নিল, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চি ড্যাগারের মত—ওটা দিয়ে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে কাটতে লাগল কণ্ঠনালী। বামহাতে মুঠো করে ধরে রেখেছে ক্রিংগলের মাথার চুল। গলার ফাঁক হয়ে যাওয়া জায়গা দিয়ে ছিটকে বেরুল কালচে রক্ত, ভাসিয়ে দিল ডেস্ক। সেখান থেকে পড়ছে কার্পেটের উপর। ঘড়ঘড় আওয়াজ শুরু করল ক্রিংগল। সিটের উপর দাপিয়ে চলেছে। তবে ছিটকে পড়বার উপায় নেই তার। বিশাল মুঠোয় তার চুল টেনে ধরে রেখেছে ব্রাঙ্কো। বিদঘুটে আওয়াজ বেরুল ক্রিংগলের গলা থেকে। তবে সেই শব্দ দেয়ালের ওপাশে পৌঁছবে না। কমে আসছে লোকটার দাপাদাপি। আড়াই মিনিট পর স্থির হলো। বুকের উপর মাথা নামিয়ে দিল ব্রাঙ্কো। খেয়াল করেছে সরে গেলে পদচিহ্ন পড়বে না। দুই টানে আগের জায়গায় নিয়ে এল ডেস্ক। ক্রিংগলের পাশে চলে গেল, লাশ সহ ঘোরাল চেয়ার। তুলে নিল ক্রিংগলকে, উল্টো ভাবে বসিয়ে দিল চেয়ারে। ঠেলে দিল ডেস্কের কাছে। সিটের দু'পাশে ঝুলছে দুই পা, কাটা ক্ষত পড়ল চেয়ারের কাঁধের উপর। মাথা কাত হয়ে

রইল। পায়ের কাছে ফেলল ওই কাঁচের টুকরো। করোনার বুঝে নেবে এই অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত হারিয়ে মৃত্যু হয়েছে। পাশেই পার্লা মোনার ছবি ফেলল ব্রাঙ্কো। ওটাই বলে দেবে মৃত্যুর আগে ওটার দিকে চেয়ে ছিল ক্রিংগল।

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা।

নিঃশব্দে দরজার কাছে চলে গেল ব্রাঙ্কো, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। এইমাত্র এসে ঢুকেছে ক্রিংগলের সেক্রেটারি, হাতে সিরামিক কফি কাপ। আরেক হাতে বড়সড় পার্স। মহিলার বয়স হবে পঞ্চাশ মত। চুলগুলো বিশ্রী ভাবে ডাই করেছে। দেহ থেকে কমপক্ষে আশি পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলা খুবই জরুরি।

'হ্যালো, ব্রাঙ্কো, কেমন আছেন?' মিষ্টি করে হাসল মহিলা।

এর নাম মনে নেই ব্রাঙ্কোর। কাজেই বলল, 'মিস্টার ক্রিংগল অফিসে চলে এসেছেন। বুঝতেই পারছেন, গত রাতে যা হলো, সেজন্য মন খারাপ।'

'হ্যাঁ, খুবই বিশ্রী ব্যাপার।'

'আসলেই তাই।' মাথা দোলাল ব্রাঙ্কো। টের পেল পকেটের ভিতর থরথর করছে সেল-ফোন। 'আমাকে বলেছেন আজ যেন তাঁকে বিরক্ত না করি।'

'আশা করি আপনি বের করতে পারবেন কারা এসব করছে। বেচারা ছেলেটাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।'

'তাই আজ আমাকে ডেকেছেন মিস্টার ক্রিংগল।' মনে পড়ল ব্রাঙ্কোর, বেটির নাম অ্যাবাগেইল ওব্রায়ান। ফোনের স্ক্রিন দেখল। যোগাযোগ করতে চাইছেন কেসলার। সিকিউর লাইনে আলাপ করতে চান। ভোরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, তারপরও ফোন, অর্থাৎ খুব জরুরি। পকেটে ফোন রেখে দিল সে।

ঘাড় কাত করে তীক্ষ্ণ চোখে ব্রাঙ্কোর চোখে চাইল

অ্যাবাগেইল। 'আমাকে মাফ করবেন, তবে আপনাকে দেখলে অনেক মানুষ ভয় পায়।' ব্রাঙ্কো কিছু না বলায় আরও উৎসাহ পেল মহিলা। 'আমার মনে হয় আপনাকে দেখতে যেমন কঠোর মনে হয়, সত্যি আপনি ঠিক তেমনই হতে পারেন। আমার আরও মনে হয়, আসলে আপনি খুব মিশুক মানুষ, কাউকে আঘাত দিতে জানেন না। আপনি অনেক বেশি ভাবেন। সমাজ ও মানুষের প্রতি অনেক দায়িত্ব নিয়ে চলেন। আপনি এখানে এলে ভাল লাগে আমার। পৃথিবী জুড়ে কত মানুষ অশিক্ষিত, তারা আমাদের দায়িত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না। আপনি বুক পেতে আমাদেরকে রক্ষা করছেন, সেজন্য ভাল লাগে। আপনার ভাল হোক, জ্যারোন ব্রাঙ্কো।' এসব বলতে পেরে খুশিতে হেসে ফেলল মহিলা। 'আপনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছেন। আমি আপনাকে বিব্রত করে তুলেছি। দুঃখিত।'

'আপনি যা বললেন...' শ্রাগ করল ব্রাঙ্কো। বুঝতে পেরেছে কেন এই মোটা মহিলা রেসপন্সিভিজমে এসে জুটেছে। কে-ই বা শুনবে এর বকবকানি? একা থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে এখানে এসে সবার জীবন শেষ করছে।

'প্রশংসা যদি আপনার গাল লাল করে দিয়ে থাকে, তো বেশ করেছি আমি।'

তুই বেটি কিচ্ছু বুঝিস না, ভাবতে ভাবতে ঘুরে দাঁড়াল ব্রাঙ্কো, পিছনে একবার চেয়ে বেরিয়ে এল দালান ছেড়ে।

আঠারো

এ হোটেল এক ঐতিহাসিক বাড়িতে, কোলোসিয়াম থেকে খানিক দূরে। ওরা ভাড়া নিয়েছে যে সুইট, সেটা উপরতলায়, এই ফ্লোরের চারভাগের একভাগ জুড়ে। বাইরের দিকে রট-আয়রনের ব্যালকনি। ওটাকে দু'পাশ থেকে ঘিরেছে দেয়াল।

এখনও কেমিক্যালের কারণে ঝিমিয়ে চলেছে অমল দাশা, তার হুইলচেয়ার ঠেলে বিলাসবহুল সুইটে ঢুকল ফু-চুং। পাশে হাঁটছে উর্বশী। বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে ওর ভাই। বোঝা যায় ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর সচেতন হয়ে উঠবে।

'হ্যালো,' সুইটের ভিতর থেকে বলে উঠল কেউ।

'হ্যালো,' পাল্টা বলল ফু-চুং। 'ডক্টর চার্চ?'

লিভিং রুম থেকে ফয়ে-এ বেরিয়ে এলেন লিয়োনার্দো চার্চ, পরনে স্ট্রাইপ দেয়া গাঢ় খয়েরী সুট, তার উপর সাদা সিল্কের পুলওভার। ভদ্রলোকের দুই হাতে পাতলা চামড়ার গ্লাভস। যেভাবেই হোক, বিকৃত হয়েছে হাতদুটো।

সাইকিয়াট্রিস্টের বয়স কত, আন্দাজ করতে চাইল ফু-চুং। মাথা ভরা চুল, এখানে-ওখানে রুপালি ছোপ। রোদে পোড়া মুখের ত্বক, তাতে কসমেটিক সার্জারি। দুই চোখ ও মুখের দু' পাশে জরজর ত্বক টানটান করা হয়েছে সার্জারির মাধ্যমে। এ লোক ডিপ্রোগ্রাম করতে যে টাকা নিয়ে থাকে, দুনিয়ার সেরা

প্লাস্টিক সার্জনকে দেখাতে পারবে। কিন্তু চেহারা এমন হয়ে উঠেছে, মনে হয় মানুষটা এক ভীত হরিণ, চোখে-মুখে এসে পড়েছে গাড়ির হেডলাইট। ফু-চুং ধারণা করল, মিস্টার চার্চ কম পয়সায় কসমেটিক সার্জারি করিয়েছেন।

ভদ্রলোকের একটা বিষয় খেয়াল করেছে উর্বশী, সামান্য অবাকও হয়েছে। হাত বাড়িয়ে দিল। 'উর্বশী দাশা।'

গ্লাভস্ পরা হাতদুটো একটু উপরে তুললেন চার্চ। 'মাফ করুন, তবে হ্যাণ্ডশেক সম্ভব নয়। কম বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনা। পুড়ে যায় দুই হাত।'

'না-না, ঠিক আছে। ইনি লিউ ফু-চুং। যে কোম্পানি আমার ভাইকে উদ্ধার করেছে, সেখান থেকে এসেছেন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল ফু-চুং। 'কিছু মনে করবেন না, আমরা রোমে পৌঁছনোর আগে জানাতে পারিনি কোন্ হোটেলে উঠছি। সাধারণ সিকিউরিটি প্রসিজিয়ার।'

'এ তো হতেই পারে,' হাতের ইশারা করলেন চার্চ, সুইটের ভিতর অংশে চলেছেন। তিন দিকে তিনটে বেডরুম। বাম দিকের দরজা খুললেন তিনি।

হুইলচেয়ার নিয়ে বিছানার পাশে থামল ফু-চুং।

'ওকে বিছানার উপর শুইয়ে দিন,' বললেন চার্চ।

অমলের পরনে হাসপাতালের জনি, মনে হলো খুব অসুস্থ। একটুও নড়ছে না, ঝিমিয়ে চলেছে। ওকে কিং-সাইজের বেডের উপর তুলল ফু-চুং। চারপাশে ঝুলছে রাজকীয় ভারী পর্দা, টেনে দিলে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়া যায়। ভাইয়ের পাশে থামল উর্বশী, আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিল কপালে। চোখে মমতা, কষ্ট, অসহায়তা। নিজেকে যেন দোষ দিয়ে চলেছে।

'ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে, ভয় নেই,' বললেন চার্চ।

মেয়েটির চোখ পড়তে পেরেছেন। তাঁর দীর্ঘ পেশা-জীবনে এমন অনেক আত্মীয় দেখেছেন। উর্বশীকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি, থামলেন ব্যালকনির ফ্রেঞ্চ ডোরের সামনে।

রোমের বিকেল। গাড়ি-ঘোড়া ছুটে চলেছে। বাইরে থেকে আসছে নানা ধরনের গুঞ্জন। রাস্তার ওপারে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের ছাত পেরিয়ে চোখে পড়ে বিশাল উঁচু লাইম-স্টোনের দেয়াল। ওটা এ শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। ওটার ওপাশে বসতে পারে পঞ্চাশ হাজার দর্শক। আধুনিক যে-কোনও স্পোর্টস এরিনার সমান এই প্রাচীন কোলোসিয়াম।

'ধারণা করি সব সঠিক ভাবে চলেছে,' বললেন চার্চ। বলবার সুরে কোনও অঞ্চলের টান। সেটা যে কোথায়, ধরতে পারল না উর্বশী। ওর মনে হলো চার্চের বাবা-মা ইংরেজ ছিলেন না।

'হ্যাঁ, সঠিক ভাবেই,' বলল উর্বশী।

'তা-ই? কী ঘটে?'

মানুষটার চোখও, ভাবল উর্বশী। কী যেন আছে দৃষ্টির ভিতর। লিয়োনার্দো চার্চের দামি চশমার ওপাশে খয়েরী চোখ। কেমন যেন চাহনি। বেশিরভাগ সময় কারও চোখ দেখে ও বুঝে ফেলে মানুষটা কেমন। কিন্তু চার্চকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

'রেসপন্সিভিস্টরা আজকাল আর্মড্ গার্ড রাখছে,' উর্বশী কিছুই বলেনি, কাজেই বলল ফু-চুং।

অত্যন্ত দামি সোফায় ধীরে বসে পড়লেন চার্চ। 'জানতাম একদিন এমন হবে। ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রী বার্থা গত কয়েক বছরে প্যারানয়েড হয়ে উঠেছে। সন্দেহ হয়েছিল এরা নিজেদের সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারে। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার এই সন্দেহ আগেই আপনাদের জানিয়ে দেয়া উচিত

ছিল।'

'আমাদের লোক আহত হলে ক্ষতি হতো, তা হয়নি,' বলল ফু-চুং।

'তবে আমার দায়িত্ব আমি পালন করতে পারিনি। নিজে যুদ্ধে গেছি, কাজেই বুঝি আপনারা মস্ত বিপদে পড়েন।'

কোরিয়া বা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছেন ডক্টর চার্চ, ভাবল উর্বশী। গগলের কাছে শুনেছে মানুষটি আমেরিকান। 'ডিপ্রোগ্রামিং কীভাবে কাজ করে?' জানতে চাইল ও।

'সাধারণত রোগীর বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবীকে কাজে লাগাই। রোগীকে তারা তাদের সর্মথন দেয়, *তুমি পারবে, বেরিয়ে আসতে পারবে রেসপন্সিভিস্টদের কবল থেকে।* তবে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রথম কিছু সেশন আমার সঙ্গে বসবে অমল, চলতে থাকবে আলাপ। তবে যখন ঘুম থেকে উঠবে, ভীষণ ঝাঁকি খাবে। বুঝে উঠতে সময় লাগবে কী ঘটেছে।' ম্লান হাসলেন চার্চ। 'আমার অভিজ্ঞতা বলে, এই শক পেয়ে ভয়ানক রেগে উঠবে।'

'মারপিট বা ভাঙচুর করে না অমল, এটুকু বলতে পারি,' বলল উর্বশী। 'আমার মত রেগে ওঠে না, ওর ভিতর রাগ নেই।'

'সাধারণত রোগী যেন শান্ত থাকে সেজন্য কিছু ওষুধ দিই। শক কেটে গেলে আর এসব ওষুধ লাগে না।' সাইড টেবিলের দিকে হাত তুললেন চার্চ। ওটার উপর পুরনো আমলের কালো ডাক্তারি ব্যাগ। পাশেই ফুলদানি ভরা তাজা ফুল।

'আপনি কতজন রোগীকে সাহায্য করেছেন, ডক্টর?'

'আমাকে দয়া করে লিয়োনার্দো বলে ডাকবেন। প্রায় দু' শ' রোগী।'

'সবাই সুস্থ হয়ে ওঠে?'

'একথা বলতে পারলে খুশি হতাম। তবে তা নয়, কিছু রোগী পরে আত্মহত্যা করে। অনেকে ফিরে যায় নিজেদের কাল্টে। ভাবলে মন ছোট হয়ে আসে। রেসপন্সিভিস্টদের ভাল কাজগুলো আকৃষ্ট করে মানুষকে। যখন ভালমত জড়িয়ে যায়, তখন টের পায় তাদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে উপর পর্যায়ের নেতারা। বিশেষ করে যখন জানিয়ে দেয় সদস্য নিজের কোনও ভালবাসার মানুষ, আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের সঙ্গে মিশতে পারবে না, শুরু হয় মনোকষ্ট। এসব মানুষ ফিরে আসতে চায় বাস্তব জীবনে, তবে আর অ্যাডজাস্ট করতে পারে না।'

'মানুষ এ পরিবেশে নিজেকে ফেলে কেন?' জানতে চাইল ফু-চুং। জানে, জবাব কী হতে পারে। কম বয়সে কোনও না কোনও গ্রুপের সঙ্গে মেশে অনেকে, নইলে চলতে পারে না। এই গ্রুপ বেশির ভাগ সময় খারাপ হয়। তাকে মেনে চলতে হয় ওটার নেতার কথা। তার কথায় কিছু অন্যায় কাজ করে বাঁধা পড়তে হয়। পরে ওই দল থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

'একাকীত্ব, গোটা পৃথিবী থেকে আলাদা থাকার কষ্ট, এগুলো তাড়িয়ে বেড়ায় এদের। রেসপন্সিভিস্টরা তখন ভরসা দিতে থাকে। মানুষ ভাবতে শুরু করে, সে একটা দলের সঙ্গে চলছে। মনে করে তারা গুরুত্বপূর্ণ। সবার ভিতর একই সিম্পটম থাকে। যারা ড্রাগ বা অ্যালকোহলের উপর ঝুঁকে পড়ে, তাদের ভিতরেও এই একই প্রবণতা। যারা অসফল হয়, তাদেরও।'

'আমার মা'র বক্তব্য অনুযায়ী মাত্র কয়েক মাস ধরে রেসপন্সিভিস্টদের সঙ্গে মিশছে অমল। এ থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে না, তা-ই না?'

'কতদিন ধরে রেসপন্সিভিস্টদের সঙ্গে মিশছে, সেটা বড় কথা নয়,' বললেন চার্চ। 'ওই বিষে কত গভীর হয়ে ডুবেছে মন, সেটাই মূল বিষয়। একটা কেসের কথা মনে পড়ল। এক মহিলা দু'বার রেসপন্সিভিস্টদের মিটিঙে যান, এরপর যখন তাঁর স্বামী জানলেন, উনি আমার সাহায্য চাইলেন। শেষে মহিলা তালাক দিলেন তাঁর স্বামীকে। এই মহিলা এখন রেসপন্সিভিস্ট গ্রিক রিট্রিটের ডিরেক্টরের সেক্রেটারি। আপনারা ওখান থেকেই উদ্ধার করেছেন অমলকে। অবাক মানুষের মন, ব্যর্থতার কথা ভোলা কঠিন। মহিলার নামটা ভুলিনি—অ্যাবাগেইল ওব্রায়ান। যাদের বিষয়ে সফল হয়েছি, ভুলেই গেছি তাদের নাম।'

নীরবতা নেমে এল সুইটে। কিছুক্ষণ পর অস্বস্তিকর পরিবেশ ভাঙল ফু-চুং। 'আমার একটা কৌতূহলঃ পার্লা মোনার মত সফল অভিনেত্রী এ ধরনের কাল্টে গিয়ে মিশছে কেন?'

'তারও মন আর সবার মতই। সে পুরস্কার ও প্রশংসা পেলে কী, সে তো একা। শিল্পীরা সহজে বাস্তব থেকে ছিটকে পড়ে। বাস্তব জীবনে তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় ভক্তরা, কিন্তু রেসপন্সিভিস্ট সংগঠনে সে শুধু সাধারণ এক সদস্য। ওদের চেনা মোনা। সবার পরিচিত। তাদের সঙ্গে মিশছে সহজে। খুশি, কারণ ওর খ্যাতি বহু মানুষকে ওই সংগঠনে এনে ভিড়াচ্ছে।'

'এ আমি বুঝি না,' ক্লান্ত স্বরে বলল উর্বশী।

'আর তা-ই আমার সাহায্য চেয়েছেন,' পরিবেশ হালকা করতে চাইলেন ডক্টর চার্চ। 'এ নিয়ে ভাবতে হবে না আপনার। শুধু বুঝিয়ে দেবেন আপনি কতটা ভালবাসেন অমলকে।'

'রেসপন্সিভিস্টদের যে ফিলিপিন্স সেণ্টার, সেটা সম্বন্ধে কিছু জানেন?' প্রসঙ্গ পাল্টে নিল ফু-চুং।

কী যেন ভাবতে চাইলেন চার্চ, কিছুক্ষণ পর বললেন, 'খুব

যে বেশি জানি, তা বলব না। তবে ধারণা করি ওখানে ফ্যামিলি-প্ল্যানিঙের ক্লিনিক খুলেছে। না, এক মিনিট... হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শুনেছি ওরা ওখানে রিট্রিট খুলছে। জমি কিনেছে। তবে এখনও বাড়িঘর তৈরি করেনি।'

'ক্রুজ শিপ ভাড়া নেয়ার ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'আপনি বলছেন গোল্ড অভ মার্সের কথা। খুবই দুঃখজনক। শুনেছি ওটাকে বলত ওরা সি রিট্রিট। গত কয়েক বছর ধরে বেড়াতে বেরোয় রেসপন্সিভিস্টরা। বেশিরভাগ সময় গোটা জাহাজ ভাড়া করে। কখনও বুক করে অর্ধেক কেবিন। জাহাজে চড়ে মিটিং করে, কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে। ওরা ওখানে কী করে জানতে একবার যাই। এসব জায়গায় যায় বড়লোকরা। এসব জাহাজকে রিক্রুটিং সেণ্টার মনে করে রেসপন্সিভিস্টরা।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'যাই, দেখি কী করছে অমল।'

ভদ্রলোক চলে যেতে সাইডবোর্ডের দিকে চাইল উর্বশী। ওটার উপর সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে বেশ কিছু রঙিন বোতল। একটা গ্লাস নিল ও, সিভাশ রিগ্যালের বোতল থেকে ঢেলে নিল দুই পেগ হুইস্কি। ওটা বাড়িয়ে দিল ফু-চুঙের দিকে। নিজেও নেবে। আস্তে করে মাথা নাড়ল চৈনিক গুপ্তচর।

'এটা মিশন নয়, তবুও থাক।'

'এটা আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখবে,' গ্লাসে চুমুক দিল উর্বশী।

'সব বুঝে কেমন লাগছে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'ভদ্রলোককে আন্তরিক মনে হয়েছে। নিজের কাজ বোঝেন। আপনার কী মনে হয়, ফু-চুং?'

'ভাল। গগল সঠিক লোক খুঁজে বের করেছে। কিছুদিনের ভিতর দেখবে সুস্থ হয়ে উঠছে অমল।'

'আপনারা যেভাবে সাহায্য করলেন, কখনও ভুলব না।'

'আমাদের কারও বিপদ হলে এই একই কাজ করতে তুমি।'

চুপ করে রইল উর্বশী। মন থেকে জানে, ঠিকই বলেছেন ফু-চুং। তবে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। পার্সের ভিতর নিচু আওয়াজে বাজতে শুরু করেছে সেল-ফোন। ওটা বের করে স্ক্রিন দেখল। যোগাযোগ করতে চাইছে রানা।

বাটন টিপে ফোন রিসিভ করল উর্বশী। 'আমরা নিরাপদে পৌঁচেছি, রানা।'

'ভেরি গুড। চার্চ পৌঁচেছে?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র ফু-চুঙের সঙ্গে কথা হলো। কপাল ভাল মিস্টার চার্চকে পেয়েছি।'

'গুড।'

'মার্ভেলে সবাই ভাল?'

'ভাল। একটু আগে আমার বসের সঙ্গে কথা হলো। খুব খুশি মনে হলো। আমেরিকান সরকার সাধু হতে চাইছে। তাদের কূটনীতিকরা এশিয়ান দেশগুলোকে বোঝাতে চাইছে কখনও তারা আক্রমণ করার কথা ভাবতেও পারেনি। পরে হয়তো উইকিলিক্স থেকে বেরিয়ে আসবে সবই, হাসবে লোকে।'

'তাই হাসবে সবাই।'

'আমার বস পাপাগোপালার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। একটু খেপেছেন উনি। পরে যখন বুঝেছেন একদল সন্ত্রাসী গ্রিক ক্যানেল ধ্বংস করতে চায়নি, তখন ঠাণ্ডা হয়েছেন। বলেছেন পরে গ্রিক ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে কথা বলবেন।'

'ওটা ছিল বিখ্যাত *'সি' প্ল্যান,*' মৃদু হাসল উর্বশী।

'সোহেল-ফু-চুং-অনিল-গগল, সবাই জড়িত,' হাসছে রানা। 'এখন ভাবছি অন্য কিছু। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে

কথা বলব। জানি না তিনি কী বলবেন!'

'সাধারণ আমেরিকান নন উনি, তোমার কাছে যতটা শুনেছি।'

'সত্যিকারের খাঁটি মানুষ।' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, 'অমল কেমন আছে?'

'একটু পর ড্রাগের প্রভাব কেটে গেলে দেখি কী করে।'

'ভাল থাকবে, তোমার ভাই তো। ওকে বুঝিয়ে দিয়ো ওকে ভালবাসো তুমি।'

'নিজের উপর কেমন যেন রাগ লাগছে।'

'এখনও তুমি নিজেকে দোষ দিয়ে চলেছ। এ ঠিক নয়। মনে রেখো ওকে সাহায্য করতে হবে। গগল তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ধরো।'

ভেসে এল গগলের কর্কশ স্বর, 'মনে রেখো জীবনটা এমনই, উর্বশী। কিছু জিনিস তুমি বদলে নিতে পারো, আবার অনেক কিছু বদলানো যায় না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, এসব জানো। যা ঘটবে সেই অনুযায়ী চলবে।'

'বারবার মন বলছে আমি ভাইকে সময় দিইনি।'

'দুনিয়ার সমস্ত বড় ভাই-বোন মনে করে ছোটদের সময় দিতে পারেনি। এভাবেই চলে দুনিয়া।'

চুপ করে রইল উর্বশী।

'রানার সঙ্গে কথা বলো, রাখি,' বলল গগল।

মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে সবাই শুনছে কথাগুলো। আবার লাইনে এল রানা, 'জীবন কঠিন, তাই না, উর্বশী? আমরা যখন মিশন নিই, বিস্তারিত পরিকল্পনা করি, ভেবে বের করি কোন্ দিক থেকে বাধা আসতে পারে। এরপর কাজে নেমে সহজে অবাক হই না। সামনে বাধা পড়লে এগুতে চাই বাঁক

নিয়ে। ঠিকই বলেছে গগল। জীবন এমনই। ছোট ভাইয়ের জন্য তুমি যা করছ, সেটা অনেকে করে না। বিপদের সময় পাশে থাকছ। এর বেশি আর কী করবে কেউ? কাউকে সর্বক্ষণ পাহারা দিলে সে তো মানুষই হবে না।'

'তুমি খুব ভাল ভাই বা বাবা হবে, রানা।'

'ঠাট্টা করছ?' হেসে ফেলল রানা। 'আমি শুধু জানি এই দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষ আমার চেয়ে অনেক ভাল।' চুপ হয়ে গেল রানা।

'এখন কী করছ তোমরা?'

'তোমাদের দক্ষিণে চলেছি। আগামীকাল রাতে পৌঁছব রিভিয়েরা। পরদিন সকাল থেকে নজর রাখতে শুরু করব সৌদি প্রিন্স আর আর্মস্ ডিলারের উপর।'

'তোমাদের পাশে থাকতে পারলে ভাল লাগত।'

'তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করছ। অমলের পাশে থাকছ।'

ফোনের দিকে ইশারা করল ফু-চুং।

'রানা, ফু-চুং কথা বলতে চান। ওঁকে দিচ্ছি।' ফোন বাড়িয়ে দিল উর্বশী।

'রানা, আমরা মিস্টার চার্চের সঙ্গে আলাপ করেছি। ভদ্রলোক বলেছেন রেসপন্সিভিস্টরা আগেও ক্রুজ শিপ ভাড়া নিয়েছে।'

'আর কিছু?'

'আমি হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছি, তবে অনিলকে বল ওই যাত্রাগুলো ক্রস-রেফারেন্স করুক। অস্বাভাবিক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।'

'ভাল বলেছিস। আর কিছু?'

'চার্চ বলেছেন গুজব শুনেছেন, ফিলিপিন্সে নতুন রিট্রিট

খুলেছে রেসপন্সিভিস্টরা। এদের চার শ' লোক ছিল গোল্ড অভ মার্সে। মারা পড়েছে সবাই। ভদ্রলোক যা বললেন, তার বাইরে অনেক কিছু ঘটে থাকতে পারে। আমাদের বোধহয় খোঁজ নেয়া উচিত।'

'ঠিক।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন লিয়োনার্দো চার্চ, পিছনে বন্ধ করে দিলেন দরজা। প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'জেগে উঠছে অমল। আমার মনে হয় আপনাদের এখন সামনে না থাকাই ভাল।' মেডিকেল ব্যাগের পাশে থামলেন ভদ্রলোক। ওটার ভিতর থেকে বের করলেন সিলিণ্ডারের মত কী যেন। দেখলে মনে হয় সুপের ক্যান। 'এটা একটা লকিং ডিভাইস। সুইটের ডোর-নবে আটকে দেব। ভিতর থেকে দরজা খুলতে পারবে না অমল।'

'আপাতত রাখি, রানা,' বলল ফু-চুং। লাইন কেটে উর্বশীর হাতে দিল ফোন।

উঠে দাঁড়িয়েছে উর্বশী। 'কতক্ষণ পর ফিরব?'

'আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে যান, পরে ফোনে জানাব। আপাতত ওর সঙ্গে আলাপ করব। ধরুন দেড়ঘণ্টা। তারপর ওকে সিডেটিভ দেব।'

বেডরুমের দরজা ভিড়িয়ে রাখা, ওটার দিকে চাইল উর্বশী, তারপর চাইল সাইকিয়াট্রিস্টের দিকে। মনের ভিতর দ্বিধা। চলে যাবে, না থাকবে! কী করা উচিত ওদের?

'ভয় নেই, মিস দাশা। আমি নিজের কাজ বুঝি।'

'বেশ,' হোটেলের স্টেশনারি কাগজে নিজের ফোন নম্বর লিখল উর্বশী, দিল ওটা মিস্টার চার্চের হাতে।

দরজার পাশে চলে গেছে ফু-চুং। দু'জন বেরিয়ে এল সুইট

ছেড়ে। দামি কাঠের প্যানেল দেয়া করিডোর পেরিয়ে পৌঁছে গেল ওরা এলিভেটর ভেস্টিউবলে। উর্বশীর দিকে চাইল ফু-চুং। মুখটা বিবর্ণ মনে হলো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একবার ঘুরে চাইল সুইটের সোনালী দরজার দিকে। ভেসে এল দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ। ক্ল্যামশেল লক আটকে দিয়েছেন চার্চ।

'চলো, তোমাকে ডিনার খাওয়াব,' বলল ফু-চুং।

'ইতালিয়ান কিছু?' বলল উর্বশী। একটু যেন কেটেছে চিন্তার মেঘ।

'তা-ই সই।' এলিভেটর চলে আসতেই হাতের ইশারা করল ফু-চুং। উর্বশীর পর উঠে পড়ল।

উনিশ

মেডিটারেনিয়ান সাগর। কালো জল চিরে ছুটছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। গতি তোলা হয়েছে বিশ নট। এখন ওটার সত্যিকারের তীব্র গতি কাজে লাগানো অসম্ভব। শিপিং লেন গিজগিজ করছে নানান জাতের জাহাজে। তবে মার্ভেলের ডাইনিংরুম বিন্দুমাত্র দুলছে না। ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন বা পাম্প-জেটের মৃদু আওয়াজ। ওগুলো না থাকলে রানার মনে হতো, ওরা বসেছে প্যারিসের কোনও নামকরা বুলেভার্ডে, ফাইভ-স্টার রেস্টুরেন্টে।

রানার পরনে সামার-ওয়েট স্পোর্টস জ্যাকেট, নীচে কাস্টম শার্ট। কলার খোলা। খুদে কাফ লিঙ্ক দুটো যেন কম্পাস। পায়ে

ইতালিয়ান জুতো। উল্টো দিকে বসেছে সানজিদা স্বর্ণা, পরনে কালো টি-শার্ট ও নীল জিন্স। মোমবাতির আলোয় চকচক করছে সবার চেহারা। নানান আলাপের ফাঁকে টুকটাক হাসাহাসি চলছে। মিশন শেষে ডিনার দেবে, কথা দিয়েছিল রানা।

'মোস্তফা আবুল বিশেষ ভাবে ডিনার তৈরি করছে, কাজেই তোমাদেরকে বলেছি আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে,' বলল রানা। 'খাবার ও তার স্রষ্টা'র সম্মানে।'

মৃদু উষ্ণ পাউরুটি ও মাখন নিল সোহেল।

'যখন বড় হয়ে উঠছি, ততদিনে চার ভাই বুঝে ফেলেছি দ্রুত না খেলে ঠকতে হয়,' বলল গগল। 'যে দেরি করল সে টেবিল ছাড়বে খিদে নিয়ে। ওই টেবিলে কোনও আনুষ্ঠানিকতা ছিল না।'

'আপনাদের সবাইকে পিট্টি দিতেন বাবা?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'চাইত, তবে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতাম। সংসারে তীব্র অভাব, মেজাজ খারাপ থাকত তার। অভাব ছিল কারণ লোকটা কাজ না করে সারাক্ষণ জুয়া আর মদ নিয়ে পড়ে থাকত। খাবারের অভাবে ভাইদের ভিতর খাতির ছিল না। এরপর মা আত্মহত্যা করতেই ছিটকে গেলাম সবাই। যে যার মত নেমে পড়লাম জীবনসংগ্রামে।'

পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল সোহেল। 'আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় টেবিল ম্যানার্স শেখান বাবা। মানতে চাইতাম না। টেবিলের উপর কনুই রাখলে শাস্তি মিলত। তবে এখন আর ভয় নেই। এক কনুই গায়েব, আরেক হাত তো খেতেই ব্যস্ত!'

তোকে দিয়ে হবে না, মনে মনে বলল রানা। কাজের দিকে সবাইকে সরিয়ে নিতে চাইল। 'ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছ, স্বর্ণা?'

'সারাদিন রেসপন্সিভিজম নিয়ে পড়াশোনা করেছি। এই জ্ঞানে রেপন্সিভিস্টদের নেত্রী হতে পারব না, তবে এদের সঙ্গে আলাপ চালাতে পারব। যত শিখছি, অবাক লাগছে। একদল বুদ্ধিমান মানুষ ভিনগ্রহের প্রাণীর ভয়ে কাবু! এদের ধারণা প্যারালাল ইউনিভার্সের প্রাণী তাদের পরিচালনা করতে চাইছে।'

'মানুষ নানা ধরনের হয়,' মন্তব্য করল রানা। ভেবে দেখেছে, কেউ কাউকে আহত না করলে, তার ব্যাপারে কিছু বলা উচিত নয়। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, ওখানে যা ঘটেছে, এরপর আরও বাড়বে সিকিউরিটি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল স্বর্ণা। 'তাই হওয়ার কথা, মাসুদ ভাই। হয়তো ঢুকতেই দেবে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?'

মন্তব্য করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল রানা। ডাইনিং রুমে এসে ঢুকেছে চারজন। ফারার পরনে ল্যাব কোট। ওর পিছনে জলিল ও কাশেম। পরনে জ্যাকেট-টাই ও জিন্সের প্যান্ট। কাশেমের শার্ট খানিক কুঁচকে বেরিয়ে এসেছে। দু'জন ফ্যাশন করতে গিয়ে পড়েছে অস্বস্তির ভিতর। অথবা অস্বস্তি মাঝখানের মানুষটির জন্য।

হেলেন জিলের চোখে বাঁধা স্কার্ফ খুলল ফারা। মেয়েটি যেন জাহাজের চারপাশ না দেখে, তাই এ ব্যবস্থা ছিল। বেচারি চেনে শুধু মেডিকেল সেকশন। এবার দেখল ডাইনিং রুম। রানা চেয়েছে কিছুক্ষণের জন্য হাসপাতাল থেকে বাইরে আসুক হেলেন। মোফিজ বিল্লার জাদুর দোকান থেকে ধার দেয়া হয়েছে পোশাক। এখনও দুর্বল হেলেন, তবে হাসছে খুশি মনে।

ওর বয়স কত, ভাবল রানা। বড়জোর বিশ? দুর্বল, তবে দেখতে মিষ্টি। গালে ফিরেছে লালচে রং। কালো কোঁকড়ানো চুল

যেন মেঘের ঢেউ, নেমে এসেছে ধবধবে সাদা কাঁধে। হেলেনের দু'পাশে আড়ষ্ট পায়ে হাঁটছে কাশেম ও জলিল। দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে চাইছে না। মুখ গম্ভীর। খানিক যেন অভিমান—তুই ব্যাটা আমার প্রেমিকা ভাগিয়ে নিতে চাস্!

ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এসো, হেলেন, আগের চেয়ে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন রানা,' কাঁচের খাঁচা থেকে বেরিয়ে খুশি হেলেন। চারপাশে চাইল।

'চোখ বেঁধে আনা হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত। চাইনি জাহাজের সেনসেটিভ জিনিসগুলো দেখো।'

হেলেনের জন্য চেয়ার টেনে দিতে চাইল জলিল ও কাশেম। একইসঙ্গে চেয়ারের কাঁধে হাত রাখল, তারপর পরস্পরের দিকে কড়া চোখে চাইল। কেউ সরিয়ে নিল না হাত।

'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ক্যাপ্টেন রানা, আপনাদের কোনও কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করব না।' মেয়েটির কণ্ঠ মিষ্টি সুরেলা, কথা গুছিয়ে বলে। 'খুব ভাল লাগছে বিছানা ছেড়ে উঠতে পেরেছি।'

'তোমার অসুখটার কী অবস্থা?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'ভাল। আগের চেয়ে অনেক। ডক্টর রাইনার হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছেন। মনে হয় না আর অ্যাটাক হবে।'

একটু হাঁ করে কথা শুনছিল কাশেম, কাজেই জিতে গেল জলিল, হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে বের করল চেয়ার, হাতের ইশারা করল হেলেনকে। 'বসুন, প্লিয। বসুন-বসুন।' আরেক হাতে বামদিকের চেয়ার ধরেছে। কিছুতে ওখানে বসতে দেবে না কাশেমকে। হেলেন বসে পড়তেই পাশের চেয়ারে বসল জলিল। তারপর বিজয়ীর ভঙ্গিতে চাইল কাশেমের দিকে। ভাব দেখে মনে হলো নতুন দেশ জয় করলেন সম্রাট আকবর।

কঠোর চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল কাশেম, তারপর ঘুরে চলে গেল উল্টোদিকে, বসল স্বর্ণার পাশে।

'দুঃখজনক, তবে হেড বাবুর্চির সঙ্গে যোগাযোগ আপাতত বন্ধ,' বলল রানা। ওর কথা শেষ হতে না হতে দরজা খুলে গেল। দুই বেয়ারা পিছনে নিয়ে এল মোস্তফা আবুল। তিনজনের হাতে দুটো করে ছয়টি ট্রে। তার উপর নানান ডিশ। গম্ভীর চেহারা বাবুর্চির। সবার উপর চাপিয়ে দিয়েছে সব দোষ। 'খানিক ভুল হয়েছে,' একবার আবুলের দিকে চেয়ে হেলেনের দিকে চাইল রানা। 'আমাদের চিফ সেফ ভেবেছে তুমি ডেনমার্কের মানুষ। যদি জানত নরওয়ের, সেদেশের ডিশ রাঁধত। আপাতত ডেনিশ খাবার।'

'আপনাদেরকে ধন্যবাদ,' মিষ্টি করে হাসল হেলেন। 'আমার কথা ভেবেছেন, কৃতজ্ঞ রইলাম। ...দু'দেশ তো খুব কাছে, যেন একাত্মা।'

'শুনলেন?' বাবুর্চির কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চাইল সোহেল।

'আমি শুনিনি, স্যর।' কঠোর মুখে বলল আবুল মোস্তফা।

দুই বেয়ারা ও বাবুর্চি টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়েছে সুস্বাদু সব ডিশ।

'সুবাস বলছে হেরিঙের ডিশ,' বলল রানা। 'ওরা তো শুরুই করে এ দিয়ে। তারপর ফিস্কবলার। ওটাও তো মাছের বড়া। তারপর খাসির কলিজা, সঙ্গে লাল বাঁধাকপি আর পোড়ানো আলু। এরপর প্যাণ্ডাক্যাজার প্যানকেক, শেষে আইসক্রিম ও চকলেট বা রিস আ ল্য ম্যাণ্ডে।'

হাসছে হেলেন। 'ওটা দুধ-ভাত দিয়ে তৈরি ক্ষীর। সঙ্গে চেরির সস্। আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি ওটা। টেবিলে আছে দেখছি।'

'তুমি কি অসলো থেকে এসেছ?' জানতে চাইল অনিল।

'আমার বাবা-মা মারা গেলে ওখানে চলে যাই। তবে আমি জন্মেছি অনেক উত্তরে, ছোট্ট এক গ্রামে। নাম ছিল অ্যারোনভাদ।'

এবার বোঝা গেল সাধারণ শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় মেয়েটি কেন একটু কালচে, ভাবল রানা। সম্ভবত ল্যাপ, আলাস্কার ইনুইট বা গ্রিনল্যাণ্ডের স্থানীয়দের মত। বরফ ও তুষার থেকে ছিটকে আসা সূর্যের আলো কিছুটা কালচে করে দেয় এদের ত্বক। হেলেনের দেহে এস্কিমো রক্তও থাকতে পারে।

কিছু বলবার আগেই আতাসিকে দেখল রানা, এই মাত্র এসে ঢুকেছে ঘরে। ডিনার করতে আসেনি। চোখের কোলে কালো দাগ। বোধহয় দু'দিন ঘুমাতে পারেনি। উঠে দাঁড়াল রানা, 'এক্সকিউজ মি, তোমরা ডিনার নিয়ে বসো।' আতাসির পাশে চলে গেল, নিচু স্বরে বলল, 'চেহারার এই অবস্থা কেন?'

'ভাল নেই শরীর, বস্,' স্বীকার করল আতাসি। 'আপনিই তো বললেন যেন কাজ চালিয়ে যাই। স্ট্যাটিকের জ্যামিঙের ভিতর থেকে ছারপোকার কথা খুঁজেছি। একটু আগে কাজ শেষ হয়েছে। এই যে দেখুন।' ভাঁজ করা একটা পৃষ্ঠা বাড়িয়ে দিল সে। 'সাউণ্ড মিক্সচার ব্যবহার করেছি। এর বেশি আর কিছু বেরুল না। মাঝে পাবেন ব্র্যাকেটের ভিতর সময়।'

কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল রানা।

আমি মনে করি না... (১:২৭) হ্যাঁ... (২:৫৭) পার্লা মোনার সম্প... (১:৩৫) ওই ইল লেফ অ্যাকটিভেট... (:৩৮) কী... (১:০৩) আগামী(কাল)... (৪:২০) তা হবে না... (:৪২) এক মিনি(ট)... (৬:৫৭) বাই। (১:১৪)

'এ-ই?' কণ্ঠের হতাশা চেপে রাখল রানা।

'ঠিক এ-ই, বস্। বোঝা যায়নি কিছু আওয়াজ। তবে

ওগুলোকে দশ পার্সেন্ট সুযোগ দিয়েছে কম্পিউটার। ওগুলো কিছু না-ও হতে পারে। আরও আছে। কম্পিউটার পার্লা মোনার নামকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বলেছে। ঠিক হতে পারে, না-ও হতে পারে। তবে মনে হয় ঠিকই ধরেছি।'

'স্ক্র্যাম্বলার চালু করার পর কেসলারের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলে ক্রিংগল?'

'তেইশ মিনিট তিন সেকেণ্ড।'

কথাগুলো আরেকবার পড়ল রানা। 'মনে হয় চারটে জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। পার্লা মোনা, কী, আংশিক শব্দ ইল ও লেফ। শেষ শব্দ সম্বন্ধে কম্পিউটার কতটা অ্যাকিউরেসির প্রবাবিলিটি জানিয়েছে?'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়েছে আতাসি, দ্বিতীয়বার নোটের দিকে চাইল না। 'ষাট পার্সেন্ট। কি-র ব্যাপারে বিরানব্বুই।'

'ইল, লেফ আর কি খুব কাছাকাছি সময়ে এসেছে। বোধহয় একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত। এরপর আছে পার্লা মোনা। তার কথা শেষে এগুলো এসেছে। সে বোধহয় কোনও ভাবে জড়িত।'

'আধঘণ্টা ভেবে শেষে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, বস্,' বলল আতাসি। 'আপনি ভেবে বের করলেন দু'মিনিটের ভিতর।'

'কারণ তুমি অর্থের মানে খুঁজতে চেয়েছ। শব্দগুলো কত সময় পর বলা হয়েছে, সেদিকে নজর দাওনি।'

'আরেকটা কাজ করেছি।' বুক পকেট থেকে মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার বের করল আতাসি, প্লে বাটন টিপল। আগের মতই শুরু হলো স্ট্যাটিকের আওয়াজ। এরপর হঠাৎ থেমে গেল। একটা কণ্ঠ পরিষ্কার স্বরে বলল, 'অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি।'

'এ লোক কে?' জানতে চাইল রানা।

'কম্পিউটার ধারণা করছে এ লোকের নিজ ভাষা ইংরেজি না।

মনে হয় মধ্য ইউরোপের লোক। বয়স হতে পারে পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করে ষাট।'

রেকর্ড টেপের কথা কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা। তারপর বলল, 'এ বোধহয় জ্যারোন ব্রাঙ্কো। সিকিউরিটি চিফ। ...চলো, এবার টেবিলে বসে পড়ি।'

টেবিলে ফিরল রানা, পাশে আতাসি। ভাঙা স্বরে কৌতুক বলবার চেষ্টা করছে জলিল, তবে কাশেম ছাড়া কাউকে হাসতে দেখা গেল না। আনন্দের হাসি। হেলেন আর পাত্তা দেবে না জলিলকে। নিজ চেয়ারে বসে পড়ল রানা। ও কথা বলে উঠতেই স্বস্তির শ্বাস ফেলল জলিল, কৃতজ্ঞ চোখে চাইল মাসুদ ভাইয়ের দিকে। 'অনিল, বিকেলে জ্যারোন ব্রাঙ্কোর ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?'

'না। কম্পিউটারে কিছুই নেই।'

'আমি বোধহয় ওই লোকটাকে চিনি,' বলল হেলেন। 'গোল্ড অভ মার্সে ছিল। রেসপন্সিভিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ কেউ।'

'এদের ওয়েব-সাইটে কখনও একে পাওয়া যায়নি,' বলল অনিল। 'বেতনের খাতায় নেই।'

'তবে জাহাজে ছিল, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি,' বলল হেলেন। 'কেউ বাধ্য না হলে তার সঙ্গে কথা বলত না। শুনেছি রেসপন্সিভিস্টদের সর্বোচ্চ নেতার ঘনিষ্ঠ লোক।'

এ লোকের বিষয়ে ভাবছে না রানা। ও জানতে চাইছে এই লোক কীভাবে উঠল ক্রুজ লাইনারে। কীভাবে এল এথেন্সে? তারপর ওর মনে পড়ল, হারিয়ে যায় গোল্ড অভ মার্সের একটা লাইফবোট। নিচু স্বরে বলল রানা, 'অর্থাৎ এই লোক খুন করেছে ক্রুজ লাইনারের সবাইকে।'

'একটু বুঝিয়ে বলবে?' জানতে চাইল ফারা। মুখের কাছে

চামচ তুলে থমকে গেছে।

'জ্যারোন ব্রাঙ্কো গোল্ড অভ মার্সে ছিল। সে এখন আছে রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিটে, গ্রিসে। জাহাজ থেকে নেমে লাইফবোট নিয়ে সরে পড়ে। হেলেন ছাড়া সে একমাত্র মানুষ, যার মৃত্যু হয়নি। এ থেকে মনে হয় আগেই জানত সবাই মারা পড়বে। সোজা কথা: সে-ই খুন করেছে সবাইকে।' হেলেনের দিকে চাইল রানা। 'তুমি এর চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

'খুব লম্বা। দুই মিটারের বেশি।' তার মানে আন্দাজ পৌনে সাত ফুট, মনে মনে বলল রানা। 'খুব শক্তিশালী মনে হতো। মাত্র কয়েকবার দেখেছি। কখনও হাসত না। সত্যি কথা বলতে, তাকে দেখে ভয় পেত সবাই, আমারও ভয় লাগত।'

'তুমি মিস্টার অনিলকে কিছুটা সময় দিতে পারবে? লোকটার একটা ছবি এঁকে দেবে তুমি।'

'কিন্তু আমি যে ছবি আঁকতে জানি না।'

'আমাদের বিশেষ কম্পিউটার আছে। ওটাই আঁকবে আসলে। তুমি শুধু বলবে তার চেহারার বর্ণনা। বাকি যা করার মিস্টার অনিল করবেন ওটার সাহায্যে।'

'এই লোক যদি সবাইকে খুন করে থাকে, তার শাস্তি পাওয়া উচিত। নিশ্চয়ই আমি মিস্টার অনিলকে সাধ্যমত সাহায্য করব।' ফোঁপাতে শুরু করেছে হেলেন। চোখের সামনে ভাসছে সে-রাতের ভয়ানক দৃশ্য। কাত হয়ে জলিলের কাঁধে মাথা রাখল। মনে মনে জলিলের প্রশংসা করল রানা। বন্ধুর দিকে একবারও বিজয়ের চাহনি দেয়নি কমাণ্ডো স্নাইপার।

কাঁটা-চামচ নামিয়ে রাখল ফারা, ন্যাপকিন রেখে উঠে দাঁড়াল। হেলেনের পাশে চলে গেল, নরম স্বরে বলল, 'এক রাতের জন্য যথেষ্ট উত্তেজনা। চলো, তোমাকে মেডিকেলে

ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানেই খাব আমরা।' হাত ধরে হেলেনকে উঠতে সাহায্য করল।

গম্ভীর চেহারা দেখে মনে হলো পাশে থাকতে চাইছে জলিল ও কাশেম। এবার উঠে দাঁড়াবে ওরা।

শান্ত স্বরে বলল রানা, 'খাওয়ার দিকে মনোযোগ দাও, কাশেম। তুমিও, জলিল। সময় বা পরিবেশ সঠিক নয়। এখন হেলেনকে একা থাকতে দাও।'

'জ্বি, মাসুদ ভাই,' প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল দুই কমাণ্ডো। মনে হলো দুটো বাচ্চা ছেলে মেনে নিয়েছে বড় ভাইয়ের কথা। গম্ভীর মুখে ভাবল রানা, ডিনারে বসে একের পর এক তথ্য যা পেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে: জ্যারোন ব্রাঙ্কো ভয়ঙ্কর এক খুনি।

হেলেনের চোখ বেঁধে দিয়েছে ফারা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

স্বর্ণার দিকে চাইল রানা । 'তোমার মিশন বাদ।'

'জী? কেন?'

'নিরস্ত্র তোমাকে ওই ফ্যাসিলিটিতে যেতে দেয়া যায় না। ওখানে থাকবে জ্যারোন ব্রাঙ্কো।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আমি তো নিজেকে রক্ষা করতে জানি।'

'এ নিয়ে আর কোনও আলাপ নয়,' একটু কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ। 'আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, জ্যারোন ব্রাঙ্কো গণহত্যাকারী। কাজেই ওখানে তোমাকে পাঠাব না আমরা। আতাসি ওই রেকর্ড স্ক্রাব করে আরও তথ্য পেয়েছে। ক্রিংগলের সঙ্গে কেসলার যে কথা বলে, তার ভিতর ছিল পার্লা মোনার কথা। আমরা জানি সে নামকরা রেসপন্সিভিস্ট। তার কাছ থেকে তথ্য মিলতে পারে। আমাদের পরের কাজ ওর কাছ থেকে ওদের পরিকল্পনা জানা।'

'এই অভিনেত্রী যদি কট্টর রেসপন্সিভিস্ট হয়, মুখ থেকে কথা বের করা কঠিন হবে,' বলল কাশেম।

'অভিনেত্রী. পোড় খাওয়া গুপ্তচর তো নয়,' বলল সোহেল। 'নিজের কথা বলতে শুরু করলে আজ পর্যন্ত যা করেছে, সব বলতে চাইতে পারে। এখন প্রথম কাজ তার কাছে পৌঁছুনো।'

'পার্লা মোনা এখন জার্মানিতে,' বলল স্বর্ণা। 'একটা ছবির শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে ওখানে।'

একটা ভুরু উঁচু ও অপরটা নিচু করে চাইল রানা স্বর্ণার দিকে। যেন নীরবে বলছে, সন্দেহ করছি সব সিনেমা দেখো।

দুই গাল লালচে হয়ে উঠল স্বর্ণার। 'হলিউডের খবর রাখি।'

খুকখুক করে কেশে উঠল সোহেল। 'এ মেয়ের কাছে পৌঁছুনো নিয়ে কথা, এই তো? তরুণ মেকআপ আর্টিস্ট মোফিজ বিল্লাহ এখনও হলিউডি বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সে হয়তো পৌঁছে যেতে পারে পার্লা মোনা পর্যন্ত।'

মোফিজ বিল্লাহ্ একটু পাগলাটে মানুষ। হলিউডে মেকআপ আর্টিস্ট ছিল। ওকে তরুণ শিল্পী না বললে রেগে যায়। বয়স চল্লিশ মত। হলিউডে খুব ভাল করছিল। ভেবেছিল জীবন কাটিয়ে দেবে সেখানে। কিন্তু নাইন ইলেভেনে নর্থ টাওয়ারে মারা পড়ল ওর প্রিয় ছোটবোন। এর তিনমাস পর বিল্লাহ ফিরল বাংলাদেশে। ততদিনে জনপ্রিয় নায়ক ও নায়িকাদের দুর্ব্যবহার পেয়ে তিক্ত হয়ে গেছে মন। আমেরিকানরা ছিল তখন মুসলিম বিরোধী। অ-শ্বেতাঙ্গ এবং মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী।

ঢালিউডে কিছুদিন কাজ করবার পর পুরুষদের জন্য বিউটি পার্লার খুলল সে। দ্রুতই দাঁড়িয়ে গেল ব্যবসা। কয়েক বছর আগে এক গভীর রাতে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ল। সে সময় তাকে উদ্ধার করে মাসুদ রানা। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় তিন

ছিনতাইকারীকে। এরপর থেকে রানার (ভাড়া করা) গুলশানের বাড়িতে দেখা করতে আসত মোফিজ বিল্লাহ্। বছর খানেক আগে রানা জানতে চায়, কিছুদিনের জন্য ওর সঙ্গে জাহাজে কাজ করবে কি না। শুনে লাফিয়ে ওঠে সে। সাগর তার পছন্দ। এরপর একটা অভিযানে বের হয় ওরা। সেটা শেষ হলে রানার সঙ্গে তার কথা হয়। ঠিক হয়, রানা যদি কখনও কোনও কাজ দিতে চায় তাকে, সে খুশি মনে করবে।

মোফিজকে বিশেষ কিছু ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করে দেয় রানা। এখন নিজ যোগ্যতায় সে দুনিয়ার সেরা অন্যতম বিউটিশিয়ান ও মেকআপ-ম্যান।

'ঠিক জায়গায় ধরেছিস, সোহেল,' বলল রানা। 'মোফিজ যদি পার্লা মোনার সঙ্গে আলাপ করে, হয়তো বেরিয়ে আসবে এরা কী করছে।'

মৃদু হাসল সোহেল। 'তবে ও যদি কিছুই না জানে, তো সময় নষ্ট হবে।'

'প্রার্থনা কর্ যেন পার্লা মোনা মুখ খোলে। আমি মার্ভেলের কাউকে গ্রিক রিট্রিটে পাঠাব না।'

'আর একা যাবি তুই ফিলিপিন্সে?' মাথা নাড়ল সোহেল। 'ভুলে যা। আমিও যাব, নইলে যাবি না তুইও।'

'তোর তো এখানে কাজ আছে।'

'উঁহুঁ। উর্বশী ওর ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত, তবে রোম থেকে ফিরছে ফু-চুং। আমরা মোনাকো পৌঁছলে পরদিন পৌঁছবে ও। তা ছাড়া সিনিয়রদের ভিতর থাকছে অনিল, আতাসি আর গগল। কোনও ঝামেলা হওয়ার কথা নয়।'

এবার আর আপত্তি তুলল না রানা। 'ঠিক আছে। ওখানে সার্ভেইল্লেন্সের কাজ সহজ। তা ছাড়া তিনদিনের ভিতর ফিরছি

আমরা।'

'তা হলে শুরু কর ডিনার,' তাড়া দিল সোহেল। 'ট্র্যাডিশনাল ড্যানিশ খাবার এনজয় করার চেষ্টা করি।'

ইচ্ছে করেই একটু জোরে বলেছে সোহেল। কিচেনের দরজা ফাঁক করে মাথা বের করল মোস্তফা আবুল। থমথম করছে চেহারা।

বিশ

এলিভেটরের দেয়ালে হেলান দিয়েছে ফু-চুং, আড়াই মিনিট পর লবিতে নেমে এল লিফট। ডানদিকে দাঁড়িয়েছে উর্বশী, দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে যেতে চাইল। তবে পারল না। আগেই হুড়মুড় করে এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে দুই লোক।

বিরক্ত হলো ফু-চুং। এরা ভদ্রতার ধার ধারছে না। ততক্ষণে ওকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একজন। সরতে শুরু করেই বুঝল ফু-চুং, সামনে ঝামেলা। ওর কোটের ভিতর হাত ভরে দিয়েছে লোকটা। নড়বার আগেই হোলস্টার থেকে বের করে নিল সাইলেন্সার লাগানো বেরেটা পিস্তল। এক সেকেণ্ড লাগল না ওর দুই চোখের মাঝে মাযল ঠেকাতে। দ্বিতীয় লোকটা হাতে পিস্তল নিয়েই ঢুকেছে, বামহাতে কেড়ে নিল উর্বশীর পার্স। পেশাদার।

'নড়লে মরবে,' বিশালদেহী লোকটা বলল। ইংরেজির ভিতর ভিন দেশি টান।

এলিভেটরের বদ্ধ জায়গায় নড়া কঠিন, মার্শাল আর্ট কোনও কাজে লাগবে না। অন্য কোনও কৌশল দরকার। ভাবতে শুরু করেছে ফু-চুং। কিন্তু বিশাল লোকটা পিস্তলের নল দিয়ে জোরে খোঁচা দিল উর্বশীর বাম বুকে।

'উহ্!' কুঁচকে গেল উর্বশীর গাল। চোখে আঁধার দেখছে।

'শেষবার সাবধান করলাম,' চাপা স্বরে বলল প্রকাণ্ডদেহী।

ফিসফিস আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো দরজা। উঠতে শুরু করেছে এলিভেটর।

একটু সামলে নিয়েছে উর্বশী, একবার চাইল ফু-চুঙের দিকে। ভাবছে, এত দ্রুত ওদের খুঁজে পেল কী করে রেপসিভিস্টরা? এ লোক যদি জ্যারোন ব্রাঙ্কো হয়, তো মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা। ফোনে এর কথা জানিয়েছে রানা। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে কেন অমলকে? একেবারে পাল্টা কিডন্যাপ করতে হবে? কেন? যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

'আমাকে মেরে ফেলতে হবে, নইলে পাবে না অমলকে, ব্রাঙ্কো,' শান্ত স্বরে বলল উর্বশী।

মনে হলো চমকে গেছে সার্ব। ভাবতে পারেনি তার নাম জানে উর্বশী। তবে দ্রুত সামলে নিল। বুঝে নিয়েছে ছারপোকা থেকে টেপ করা হয়েছে ওর কথা।

দেখলে সাধারণ মস্তান মনে হয়, ভাবল ফু-চুং। তবে তা নয়, এ লোক ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

'দরকার পড়লে মেরে রেখে যাব, সে তো জানোই,' বলল ব্রাঙ্কো।

তুমি জানো না আমাদের পরিচয়, মনে মনে বলল ফু-চুং। হাতে টেক্কা নেই, তবে এটুকুও কিছু না থাকার চেয়ে ভাল। ভাবতে চাইল, ব্রাঙ্কোর জায়গায় ও হলে কী করত। প্রথমেই

জানতে চাইত রেপসিভিস্টদের সিকিউরিটি কতটা ভেদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ লোক ওদের আটক করবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তার আগেই ফাঁদ কেটে বেরুতে হবে। অস্ত্র নেই, কাজেই ওরা একে অপরের সাহায্যে আসবে না। যা করবার নিজের চেষ্টায় করতে হবে। কেউ আসবে না উদ্ধার করতে। হোটেলের কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছে ওরা, কেউ যেন বিরক্ত না করে।

এলিভেটর উঠছে, তার আগেই বুঝে ফেলেছে ফু-চুং, কী ধরনের বিপদে পড়েছে। মরতে চলেছে ব্রাঙ্কোর হাতে। বাঁচতে চাইলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এবং সেটা আলাদা আলাদা ভাবে। উর্বশী দক্ষ নেভি অফিসার, নানান ধরনের ট্রেইনিং নিয়েছে। বুদ্ধিমতী, নইলে নেভাল ইন্টেলিজেন্সে টিকত না। তবে এই মুহূর্তে দুলছে ওর মন। হয়তো চাইবেই না নিজেকে রক্ষা করতে। সর্বক্ষণ ভাবছে ভাইয়ের কথা। চাইছে তাকে আগলে রাখতে। কাজেই যা করার ওর নিজের করতে হবে।

খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। নীরব সঙ্গীকে নিয়ে পিছিয়ে গেল ব্রাঙ্কো। অস্ত্র তাক করে বেরুতে বলছে। পরস্পরের দিকে চাইল ফু-চুং ও উর্বশী। যেন নিঃশব্দে আলাপ হলো। একই কথা ভাবছে। এবং নীরবে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল। তিরতির করে কাঁপল উর্বশীর চোখের পাপড়ি। ওটা যেন ফু-চুংকে জানিয়ে দিল, সুযোগ বের করে চলে যান এখান থেকে। নিজেকে রক্ষা করুন। আমি নিজে রয়ে যাব ভাইয়ের পাশে। ফলাফল যাই হোক।

করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। সোজা গিয়ে থামল সুইটের দরজার সামনে। একবার মার্শাল আর্ট দিয়ে চেষ্টা করব, ভাবল ফু-চুং। ব্রাঙ্কোর সঙ্গী খানিক পিছনে। এক আঘাতে তাকে শেষ করা সম্ভব। তবে সার্ব রয়েছে কয়েক ফুট পিছনে। খেয়াল করছে ওদের হাঁটবার ভঙ্গি।

'বামহাত দিয়ে পকেট থেকে কি কার্ড বের করুন,' নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো।

তিক্ত হয়ে গেল ফু-চুঙের মন। বেশিরভাগ ডানহাতি লোক ডান পকেটে রাখে চাবি। এ লোক ধরে নিয়েছে ও ডানহাতি। ডান পকেট থেকে বামহাতে চাবি বের করতে চাইলে বেকায়দা হবে। কোনও সুযোগ রাখছে না সার্ব।

শরীর মোচড় দিয়ে দাঁড়াল ফু-চুং, চাবি বের করবে। তারই ফাঁকে চাইল ব্রাঙ্কোর চোখে। স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'ওটা বিশেষ ধরনের তালা। ভিতরে ঢোকা যাবে না।'

'এ জিনিস আগেও দেখেছি। খোলা যায়। আরেকবার কথা বললে আপনার বাম হাঁটুর উপর গুলি করব।'

ডান পকেটে বামহাত ভরল ফু-চুং, বের করল ইলেকট্রনিক কি, ওটা ভরল তালার ভিতর। ইনসার্ট বাতি লাল থেকে সবুজ হলো। এবার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।

'এবার পিছিয়ে আসুন,' নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো।

পিছিয়ে এল উর্বশী ও ফু-চুং। সুইটের ভিতর ঢুকল ব্রাঙ্কোর সঙ্গী। পাঁচ সেকেণ্ড পর ডক্টর চার্চের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চমকে উঠেছেন। 'আপনি এখানে কী করছেন! কী চান?' দ্বিতীয়বার একই কথা বললেন ডক্টর।

বিশ সেকেণ্ড পর গলা উঁচু করল ব্রাঙ্কোর সঙ্গী। ইংরেজি উচ্চারণ জানিয়ে দিল এ লোক আমেরিকান। 'সুইটে অন্য কোনও লোক নেই। শুধু ডিপ্রোগ্রামার, আর ছেলেটা।'

পিস্তলের নল দিয়ে ইশারা করল ব্রাঙ্কো। সুইটের ভিতর ঢুকল ফু-চুং ও উর্বশী। ডক্টরের তালা এক পলক দেখল সার্ব। দরজা বন্ধ করল না। তার জানা আছে ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যায় তালা।

'দিদি?' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অমল। ড্রাগের কারণে বিধ্বস্ত চেহারা।

'অমল।'

'তুমি এভাবে আমাকে অপমান করলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'কারণ আমি তোকে ভালবাসি,' বলল উর্বশী। কণ্ঠে অসহায়তা ও আবেগ।

'আমি কি কচি খোকা...'

'চুপ্!' ধমকে উঠল ব্রাঙ্কো। ডক্টর চার্চের সামনে থামল সে। মনে হলো পাহাড় দাঁড়িয়েছে বামনের সামনে। ভীষণ ভয় পেয়েছেন ভদ্রলোক। বার কয়েক ঢোক গিললেন।

খুনি সার্ব গর্জে উঠল, 'মিস্টার কেসলার বলে দিয়েছে যেন তোকে খুন না করি। তবে বলেনি এটা করলে কী হবে।' বলেই খটাস্ করে পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল সাইকিয়াট্রিস্টের মাথার উপর।

একইসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। মেঝের উপর ঢলে পড়লেন চার্চ। ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ওই একই মুহূর্তে দৌড়াতে শুরু করল ফু-চুং।

ফ্রেঞ্চ ডোর পেরুলে ব্যালকনি, ওখানে পৌঁছতে হলে পেরুতে হবে দশ কদম। কেউ কিছু বুঝবার আগেই চার ভাগের তিন ভাগ পেরুল ফু-চুং। তার আগেই ডানদিকে এক পা ফেলেছে উর্বশী। ওর কারণে গুলি করতে পারল না দ্বিতীয় লোকটা। তখনও রাগ নিয়ে ডক্টরের দিকে চেয়ে ব্রাঙ্কো।

তীরের মত দরজা পেরুল ফু-চুং, কুঁজো করে নিয়েছে দুই কাঁধ। মুহূর্তে দামি কাঠের ফ্রেম ও অ্যান্টিক কাঁচ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। ভাঙা কাঁচ ঝরঝর করে পড়ল ওর উপর। এখানে-

ওখানে কেটে গেল। পরক্ষণে এল গুলির আওয়াজ। কাঁধের উপর দিয়ে শিস তুলে গেল বুলেট, গাঁথল ইঁটের দেয়ালে। চারপাশে ছিটকে উঠল লাল ইঁটের কণা।

না থেমেইনি রেলিঙে পৌঁছে গেল ফু-চুং। দু'পা তুলেই পেরিয়ে গেল বাধা, ততক্ষণে ঘুরছে ওর দেহ। শূন্যে ঘুরে গিয়ে বাড়ির দিকে মুখ করল। আটতলা থেকে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু অসংখ্য রট আয়রন রডের দুটো খপ করে ধরল। পিছলে নেমে চলেছে ঘর্মাক্ত হাত। বাধা দিল না নিজ পতনকে। অনেক নীচে পাকা সড়ক। সাঁই-সাঁই চলছে গাড়ি-ঘোড়া।

নীচের মেঝের কংক্রিট বাধা দিল দুই হাতকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ফু-চুং। টের পেল দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করেছে সাততলার রেলিং। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সরিয়ে নিল দুই হাত। আবার পড়তে শুরু করেছে। অনেক নীচে ফুটপাথ। মুখের সামনে সাততলার ব্যালকনি দ্রুত উপরে উঠছে। দুই হাতে খপ করে ধরল দুটো রড, আবার কমিয়ে নিল গতি। নিয়ন্ত্রিত গতিতে নেমে চলেছে। এ যেন ওর প্রচণ্ড শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকাশ। মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই।

ছয়তলার রেলিঙে পা রাখল, ঠিক করে নিল ভারসাম্য, তারপর আবার খসে পড়ল। ততক্ষণে সুইটের ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসেছে ব্রাঙ্কো। ভেবেছে পেভমেন্টে দেখবে লোকটার লাশ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর নীচের ব্যালাস্টারে দেখল ফু-চুংকে। গুলিবৃষ্টি শুরু করল সার্ব।

চারপাশে একের পর এক গুলি, চাবুকের মত বাতাস এসে লাগছে দেহে। রড বেয়ে নেমে চলেছে ফু-চুং। পঞ্চমতলার কংক্রিটের মেঝের উপর ঠাস্ করে নামল দুই হাত। আকড়ে ধরল দুই শিক। প্রচণ্ড টান পড়ছে দেহে। তীব্র ব্যথায় লাল হয়ে গেল

মুখ। এখনও চারতলা ব্যালকনির রেলিঙে পৌঁছয়নি পা। ছেড়ে দেবে রড? নীচে গিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! তবে পায়ের এক ইঞ্চি নীচে পেয়ে গেল রেলিং। আস্তে করে ভর দিল রেলিঙে। চরকির মত ঘুরছে দু'হাত, চাইছে ভারসাম্য রাখতে। তিন সেকেণ্ড ওভাবে রইল, তারপর নতুন করে শুরু হলো পতন। খপ্ করে ধরতে হবে চতুর্থতলা ব্যালকনির রড। যে-কোনও সময়ে টান খেয়ে ভাঙবে হাতের হাড়। এই ভাবে নামতে পারলে তা হবে বিস্ময়কর একটা ব্যাপার।

শরীর ঘুরিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ব্রাঙ্কো, তবে গুলি করতে পারছে না। গুলির আওয়াজে উপরে চাইছে পথচারীরা। অবাক ব্যাপার! চিনা এক লোক দুর্দান্ত স্টাণ্ট দেখিয়ে নেমে চলেছে! অস্ত্র সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, দৌড়ে গিয়ে ঢুকল সুইটে।

আবার রড বেয়ে নামতে শুরু করল ফু-চুং। ফেটেছে দু'হাতের তালুর চামড়া। খসখস করছে। তৃতীয়তলার রড ধরে ফেলল। একবার ভাবল, কেমন হয় ব্যালকনি পেরিয়ে ঘরে ঢুকে গেলে! তবে জানা নেই ব্রাঙ্কোর সঙ্গে ক'জন থাকবে। হয়তো পুরো হোটেল ঘিরে রেখেছে। এখন ওর উচিত এ হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া। পরে ভেবে ঠিক করবে কী করা যায়।

দোতলা পনেরো ফুট সামনে বেড়ে পেভমেণ্টের উপর গেছে। ওখানে হোটেলের লবির ছাত। নীচে নামতে হলে পেরুতে হবে বিশ ফুট। তবে বামদিকে উজ্জ্বল হলুদ ক্যানোপি। ওটা ঢেকেছে সাইডওয়াক ও হোটেলের এণ্ট্র্যান্স। কসরৎ করে রেলিঙের উপর উঠে এল ফু-চুং, দড়িবাজের মত বামে সরছে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যানোপি লক্ষ্য করে। দেহ ঘুরিয়ে নিয়েছে, টানটান কাপড়ের উপর নেমে এল পিঠ দিয়ে।

ছাতি থেকে পিছলে পড়ছে। ততক্ষণে নীচের দিকে তাক

করেছে দুই পা। দুই উরুর ভিতর পেয়ে গেল ছাতির ফ্রেমের শিক। দ্রুত নেমে চলেছে, তারই ফাঁকে নিজেকে সোজা করে নিতে চাইল। পারল না। মনে হলো ছাত থেকে সমারসল্ট দিয়ে নীচে গিয়ে পড়বে। একবার দুই হাতে শক্ত করে ধরল কাপড়। ছ্যাঁৎ করে উঠল ছেঁড়া ত্বক। কয়েক সেকেণ্ড ওখানে ঝুলে রইল, তারপর সামলে নিয়ে আস্তে করে নেমে এল পেভমেণ্টে। ক'জন দর্শক জুটেছে। হাততালি দিয়ে চলেছে। ভেবেছে সিনেমার শ্যুটিং চলছে। জানে না, মরতে বসেছিল মানুষটা!

লাফ দিয়ে ফুটপাথে উঠল ফু-চুং, ভিড়ের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে। ঠিক তখন চারপাশের আওয়াজ ছাপিয়ে এল ইঞ্জিনের গর্জন। ঘুরে চাইল ফু-চুং, পিছনের বাঁক থেকে রওনা হয়েছে একটা লাল ডুকাটি মোটরসাইকেল। ওটার সামনে থেকে ছিটকে সরছে পথচারীরা। পুরো থ্রটল খুলে তীব্র গতি তুলল আরোহী। আর বড়জোর পনেরো ফুট দূরে শিকার।

দৌড়াতে শুরু করেছে ফু-চুং। মনে হলো হোটেলের পাশের এক বইয়ের দোকানে ঢুকতে চলেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল পার্ক করা এক গাড়ির হুডে। পিছলে নেমে গেল ওপাশে, সড়কে নেমেই পড়ল আরেক বিপদে। জ্যামের ভিতর জায়গা পেয়ে সামনে বেড়েছে এক ভলভো ট্রাক। গাড়ির হুড থেকে কেউ নেমেছে খেয়াল করেনি ড্রাইভার। অ্যাক্সেলারেটার দাবিয়ে ধরল সে। এক সেকেণ্ড পর ট্রাকের নীচে চাপা পড়বে ফু-চুং। এগিয়ে এল ধুলোমাখা চাকাগুলো। রাস্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফু-চুং, দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে মাথা। জানে, মরতে চলেছে। ওর মনে হলো, জ্বলন্ত ফার্নেসের ভিতর পুড়ছে। ইঞ্জিন থেকে এল তীব্র তাপ ও তেলের গন্ধ। পরক্ষণে ওকে পেরিয়ে গেল দশ চাকার ট্রাক।

ব্রেক কষল যন্ত্রদানবের ড্রাইভার। অ্যাসফল্টের উপর কর্কশ আওয়াজ তুলল চাকা। আবারও মোটরসাইকেলের গর্জন শুনল ফু-চুং। ওটা বোধহয় দু'পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোর মাঝের সড়কে, ভলভোর সামনে।

ট্রাকের নীচ থেকে ছিটকে বেরুল ফু-চুং, চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। উল্টো দিকের লেনে ছাত-খোলা এক ডাবল-ডেকার টুরিস্ট বাস। ওটা থেকে নামছে টুরিস্টরা। আশা করা যায় উঠে পড়লে খেয়াল করবে না ড্রাইভার। এক লাফে বাসের পাশে পৌঁছুল ফু-চুং, একটা জানালা ধরে নিজেকে তুলে নিল রাস্তা থেকে। পাশের ট্রাকে বাম পা রেখে ডান পা ঠেকাল বাসের গায়ে। মাঝখানের ফাঁক দিয়ে উঠতে হবে। প্রতিবারে উঠছে এক ফুট করে। জানালা দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে টুরিস্টরা। প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি ও দক্ষতা ওকে তুলে নিয়ে চলেছে উপরে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই ভলভো ট্রাকের উপর উঠে পড়ল ফু-চুং। ছাতের উপর গড়িয়ে দিল দেহ, হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। ভেবেছে এবার একটু বিশ্রাম নেবে, কিন্তু তা হলো না। ওর মুখের পাশে গেঁথেছে কী যেন! জ্বলন্ত ধাতু হিস্-হিস্ আওয়াজ তুলল।

মুখ তুলে চাইল ফু-চুং। হোটেলের ব্যালকনিতে আবারও এসে দাঁড়িয়েছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। পিস্তল তাক করছে ওর মাথা লক্ষ্য করে! কী ঘটছে টের পাবে না পথচারীরা। অস্ত্রের মুখে সাইলেন্সার। আরাম করে শিকার করতে চাইছে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, ঝেড়ে দৌড় দিল ছাত ধরে। পরক্ষণে লাফ দিল বাস লক্ষ করে। মাত্র রওনা হয়েছে ওটা। সিটের উপর দিয়ে উড়ে গেল ও, নীচে রইল জাপানি টুরিস্ট। তাদের টপকে ধুপ করে পড়ল মাঝখানের আইলে। ওখান থেকে উঠেই রওনা হয়ে গেল বাসের পিছন দিক লক্ষ্য করে। তারই ফাঁকে দেখেছে, ভলভো

ট্রাক ঘুরে পিছু নিয়েছে ডুকাটি মোটরসাইকেল।

হোটেল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে ফু-চুং, কিন্তু এখন তাড়া করছে ওকে ব্রাঙ্কোর দলবল।

মোটরসাইকেলের কালো পোশাক পরিহিত আরোহী পিছু নিয়েছে বাসের। নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছে না। এর হেলমেটের ভিতর রেডিও আছে কি না, জানে না ফু-চুং। তবে অপারেশনের দায়িত্বে রইলে ও নিজে চাইত এর সদস্যরা যেন নিজেদের ভিতর যোগাযোগ রাখে। আর তাই ওর মনে হয়েছে, কিছুক্ষণের ভিতর হাজির হবে এর সঙ্গীরা। ব্রাঙ্কো নিশ্চয়ই হোস্টেজ রেসকিউ টিম বিষয়ে বিশদ জেনে এসেছে। কাজেই অমল দাশাকে কেড়ে নিতে সঙ্গে এনেছে বড় কোনও দল।

চার লেনওয়ালা বড় সড়কে পড়েছে বাস, গতি তুলে চলেছে কোলোসিয়ামের দিকে। বাসটাকে পাশ কাটানোর সময় তীব্র-গতি গাড়িগুলোর ড্রাইভাররা কখনও বিশ্রী ভঙ্গি করছে জানালা দিয়ে। ডুকাটি মোটরসাইকেল যেন কোনও মাল্টা রে, অনুসরণ করে চলেছে মস্ত কোনও তিমিকে।

পাঞ্জা দুটো বারবার মুঠো করছে ফু-চুং, চাইছে স্বাভাবিক হোক রক্ত চলাচল। তার ফাঁকে ভাবছে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় এই ঝামেলা থেকে। সুইটে রেখে এসেছে নিজের সেল ফোন। ভেবেছিল ফোন সঙ্গে রয়েছে উর্বশীর, তাতেই হবে। হঠাৎ উদ্ভট একটা চিন্তা এল ওর মনে। জানে হাতে সময় নেই। এ পরিকল্পনা বাদই দিত, কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাজেই...

বাসের পিছনে সরু সিঁড়ির দিকে চাইল ফু-চুং, রওনা হয়ে গেল ওটার দিকে। নেমে এল এক তলায়। মনে মনে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। এই ট্রিপে বেশি টুরিস্ট নেই। পুরো বাসে রয়েছে জনা পনেরো যাত্রী। তাদের বেশিরভাগই উপরের তলায়। নীচে যারা

রয়েছে তারা চারপাশ দেখছে, ফু-চুঙের দিকে ফিরেও চাইল না। আইল ধরে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল ও, ড্রাইভারের দিকে চলেছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে এক মহিলা অনুবাদক, দু' হাতে রুপালি বোর্ড। বক্তৃতার জন্য পড়ছে ট্যুর স্ক্রিপ্ট। ফু-চুং এগিয়ে যেতেই মুখ তুলল সে, ফাইল রেখে মিষ্টি হাসি দিল্। ধরে নিয়েছে ফু-চুং তার গ্রুপের কেউ। জাপানি ভাষায় কী যেন জানতেও চাইল।

ভাব দেখে মনে হলো শোনেইনি ফু-চুং। ড্রাইভারের দিকে খেয়াল। লোকটার পরনে সাদা শার্ট, কালো টাই, মাথার উপর ক্যাপ, বিমানের পাইলটের। লোকটা স্বাস্থ্যবান নয়, খুশি হয়ে উঠল ফু-চুং। খপ্ করে তার ডান বাহু ধরল, একটানে সরিয়ে দিল ড্রাইভিং সিট থেকে। কুঁজো হয়ে গেছে, পরমুহূর্তে কাঁধের উপর তুলেই পিছনে ফেলল ড্রাইভারকে। ডিগবাজি খেয়ে পিছলে পড়ে গেল লোকটা বাসের সিঁড়ির ধাপে। সেখান থেকে নামল দরজার উপর। ঠাস্ করে কপালে লাগল হাতল। ওখানেই ধুপ করে পড়ল। অচেতন।

শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন বিরতি নেয়নি বললেই চলে, তার আগেই ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে ফু-চুং। মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। ট্যুর গাইড প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করেছে। তার চিল-চিৎকার ভীত করে তুলল যাত্রীদের। বিশাল উইং মিররে চাইল ফু-চুং, পরক্ষণে কড়া ব্রেক কষল।

চারপাশ থেকে শুরু হলো হর্নের আওয়াজ। পিছনের গাড়িগুলো ব্রেক কষছে। বাসের পিছন থেকে সরে গেল মোটরসাইকেল, পাশের গাড়িগুলোর মাঝখানের সরু জায়গা দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাকে আসতে দিল ফু-চুং, তারপর হঠাৎ গতি বাড়িয়ে বাঁয়ে সরতে লাগল। মোটরসাইকেলের সামনে আর পথ

নেই। পাশের লেনে একের পর এক গাড়ি, প্রায় ঠেকিয়ে রেখেছে সামনের গাড়ির বাম্পারে। ব্রেক চেপে পিছনে রয়ে যেতে পারে মোটরসাইকেল। সেক্ষেত্রে আবারও পিছু নিতে হবে। কিন্তু তা করল না আরোহী, মাঝখানের সরু অংশ পেরিয়ে এগুতে চাইল। নিচু গিয়ার ফেলল সে, মুচড়ে ধরল থ্রটল। গর্জে উঠল এক হাজার সিসি ইঞ্জিন. রাস্তা ছাড়ল সামনের চাকা। হ্যাণ্ডেলবারের কাছে নামিয়ে নিয়েছে মাথা, দ্রুত এগুতে চাইছে। বাতাসের বাধা খানিক কমে যেতেই বোধহয়, বাড়তি গতি পেল।

তবে কোনও সুযোগ নেই আরোহীর। দশ ফুট দূরে ড্রাইভিং সিটে ফু-চুং। বাসের ধাক্কা খেয়ে বামের লেনে চলে গেল ডুকাটি, দড়াম করে গুঁতো দিল এক গাড়ির পিছনে। মোটরসাইকেল থেকে উড়াল দিল আরোহী, সামনের গাড়ি পেরিয়ে পরের গাড়ির পিছনের কাঁচে গিয়ে নামল হেলমেট নিয়ে। সেফটি গ্লাস বিস্ফোরিত হতে মনে হলো ছিটকে উঠল হাজারো হীরা। মোটরচী যদি সুস্থ থাকে, বলে বেড়াবে বেঁচেছে হেলমেটের কারণে। ওই এক সংঘর্ষে একের পর এক ছোট দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করল। চার লেন জুড়ে।

বাস থামাল ফু-চুং, দরজা খুলবার কন্ট্রোল টিপে দিতেই আংশিক ভাবে খুলে গেল দরজা। পুরো খুলবে না। অতিরিক্ত ড্রাইভারের কারণে। অনুভব করছে ফু-চুং, রক্তে কমে গেছে অ্যাড্রিনালিন। সিট থেকে উঠে পড়ল, ট্যুর গাইডের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

মস্ত হাঁ করে খাবি খেল গাইড, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

একবার চট্ করে পিছন দিক দেখে নিল ফু-চুং। ওখানে ঝামেলা শুরু হয়েছে। এক বাঁক থেকে আরেক বাঁক পর্যন্ত গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট। গাড়ির মালিকরা বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে চলেছে।

সম্ভব শুধু ইটালিতে। বাস থেকে নেমে পাশের এক গলিতে চলে এল ফু-চুং, একবার চাইল পিছনে। ঠিক তখন দেখল সেডানটা। চারপাশের গোলমালে যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত আসছে ওটা। দুই লোক ওটার সামনে থেকে সরতে চাইল, বদলে গুঁতো দিল সামনের গাড়িকে। সেডানের গতি কমছে না, সামনের বাম্পার বাঁকা-চোরা। ভিতরের লোকগুলোকে দেখতে পেল না ফু-চুং। তাদের চেপে ধরেছে ইনফ্লেটেড এয়ার ব্যাগ।

ওরা ওকেই শিকার করতে চাইছে, বুঝতে দেরি হলো না ওর। দুই লাফে আবার এসে উঠল বাসে, বসে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। কান খাড়া রেখেছে। সুন্দরী ট্যুর গাইড এইমাত্র চেঁচানোয় বিরতি দিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখল সেই ভয়ানক লোকটা আবার কোত্থেকে উদয় হয়েছে! এবারের চিৎকার তিনগুণ বাড়ল। তারই ফাঁকে গুলির মত বেরুল ইতালিয়ান ভাষা। দাঁড়ি-কমা নেই, স্রেফ বিরতিহীন গালি।

অটোমেটিক ট্র্যান্সমিশন দিল ফু-চুং, দেরি না করে ফেলল গিয়ার। জোর এক ঝাঁকি খেয়ে রওনা হলো বাস। সিট ছেড়েছে কয়েকজন টুরিস্ট, হুড়মুড় করে মেঝের উপর পড়ল তারা।

একহাতে হুইল ধরেছে ফু-চুং, কোলোসিয়ামের বৃত্তাকার সড়কে এগিয়ে চলেছে। ডান কাঁধের কাছে ঝুলন্ত পিএ সিস্টেম মাইক্রোফোন। ওটা বামহাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই উপরতলায়! জলদি!'

মাত্র ক'জন টুরিস্ট, জান হাতে নিয়ে ছুটল তারা বাসের পিছন দিকে। উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখেছে ফু-চুং. কালো ফিয়াট ব্রাভো তেড়ে আসছে বুলেটের মত। দেখতে না দেখতে চলে এল বাসের পাশে। ভিতরে তিনজন লোক। সামনের জনের হাত ডোরসিলের নীচে, তবে চোখে পড়ল পিছন

সিটের লোকটার কোলে রাইফেল।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাসল্ট রাইফেলের নল, ব্রাশ ফায়ার করা হলো বাসের পাশে। বুলেট-বৃষ্টির কারণে বিস্ফোরিত হলো জানালার কাঁচ, ছিন্নভিন্ন হলো সিটের গদি। বাতাসে ভেসে উঠল ফোম। গাড়ির দিকে সরতে শুরু করেছে ফু-চুং। ব্রেক চেপে পিছিয়ে গেল ব্রাভো। বাসের উপরতলা থেকে আসছে যাত্রীদের আর্তচিৎকার।

দু'পাশের গাড়িগুলো নিজ লেনে থেমেছে, সেগুলো এড়াতে গিয়ে বনবন করে ঘোরাতে হলো স্টিয়ারিং হুইল। টের পেল ফু-চুং রাস্তা ছাড়ছে বাসের বামদিকের চাকা। সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে যে-কোনও সময়ে উল্টে পড়বে ওরা। স্টিয়ারিং হুইলে হালকা মোচড় দিল ও, ভারী বাস ধপাস করে নেমে এল রাস্তার উপর। সাসপেনশনের কারণে বারবার দু'পাশে দুলছে। সামনের পথ সোজা, কোলোসিয়াম এক চক্কর ঘুরে এসেছে ওরা, চলেছে এখন উত্তর-পুবে। দু'পাশে প্রাচীন আধুনিকতার মিশেল। পেরিয়ে চলেছে অফিস ব্লক, চার্চ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির। আবারও বাসকে পিছনে ফেলতে চাইল ফিয়াট। দু'পাশে সরে গাড়িটাকে বাধা দিয়ে চলেছে ফু-চুং। কয়েকবার ধাতব আওয়াজ পেল। প্রতিবার ছিটকে সরে গেল ফিয়াট।

কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ফু-চুং। ভাবল, বারোটা বেজে গেছে সেডানের। আর এগুবে না ড্রাইভার। ঠিক তখনই খটাখট আওয়াজ তুলল অটোমেটিক রাইফেল। মনে হলো ঝাঁকি খেল প্রকাণ্ড বাসের চেসিস। লোকগুলো গুলি করছে ইঞ্জিন লক্ষ্য করে। পিছন থেকে থামিয়ে দিতে চাইছে বাস, তারপর উঠে এসে খুন করবে ওকে।

সামনে অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল, ওটা হতে পারত বিশাল

এক ওয়েডিং কেক। ওই দালান সত্যিই প্রকাণ্ড, তৈরি করা হয়েছে মার্বেল পাথর দিয়ে। ওটা যেন ঝুঁকে আছে এরিনার দিকে। আবছা মনে পড়ল ফু-চুঙের, কোথায় যেন পড়েছিল ওটা দ্বিতীয় ভিক্টর ম্যানুয়ালের মনুমেন্ট। এ লোক গোটা ইটালির খুদে রাজ্যগুলো একত্র করেন, জন্ম দেন বর্তমানের ইটালি রাষ্ট্র। এই মার্বেলের বিল্ডিং এতই বড়, সামনে থেকে দেখলে হাঁ হয়ে যেতে হয়। একের পর এক পিলার, ধাপে ধাপে উঠেছে উপরে। হঠাৎ দেখলে লাগে বিশাল দাঁতের সারি, মনে হয় না মস্ত এক নেতার মনুমেন্ট।

বামে চলে গেছে সড়ক, এ পথে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল ঘোড়ার পিঠে ব্রোঞ্জের ভিক্টর। সূর্য ডুবছে, সেই রক্তিম আলোয় মনুমেন্টের উপর টুরিস্ট ও ব্যাকপ্যাকাররা সফট ড্রিঙ্ক কিনছে ভেণ্ডারদের কাছ থেকে।

বাসের পিছনে আবারও লাগল এসে অসংখ্য গুলি। চারপাশে ছিটকে গেল টুরিস্টরা, মনে হলো বিস্মিত পাখির দল।

হয়তো ইঞ্জিনের জরুরি কোনও পার্টস নষ্ট হবে, অথবা সামনে পড়বে পুলিশের রোডব্লক। দূর থেকে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হবে পুলিশ। একটা সাইন পড়ল ফু-চুং: *ভিয়া ডেই ফোরি ইমপেরিয়ালি।* ওটার অর্থ বুঝল না। ইটালিয়ানদের অন্য সব সড়কের তুলনায় সামনের সড়ক অনেক চওড়া। চারপাশ খোলা। এ পথে যাবে না, ঠিক করে ফেলল ফু-চুং। সামনে দু'দিকে বাঁক নিয়েছে সড়ক। একটা গেছে বিশাল এক পার্কিং লটে। ওখানে অসংখ্য বাস। ঠিক ওর বাসের মত।

বামের সড়কে বাঁক নিল ফু-চুং, এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে চার-পাঁচতলা ইঁটের বাড়ি। নীচে দোকান। সেখানে চামড়ার

জিনিস থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স সবই পাওয়া যায়। কিছু দোকানে বিক্রি চলছে পোষা প্রাণীর। এ রাস্তা বেশ চওড়া, এমন পথ চাইছে না ফু-চুং। সামনে অসংখ্য গাড়ির ব্রেক লাইট। জ্যামে পড়েছে। বামহাতে হর্ন টিপে ধরল ফু-চুং, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে চলে গেল সামনের বাঁকে। পাশের ফুটপাথে ভারী যান নিয়ে ওঠা কঠিন। বাস নিয়ে কাত হয়ে উঠে পড়ল কোবল পাথরের ফুটপাথে। পার্কিং মিটার খটা-খট ভাঙছে বাসের সঙ্গে লেগে। ওগুলো যেন উপড়ে নেয়া খড়। পাশের গাড়িগুলোকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে বাস। হই-হই শুরু করল গাড়ির মালিকরা, চারপাশে নানা ধরনের হর্ন।

একটা টুরিস্ট শপের নানান জিনিস বাইরে রাখা, ওগুলোর ভিতর দিয়ে চলল বাস। উজ্জ্বল রঙের নানান পোস্ট কার্ড ছিটকে উঠল চারদিকে। এক সেকেণ্ডের জন্য ফু-চুঙের মনে হলো সামনে থেকে উড়ে গেল এক মহিলা। তা নয়, ওটা টি-শার্ট পরা ম্যানিকিন। হঠাৎ এক বাড়ির সঙ্গে ঘষা লাগতেই উপড়ে গেল ডানদিকের আয়না।

চারপাশে হুলুস্থুল তৈরি করে এক ইণ্টারসেকশনে ঢুকল ফু-চুং। বাস নিয়ে ঢুকে পড়ল সরু এক লেনের ভিতর। ওটাকে সড়ক বলা চলে না, দুই পাশের বাড়ির মাঝখানে গলি। তার ভিতর দিয়ে চলছে গাড়ি চলাচল। তবে উল্টো দিক থেকে কেউ আসছে না।

খরচ করা ম্যাগাযিন ফেলে নতুন ম্যাগাযিন ভরে নিল ব্রাঙ্কোর লোক, আবার গুলি শুরু করল বাসের পিছনে। গ্যাস পেডালে হঠাৎ ভুস্ করে ডেবে গেল পা। বামদিকের আয়নায় চাইল ফু-চুং, বাসের পিছন থেকে কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া।

'আর একটু, পঞ্চাশ গজ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ফু-চুং।

খক-খক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন। থামছে না কাশি। খ্যার-খ্যার আওয়াজ তুলছে। মৃত্যু-ঘণ্টি বাজছে ইঞ্জিনের। মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলল ফু-চুং। দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে বাড়িগুলো, তবে গলি ধরে এখনও এগুনো সম্ভব।

'সবাই শক্ত কিছু ধরে বসুন।'

যে-কোনও সময়ে বন্ধ হবে ইঞ্জিন। একটানে ট্র্যান্সমিশন নিউট্রালে নিল ফু-চুং, বাকি তিরিশ ফুট নিঃশব্দে এগুলো। পিছন থেকে শুনতে পেল সিয হয়ে গেল মোটর। ধাতব কী যেন ছিঁড়ে পড়ল।

অন্ধকার-প্রায় গলির দু'পাশে মাত্র তিন ইঞ্চি জায়গা। বামদিকের আয়না ছিঁড়ে পড়ল। সামনের পথ আরও সরু হয়েছে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং অন্যগুলোর চেয়ে খানিক বড়। ওই বাড়িতে গুঁতো দেয়ার আগেই ব্রেক করল ফু-চুং। একটু দুলে উঠল বাস, তারপর উল্টোদিকের বাড়ির সঙ্গে ঘষা খেয়ে থামল। উপর থেকে ভেসে এল টুরিস্টদের ভীত চিৎকার। তবে কেউ আহত হয়নি, নীরবতা নামল কয়েক সেকেণ্ড পর।

বড়সড় লাল এক ফায়ার এক্সটিংগুইশার ফু-চুঙের পায়ের কাছে, ওটা খুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল উইণ্ডশিল্ডের উপর। ফেটে গেল কাঁচ, তবে চুরচুর হয়ে পড়ল না। দ্বিতীয়বারের মত এক্সটিংগুইশার কাজে লাগাল ও, তারপর তৃতীয়বার। এবার ভেঙে পড়ল কাঁচ। যে ফাঁক তৈরি হলো, তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে যে-কোনও লোক। লাফ দিয়ে ফোকর পেরুল ফু-চুং, চার হাত-পায়ে নেমে এল গরম অ্যাসফল্টের উপর। লাফ দিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল। একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল। বাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ঘন কালো ধোঁয়া। ব্রাঙ্কোর লোক বাস পেরুতে পারবে না। অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো ঘুরে

আসতে হবে। আর পিছন থেকে যদি কোনও গাড়ি এসে থাকে, আটকা পড়েছে তারা ভাল মতই।

গলির মুখে বাঁক নিল ফু-চুং, দৌড়ের গতি কমিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। চারপাশে হেঁটে বাড়ি ফিরছে পথচারীরা। কেউ কেউ পরিবার নিয়ে বেরিয়েছে ডিনার সারতে। একমিনিট পর দূর থেকে চাকার বিশ্রী আওয়াজ এল। পাশে এক ট্যাক্সি পেয়ে দেরি না করে উঠে পড়ল ফু-চুং। রওনা হয়ে গেল ট্যাক্সি। একবার ঘুরে চাইল ও, দেখল গলির মুখে থেমেছে ফিয়াট ব্রাভো।

এবার খুঁজতে থাক্, মনে মনে বলল ফু-চুং। সাত মিনিট পর ড্রাইভারের দিকে দশ ইউরোর একটা নোট বাড়িয়ে দিল। জ্যামের ভিতর নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। খানিক হেঁটে তামাকের ছোট এক দোকানে থামল, ওখান থেকে কিনল প্রিপেইড ডিসপোজেবল সেল-ফোন। ঢুকে পড়ল পাশের বারে। কাউন্টারের মেয়েটিকে বলতেই বাড়িয়ে দিল টাইগার বিয়ার। ওটা নিয়ে এক কোণে চলে এল ফু-চুং, ফোন করল হোটেলে। ওপাশ থেকে শুনতে পেল লোকজনের আলাপ। এক লোক নাকি আটতলার ব্যালকনি বেয়ে নীচে নেমে গেছে। দু'মিনিট লাগল ওর ক্লার্ককে বোঝাতে যে, একদল ডাকাত ঢুকেছে ওদের সুইটে। রিসেপশন ক্লার্ক কথা দিল, এখনই ফোন করবে পোলিযিয়ায়। নিজের সেল-ফোনের নাম্বার দিল ফু-চুং।

পনেরো মিনিট পর বিয়ার শেষ হলো ওর। তার এক মিনিট পরেই বেজে উঠল ফোন।

'মিস্টার, সুং,' এ নামে সুইট ভাড়া নিয়েছে।

'হ্যাঁ, বলছি।'

'আমাদের ম্যানেজার পুলিশ নিয়ে আপনার সুইটে ঢুকেছেন। ওখানে ছিল এক লোক। নাম, লিয়োনার্দো চার্চ। মাথা ফেটে

গেছে তার।' দুঃখিত স্বরে বলল ক্লার্ক, 'পুলিশ চাইছে আপনি এসে একটা স্টেটমেন্ট দেবেন। এটাই তো আপনার ফোন নাম্বার? তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জন্মেছে, জানতে চাইছে কী ঘটেছে সুইটে। আশপাশে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। সে ব্যাপারেও জানতে চায়।'

'নিশ্চয়ই জানবে, আমি সবই জানাব কর্তৃপক্ষকে। বিশ মিনিট পর আসছি।'

'অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার সুং।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ,' লাইন কেটে অন্য একটা নাম্বারে যোগাযোগ করল ফু-চুং। পাঁচ সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে ফোন ধরতেই বলল, 'নিং লং, আমি লিউ ফু-চুং। শহর থেকে বেরিয়ে যেতে প্লেনের টিকেট দরকার। যত দ্রুত সম্ভব।'

চাইনিজ সিক্রেট এজেন্টকে কথা বলতে না দিয়েই ফোন রেখে দিল ফু-চুং, আবার ফোন করল। জানে, এ শহরে থাকবে না জ্যারোন ব্রাঙ্কো। বেরিয়ে যাবে ইটালি থেকে। কাজেই ওরও বেরিয়ে যাওয়া উচিত। পুলিশের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

'হ্যালো।'

'রানা, আমি ফু-চুং।'

'বল?'

'জ্যারোন ব্রাঙ্কো কিডন্যাপ করেছে উর্বশীকে।'

পাঁচ সেকেণ্ড পেরুল, তারপর জানতে চাইল রানা, 'আর অমল?'

'আমার ধারণা ওই ছোকরা এর সঙ্গে জড়িত।'

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

প্রথম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলোকে গ্রাস করতে চলেছে পশ্চিমা দুনিয়া। প্রস্তুতির কাজ শেষ। এমন সময় মাসুদ রানার হাতে এল ওদের পরিকল্পনার নীল নকশা।
পৌঁছে গেল ওটা বাংলাদেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের হাতে।
ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে এমন কয়েকটি দেশের সিক্রেট সার্ভিস চিফের সঙ্গে বসে তৈরি করলেন তিনি পাল্টা পরিকল্পনা।
প্রস্তুত রইল এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের সেনাবাহিনী।
ঠিক হল, ইজরায়েলের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে মার্কিন পারমাণবিক মিসাইল।
ডাক পড়ল মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, লিউ ফু-চুং, অনিল চট্টোপাধ্যায়, আতাসি ও উর্বশী দাসার। ওদের সঙ্গে সেই ধচাপচা জাহাজে করে চলেছে আরও অনেকে।
জাহাজটা কিন্তু আপনার খুবই চেনা...
স্বর্ণ-বিপর্যয়ের সেই মার্ভেল অফ গ্রিস।
পাঠক, এই আত্মঘাতী মিশনে যাবেন ওদের সাথে??

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Rizon

মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক কাজে গিয়ে জড়িয়ে গেল ওরা আরেক ঝামেলায়।
প্রলয় ঘনিয়ে আনছে ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ বিজ্ঞানী।
কাজে নেমেছে তার অদ্ভুত বিপজ্জনক কাল্ট।
চাইছে বিশ্বের আশি ভাগ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে!
হাতে অমোঘ মারণাস্ত্র!
রানা ও তার বন্ধুরা বুঝল, মানব সভ্যতা বাঁচাতে চাইলে এখনই সময়। কাজে নেমেই টের পেল ওরা কী ভয়ঙ্কর ফ্যানাটিক একটা দলের বিরুদ্ধে লেগেছে।
ভীষণ বিপদে পড়ল রানা, সোহেল, ফু-চুং, উর্বশী, স্বর্ণা।
এক পর্যায়ে বলল সোহেল, আর উপায় নেই রে,
এখন দরকার ইজরায়েলের তৈরি জিব্রাইলের মুষ্টি।
কিন্তু তা পেতে চাইলে মস্ত ঝামেলা পোহাতে হবে।
তাই করল ওরা, মহাশূন্যে চলে গেল পৃথিবী রক্ষা করতে।
পারবে ওরা?
এদিকে তো চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যু।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪১৬

সর্বনাশের দূত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7416-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-416
SHARBONASHER DOOT
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সাতাশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজ্জনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট *মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র *শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার *খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত।

এক

'এক মিনিট, ফু-চুং,' চট্ করে পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাইছে রানা। নিজের কেবিনে একা, ডেস্কের উপর এলোমেলো ছিটানো কাগজ। অফিশিয়াল কাজ। ইন্টারকম তুলে নিল রানা, যোগাযোগ করল অপারেশন্স সেন্টারের কমিউনিকেশন স্টেশনে।

'জী, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল রাতের সুপারভাইজার।

'দেখো তো উর্বশীর রেডিও আইডি চিপ চলছে কি না।'

ওদের সবার শরীরে সার্জারি করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে মাইক্রোচিপ, সর্বক্ষণ মৃদু আওয়াজ করছে। দেহের নার্ভাস সিস্টেমের কারণে স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলছে মাইক্রোচিপ। যেমন বৈদ্যুতিক বুস্টের ফলে চলে পেসমেকার। এই চিপের কম্পনকে ধরছে বিশ্বের চারদিকের কমিউনিকেশন স্যাটালাইটগুলো। সহজে জানা সম্ভব হচ্ছে কোথায় রয়েছে দলের সবাই।

'কোনও সিগনাল নেই। এক মিনিট। পেয়েছি। ঠিক এগারো মিনিট আগে থেমে গেছে মাইক্রোচিপ। তখন হোটেল থেকে দুই মাইল দূরে ছিলেন। মিস্টার ফু-চুঙের চিপ ঠিক চলছে। উনি আছেন রোমের মাঝখানে। কলোসিয়াম থেকে সিকি মাইল দূরে।'

'ঠিক আছে।' ইন্টারকম রেখে দিল রানা, কথা বলল ডেস্ক

টেলিফোনে। ওটা অত্যন্ত আধুনিক, তবে তৈরি করা হয়েছে উনিশ শ' ত্রিশ সালের বেকালাইট ফোনের মত করে। 'ফু-চুং, উর্বশীর ট্র্যান্সপণ্ডার কাজ করছে না।'

'তেমনই ধারণা করছি,' বলল ফু-চুং। 'এই একই জিনিসের কারণে ধরা পড়েছি। গ্রিসে নিশ্চয়ই ওরা চিপ বসিয়েছিল অমল দাশার শরীরে।'

'চিপ তো মোটামুটি জায়গা দেখাবে,' বলল রানা। 'হোটেল পর্যন্ত টেনে আনবার ক্ষমতা নেই ওগুলোর। জিপিএসের মত সঠিক হয় না। মনে হয় অন্য কোনভাবে খুঁজে পেয়েছে তোদের।'

'তা হতে পারে,' ফু-চুঙের কণ্ঠে দ্বিধা।

'অমল খবর দেয়নি তো?'

'এখন মনে হচ্ছে... সম্ভব। এলিভেটরে আমাদের অ্যাম্বুশ করে সোজা ধরে নিয়ে গেল সুইটে। তখন ড্রাগের নেশা ছুটে গেছে অমলের। আমার মনে হয় ক্রিট থেকে ফ্লাইটে কোনও একসময়ে সচেতন হয়ে যায়। তারপর থেকে ভান করছিল। সুইটে কয়েক মিনিট একা ছিল। আমরা তখন ডক্টর চার্চের সঙ্গে আলাপ করছি। ভেবেছি অমলের জ্ঞান নেই, কিন্তু আসলে তখন ফোন করছে ব্রাঙ্কো বা আর কোনও লোকের কাছে। আমাদের নাম, হোটেল ও রুমের নম্বর জানিয়ে দিয়েছে।'

'আচ্ছা... ব্রাঙ্কো চিপ অনুসরণ করে গেছে রোমে, তারপর তাকে সঠিক ঠিকানা জানিয়েছে অমল।'

'ঠিক তা-ই।'

'আর ডক্টর চার্চের বিষয়? হতে পারে না, রেসপন্সিভিস্টদের কাছে সে-ই ফাঁস করে দিয়েছে সব?'

'তা-ও হতে পারে,' বলল ফু-চুং। 'অবশ্য কথা শুনে তো মনে হলো রেপন্সিভিস্টদের অপছন্দ করে সে। তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ব্রাঙ্কো। ওটা কোনও অভিনয় ছিল না। মনে হয় এ লোক বিক্রি হয়নি।'

'আর কী ঘটতে পারে ভাবছিস?'

'রানা, একটা ব্যাপার ঠিক মেলে না। কোনও যুক্তি নেই কিন্তু, অমল যদি সাধারণ কর্মী হবে, তো তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য এত ব্যাপক তৎপরতা কেন?'

'ওরা যে পরিকল্পনা করছে সেটার সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত।'

'অথবা রিট্রিটে এমন কিছু জেনেছে, যা বাইরের কাউকে জানানো চলবে না,' বলল ফু-চুং।

'হ্যাঁ। অমলকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে নিজেদের সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে।'

'তারা যদি এই পরিমাণ প্যারানইয়ার ভিতর থাকে, তো ধরে নিতে পারি স্বর্ণা ওই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে পারবে না।'

'আগেই ওই মিশন বাতিল করে দিয়েছি। আমরা এখন জানি গোল্ড অভ মার্সে ছিল ব্রাঙ্কো, সম্ভবত সে-ই খুন করেছে মানুষগুলোকে। স্বর্ণা এখন অ্যাসাইনমেণ্ট বুঝিয়ে দেবে মোফিজ বিল্লাহকে। সে যোগাযোগ করবে পার্লা মোনার সঙ্গে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন ভাবল ফু-চুং, তারপর বলল, 'মাত্র কয়েক মিনিট ছিলাম ব্রাঙ্কোর সঙ্গে, তবে বলতে পারি, লোকটা পাগলাটে। চোখদুটো ছিল ঠাণ্ডা, খুনির। আরেকটা বিষয়, হোটেলে ব্রাঙ্কো বলেছিল, ডিয়েটস কেসলারের বারণ থাকায় ইচ্ছে সত্ত্বেও খুন করতে পারল না ডক্টর চার্চকে। কিন্তু কেন এই বারণ, তার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। ডক্টরকে ফেলে

গেছে, কিন্তু কিডন্যাপ করেছে উর্বশীকে। কেন? ওদের খুন করলে সমস্যা চুকে যেত। সে সুযোগ ছিল, বাড়তি কোনও ঝামেলা হতো না। কেন ছেড়ে দেয়া হলো?'

'ঠিক বলেছিস। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার। পরে। এ মুহূর্তে অন্য কাজ আছে আমাদের।'

'হ্যাঁ, মস্ত বিপদে পড়েছে উর্বশী।'

নরম স্বরে বলল রানা, 'সত্যিই তা-ই।'

'তুই আমাকে কী করতে বলিস?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল ফু-চুং।

দুই বন্ধু একই কথা ভাবছে।

'তুই মোনাকো এসে মার্ভেলে ওঠ। কান পাতার কাজ বুঝে নিবি। আমার কাজ নাটের গুরুর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

'সোহেলকে নিয়ে ফিলিপিন্সে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'উর্বশীকে ফিরে পেতে হলে কেসলারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ চাই।'

'তোর কি মনে হয় ততক্ষণ টিকবে উর্বশী?'

'জানি না। তবে নিজের ব্যাপারে বেশি কিছু বলে না উর্বশী,' বলল রানা। 'নেভির কমাণ্ডো ট্রেনিঙের সময় ইরাকে ছিল। ওকে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে নামিয়ে দেন সাদ্দাম হোসেন। আমেরিকানদের হাতে বন্দি হয়েছিল। প্রচণ্ড অত্যাচার চলে ওর উপর। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ধরে নেয়া যায়, ও টিকবে।'

'ব্রাঙ্কো ওকে ভাঙতে চাইবে।'

'তুই তো জানিস অত্যাচার সহ্য করবার সময় দৈহিক শক্তির চেয়ে জরুরি মানসিক শক্তি। তা ওর আছে। আমার ধারণা আগের চেয়ে আরও শক্ত হয়েছে এখন। জানে, ওকে খুঁজে বের করব আমরা।'

'ইরাকের সেই বন্দিশালা থেকে বের হয় কীভাবে?'

'এক জেল থেকে আরেকটাতে সরিয়ে নেয়ার সময় দুই ইরাকি সৈনিককে নিয়ে পালিয়ে যায় ইরানের উদ্দেশে। পিছনে পড়ে থাকে ছয় আমেরিকান সৈন্যের লাশ। ওর সঙ্গী ইরাকিরা মারা পড়ে ইরান সীমান্তে, মেরিনদের অ্যাম্বুশে। তবে ইরানে ঢুকে পড়ে উর্বশী।'

পরদিন ভোর।

পাইলট হাউসের উইং ব্রিজে রানা। মোনাকোর ওপাশ থেকে উঁকি দিয়েছে মস্ত বলের মত সূর্য, সোনালী আলো ফেলেছে পাহাড়ি শহর মণ্টি কার্লোর উপর। আজ মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল বেশ উষ্ণ। কোথাও বাতাস নেই। মণ্টি কার্লো এসেছে রানা এ নিয়ে তৃতীয়বারের মত। ওর মনে পড়ল, বিশ্বে শেষ যে ক'টি রাজ-পরিবার আজও দেশ পরিচালনা করছে, তাদের ভিতর অন্যতম মোনাকোর রাজ-পরিবার: গ্রিমালডি। সাত শ' বছর ধরে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে তারা। এভাবে শত শত বছর ধরে টিকে আছে শুধু জাপানের ক্রিস্যানথেমাম সিংহাসন।

বহু বছর ধরে বিশ্বের সেরা অভিজাত মানুষগুলো আসছেন মোনাকোতে। অদ্ভুত সুন্দর বন্দরে অভাব নেই দামি অপূর্ব সব ইয়টের। কোনও কোনোটা দৈর্ঘ্যে এক শ' ফুটের বেশি। কয়েকটা তিন শ' ফুটি। রানার চোখ পড়েছে ইয়ট মাউন্ট সিনাইয়ের উপর। ওখানে রয়েছে ইজরায়েলি আর্মস মার্চেন্ট ব্যালফোর জেনকিন্স। পাহাড়ের দিকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। টিলার কোলে সুদৃশ্য সব অভিজাত ভিলা, প্রায় ঘিরে ফেলেছে বন্দরকে। এ শহরের জমির দাম বিশ্বের অন্য যে-কোনও এলাকার চেয়ে বহু গুণ বেশি। রানা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান

থেকে দেখা যায় বিখ্যাত মণ্টি কার্লো ক্যাসিনো। বার কয়েক ওখানে গেছে ও, ভাল লেগেছে কর্তৃপক্ষের অভ্যর্থনা।

ইনার হার্বার থেকে রওনা হয়েছে দামি এক স্পিডবোট, ছুটে আসছে জাহাজ লক্ষ্য করে। উপকূল থেকে এক মাইল দূরে নোঙর ফেলেছে মার্ভেল। বন্দর-কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো হয়েছে জাহাজের ইঞ্জিন খুলে মেরামত করতে হবে। জার্মানি থেকে আসবে পার্টস, তার আগে নড়বার উপায় নেই। মোনাকোর তিন মাইল জলসীমার ভিতর ওরা, কিন্তু পনেরো মিনিট আগে বিনকিউলার দিয়ে জাহাজটা দেখেছে হার্বারমাস্টার, এরপর আর মার্ভেলে এসে উঠতে আগ্রহ বোধ করেনি।

প্রায় ষাট নট গতি তুলে জাহাজের পাশে পৌঁছে গেল স্পিডবোট, চালকের ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে অফশোর রেসে নেমেছে। সিঁড়ি বেয়ে মেইন ডেকে নেমে এল রানা, থামল বোর্ডিং ল্যাডারের পাশে। আগেই পৌঁচেছে সোহেল, চোখে সানগ্লাস। হাতে ঝুলছে দুটো ওভারনাইট ব্যাগ।

'আমার মন কু ডাকছে রে,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'উর্বশীকে ফিরে পেতে হলে এটাই একমাত্র উপায়। আমি পনেরোবার যোগাযোগ করেছি, কথা হয়নি ডিয়েটস কেসলারের সঙ্গে। প্রতিবার নিজের নাম বলেছি, শেষেরবার জানিয়েছি, আমরা কী জানতে পেরেছি। কিন্তু লোকটা যেন পণ করেছে, শুনবে না কিছুই। তার উপর জোর না খাটালে যা খুশি করবে।'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কোনও সাহায্য করতে পারেন?'

'কিছুক্ষণ আগে যোগাযোগ করেছি। নরম স্বরে বললেন, লোকটার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। থাকলে হয়তো কিছু করা যেত। আসলে টাকার অভাব নেই রেসপন্সিভিস্টদের, ফলে

জোরালো প্রভাব ওয়াশিংটনে। শক্ত প্রমাণ না থাকলে কেসলারের বিরুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব।'

'আমরা ফিলিপিন্সে না গিয়ে সরাসরি ঠিক জায়গায় হাত দিই না কেন? ধরে নিয়ে যাই কেসলারকে।'

'একই কথা ভেবেছি। আবছা ইঙ্গিতে আমাকে নিষেধ করেছেন অ্যাডমিরাল। ইউনাইটেড স্টেটসে-এ অপারেশন করতে গিয়ে ধরা পড়লে বাকি জীবন জেল থেকে বেরুতে পারব না।'

'ধরা পড়লে তবে তো।'

প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল রানা। 'যদি বাধ্য হই, যাব। হয়তো নষ্ট হবে অ্যাডমিরালের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তারপরও। ডিয়েটস কেসলার বা তার স্ত্রীকে যদি কিডন্যাপ করতে পারি, সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেবে উর্বশীকে।'

'তোর সঙ্গে আমিও যাব।'

এগজিকিউটিভ ওয়াটার ট্যাক্সি জাহাজের পাশে এসে ভিড়েছে। সত্যিই অপূর্ব সুন্দর বোট, তবে ওটার ড্রাইভারের তুলনা হয় না। তন্বী তরুণী স্বর্ণকেশী, পরনে সরু সবুজ ব্লাউজ, এদিকে স্কার্টটা উরুর তিন ইঞ্চি নেমেই শেষ। হ্যাঙারের ভিতর কপ্টার নষ্ট, ফলে দ্রুত তীরে পৌঁছতে নিতে হয়েছে হার্বার ট্যাক্সি। তা ছাড়া, ওরা চায়নি মার্ভেলের দিকে কারও মনোযোগ পড়ুক।

'ক্যাপিটেইন টম হবস্, জে সুইস স্টেলা,' বোটের অলস ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে বলল মেয়েটি।

অপলক চেয়ে রইল সোহেল। ঠোঁটে মধুর হাসি। 'এসব মেয়ে দেখবি শুধু মোনাকোয়,' নিচু স্বরে বলল। 'থাকবেই তো। ধনী লোক সারারাত ক্যাসিনোয় জুয়া শেষে ফিরবে নিজের

ইয়টে। নিশ্চয়ই চাইবে না বিশ্রী চেহারার কোনও ড্রাইভার তাকে পৌঁছে দিক।'

মেয়েটি একহাতে বোর্ডিং ল্যাডার ধরে ক্র্যাফট স্থির করে রেখেছে। একে একে তরতর করে নেমে এল রানা ও সোহেল। কাঁধ থেকে ডেকের উপর নামিয়ে রাখল ব্যাগগুলো।

'অনেক ধন্যবাদ, স্টেলা,' বলল রানা।

ওরা সিটে বসতেই ক্রোম থ্রটল কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হলো সুন্দরী।

পঁচিশ ফুট উপরে মার্ভেলের রেলিং, ওখান থেকে ডেকে উঠল আতাসি, 'বস্, এক মিনিট!'

'কী?'

'একটা ব্যাপার খুঁজে পেয়েছি।'

'পরে বললে হয়? হাতে সময় নেই, অপেক্ষা করছে কপ্টার।'

'এক মিনিট! আসছি!' রেলিং টপকে নামতে শুরু করেছে আতাসি। বামহাতে মই বেয়ে নামছে, ডানহাতে ল্যাপটপ কম্পিউটার। প্রথমবারের মত দেখল স্টেলাকে। বিশাল চওড়া এক হাসি ফুটে উঠল গালে, মনে হলো ভুলে গেছে কী কারণে আসছে। 'নাউযুবিল্লাহ্! এ তো হুরপরি, বস্! আমার চাচাতো ভাইয়ের বউ হওয়ার মত! এতদিন একেই তো খুঁজছি আমরা!'

আতাসি নেমে আসতেই মেয়েটির দিকে সামান্য মাথা দোলাল রানা। থ্রটলে মোচড় দিল সুন্দরী। সোহেল চলে গেল বোটের সামনে, মেয়েটির মনোযোগ ধরে রাখবে। এই সুযোগে কী ঘটেছে রানাকে বলবে আতাসি। রওনা হয়ে গেল বোট। প্রচণ্ড গর্জন করছে ইঞ্জিন। গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হবে। সামনে থেকে আসছে প্রবল হাওয়া।

'কী?' জানতে চাইল রানা।

কম্পিউটার খুলল আতাসি। 'জাহাজে অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে চেক করছি, বস্! রেসপন্সিভিস্টদের ওই সব সি রিট্রিট!'

'কী পেলে?'

'কী পাইনি, বস্! আপনি কিছুদিনের খবরগুলো দেখেছেন? ক্রুজ শিপে বেড়ে গেছে ভাইরাসের আক্রমণ! গ্যাসট্রোইন-টেস্টিনাল নরোভাইরাস!'

'গত কয়েক বছর ধরে চলছে।'

'এটা সাধারণ বিষয় নয়। প্রথমে আমি ক্রুজ কোম্পানির কাছ থেকে নিয়েছি যাত্রীদের ম্যানিফেস্ট।' কীভাবে তথ্য জোগাড় করেছে, জানতে চাইল না রানা। 'ওটা ক্রস-রেফারেন্স করেছি রেসপন্সিভিস্টদের সদস্য লিস্টের সঙ্গে। তারপর বুঝলাম সব কিছুর ভিতর রয়েছে সরল প্যাটার্ন। আমি বিশেষ মনোযোগ দিলাম ক্রুজ লাইনারগুলোর দিকে। যেসব যাত্রায় দেখা দিয়েছে অস্বাভাবিক অসুস্থতা। এরপর মাটি খুঁড়ে বহু কিছু পাওয়া গেল। এসব জাহাজে দুই বছরে সতেরোটা অস্বাভাবিক অসুস্থতা ঘটে। এগুলোর মধ্যে ষোলোবার ঘটে এমন সব জাহাজে, যেখানে ছিল রেসপন্সিভিস্টরা। সতেরোতম আক্রমণ কোনও নোরোভাইরাস ছিল না, ওটা ছিল ই-কোলাই। পাওয়া যায় ক্যালিফোর্নিয়ায় এক লেটুস ফার্মের সাপ্লাইয়ে। ওই ই-কোলাইয়ের স্ট্রেন ফ্লোরিডা, জর্জিয়া ও অ্যালাবামাকেও আক্রমণ করে।'

'আর কিছু?'

'পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেল। আপনি তো জানেন, বস্, এসব ক্রুজ লাইন্স বা বন্দরে ভাইরাসের আক্রমণের কোনও প্যাটার্ন নেই। তবে ঠিক দেখবেন এক ধরনের প্যাটার্ন

আছেও। প্রথমবার সামান্য কয়েকজন যাত্রী আক্রান্ত হয়, তাদের বেশিরভাগই ছিল বয়স্ক। দ্বিতীয় আক্রমণে চল্লিশজন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দুই মাস আগে ডোমিনো নামের এক জাহাজে সতেরোতম আক্রমণ হয়। তখন প্রায় প্রতিটি মানুষ ইনফেক্টেড হয়। সে সময় কপ্টারে করে মেডিকেল টিম নিয়ে যেতে হয়। এরপর বন্দরে জাহাজ ফিরিয়ে নেবার দায়িত্ব নেয় নতুন একদল অফিসার।'

নরম চামড়ার সিটে হেলান দিল রানা। বোটের ইঞ্জিন গর্জে চলেছে। তার উপর দিয়ে ভেসে এল স্টেলার হাসির নূপুর-ঝংকার। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল রানা, 'ওরা নিখুঁত করছে ডিসবার্সাল মেথড।'

'মিস্টার অনিলও একই কথা বললেন। প্রতিবার আগের চেয়ে খুঁত কমিয়ে আনছে। আর এখন তো এক শ' পার্সেন্ট লোককে ইনফেক্টেড করতে পারছে।'

'এই প্যাটার্নে গোল্ড অভ মার্সের ভূমিকা কোথায়?'

'এরা যখন বুঝল পুরো জাহাজ ভরা লোক খুন করা সম্ভব, তখন দরকার পড়ল শেষ একটা পরীক্ষা। কাজেই টেস্ট করল তাদের টক্সিনের কার্যকারিতা।'

'নিজ লোকের উপর,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল রানা।

শুনতে পেয়েছে আতাসি। মাথা দুলিয়ে বলল, 'এরা সেই লোক, যারা তৈরি করেছে ভাইরাস। তাদের কেউ যদি মনস্থির করত মুখ খুলবে, আর এসবের সঙ্গে জড়াবে না, তাই।'

'তাই এই টোটাল এলিমিনেশন!'

রানার সামনে মস্ত এক পাযলের টুকরো মিলতে শুরু করেছে। তবে অনেক অংশ এখনও মিলছে না। ক্রুজ শিপে গণহত্যা করে লাভ কী? জবাব নেই কোনও। রেসপন্সিভিস্টদের

সংগঠন কোনও টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন নয়। তেমন হলে আগেই ধরা পড়ত। এ ধরনের অস্ত্র পাওয়ার জন্য বহু কিছু দিতে রাজি বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন বা সন্ত্রাসীরা। তবে বিক্রি করে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে তৈরি করেনি এরা ভাইরাস। রেসপন্সিভিস্টদের টাকার অভাব নেই, এদের কাছে হুড়-হুড় করে আসছে হলিউডি টাকা।

এরা চায় জনসংখ্যা কমিয়ে রাখতে। সেজন্য জাহাজ ভরা রিটায়ার্ড মানুষগুলোকে খুন করলে লাভ কী? এভাবে ক'জনকে মারবে? পনেরো হাজার, বিশ হাজার? তাতে বিশ্ব ভরা কোটি কোটি মানুষ কমবে না। যদি এতই উন্মাদ হয়ে থাকে, আরও অনেক বড় কোনও পরিকল্পনা নিয়ে এগুবে। খুন করতে চাইবে লাখ লাখ মানুষকে।

রানার মনের ভিতর ঘুরপাক খেয়ে চলেছে পাযল। তবে অসংখ্য টুকরো মিলছে না। 'আমরা এখনও অনেক তথ্য জানি না, যেগুলো খুব জরুরি।'

ইনার হার্বারে ঢুকতেই গতি কমে এল স্পিডবোটের। চলেছে অভিজাত এক রেস্টুরেন্টের পাশের পিয়ারের দিকে। এক ওয়েটার হোসপাইপ দিয়ে ধুয়ে চলেছে কাঠের জেটি। বারবার চাইছে একটা ভিড়ের দিকে। লোকগুলো সারারাত মদপান করে এখন আসছে নাস্তার জন্য।

'আমরা আসলে সব তথ্য একটার সঙ্গে আরেকটা মেলাতে পারছি না, তাই না, বস্?' বলল আতাসি। 'এটা তো ধরে নিতে পারি, ওদের লোকের কাজ ক্রুজ শিপে সাধারণ মানুষকে ইনফেক্ট করা। এখন মানুষ খুন করতে তারা এক শ' পার্সেন্ট সফল।'

'এক শ' পার্সেন্ট নয়, ওরা যদি গোল্ড অভ মার্সে ভাইরাস

ছড়িয়ে থাকে, বাঁচত না হেলেনও।'

'সে তো বেঁচেছে সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেনের কারণে।'

'নাকে ক্যানিউলা থাকলেও জাহাজের ভেন্টিলেশন সিস্টেমের ভিতর দিয়েই শ্বাস নিয়েছে।'

'ভাইরাস হয়তো এয়ারবোর্ন ছিল না। পানি বা খাবারে মিশিয়ে দিতে পারে। তদন্ত করলে হয়তো জানা যাবে পানি বা খাবার গ্রহণ করেনি হেলেন।'

'তুমি নিজেও জানো অমন হতে পারে না। একই সময়ে প্রত্যেকটা লোক মারা পড়ে। এমন কী কেউ রেডিও করতেও পারেনি। শত শত মানুষকে পানি বা খাবার খেতে বাধ্য করা যায় না। কাজেই, খাবার বা পানির ভিতর ভাইরাস ছিল না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল আতাসি। 'দুঃখিত, বস্। এঁড়ে ষাঁড়ের মত তর্ক করেছি, খামোকা।'

'অবশ্য এমন হতে পারে, গোল্ড অভ মার্সের আক্রমণ সাধারণ প্যাটার্নের বাইরের কিছু।'

'যেমন, বস্?'

'জানি না। ভাবছি। রেসপন্সিভিস্টরা প্রায় এক শ' পার্সেন্ট সফল হয় দু' মাস আগে।'

'ডোমিনো জাহাজে।'

'ঠিক। ওখানে। তা হলে নতুন করে আবার অন্য কোনও জাহাজে হামলা কেন? ওরা তো জেনে ফেলেছে ওদের ভাইরাস ঠিক ভাবে কাজ করছে।'

'এমন হতে পারে গোল্ড অভ মার্সের লোকগুলোর মুখ বন্ধ করতে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।'

পিয়ারের সঙ্গে বোটের লাইন বেঁধে ফেলেছে স্টেলা, উঠে দাঁড়াল রানা। 'তা হতে পারে। তুমি কাজ চালিয়ে যাও। আমরা

চার্টার জেট নিয়ে পৌঁছব ম্যানিলায়। তার আগেই অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করব। উনি ডিয়েটস কেসলারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নিলেও, ক্রুজ লাইন্সগুলোকে জানিয়ে দিতে পারেন, তাদের যে-কোনও সময়ে আক্রমণের হুমকি দেবে একদল টেরোরিস্ট।' ওয়াটার ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল রানা, 'স্টেলা?'

'কুই, ক্যাপিটেইন।'

'আমার সঙ্গীকে আবার আমাদের জাহাজে পৌঁছে দেবে, তোমার বসের সঙ্গে বিলের ব্যাপার পরে ঠিক করে নেব।'

'অফ কোর্স, স্যর। কোনও সমস্যা নেই।'

আতাসির দিকে চাইল রানা। 'লেগে থাকো। নতুন কিছু জানলে আমাকে জানিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে, বস্। আর এই সুযোগে দেখি এ মেয়ের সঙ্গে চাচাতো ভাইয়ের বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারি কি না।'

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বোট থেকে ডকে নেমে এল রানা ও সোহেল। হাঁটতে শুরু করে শুনতে পেল আতাসির কণ্ঠ। মিহি স্বরে আলাপ জুড়েছে সুন্দরীর সঙ্গে।

দুই

ঘুম ভেঙে গেছে উর্বশীর। ভাবতে চাইল কখন ঘুমিয়েছে। মনে নেই কিছুই। দপদপে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে উরু থেকে। বিশ্রী

টিসটিসে অনুভূতি মাথার তালুর ভিতর। প্রথমে মন চাইল, মাথা টিপে ধরে। কিন্তু সাইক্লোনের মত ছিটিয়ে পড়ছে উরুর ব্যথা। তবে চেতনা ফিরে এসেছে ওটার কারণেই। বুঝতে পারছে পড়ে থাকতে হবে চুপচাপ। আগে জানা দরকার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে কি না। এ খুব জরুরি, কিন্তু কেন জরুরি, মনে পড়ছে না। তিলতিল করে পেরিয়ে চলেছে সময়। কতক্ষণ পেরুল? পাঁচ মিনিট? আবার দশ মিনিটও হতে পারে। মাথার তালুর ব্যথা, বা উরুর ব্যথা, এ ছাড়া কোনও অনুভূতি নেই। ...না, আছে, হৃৎপিণ্ডের কম্পন? শান্ত ভাবে চলছে ওটা।

আরও সচেতন হয়ে উঠল উর্বশী। শুয়ে আছে কটে। চাদর বা বালিশ নেই। পিঠের নীচে নারকেল-ছোবড়ার কর্কশ ম্যাট্রেস। ভঙ্গি নিল, যেন ঘুমে কাদা। তারই ফাঁকে নড়ে-চড়ে শুলো। এখন জানে, ওকে উলঙ্গ করা হয়নি। বুকের উপর শার্ট। জিন্সের প্যান্ট কোমরে। তবে পায়ের গোড়ালি ও হাতের কব্জিগুলোতে শক্ত দড়ির বাঁধন। বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে।

হঠাৎ আচমকা সব মনে পড়ল। জ্যারোন ব্রাঙ্কো, ফু-চুঙের পালিয়ে যাওয়া, তারপর কে যেন ওর নাকে-মুখে চেপে ধরল মিষ্টি সুবাসের কাপড়। খুব মাথা ধরল ড্রাগ দেয়ায়। তারপর কী?

এরপর একটা ভ্যানের ভিতর ছিল। হোটেল থেকে সরিয়ে নিল ওকে। স্বল্প পরিমাণে নার্কোটিক দিয়েছে ব্রাঙ্কো, মাতাল হয়ে উঠল। যেন পার্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। ভ্যানের পিছনে শুইয়ে দেয়া হলো। আবছা ক'জনের অবয়ব। তাদের ভিতর ছিল অমল? বা ডক্টর চার্চ? বলতে পারবে না।

ওর দেহের উপর ডাণ্ডার মত কিছু বোলাল ব্রাঙ্কো। জিনিসটা এয়ারপোর্টের মেটাল ডিটেক্টরের মত। তারপর উরুর উপর ডাণ্ডা

আসতেই টিট-টিট শব্দ উঠল। পায়ে বাঁধা খাপ থেকে ছোরা বের করল ব্রাঙ্কো, ওটা দিয়ে চিরে দিল ওর প্যান্ট। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর লোকটা পুরনো ক্ষতটা পেয়ে গেল। ঘ্যাঁচ করে ওই ক্ষতের উপর চালাল ছোরা। চিরচির করে কাটছে পেশি। সামান্য অ্যানেস্থিযিয়া ছিল, তবে ওর মনে হলো গনগনে আগুন পুড়িয়ে দিচ্ছে পা-টা। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু আগেই মুখ বেঁধে দিয়েছে। ছটফট করে সরে যেতে চাইল, কিন্তু কে যেন ওর দুই কাঁধ ধরে মেঝের সঙ্গে চেপে রাখল।

চিরে যাওয়া জায়গার ভিতর ছোরা দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে ব্রাঙ্কো, তারপর দুই আঙুল ভরে দিল কাটা মাংসের ভিতর। বহু গুণ বেড়ে গেল ব্যথা। গলগল করে বেরুতে লাগল রক্ত। কষ্ট সহ্য করতে চাইল উর্বশী, কিন্তু ব্যথা অসহ্য। হাতে কোনও গ্লাভস্ নেই, ক্ষত ঘেঁটে চলেছে ব্রাঙ্কো। রক্তে ভিজে গেল কব্জির কাছে শার্ট।

মনে হলো এক যুগ পর বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর সরিয়ে নিল হাত।

ওই ট্র্যান্সডার্মাল ট্র্যান্সপণ্ডার বড়জোর ছোট একটা ডিজিটাল ঘড়ির মত। জিনিসটা ওর চোখের সামনে ধরল ব্রাঙ্কো, তারপর ওটা ফেলল ভ্যানের মেঝের উপর, পিস্তলের বাট দিয়ে পিষে দিল। ভুরু কুঁচকে ফেলল উর্বশী। দেখতে না দেখতে গুঁড়ো হয়ে গেল প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক্স।

এবার ওর বাহুর ভিতর গেঁথে দিল হাইপোডারমিক নিডল, নিচু স্বরে বলল, 'ড্রাগ কাজ শুরু করার পর ট্র্যান্সপণ্ডারটা বের করতে পারতাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে এরকম মজা হতো?'

আর কিছুই মনে নেই ওর। এরপর এইমাত্র ফিরেছে জ্ঞান। কোথায় বন্দি, জানে না। ইচ্ছে করছে মাথার তালু টিপতে, তা

ছাড়া পরীক্ষা করে দেখতে হবে পায়ের অবস্থা। কিন্তু শক্ত বাঁধনের কারণে কিছু করা অসম্ভব। ঘরে একা। বেশ কিছুক্ষণ হলো কান পেতেছে। কাজ করছে সব ক'টি ইন্দ্রিয়। বুজে রইল চোখ। দেয়ালে ক্যামেরা থাকতে পারে, তা ছাড়া কাছেই থাকতে পারে মাইক্রোফোন। ও যে জেগে উঠেছে, তা শত্রুরা বুঝবার আগে একটু সময় পেতে চাইছে। আগে শরীর থেকে কমে আসুক ড্রাগসের প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পারছে, সামনে কঠিন সময় পার করতে হবে। তার আগে যতটা পারা যায় নিজেকে ফিট রাখা।

একঘণ্টা পেরুল, বা দশ মিনিটও হতে পারে। বুঝবার উপায় নেই। ধারণা নেই এখন ক'টা বাজে। দেহ-ঘড়ি সঠিক ভাবে জানান না দিলে, বা সময় জানতে না পারলে অসহায় হয়ে পড়ে মানুষ। আর সে-সুযোগ গ্রহণ করে দক্ষ ইন্টারোগেটর। কাজেই মন থেকে মুছে ফেলল উর্বশী দিন-তারিখ-সময়—সব। এখন দিন, সকাল, দুপুর, বিকেল বা রাত, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে পাগল হয়ে ওঠে বেশিরভাগ বন্দি। কিন্তু কিছুই জানতে চাইছে না উর্বশী, সময় বিষয়টি নিয়ে অত্যাচার করতে চাইবে ব্রাঙ্কো। কিন্তু ব্যর্থ হতে হবে তাকে।

ইরাক যুদ্ধে বন্দি হওয়ার পর বেশি ভাবতে হয়নি ওকে। খাঁচা বা বাক্সের ভিতর পুরে রাখা হতো। তখন প্রতিদিন সূর্যের আলো দেখতে পেয়েছে। তবে ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে এসে শিখেছে ইন্টারোগেশন টেকনিক। বন্দির কাছে সময় অর্থবহ মনে হলে, তা শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ব্রাঙ্কো তাই চাইবে।

এরা আর কী করবে, ওর জানা নেই। কাজেই মন থেকে সব চিন্তা দূর করে দিয়ে অপেক্ষা করতে চাইছে। যা হওয়ার তা

এমনিতেই হবে।

কাছেই কোথায় যেন ভারী তালা খোলা হলো। দূর থেকে কে যেন হেঁটে আসছে। দরজা নিশ্চয়ই ভারী কিছুর। তা হলে বোধহয় এই ঘর জেলখানার মত করে তৈরি। ওকে অল্পক্ষণের জন্য এখানে রাখা হয়নি। তার মানে রেসপন্সিভিস্টদের এ ধরনের সেল আছে। দরকার পড়লে সেখানে বন্দি করা হয়।

ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা। ধাতব কবজার উপর মরিচা। নিয়মিত ব্যবহার হয় না সেল। অথবা এ ঘরের আশপাশের আবহাওয়া ভেজা। ঘরটা মাটির নীচেও হতে পারে। সামান্যতম নড়ল না উর্বশী। দু' জোড়া পায়ের আওয়াজ। আসছে ওর কটের দিকে। দু'জনের একজন ভারী গড়নের। তবে কোনও সন্দেহ নেই দ্বিতীয়জন পুরুষ। ব্রাঙ্কো? সঙ্গে কোনও চ্যালা?

'এতক্ষণে জেগে ওঠার কথা,' বলল ব্রাঙ্কো।

'ঠিক,' সায় দিল তার সঙ্গী। আমেরিকান নাকি সুর। 'তবে মানুষ একজন থেকে আরেকজন আলাদা।'

আস্তে করে উর্বশীর গালে চাপড় দিল ব্রাঙ্কো। খুব দুর্বল স্বরে কী যেন বলে উঠল উর্বশী। এমন ভঙ্গি নিয়েছে, আবছা ভাবে টের পেয়েছে কেউ আশপাশে আছে। তবে গাঢ় ঘুম ভাঙতে চাইছে না।

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে,' বলল খুনি সার্ব। 'আর এক ঘণ্টার ভিতর যদি না ওঠে, ওকে স্টিমুল্যান্ট ইনজেক্ট করব।'

'দুই ধরনের ড্রাগ মিলে হার্ট অ্যাটাক হলে?'

'হলে কী আর করা!'

মনের ভিতর গেঁথে নিল উর্বশী, ব্রাঙ্কো ইঞ্জেকশন দেয়ার আগেই জেগে উঠতে হবে।

'যে-কোনও সময়ে পৌঁছুবেন মিস্টার কেসলার। তার আগেই জানতে হবে এ ওর ভাইয়ের সঙ্গে কী আলাপ করেছে। যতক্ষণ পেরেছে সিডেটিভ দিয়ে রেখেছিল। তবে ছোকরা ড্রাগের ঘোরে কী বলেছে, তা কে জানে!'

এদের দ্রুত তথ্য দরকার, ভাবল উর্বশী। সাধারণ মানুষ মনে করে দ্রুত ইন্টারোগেশন করা সম্ভব। মস্ত ভুল ধারণা। ভাল ভাবে তথ্য আদায় করতে চাইলে কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাজ করতে হয়। কখনও কয়েক মাস। সহজে তথ্য পেতে হলে প্রচণ্ড ব্যথা দেয়ার নিয়ম। কিন্তু সমস্যা হলো: ইন্টারোগেটর ব্যথা দিলে সে যা শুনতে চাইছে, তাই জানাতে শুরু করে মানুষ। সঠিক পথ: ইন্টারোগেটর মোটেই নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে, যাতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সত্যি কথা বলতে শুরু করে বন্দি।

আপাতত এক ঘণ্টা হাতে, ভাবল উর্বশী। সত্যি কথা কক্ষনো বলব না, তবে এরইমধ্যে ভেবে বের করতে হবে ব্রাঙ্কো কী জানতে চায়।

ব্যারিকেড পেরিয়ে মুভি সেটে ঢুকে পড়ল মোফিজ বিল্লাহ, তিক্ত হাসল। এই মায়াজগতে যখন ছিল, তখনও ভাল লাগত না চারপাশের মানুষগুলোর ভণ্ডামি। তারপর তো কাজ ছেড়ে চলেই গেল নিজ দেশে। বোনের কাছে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও এ জগতের নোংরামির ভিতর পা রাখবে না। কিন্তু মাসুদ ভাইয়ের কারণে আসতেই হলো। হয়তো মাফ করবে আদরের ছোট্ট বোনটি।

স্ক্রিপ্টের এ অংশে জার্মানির রিউনিফিকেশনের সময় পরিত্যক্ত এক ওয়্যারহাউসে বন্দি হবে পার্লা মোনা। বিল্ডিং

দেখে মার্ভেলের কথা মনে পড়ল মোফিজের। তবে এখানে সত্যিকারের মরিচার অভাব নেই। বাঁকা চাঁদের মত রাখা হয়েছে ছ'টা সেমিট্রেইলার। পাশেই দুটো ক্যাটারিং ট্রাক। চারদিকে ক্যামেরার জন্য স্ক্যাফোল্ড ও ডলি ক্রেন। রয়েছে ন্যারো গেজ ট্র্যাক। তার উপর দিয়ে চলছে শট তোলা। জায়গাটা যেন পার্কিং লট। সেটের চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করছে অসংখ্য মানুষ। এখন ওভারটাইম চলছে। সিনেমার জগতে সময় খুব জরুরি, সময় মানেই টাকা। মোফিজ শুনেছে এই সিনেমার প্রডিউসার প্রতিদিন এখানে তিন লাখ ডলার খরচ করছেন।

বিগ বাজেট মোশন পিকচারে থাকবে মানুষের হই-চই, এতে অভ্যস্ত ছিল বিল্লাহ। তবে এখন কেমন যেন বিরক্তি ধরে গেল। এসব যেন অনেক দূরে অন্য কোনও গ্রহে ঘটছে।

ইউনিফর্ম পরা নিরস্ত্র এক গার্ড আসছে ওর দিকে, তবে লটের আরেক পাশ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি কাকে দেখছি! এ কি সত্যিই আমাদের সেই মোফিজ বিল্লাহ?'

গার্ডকে পাশ কাটিয়ে ছুটতে ছুটতে এল কাইলি স্মিথ, পরক্ষণে এসে জড়িয়ে ধরল মোফিজ বিল্লাহকে। চপাচপ দুটো ভেজা চুমো দিল দুই গালে। দশ সেকেণ্ড পর এক পা পিছিয়ে দেখল মোফিজকে। 'আরে, বিল্লাহ, তোমাকে তো দারুণ সুন্দর লাগছে!'

'কোনও ডায়েট দিয়ে কাজ হয়নি, শেষে কয়েক বছর আগে স্টমাক বাইপাস সার্জারি করিয়েছি।'

এখন সে এক শ' পঁচাশি পাউণ্ড ওজন নিয়ে খুশি। থলথল করছে না শরীর। ব্যায়াম করে না বটে, তবে বাইরের খাবার ত্যাগ করেছে।

'দারুণ কাজ হয়েছে দেখছি, এখন আবার তরুণ!'

মোফিজকে প্রায় ঘুরিয়ে ফেলল কাইলি, ডানহাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে ওর বাহু। একসারি ট্রেইলারের দিকে নিয়ে চলল। কাইলি মেয়েটির বয়স তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ পর্যন্ত যা খুশি হতে পারে। আসল বয়স মোফিজ বলতে পারবে না। জানে না কেউ। চুলগুলো বেগুনি রঙের। উজ্জ্বল রঙের সাইকেল প্যান্ট পরেছে, পেটের কাছে থেমে গেছে ছেঁড়া অক্সফোর্ড শার্ট। গলা থেকে ঝুলছে কমপক্ষে বিশটা সোনার নেকলেস। দুই কানে কম করেও বিশটা খুদে গর্ত। একসময় ছিল মোফিজ বিল্লাহর অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখন নিজগুণে নামী-দামি মেকাপ আর্টিস্ট। সে সময়ে মেকআপ আর্টিস্ট হিসাবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিল্লাহকে নমিনেট করা হয়। তবে অ্যাওয়ার্ড মেলেনি ওর। অযোগ্য এক শ্বেতাঙ্গ মেকআপ-ম্যানকে দেয়া হয় সেটা। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে কাইলি।

'অন্তত দশ বছর হলো তুমি সবার রেইডার থেকে হারিয়ে গেছ। কেন? কেউ জানে না তুমি কোথায়, কী করছ।' ঝড়ের মত বলে চলেছে কাইলি। 'খুলে বলো তো শুনি, এখন কী করছ!'

'বলার মত কিছু না।'

একটা বাবল-গাম ফোলাল কাইলি। 'যা বললে না! তুমি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে। দশ বছরের বেশি হলো। বলার মত কিছু নেই বললেই শুনব? মানব? এক মিনিট, ওহ্-হো, তুমি তো পার্লা মোনার সঙ্গে কথা বলতে চাও। তুমি আবার ওর দলের সঙ্গে মিশছ নাকি? মানে ওই রিয়্যাকশনিস্ট হয়ে গেছ?'

'রেসপন্সিভিস্ট,' শুধরে দিল মোফিজ।

'যা খুশি হোক, আমার কী?' বলল কাইলি। 'তো ওদের সঙ্গে আছ?'

'না। ঠিক তা নয়। তবে এদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাই ওর কাছে।'

মেকআপ ট্রেইলারে পৌঁছে গেছে ওরা। নিজেরটার দরজা খুলল কাইলি, মোফিজকে নিয়ে উঠে পড়ল ভিতরে। চারপাশে কসমেটিক্সের মোম ও পটপউরির গন্ধ ভুরভুর করছে। এক পাশে ছয়টি চেয়ার রাখা। সামনের দেয়ালে বিস্তৃত আয়না। কাউন্টারের উপর অসংখ্য বোতল ও জার, হাজারো আকৃতির। এখানে ওখানে আইলাইনার পেন্সিল। এতরকমের ব্রাশ যে ফুটবল স্টেডিয়াম ঝাড়ু দেয়া যায়। ছোট্ট ফ্রিজ থেকে দুটো পানির বোতল নিল কাইলি, একটা বাড়িয়ে দিল মোফিজের দিকে। হাতের ইশারা করে চেয়ারে বসতে বলল। নিজেও বসে পড়ল। তীব্র আলোয় কাইলির চুলগুলো হাওয়াই মিঠাইয়ের মত লাগছে, তবে বেগুনি রঙের।

'বলো না, বিল্লাহ, এরপর কী করলে। অস্কারের পরপরই উধাও হয়ে গেলে কোথায়? ওই পুরস্কার তোমার পাওয়ার কথা ছিল। এরপর স্রেফ উধাও হয়ে গেলে। কোথায় কী করলে?'

'বাধ্য হয়ে হলিউড থেকে সরে গেলাম। আর সহ্য করতে পারিনি নকল ওই জগৎটা।' নিজ জীবনের গল্প শোনাতে আসেনি মোফিজ, তবে কাইলি সত্যি ভাল বন্ধু ছিল। মিথ্যা বলতে চাইল না সে। 'তুমি তো আমাকে চেনো। কেউ দুর্ব্যবহার করলে পাল্টা জবাব দিই। এখানে আর ভাল লাগছিল না। দেশে ফিরে ব্যবসা শুরু করলাম। ওখানেই রয়ে গেলাম।'

'সত্যিই, নাইন/ইলেভেনের পর খুব খারাপ ব্যবহার করেছে সবাই তোমার সঙ্গে।'

'ওরা জানে না সেদিন আমার ছোট বোন বস্টন থেকে আসছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিমানটা বিধ্বস্ত হলো নর্থ

টাওয়ারে।'

আফসোস করে মাথা দোলাল কাইলি। 'থাক, না-ই বা বললে ওই কষ্টের কথা।' মোফিজের হাত ধরল সে। 'আমি সত্যিই দুঃখিত। মনে করিয়ে দিতে চাইনি।'

'কাউকে কিছু বলতে চাইনি। সহ্য করে গেছি চুপচাপ।'

'এরপর চলে গেলে তুমি বাংলাদেশে। যোগাযোগ করতে চেয়েছি, কিন্তু ঠিকানা পাইনি।'

'দেশে ফিরে দ্বিতীয়বার ফিরতে চাইনি আর হলিউডে। ওই জগৎ নকল মানুষে ভরা। কারও মন ছুঁতে পারবে না তুমি। মিথ্যা গর্ব নিয়ে ময়ূরের মত পেখম মেলে চলছে সবাই। টাকার জোরে সব পেতে চাইছে, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা।'

'সত্যিই তাই,' বলল কাইলি। 'টাকা পাই তাই রয়ে গেছি। যখন বুঝব বাকি জীবন চালিয়ে নেয়ার মত টাকা হয়ে গেছে, আমিও অবসর নেব।'

মেয়েটির কথার পর নীরবতা নামল ট্রেইলারে। থমথম করছে পরিবেশ। দুই বন্ধু কোনও কথা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ খুলে গেল ট্রেইলারের দরজা। ধাপ বেয়ে উঠে এসেছে পার্লা মোনা। প্রায় প্রতিদিন তাকে ইন্টারভিউ দিতে হয়, যেখানে যায় মেলে লাল কার্পেট সম্বর্ধনা—সে যেন হয়ে উঠেছে আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমা। প্রায় ঝড়ের গতিতে ট্রেইলারে ঢুকল সে, চুলগুলো ঢেকেছে বেসবল ক্যাপের নীচে। এই মুহূর্তে কোনও মেকআপ নেই মুখে। রোগী মনে হলো। বয়স হবে পঁচিশ কি তিরিশ। মুখভঙ্গি বলছে সে জানে নিজের ক্ষমতা। দুই চোখের শিরাগুলো রক্তলাল, চোখ ঘিরে গোলাকার কালো দাগ। এগিয়ে আসতেই তার মুখে গতরাতের অ্যালকোহলের বাসি গন্ধ পেল বিল্লাহ।

'কে এই জাহান্নামের লোক? এখানে কী করছে?' কড়া স্বরে জানতে চাইল পার্লা মোনা। এ মুহূর্তে তার মিষ্টি স্বর ফেটে গেছে হ্যাংওভারের কারণে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল, চেয়ে রইল মোফিজ বিল্লার দিকে, কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল সামনে কে। 'তুমি মোফিজ বিল্লাহ্ না? তুমিই তো ফ্যামিলি টাই সিনেমায় আমার মেকআপ করেছিলে।'

'সে সিনেমায় তুমি ভাল ব্রেক পাও,' উঠে দাঁড়াল মোফিজ।

'সেরা আমি হতামই, আগে আর পরে,' বলল পার্লা মোনা। কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল গর্ব। নিজেকে মস্ত কেউ ভাবছে। মোফিজ যে চেয়ার ছেড়েছে সেটাতে বসে পড়ল, কাঁধের উপর দিয়ে চাইল কাইলির দিকে। 'আমার চোখের নীচে যে থলিগুলো ঝুলছে, ওগুলো দূর করে দাও। কয়েক ঘণ্টা পর শ্যুট করতে হবে, তবে চাই না কেউ এই অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলুক।'

মোফিজের বলতে ইচ্ছে করল, তোমার উচিত নয় সারারাত ধরে একের পর এক ক্লাবে ঢুঁ দেয়া। জিভ সামলাও, নইলে কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে।

চট্ করে একবার মোফিজের দিকে চাইল কাইলি, নীরবে যেন সায় দিয়ে চলেছে। 'ঠিক আছে, হানি, সব ঠিক করে দিচ্ছি। এখনই ব্যবস্থা হবে।'

'এই সিনেমার সঙ্গে আছ তুমি, বিল্লাহ?' জানতে চাইল পার্লা মোনা। ব্রাশ ও আইলাইনার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কাইলি।

'ঠিক তা নয়। আমি এখানে এসেছি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে, যদি খানিক সময় দাও।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল পার্লা মোনা। 'বলো কী বলতে চাও।'

কাইলির দিকে চাইল মোফিজ। বুঝতে পেরেছে মেয়েটি।

'মোনা হানি, মোফিজ তোমার মেকআপ করে দিক, সেইসঙ্গে আলাপও চলতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল মোফিজ, নিঃশব্দ ধন্যবাদ। চেয়ারের পাশ থেকে সরে গেল কাইলি, ওর হাত থেকে ব্রাশ নিল মোফিজ। ট্রেইলার থেকে নেমে চলে গেল মেয়েটি, এবার কাজে নামল দুনিয়ার সেরা মেকআপ আর্টিস্ট। 'আমি আসলে এসেছি ডিয়েটস কেসলার আর রেসপন্সিভিস্ট মুভমেন্ট সম্বন্ধে জানতে।'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল পার্লা মোনা। 'দুঃখিত, এ বিষয়ে কথা বলব না আমি।'

'খুব জরুরি, হানি। এর উপর মানুষের জীবন নির্ভর করছে।'

'আমি এসব নিয়ে আলাপ চাইছি না, ঠিক আছে? তুমি যদি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে জানতে চাও, বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে, তো ঠিক আছে; কিন্তু রেসপন্সিভিজম নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না, শুনতেও চাই না।'

'শুনতে দোষ কী?'

'আমি শুনতে চাই না, ব্যস!'

সানজিদা স্বর্ণা ইন্টারোগেশনের ব্যাপারে গত একদিন কী শিখিয়েছে, মনে করতে চাইল মোফিজ। 'দু' সপ্তাহ আগে একটা জাহাজ চার্টার করে রেসপন্সিভিস্টরা, তবে সে জাহাজ ডুবে যায় মেডিটারেনিয়ান সাগরে।'

'হ্যাঁ, জানি। টিভির খবর শুনেছি। ওরা বলে বিশাল এক ঢেউ এসে ডুবিয়ে দেয় জাহাজ। ওই ঢেউকে কী যেন বলে।'

'রোগ ওয়েভ,' তথ্য যোগান দিল মোফিজ। 'ওগুলোকে বলে রোগ ওয়েভ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। সেই ঢেউ ডুবিয়ে দেয় জাহাজ।'

ব্যাকপ্যাক থেকে পাতলা ল্যাপটপ বের করল মোফিজ, ওটা খুলে রাখল কাউন্টারের উপর। সরে গেল কাইলির মেকআপের জিনিসগুলো। ওর কয়েক সেকেণ্ড লাগল সঠিক ফাইল খুঁজে বের করতে।

যে ছবি ভেসে উঠল তার কোয়ালিটি মোটেই ভাল নয়। ক্যামেরার জন্য যথেষ্ট আলো ছিল না। এসব তোলে ফু-চুং। তবে পরিষ্কার দেখা গেল ব্রিজের ভিতর বিকৃত ভাবে পড়ে আছে মৃতদেহগুলো। শরীর থেকে ঝরঝর করে ঝরেছে রক্ত। পুরো পাঁচ মিনিট দৃশ্যগুলো দেখাল মোফিজ বিল্লাহ।

ছবিগুলো মিলিয়ে যেতে চাপা শ্বাস ফেলল পার্লা মোনা। 'ওটা কীসের ছবি? ওই সিনেমায় কাজ করছ?'

'এই ছবিগুলো নেয়া হয়েছে গোল্ড অভ মার্স থেকে। আসলে ডুবে মরেনি ওরা, সমস্ত প্যাসেঞ্জার ও ক্রু খুন হয় ওখানে। কোনও ধরনের টক্সিন দিয়ে খুন করা হয়। মানুষগুলো এত দ্রুত মারা পড়ে যে রেডিও পর্যন্ত করতে পারেনি।' ভিডিওর আরেকটা দৃশ্য স্ক্রিনে নিয়ে এল মোফিজ। এটা এসেছে মার্ভেলের মাস্তুলের উপর থেকে। ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল গোল্ড অভ মার্স। তার আগে সার্চ লাইটে দেখা গেল জাহাজের বো-তে লেখা নাম।

বিভ্রান্ত মনে হলো পার্লা মোনাকে। 'ওই ছবিগুলো তুলেছে কে? তা ছাড়া সে বা তারা মিডিয়াকে জানায়নি কেন?'

'ফুটেজগুলো কে তুলেছে, তা জানাতে পারব না। তবে এখনও মিডিয়াকে জানানো হয়নি। এর কারণ ওই জাহাজে টেরোরিস্ট হামলা হয়। কর্তৃপক্ষ চাইছে না টেরোরিস্টরা আগে থেকে কিছু টের পেয়ে যাক।'

মনে মনে নিজের প্রশংসা না করে পারল না মোফিজ। ওর

কণ্ঠে কর্তৃত্ব ফুটে উঠেছে।

'তুমি কি... সিআইএ... বা এ ধরনের কোনও সংগঠনের সঙ্গে রয়েছ?' বলল পার্লা মোনা।

'সরাসরি জবাব দেব না, হানি। তবে এই ছবি সঙ্গে থাকা কি প্রমাণ করে না, আমি কী ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত?'

'আমাকে এসব দেখালে কেন? আমি তো টেরোরিস্টদের ব্যাপারে কিছু জানি না।'

'ইন্টারোগেশনের সময় কয়েকবার তোমার নাম উঠে এসেছে। প্রমাণগুলো আঙুল তাক করছে এই হামলার সঙ্গে জড়িত রেসপন্সিভিস্টদের কেউ কেউ ঠাণ্ডা মাথার খুনি।' নরম স্বরে বলছে মোফিজ। এখনও নিশ্চিত নয়, এই নায়িকা ওর কথা বিশ্বাস করবে কি না। হয়তো এখনই সিকিউরিটিকে ডাক দিয়ে ওকে এখান থেকে বের করে দেবে।

আয়নার ভিতর প্রতিচ্ছবি পড়ছে পার্লা মোনার। পাথরের মত বসে। মোফিজ বিল্লাহ ক্যারিয়ার শুরু করে মানুষের মুখের ছাপ দূর করতে। তবে এ মুহূর্তে পার্লা মোনার চোখ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। মনে মনে বলল, আমার কেমন লাগত, যদি জানতাম যে পীরকে শ্রদ্ধা করি, সে এক নৃশংস জঙ্গি।

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না,' কিছুক্ষণ পর বলল পার্লা মোনা। 'আমার মন বলছে তুমি ওই ফুটেজ তৈরি করেছ কেসলার আর বার্থাকে ছোট করতে।'

যাক, কান ধরে বের করে দেবে না, ভাবল মোফিজ। জানতে চাইল, 'বলো তো কেন মিথ্যা বলব? আমার উদ্দেশ্য কী? এসব ভিডিও নকল করেছি, অর্ধেক দুনিয়া উড়ে এসেছি, শুধু তোমাকে দেখাতে?'

'আমি কী করে জানব তোমার উদ্দেশ্য কী!' ঝাঁঝ বেরুল

পার্লা মোনার কণ্ঠ থেকে।

'প্লিয, মোনা হানি, যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখো। আমার উদ্দেশ্য যদি হতো রেসপন্সিভিজমকে ছোট করা, তো আমি চলে যেতাম না সিএনএন বা ফক্সে?' কিছুক্ষণ পেরুল, জবাব দিল না পার্লা মোনা। এবার বলল মোফিজ, 'এবার নিজেই বলো, হানি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'আমি কি সিএনএন বা ফক্সে গেছি? আমার নিশ্চয়ই অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। ঠিক কি না?'

'তাই তো মনে হয়,' স্বীকার করল নায়িকা।

'তা হলে কেন আমি মিথ্যা বলব?'

'রেসপন্সিভিস্টরা কখনও হিংস্রতা পছন্দ করে না। এ হতে পারে না যে আমাদের গ্রুপ এসব করছে। তবে হতে পারে এরা র‍্যাডিক্যাল অ্যান্টিঅ্যাবর্শনিস্ট বা এ ধরনের কোনও সংগঠন।'

'মিস মোনা, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, মিথ্যে বলছি না—আমরা দুনিয়ার সমস্ত গ্রুপ ঘেঁটে দেখেছি। শেষ কথা হচ্ছে, ওই গণহত্যা করেছে রেসপন্সিভিস্টরাই। এতে কোনও ভুল নেই। কে বা কারা করেছে, এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না।' কিছুক্ষণ হলো গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় শুরু করেছে মোফিজ। এবং বুঝছে, বেশ ভালই করছে। 'আমরা জানি রেসপন্সিভিস্টদের একটা দল এসব করতে শুরু করেছে। তারা বড় কোনও গণহত্যার জন্য তৈরি হচ্ছে।

'আমাদের চেনাজানা কিছু লোক আছে যারা সবসময় নিজ বিশ্বাসকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এরা জঘন্য লোক। আমরা এখানে এক্সট্রিমিস্টদের নিয়ে কথা বলছি। তোমাদের সংগঠনের ভিতর আছে তারা। তুমি যদি সত্যিই তোমার বন্ধুদের

সাহায্য করতে চাও, আমাকে সব খুলে বলতে হবে।'

'ঠিক আছে,' মিইয়ে যাওয়া স্বরে বলল নায়িকা।

পরবর্তী প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ করল ওরা। তারপর ফিরল কাইলি। সঙ্গে কয়েকজন এক্সট্রা। আগামী সিনের জন্য এদের মেকআপ দিতে হবে। ততক্ষণে বুঝে গেছে মোফিজ বিল্লাহ, ওরা যা নিয়ে কাজ করছে তার কিছুই জানে না পার্লা মোনা। আরও বুঝতে পেরেছে, পার্লা মোনা দুঃখী ও একাকী এক মেয়ে, নিজের তৈরি সাফল্যের ভিতর আটকা পড়েছে। ওকে ব্যবহার করছে রেসপন্সিভিস্ট মুভমেন্টের নেতারা। ওর কারণে ভিড়ছে বহু লোক। মনে মনে বলল মোফিজ: *প্রার্থনা করি একদিন যেন তুমি শক্তি পাও নিজ বুকের ভিতর। সেদিন যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো।* তবে জানে, এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, তবুও...

'আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' ল্যাপটপ ব্যাগে ভরে রাখল মোফিজ।

'আমার মনে হয় না তেমন কোনও সাহায্য করতে পেরেছি।'

'তা নয়। অনেক কিছু জানতে পারলাম। ধন্যবাদ।'

আয়নার দিকে চেয়ে নিজেকে দেখছে পার্লা মোনা। নতুন করে আবার হয়ে উঠেছে আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমা। এ রূপ দেখে মুগ্ধ হয় কোটি কোটি দর্শক। হারিয়ে গেছে গতরাতের অত্যাচারের ছাপ। ফুটফুটে সুন্দর রমণীয় লাগছে ওকে। এসব সম্ভব শুধু মেকআপ আর্টিস্টের কারণে। তবে পার্লা মোনার দুই চোখে যে একাকীত্বের হাহাকার, তা দূর করবে কোন্ মেকআপ?

তিন

ফিলিপিন্সে পৌঁছতে চোদ্দ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল রানা ও সোহেলের। এই দ্বীপ-রাজ্যে রয়েছে ছোটবড় সাত হাজারেরও বেশি দ্বীপ। ম্যানিলা থেকে পৌঁছতে হবে বোহোল দ্বীপের টুবিগোন-এ। সেটা রাজধানী থেকে পাখির হিসাবে তিন শ' মাইলেরও বেশি দূর। বোহোলে গাড়ি পাওয়া যাবে কি না তার ঠিক নেই। কাজেই প্রথমে বিমান ধরে কাছের দ্বীপ কেবুতে নামল রানা ও সোহেল। ওখান থেকে ভাড়া নিল শক্তপোক্ত কিন্তু পুরনো এক জিপগাড়ি। এরপর বোহোল স্ট্রেইটের ফেরি আসতেই ধরল। ফেরিটা এতই প্রাচীন ও মরচে ধরা, পাশ থেকে যে টায়ারগুলো ঝুলছে, সব ফেটে ঝুরঝুর করে পড়ছে। স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে পড়েছে ফেরি, কাজেই ইচ্ছে করে মালামাল বেশি তোলা হয়েছে পোর্টসাইডে। ওরা ভেবেছিল মাঝখানের এ সময়টা কাটিয়ে দেবে ঘুমিয়ে। তা হলো না। ওদের জিপের পাশে রাখা হয়েছে একটা ট্রাক্টর ট্রেইলার। তার উপর বাঁধা একপাল শুয়োর। ওগুলোর গা থেকে এমন উৎকট মলের গন্ধ আসছে যে মরা লাশও চমকে জেগে উঠবে। সেইসঙ্গে সবকটা মিলে সারাক্ষণ এমনই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে যে দুই চোখের পাতা এক করার উপায় নেই।

সাগর-প্রণালী পেরুনোর সময় দু'বার বন্ধ হয়ে গেল ফেরির

ইঞ্জিনগুলো। প্রথমবার কয়েক মিনিট পর চালু হলো। তবে দ্বিতীয়বার প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর রওনা দিল ফেরি। নাক-ডাকা এক ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিন্তু সে ঘুম থেকে কিছুতেই উঠল না। ক্রুরা ঘটাং-ঘট আওয়াজ তুলে অনেক কষ্টে চালু করল ফেরি।

উত্তাল সাগরে ফেরি শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে, নাকি তলিয়ে যাবে, বুঝে উঠতে পারল না রানা। ফলে অন্য দিকে তেমন মনোযোগ দেয়া হলো না। ভাববার সময় মিলল না এ মুহূর্তে কোথায় উর্বশী। কিন্তু অনেকক্ষণ পর যখন চালু হলো ইঞ্জিনগুলো, ভাবতে শুরু করল রানা বান্ধবীর কথা। ওর মনে পড়ল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে করেগিডোর দ্বীপে মারা পড়েন উর্বশীর দাদা।

রানা জানে, যে ভাবে হোক ছোট ভাইকে রক্ষা করতে চাইবে উর্বশী। বংশের বাতি। নিজে শেষ হয়ে যাবে উর্বশী, কিন্তু কর্তব্য থেকে হটবে না এক কদমও। এখন ওদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে উর্বশীকে উদ্ধার করা। সেজন্য যা করবার করতে হবে। ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই, তথ্য পাওয়ার জন্য উর্বশীকে যে-কোনও ধরনের অত্যাচার করবে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। এবং যদি বেচারি কথা বলতে বাধ্য হয়, তাতেও ছাড়া পাবে না, চিরতরের জন্য ওর মুখ বন্ধ করে দেবে সে।

একই চিন্তা ঘুরে ফিরে আসছে রানার মনে।

অনেকক্ষণ পর দূরে চোখে পড়ল টুবিগোনের আলো। তার একটু পর বেজে উঠল স্যাটালাইট ফোন।

'হ্যালো, স্বর্ণা বলছি। মাসুদ ভাই?'

'নতুন কিছু জানলে?'

'কেসলারের বিষয়ে? না।'

রেসপন্সিভিস্টদের ডিরেক্টর বরাবর দশটি কল পাঠিয়েছে রানা, জানিয়েছে ও সিকিউরিটি কোম্পানির এমডি। তারাই উদ্ধার করে অমল দাশাকে। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে আলাপ থেকে জানা গেছে সে লাঞ্চের সময় রোমান্টিক বই পড়তে ভালবাসে। মেয়েটি প্রতিবার ওকে বলেছে মিস্টার কেসলারকে এখন পাওয়া যাবে না। চাইলে ভয়েস মেইল করতে পারে। তাই করেছে রানা। তারপরও যখন জবাব এল না, শেষ বার স্পষ্ট করে বলেছে, উর্বশীকে ছেড়ে দেয়া হোক, নইলে কেসলার এবং তার স্ত্রীকে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই হুমকিও বোধহয় পাত্তা দিতে চাইছে না কেসলার।

'তা হলে ফোন কেন, স্বর্ণা?'

'পার্লা মোনার সঙ্গে কথা বলেছেন মোফিজ বিল্লাহ। সে কিছুই জানে না।'

'তোমরা শিওর?'

'একঘণ্টা কথা বলেন,' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল স্বর্ণা। 'এই অভিনেত্রী ফালতু এক কাল্টের সঙ্গে মিশছে, তবে সরাসরি জড়িত নয়। কেসলার নিজেদের ঝামেলার ভিতর হাই-প্রোফাইল কাউকে জড়াতে চাইবে না। তার চেয়ে বড় কথা, পার্লা মোনা এখন যে সিনেমার শিডিউল দিয়েছে, তাতে আগামী চারমাস দম ফেলার ফুরসত পাবে না। তার বর্তমান প্রেমিক এক অস্ট্রেলিয়ান র‍্যাগু লিডার—তাকেও সময় দিতে পারছে না।'

'ক্রিংগল যদি কেসলারকে পার্লা মোনার কথা না বলে থাকে, তা হলে অন্য কী বলল? সেটা হয়তো জরুরি কিছু। আতাসি টেপ চালু করে আবার শুনে দেখুক।'

'বলব। আমাকে বলেছেন ওই টেপ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছেন।'

'আর কিছু?'

'রোম থেকে ফিরেছেন মিস্টার ফু-চুং। আমরা আর্মস ডিলারের ইয়ট থেকে ভাল অডিও ফিড পাচ্ছি। তবে লোকটা আপাতত কিছু করছে না।'

ওই মিশনের কথা চট্ করে মনে পড়ে গেল রানার। 'ঠিক আছে। তোমরা শুনতে থাকো। সোহেল আর আমি পৌঁছে গেছি ফিলিপিন্সে। রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিট থেকে তিন ঘণ্টা দূরে। কিছু পেলে তোমাদের জানাব।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। মার্ভেল আউট।'

রানা পকেটে রেখে দিল ফোন।

'পার্লা মোনার ব্যাপারে এগুনো গেল না?' জিপের অন্ধকার থেকে বলল সোহেল। পরনে কালো শার্ট-প্যান্ট, বসেছে রানার পাশে।

'কিছুই জানে না।'

'হতে পারে। এসব মেয়ে মর্নিংওয়াকে কুকুর সঙ্গে নেবে না, যদি না পাপারাৎসিরা আশপাশে থাকে।'

'আগেই বোঝা উচিত ছিল ওখানে গিয়ে লাভ হবে না,' নিম পাতার মত তেতো রানার কণ্ঠ।

'শুরু থেকেই আমাদের হাতে সলিড কোনও তথ্য-প্রমাণ নেই, সামান্য সূত্র পেলেই হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছুটছি তার পিছনে। তবে আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, নতুন তথ্য মিলবে। ফিলিপিন্সে কী ঘটছে বা ঘটেছে, সবই বেরিয়ে আসবে।'

'হয়তো।'

'এখন পর্যন্ত পাওয়া সেরা সূত্র ধরে এখানে এসেছি। চার শ' রেসপন্সিভিস্ট এখানে কেন জড়ো হয়েছিল, আমরা জানি না।

সবাই এখন লাশ। মরা মানুষ কথা বলে না। তবে তাদের কীর্তি রয়েই যায়। সেই সূত্র ধরে চললে বেরিয়ে আসবে অনেক কিছু। ফেরত পাব উর্বশী আর ওর ভাইকে।'

দরকার পড়লে নিজের হাতে ডিয়েটস কেসলার ও জ্যারোন ব্রাঙ্কোকে নির্মম শাস্তি দেবে, ভাবছে রানা। লোকগুলো পালাবে কোথায়? দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করবে ও।

ধুঁকতে ধুঁকতে জেটিতে এসে ভিড়ল ফেরি। মড়মড় করে উঠল কাঠের পাইলিং। এত অদক্ষ পাইলটিং আগে চোখে পড়েনি রানার। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল ঠিক ভাবে ফেরি বাঁধতে। এরপর নামানো হলো র‍্যাম্প। জিপ চালু করল রানা, কয়েকটা ট্রাকের পিছন পিছন নেমে এল মাটিতে। এতক্ষণ জানালা বন্ধ করে বসে ছিল সোহেল, এবার শুয়োরের গায়ের গন্ধ দূর হতেই খুলে দিল কাঁচ।

'এবার জিনিসগুলো বের কর্,' বলল রানা। পা দিয়ে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটার। ঝিরঝির আওয়াজ তুলল ডিজেলের পুরনো ইঞ্জিন।

কাঁধ থেকে বাম হাতটা খুলতে শুরু করল সোহেল। দেখতে জিনিসটা বিশ্রী, শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা প্লাস্টিকের হাত। বাহুর একটু উপরে ছোট্ট একটা ক্যাচ। ওটা টিপতেই একটু আলগা হয়ে এল নকল হাত। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল এলেন রেঞ্চ, ওটা বসাল একটা ফুটোর ভিতর। ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘোরাতে শুরু করল। কয়েক প্যাঁচ দেয়ার পর বাহুর দু'পাশে সরে গেল পাত। ভিতর থেকে দুটো কেল-টেক পিস্তল বের করে নিল সোহেল।

অস্ত্রদুটো দেখতে খুদে, তবে কেল-টেক দিয়ে পি-রেটেড .৩৮০ ক্যালিবারের বুলেট বেরোয়। এই মিশনের জন্য এটা

বাছাই করেছে স্বয়ং রানা। পিস্তলের ভিতর রয়েছে সাতটা করে বুলেট। এ ছাড়া রয়েছে বাড়তি তিনটে করে লোডেড ম্যাগাজিন। প্রতিটা বুলেটের ভিতর রয়েছে পারদ। কোথাও আঘাত হানলে গতির কারণে বিস্ফোরিত হয় বুলেট। ফলাফল ভয়াবহ। বিশ্রী ক্ষত তৈরি করে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কাঁধ বা উরু। একটা কোমরে গুঁজল সোহেল, অন্যটা দিল রানাকে।

বাহুর ভিতর থেকে আরও বেরুল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ও দুটো ডেটোনেটর পেন্সিল। পাঁচ মিনিটে সেট করা। সোহেলের নকল হাতের কারণে বাড়তি সুবিধা মেলে ওদের। এয়ারপোর্টের মেটাল ডিটেক্টর থামিয়ে দেয় ওকে, তবে যখন কাস্টমসকে শার্ট তুলে হাতটা দেখায় সোহেল, প্রতিবার তারা আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করে হাতের ইশারায় এগিয়ে যেতে বলে। এখন পর্যন্ত কোনও বোমা শুঁকতে অভ্যস্ত কুকুরের খপ্পরে পড়েনি, তবে ওগুলোর জন্যও তৈরি আছে ও। ছোট একটা বোতলে রেখেছে নাইট্রোগ্লিসারিন পিল। কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলে বলবে, ওর হার্টের সমস্যা।

কিছুক্ষণ হলো শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে জিপ। সামনে পাহাড়ি এলাকা। আধপাকা রাস্তার উপর পিচের আস্তরণ পড়েনি গত বিশ বছর। রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিট দ্বীপের আরেক প্রান্তে। কাছাকাছি পৌঁছতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। তার আগেই পুবে মুখ তুলেছে সূর্য। রাস্তার দুইপাশে প্রাচীন রেইন ফরেস্ট, মাথার উপর ছুঁয়েছে পরস্পরকে। ফলে আধপাকা সড়কটা বেশিরভাগ জায়গায় দেখায় সুড়ঙ্গের মত। মাথার উপর সবুজের আচ্ছাদন। ডাইনে-বামে চোখে পড়ল এক আধটা কুঁড়ে ঘর। ছাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নমানের ঢেউটিন। বিশ্বযুদ্ধের সময় এসব এলাকা দখল করে নেয় জাপানিজ আর্মি, এখানে সেখানে রয়েছে

বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটি। চারদিকের জঙ্গল দেখে মনে হয় চিরকাল এমনই ছিল এ দ্বীপ।

গন্তব্যের পাঁচ মাইল দূরে পৌঁছে গতি কমাল রানা, রাস্তা থেকে সরে ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড় ও গাছপালার ভিতর। সড়ক থেকে পঞ্চাশ গজ ভিতরে ঝোপের আড়ালে রাখল গাড়ি। চট্ করে কেউ বুঝবে না এখানে কেউ জিপ রেখেছে। রানা ও সোহেল জানে না রেসপন্সিভিস্টরা নিজ আখড়ায় গার্ড রেখেছে কি না। কোনও ঝুঁকি নিতে চাইল না তাই। দশ মিনিট ব্যয় করল ওরা গাড়িটা ক্যামোফ্লেজ করতে। আরও দশ মিনিট গেল ওদের ভেজা, নরম মাটি থেকে চাকার দাগ মুছে ফেলতে। জিপগাড়ি যেখানে রাখা হয়েছে, তাতে রাস্তা থেকে কেউ ওটাকে খুঁজে পাবে না। ওটার সামনে নুড়িপাথর যোগাড় করে ছোট একটা স্তূপ তৈরি করল রানা। পরে ওটা দেখে খুঁজে বের করবে গাড়ি।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভরা দুটো ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল ওরা, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করল। বহুদূর হাঁটতে হবে। মনে হলো হারিয়ে গেছে সূর্য, বদলে মাথার উপর থেকে আসছে সবুজ আভা। অনেক উপরে গাছের চাঁদোয়া। রানার মনে পড়ল রাতে মার্ভেলের মুন পুলে আলো জ্বাললে এমন আলো দেখা যায়।

দুই বন্ধু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে শিকারি চিতাবাঘের মত। কোনও শব্দ করছে না বললেই চলে। ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা। তার ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে এগোতে হচ্ছে। আওয়াজ বলতে পোকার গুঞ্জন ও পাখির ডাক। আওয়াজ বাড়ছে না বা কমছে না, এটা ভাল লক্ষণ। আশপাশে কেউ নেই।

রানার পিছু নিয়ে চলেছে সোহেল। চারপাশ দেখছে, যদি কোনও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে। বাতাস আর্দ্র, হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে ওরা। দরদর করে ঘামছে। দুই ঘণ্টা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগুলো ওরা, তারপর হাতের ইশারা করল রানা। শুয়ে পড়ল আস্তে করে। ওর পাশে শুলো সোহেল। একটু সামনে শেষ হয়ে গেছে জঙ্গল। তারপর সিকি মাইল ঘাসজমি। তারপর হঠাৎ জমি শেষ হয়ে শুরু হয়েছে একের পর এক টিলা।

সূর্য ওদের পিছনে, কাজেই বিনকিউলার বের করল রানা, চারপাশ দেখে নিল। টিলা থেকে খানিক দূরে রেসপন্সিভিস্টদের টিনের ঘর। একটাই। তবে প্রকাণ্ড। মনে হলো যেন বিশাল এক গুদামঘর। ঢালু ছাত। হওয়ারই কথা: এ অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে সাড়ে তেরো ফুট বৃষ্টি পড়ে। ঘরে আলো আসার জন্য ঢালু ছাতে বেশ কিছু স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যানেল আছে। জানালা একটাও নেই। তিন পাশ দেখে মনে হলো টিনের দেয়ালে লাল অক্সাইড অ্যান্টিকরোশন পেইন্ট দেয়া হয়েছে। একটা মাত্র দরজা। সেটার সামনে বিশাল এক পার্কিং লট। ওখানে অন্তত পঞ্চাশটা গাড়ি রাখা সম্ভব। ওয়্যারহাউস থেকে তিরিশ গজ দূরে গোটা সীমানা ঘিরে ছোট ছোট অসংখ্য চৌকো কংক্রিট প্যাড। এলাকাটা বেড়া দেবার জন্য লোহার খুঁটি বসানো ছিল সেগুলোয়। এখন খুঁটি বা কাঁটাতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। গুনতে শুরু করল রানা। সামনের দিকটায় চল্লিশটা খুঁটি ছিল।

রানার কাঁধে টোকা দিল সোহেল, ওয়্যারহাউসের দিকে চাইতে বলছে। তারপর আঙুল তুলল চৌকো প্যাডগুলোর দিকে। বিনকিউলার কাজে লাগাল রানা, ওয়্যারহাউসের চারপাশটা জরিপ করছে। প্যানেলগুলোর দুই পাশে ঘাসের রঙে সামান্য তফাত দেখা গেল।

'একসময় কম্পাউণ্ড ঘিরে ছিল কোনও ধরনের বেড়া,' মনে মনে বলল সোহেল। এবার দুই আঙুল দিয়ে চোখের কোনা ঠেলে উঁচু করল।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

এটা একসময়ে জাপানিদের দখলে ছিল। সম্ভবত যুদ্ধবন্দিদের রাখা হতো এখানে। অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে তারকাঁটার বেড়া আর খুঁটি। রয়েছে শুধু কংক্রিটের স্ল্যাব। হঠাৎ একটা চিন্তা এল রানার মাথায়—রেসপন্সিভিস্টরা ইচ্ছা করে এ জায়গা বেছে নিয়েছে, না খালি পড়ে ছিল বলে ব্যবহার করেছে?

পরবর্তী আরও দু'ঘণ্টা চারপাশে নজর রাখল ওরা। কিছুক্ষণ পর পর হাত বদল হলো বিনকিউলার। ক্লান্ত হয়ে উঠল চোখ। সামনে কোনও নড়াচড়া নেই। শুধু হাঁটু সমান ঘাসগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে এলোমেলো হাওয়া।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'দুশ্‌শালা, আমরা গাধা,' বলে উঠল। 'কেউ নেই এখানে।' এতক্ষণ নীরবতার পর বিদঘুটে লাগল কথাগুলো ওর নিজের কানেই।

'শিওর হলি কী করে?' নিচু স্বরে বলল সোহেল। 'থাকতেও তো পারে।'

'কান পেতে শুনে দেখ,' নিজের উপর রেগে গেছে রানা।

'প্রায় কোনও আওয়াজ নেই,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল। 'আছে শুধু টিলার পায়ে আছড়ে পড়া সাগরের ঢেউ।'

'সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমাদের। এখানে তাপমাত্রা কমপক্ষে নব্বুই ডিগ্রি, তার মানে ওই টিনের ওয়্যারহাউসের ভিতর এক শ' পঁচিশ। এক সময়ে প্রকাণ্ড সব এয়ার-কণ্ডিশনার ইউনিট চালু ছিল এখানে। ওরা যখন চলে যায়, তার আগে সেসব খুলে নিয়ে গেছে। পারলে টিনগুলোও সঙ্গে

নিত। এখানে কিছুই নেই।'

হাত ধরে সোহেলকে টেনে তুলল রানা। ভুরু কুঁচকে রেখেছে। মূল্যবান সময় বিফলে পেরিয়ে গেছে, উর্বশীকে উদ্ধারের ব্যাপারে কোনও অগ্রগতিই হয়নি।

দুই বন্ধু হাঁটতে শুরু করল ওয়্যারহাউসের দিকে। তবে সতর্ক। প্রয়োজন পড়লে ছোঁ দিয়ে বের করবে পিস্তল। দরজা এড়িয়ে ধাতব দেয়ালের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে দেয়াল স্পর্শ করল রানা। আগুনের মত গনগনে। পুড়ে যেতে চাইল ত্বক।

হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। দরজার দিকে চলেছে ওরা। একবার থামল রানা, ব্যাগ নামাল পিঠ থেকে। ওটার ভিতর থেকে বের করল বেশ লম্বা এক রাবারের টিউব। ওটা দিয়ে প্যাঁচ দিল দরজার নবে। একপ্রান্ত দিল সোহেলের হাতে, অন্য প্রান্ত নিজের হাতে। দরজার দু'পাশে সরে দাঁড়িয়েছে ওরা। টিউব টানতে শুরু করল রানা। নবে ঘসা খেয়ে সরছে টিউব। ফলে ঘুরতে শুরু করেছে নব। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্লিক্ করে খুলে গেল লক। বিস্ফোরক থাকতে পারে, কাজেই দরজার কাছ থেকে দূরে ছিল ওরা।

'তালাটা খোলা দেখছি,' বলল সোহেল।

ভিতরে উঁকি দিল রানা। 'বন্ধ থাকবে কেন, ভিতরে তাকিয়ে দেখ।'

ছাতে বেশ কিছু টিন নেই, সে-পথে ওয়্যারহাউসের ভিতর এসে পড়েছে রোদ। তারপরও বেশিরভাগ জায়গা আঁধার মত। চোখে পড়ল ভিতরে কিছুই নেই। এমন কী ছাত ধরে রাখবার যে সাপোর্ট কলাম থাকবার কথা, তাও নেই। ছাতের আড়াগুলো একটু ঝুলে পড়েছে। দরজা যদি এত ছোট না হতো, রানা

ধারণা করত এটা এয়ারক্রাফট হ্যাঙার। মেঝের উপর ধূসর রং করা, চারপাশ একদম পরিষ্কার। ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। নাকে কীসের যেন গন্ধ। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল ব্লিচ দিয়ে ধোয়া হয়েছে চারপাশ। কেন?

'দেরিতে এসেছি,' রানার পাশে চলে এসেছে সোহেল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। তিক্ত লাগছে মন। কেসলারকে দায়ী করবার মত কিছুই নেই এখানে। উর্বশীকে উদ্ধারের কোনও ক্লু নেই। কিছুই হলো না। এত দৌড়ঝাঁপ সব বিফলে গেছে। রেসপন্সিভিস্টরা এই গুদামঘরের ভিতর যাই করে থাকুক, তার কোনও চিহ্ন বা প্রমাণ নেই। এমন কী খুলে নিয়ে গেছে এয়ার-কণ্ডিশনিং ডাক্টও। ওয়ায়্যারিং থেকে শুরু করে প্লাম্বিং—সব।

'অনেক সময় নষ্ট করলাম,' কিছুক্ষণ পর বলল রানা।

উবু হয়ে মেঝের দিকে কী যেন দেখছে সোহেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বহুদিনের কংক্রিট। কারাগার যখন তৈরি করে জাপানিজ আর্মি, তখনকার।'

'কিন্তু কেন এত প্রকাণ্ড ঘর লাগল তাদের?' আনমনে বলল রানা। 'চারপাশে পাহাড়ি এলাকা, এয়ারস্ট্রিপ নেই যে এটাকে হ্যাঙার মনে করা যাবে।'

'জানি না। কোনও ধরনের স্টোর হতে পারে।'

'ফ্যাক্টরি,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাসের মত খাটাত জাপানিরা। যে দেশ জয় করত, সেখানে ওদের মজুর হিসাবে ব্যবহার করা হত।'

'তাই পড়েছি যুদ্ধের ইতিহাসে।'

স্যাটালাইট ফোন বের করল রানা, যোগাযোগ করতে চাইল মার্ভেলের সঙ্গে। নিশ্চয়ই রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিট থেকে পাওয়া

টেপ নিয়ে কাজ করছে আতাসি ও অনিল। ডিউটিতে থাকা কমিউনিকেশন অফিসারকে রানা বলল অনিলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।

'হ্যাঁ, বল্।' কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে এল অনিলের কণ্ঠ।

'তোর সাহায্য দরকার। ফিলিপিন্সের বোহোল দ্বীপ যখন দখল করে নিল জাপানিরা, সে সময়ের ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। আমার জানা দরকার এখানে কোনও কারাগার বা ফ্যাক্টরি ছিল কি না।'

'এক মিনিট। দাঁড়া।'

রিসেপশন এতই পরিষ্কার যে কি বোর্ডের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ঝড়ের গতিতে টাইপ করে চলেছে অনিল। 'কম্পিউটার যা বলছে,' কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা জিনিস পেলাম। উনিশ শ' তেতাল্লিশের মার্চে ওখানে সাধারণ অপরাধীদের জন্য একটা কারাগার চালু করা হয়। এরপর যখন চুয়াল্লিশের অক্টোবরে ফেরত এলেন ম্যাকআর্থার, ওটা বন্ধ হয়ে গেল। ওই কারাগারকে বলা হতো ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু। তুই বললে ওটার ব্যাপারে সার্চ দিয়ে দেখতে পারি।'

'না, থাক,' বলল রানা। গুদামের ভিতর এক শ' বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা, তারপরও ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল শীতল এক প্রবাহ। চাপা স্বরে বলল, 'আমি জানি এটা কী।'

কানেকশন কেটে দিল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'এটা একটা ডেথ ফ্যাক্টরি। অপারেট করত ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু।'

'শুনিনি কখনও।'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই। জার্মানি তো যুদ্ধাপরাধ করে

মাফ চেয়েছে, কিন্তু জাপান সরকার কখনও যুদ্ধাপরাধের জন্য ক্ষমা চায়নি। বিশেষ করে ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র ব্যাপারে একদম চুপ থেকেছে।'

'কী করত তারা?'

'অকুপেশনের সময় পুরো চিন জুড়ে ফ্যাক্টরি আর ল্যাবোরেটরি তৈরি করে জাপানিরা। তাদের ইচ্ছা ছিল বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার পরীক্ষা করা। আন্দাজ হিসাব থেকে জানা যায়, ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু এবং ওটার মত ইউনিটগুলো যত লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, তত হত্যা করতে পারেনি জার্মানির হিটলারও। হত্যা ক্যাম্পগুলো ছিল নির্বিকার ভাবে খুন করবার জন্য। বন্দিদের উপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা করত তারা। আজ পর্যন্ত যত ভাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগ ব্যবহার করা হয় মানুষগুলোর উপর। ভাইরাস ইঞ্জিনিয়ারিং করত তারা, মানুষের উপর প্রয়োগ করত বিউবোনিক প্লেগ, টাইফাস বা অ্যানথ্রাক্সের মত ভাইরাস। কয়েকবার ছেড়ে দেয়া হয় চিনের কয়েকটি শহরে। কখনও বিমান ব্যবহার করেছে তারা, আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে ভাইরাস। এ কাজে ব্যবহার করত রোগাক্রান্ত মাছি, বোমার ভিতরে বিশেষ কম্পার্টমেন্টে ভরে দিত ওগুলোকে। তাদের আরেকটা প্রিয় কৌশল ছিল স্থানীয় ওভারহেড টাঙ্কিগুলোর পানিতে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া। এর ফলে শহরকে শহর খতম হয়ে গেছে।'

'এবং এসব করে পারও পেয়ে গেছে?'

'মোটামুটি তাই বলা যায়। তাদের আরেকটা গবেষণা ছিল মানুষের দেহে নানারকম বিস্ফোরকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। গুলি করে মানুষ মারত তারা, উড়িয়ে দিত বোমা দিয়ে, কখনও একইসঙ্গে শতখানেক মানুষকে পুড়িয়ে মারত। যত রকমের

অত্যাচার ভেবে বের করা যায়, সব করেছে ওই ইউনিট। একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা শুনেছি বসের কাছে। ওরা বন্দিদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেখত কতক্ষণ পর মরে লোকটা।'

'বুড়ো কখনও আমাকে এসব বলেনি,' বলল সোহেল।

'বুড়ো ডিনারের দাওয়াত দিলে একটু একটু ছাড়ে। যা বলে অল্প কথায়।'

'তা হলে তোর ধারণা এটা ছিল ওই ধরনের কোনও ল্যাবোরেটরি?' চারপাশে একবার চাইল সোহেল।

'আর স্থানীয় ফিলিপিনোরা ছিল ল্যাবোরেটরির ইঁদুর।'

'একটা কথা ভাবছি।'

'ভাবছিস এই জায়গা কেন বেছে নিয়েছে কেসলার?'

'বিশেষ কারণ, যারা গবেষণা করল, গোল্ড অভ মার্সে তাদেরকে তুলে তাদেরই উপর ব্যবহার করেছে সেই টক্সিন। পুরনো এই জার্ম-ওয়ারফেয়ার ফ্যাক্টরি বেছে নিয়েছে ভাইরাস তৈরি করতে। এসব কাকতালীয় হতে পারে না। এমনও হতে পারে, জাপানী আর্মি কিছু ভাইরাস ফেলে গেছিল, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং করে তৈরি হয়েছে ওই টক্সিন। হতে পারে না?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'পারে। ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র কথা অনিল বলতেই মনে হয়েছে এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানে বসে তৈরি করেছে ভাইরাস।'

'তোর কি মনে হয়, বায়োহ্যাজার্ড সুট ছাড়া ঘোরা ঠিক হচ্ছে?'

'অসুবিধে নেই। গন্ধেই তো টের পাচ্ছিস, এই ঘর ওরা ডিজইনফেক্ট করেছে, আক্রান্ত হব না।'

'তারপরও কেমন যেন লেগে উঠছে।'

'ফারার ইয়োগা টেকনিক কাজে লাগা,' হাসল রানা। 'চোখ

দিয়ে বাতাস নেয়ার চেষ্টা কর্।'

টিটকারি গায়ে মাখল না সোহেল।

ফ্ল্যাশলাইট বের করেছে ওরা, দু'জন বিপরীত দিকে রওনা হয়ে গেল। ওয়্যারহাউসের প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখল। মেঝের উপর কিচ্ছু নেই। একটা ম্যাচের কাঠিও না। সব পরিষ্কার।

'কিছুই নেই,' বলল রানা।

'অত তাড়াতাড়ি করলে ভুল হবে, বৎস,' প্রশান্ত একটা ভঙ্গি নিল সোহেল। চেয়ে রয়েছে ওয়্যারহাউসের পিছন দেয়ালের দিকে। চলে গেল ওখানে, ন্যাংটো স্টিলের সাপোর্ট কলামগুলোর একটার উপর টোকা দিল। ফাঁপা নয়। এবার হাত রাখল কলামের পাশের দেয়ালে। উষ্ণ, তবে উত্তপ্ত নয়। এটা তেমন কোনও ব্যাপার নয় যে উৎসাহী হওয়া যায়। মাথার উপর সূর্য নেই এখন।

'দেয়াল ধরে কী ভাবছিস?' জানতে চাইল রানা। 'নীলার কথা?'

'ভাবছি রে, ভাবছি।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সোহেল। পা মেপে চলেছে। 'চুরানব্বুই... আটানব্বুই... এক শ', উল্টো দিকের দেয়ালের সামনে পৌঁছে গেছে। 'প্রতি পদক্ষেপে তিন ফুট, তা হলে আমরা পেলাম তিন শ' ফুট লম্বা একটা গুদাম।'

'বাহ্, তুই তো গুনতে পারিস!'

'তার চেয়ে বেশি পারি,' চোখ পাকালো সোহেল। 'বিশ্বাস হয় না তোর?'

রানার কনুই ধরে ওকে নিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে এল সোহেল। দেয়ালের পাশ দিয়ে চলেছে। প্রতি পা আবার

গুনতে শুরু করেছে। 'আটানব্বুই, নিরানব্বুই, এক শ', এক শ' এক...'

'তুই গুনতে ভুল করেছিস,' সোজা কথা জানিয়ে দিল রানা।

'দেয়ালের উপর হাত রেখে দেখ,' সোহেল জানে এবার টের পাবে বৎস।

টের পেল বটে, চমকে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল রানা। আগুনের মত গরম দেয়াল। রাহাত খানের ভঙ্গিতে কড়া চোখে চাইল বন্ধুর দিকে। 'আমার হাতে ফোস্কা ফেলার কারণ কী, প্রভু?'

'ভিতরের কলাম কিন্তু লোড বিয়ারিং না। ওপাশের ধাতু অনেক পাতলা।'

'তা-ই?' মগজ নড়াতে শুরু করেছে রানা।

'তুইও বুঝতি। আর্মি ট্রেইনিঙের কথা ভাবিসনি। মনে নেই, আমাদের শিখিয়েছে এসব কীভাবে গড়তে বা ভাঙতে হয়। ঠিক এই জায়গায় একটা ফলস দেয়াল আছে। ছয় ফুট চওড়া ফাঁকা জায়গা।'

'চল্ দেখি সত্যিই আছে কি না।'

আবার ওয়্যারহাউসের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। দম বন্ধ করা গরম। পকেট থেকে ফোল্ডিং নাইফ বের করল রানা, খোঁচা দিল দেয়ালের উপর। ফুটো হয়ে গেল কাগজের মত পাতলা ধাতু। এবার ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করল পাতটা। কেটে চলেছে, নামিয়ে দিল মেঝে পর্যন্ত। যে ফুটো তৈরি হয়েছে সেখানে ছুরি ভরে এবার বাম দিকে চিরে দিল মেঝের সমান্তরালে তিন ফুটের মত টিন, তারপর আবার টিন কেটে নামিয়ে আনল নীচে। দাঁত কিড়মিড় করবার মত আওয়াজ হলো।

'এই ছুরি এমার্সন সিকিউসি-৭এ,' দু' আঙুলে নিজের কলার

ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'প্রমাণ পেলি, এ দিয়ে লোহা কাটা যায়।'

দেয়ালের গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সোহেল। দুপাশে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল, তারপর দেখল...

'কিছুই তো নেই, রে! একদম ফাঁকা। পুরো ওয়্যারহাউসের মতই খালি।' মুখটা জিলাপির মত পেঁচিয়ে ফেলল সোহেল।

'তবু চল্, ঘুরে দেখি,' ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ওয়্যারহাউসের ফলস দেয়ালের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল দুই বন্ধু। অপ্রশস্ত জায়গা। সামনের দিকে, উপরে, নীচে আলো ফেলছে। টিনের দেয়ালের কারণে প্রচণ্ড গরম, যেন স্টিল মিলের ভিতর ঢুকেছে।

ছাতের দিকে টর্চ তাক করেছে সোহেল, এমন সময়ে মেঝের উপর আলো ফেলল রানা। কী যেন চোখে পড়েছে ওর। ওখানেই থমকে গেল, উবু হয়ে আরও ভালভাবে দেখতে চাইল। জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দেখল মেঝের কংক্রিট মসৃণ। বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

'কী পেলি?' রানার দিকে ফিরল সোহেল।

'এই কংক্রিট নতুন। পুরো মেঝে না, কেবল এই জায়গা।'

টর্চ ফেলে দেখল সোহেল। ঠিকই বলেছে রানা। দৈর্ঘ্যে জায়গাটা দশ ফুট মত। চওড়ায় ছয় ফুট। এ অংশের কংক্রিট অন্য অংশের তুলনায় অনেক মসৃণ। মনেই হয় না পুরনো।

'তোর কী মনে হয়?' জানতে চাইল রানা।

'নীচ তলায় যাবার সিঁড়ি ছিল। আকৃতিও মেলে।'

'আয় দেখি কী পাই।' ব্যাগ হাতড়ে সি-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করল রানা। দু'হাতে বোমা বানাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো। এটা ফাটালে নীচের দিকে ছুটবে বিস্ফোরকের প্রচণ্ড শক্তি। ওটার ভিতর গেঁথে দিল টাইমার

পেন্সিল। একবার প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল। তৈরি সোহেল। এবার ডেটোনেটর অ্যাকটিভেট করল রানা।

গোপন কক্ষ থেকে বেরোবার জন্য ছুট লাগাল ওরা। যেন উড়ে চলেছে, কেউ কাউকে হারাতে পারছে না দৌড়ে। ফোকর গলে বেরিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে দরজার দিকে ছুটল। গরমের ভিতর ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। দরজা দিয়ে পাশাপাশি বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। দু'সেকেণ্ড পর চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল। ছাত থেকে উড়ে গেল একটা স্কাইলাইট প্যানেল, বেশ দূরে গিয়ে পড়ল। ওয়্যারহাউসের ভিতর থেকে ঘন ধোঁয়ার মত বেরুতে লাগল কংক্রিটের ধুলো। ছাতের ফোকর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ধুলো। দেখে মনে হলো আগুন ধরে গেছে ওয়্যারহাউসে।

কংক্রিটের কণার মেঘ ধীরে ধীরে নামছে। পরস্পরের দিকে চাইল দুই বন্ধু। দু'জনই টের পেল, কেমন যেন অস্বস্তি চেপে ধরেছে ওদের। বার কয়েক জঙ্গলের দিকে চাইল। এবং একই সঙ্গে চোখে পড়ল সূর্যের আলোর প্রতিফলন। পার্কিং লটের মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ও সোহেল। তার ঠিক দু' সেকেণ্ড পর শোনা গেল দুটো রাইফেলের গর্জন। আধ সেকেণ্ড আগে মেঝেতে শুয়ে পড়েছে, তাই বেঁচে গেল ওরা। মাথার উপর দিয়ে গেল বুলেট। গাছের আড়াল থেকে গুলি শুরু করেছে দুই আততায়ী। সুইচ অটোমেটিকে সরিয়ে নিয়েছে। পার্কিং লটের যেখানে রানা ও সোহেল, সে জায়গা লক্ষ্য করে এল অন্তত তিরিশটি বুলেট।

মাত্র দুটো পিস্তল দিয়ে কিছুই করতে পারবে না রানা বা সোহেল। কোনও কাভারও খুঁজে নিতে পারেনি। আগামী কয়েক সেকেণ্ড পর লাশ হতে হবে। কোনও কথা হলো না দু'জনের

ভিতর, ছিটকে উঠে দাঁড়াল ওরা, তারপর ধনুকের ছিলা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীরের মত ছুটল ওয়্যারহাউস লক্ষ্য করে। নুড়ি পাথর ছিটকে উঠল ওদের পায়ের কাছে। বুলেট এসে মাথা খুঁড়ছে পার্কিং লটের মেঝেতে।

ওয়্যারহাউসে আগে ঢুকতে পারল সোহেল। পরক্ষণে রানা। ছুটল ওরা বিস্ফোরণের জায়গা লক্ষ করে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ওখানে ফাটিয়ে দিয়েছে মেঝে, কিন্তু নীচে নামার মত গর্ত তৈরি হয়নি। অত কম বিস্ফোরক কংক্রিটে গর্ত তৈরি করতে পারেনি। শুধু প্রচণ্ড খরায় ফেটে যাওয়া জমির মত অবস্থা হয়েছে। মেঝের উপর আলো ফেলে আঁকাবাঁকা ফাটলগুলো দেখল রানা। ওখানে এমন কোনও ফুটো নেই যেখান দিয়ে ভিতরে নামা যেতে পারে।

চট্ করে একবার সোহেলের দিকে চাইল রানা। ওরা জানে, আটকা পড়েছে ফাঁদে। ওয়্যারহাউসের দেয়াল ফুটো করল বেশ কয়েকটা বুলেট। দু'বন্ধু কখন যেন হাতে তুলে নিয়েছে পিস্তল। ওদের পিছন পিছন তেড়ে এসেছে আততায়ীরা। দরজার দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে। তিনবার কাভারিং শট নিল রানা। কেল-টেকের রেঞ্জের বাইরে রয়েছে ওরা, কাউকে গুলি লাগল না। লোকগুলো জানে নিরাপদে রয়েছে।

রানাকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠল সোহেল। নামার মুহূর্তে জোড়া পায়ে জোর এক লাথি মারল ফাটা মেঝেতে। বিস্ফোরণের ফলে এমনিতেই প্রচণ্ড চাপ পড়েছে কংক্রিটের উপর, এখন উঁচু থেকে লাফিয়ে নামা হয়েছে। আর অত্যাচার সহ্য করতে পারল না মেঝেটা, চার বর্গফুট এলাকার রড-সিমেন্ট ধসে পড়ল নীচে। সবকিছুর সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সোহেলও।

কংক্রিটের চাপড়া তখনও ফাটছে। সিঁড়ির নীচে গিয়ে পড়ছে

সব। একবার অন্ধকার ফোকরের দিকে চাইল রানা, তারপর অন্ধের মত লাফ দিল। নাকে এসে লাগল শীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় মিশে রয়েছে যেন মৃত্যুর গন্ধ।

চার

'উহ্!' কাতরে উঠল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার উর্বশী।

উর্বশীর ডান স্তন টিপে মুচড়ে ধরেছে ব্রাঙ্কো। পরক্ষণে স্তন ছেড়ে দিল, এক পা পিছিয়ে আরেকটা চড় কশিয়ে দিল গালে। তীব্র জ্বলুনি গালে, তবুও সোজা হয়ে বসতে চাইল উর্বশী। চেয়ারের সঙ্গে পা থেকে বুক পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। গায়ের শক্তির সিকি ভাগও খরচ করেনি ব্রাঙ্কো, তার পরেও উর্বশীর মনে হলো ছিঁড়ে গেছে ঘাড় ও চোয়ালের পেশি। গুঙিয়ে চলেছে। ফাটা ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালার সঙ্গে রক্ত।

একমিনিট আগেও বামহাতে ওর চুলের ঝুঁটি পেঁচিয়ে নিয়ে ডানহাতি চড় কশিয়েছে গালে।

এ নিয়ে তৃতীয়বার গায়ে হাত তুলল ব্রাঙ্কো। লোকটা এত শীঘ্রি অত্যাচার শুরু করবে, ভাবতে পারেনি উর্বশী। বেঁধে রেখেছে ওর চোখদুটো। বুঝবার উপায় নেই কখন কোনদিক থেকে হামলা আসবে। গরিলার শক্তি লোকটার হাতে। পাঁচ মিনিট আগে ঘরে ঢুকেছে। এখন পর্যন্ত একটা প্রশ্ন করেনি। শুধু

মেরে চলেছে।

চোখের উপর থেকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়া হলো ডাক্ট টেপ। সঙ্গে উঠে গেল ভুরুর চার ভাগের এক ভাগ রোম। উর্বশীর মনে হলো চোখের উপর জ্বলে উঠেছে আগুন। চোখে অ্যাসিড ঢেলে দিল? ভীষণ জ্বলছে! মুখ বুজে থাকতে চাইল, কিন্তু পারল না, গুঙিয়ে উঠল আবারও।

চারপাশে চাইল। চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেছে পানিতে। ঘরে প্রায় কিছুই নেই। দেয়ালগুলো কাঠের গুঁড়ির, মেঝে কংক্রিটের। একটা ড্রেন গেছে ওর পায়ের নীচ দিয়ে। পাশে রাখা বদনা। সঙ্গে লাগানো লম্বা হোসপাইপ। ওটা গেছে লোহার দরজার ওপাশে। এখন দরজা খোলা। চোখ পড়ল হলওয়েতে। পুরু কাঠের দেয়ালগুলো সাদা রং করা।

ওর সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রাঙ্কো, পরনে সুট। কোটের নীচে সাদা শার্ট। সর্বক্ষণ ঘেমে চলেছে লোকটা। শার্টে লেগেছে উর্বশীর লালা ও রক্ত। দু'পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রহরী, পরনে জাম্পসুট। লোকগুলোর চেহারা পাথুরে। একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ব্রাঙ্কো। কয়েক শিট কাগজ ওর হাতে দিল লোকটা। জবানবন্দি লেখা হবে।

'তোমার ভাইয়ের কথা অনুযায়ী,' শুরু করল ব্রাঙ্কো, 'তোমার নাম উর্বশী দাশা। তুমি ইন্দোনেশিয়ান নেভির লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ঠিক?'

'জাহান্নামে যাও,' নিচু স্বরে বলল উর্বশী। ফাটা ঠোঁটের কারণে জড়িয়ে গেল কথা।

ওর ঘাড়ের নার্ভগুলো খামচে ধরল ব্রাঙ্কো। ভয়ঙ্কর ব্যথা পেয়ে ছিটকে সরে যেতে চাইল উর্বশী। কিন্তু নড়তে পারল না

একচুল। নার্ভে প্রেশার দিয়ে চলেছে খুনি, আরও বাড়িয়ে দিল চাপ। দাঁতে দাঁত চেপে ফোঁপানি থামাতে চাইল উর্বশী।

'এসব তথ্য কি সত্য?'

'হ্যাঁ!'

ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, এবার বামহাতে চড় লাগাল গালে। কট-কট্ করে ফুটল ঘাড়ের হাড়।

'মিথ্যা বলেছ। তোমার সঙ্গে একটা ট্র্যান্সপণ্ডার ছিল। উরুর ভিতর। ...সাধারণ নেভি অফিসারের সঙ্গে এ জিনিস থাকে না।'

'আমার ভাইকে ফিরে পেতে সিকিউরিটি কোম্পানিকে হায়ার করি, তারা দিয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। স্বাভাবিক রাখতে চাইল চেহারা। কুঁচকে গেছে মুখ। 'ওরাই ট্র্যান্সপণ্ডার ইমপ্ল্যান্ট করে।'

চড়াৎ করে আবার জোরালো চড় পড়ল গালে। একটা দাঁত নড়ে গেছে, টের পেল উর্বশী।

'ভালই মিথ্যা বলছ। তবে ওই ক্ষত অন্তত একবছর আগের।'

সঠিক আন্দাজ করেছে ব্রাঙ্কো। দুনিয়া জুড়ে স্বর্ণ-বিপর্যয় হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তার কিছুদিন আগেই উরুর ভিতর ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করা হয় ওই ট্র্যান্সপণ্ডার।

'শপথ করে বলতে পারি...' বলল উর্বশী। 'আমি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠি।'

উর্বশীর মুখ থেকে এক ইঞ্চি দূরে থামল ব্রাঙ্কোর নাক। 'সারাজীবনে অনেক ক্ষত তৈরি করেছি, যে-কোনও অভিজ্ঞ সার্জনের চেয়ে অনেক... অনেক বেশি। কত দ্রুত সুস্থ হয় দেহ আমার জানা আছে। ওই ইমপ্ল্যান্ট হয় কমপক্ষে ছ'মাস আগে। এবার বলো তুমি কে, এবং কী করো। তোমার কাছে ট্র্যান্সপণ্ডার

কী কারণে?'

মাথা পিছনে নিল উর্বশী, যেন ভয় পেয়েছে। পরক্ষণে জবাব দিল দ্রুত কপাল ঠুকে। ওর কপালের হাড় নেমে এল ব্রাঙ্কোর খাড়া নাকের উপর। ভাঙতে পারত নাকের হাড়, কিন্তু তত জোরে মারতে পারেনি, চেয়ার আটকে রেখেছে উর্বশীকে। আধবোজা চোখে দেখতে পেল লোকটার নাকের দুই ফুটো দিয়ে ঝরঝর করে ঝরছে রক্ত। ডানহাতে রক্ত মুছতে চাইল ব্রাঙ্কো।

জান্তব ক্রোধ নিয়ে মেয়েটির দিকে চাইল দৈত্য। দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করেছে। এবার ওকে প্রচণ্ড মারপিট করবে, বুঝতে পারছে উর্বশী। তবে সেজন্য কোনও পরোয়া নেই। হিম চোখে চাইল ব্রাঙ্কো, রক্তে মাখামাখি নাক-মুখ। এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে, ভাবল উর্বশী।

ঘুসিগুলো এল শিলাবৃষ্টির মত, কোনও নিয়ম ছাড়াই। কোথায় গিয়ে ঘুসি পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই সার্ব খুনির। যেন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে। আদিম মানুষ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ত হিংস্র জানোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। ঘুসি নামছে উর্বশীর মুখ-কাঁধ-বুক-পেট-তলপেটে। যেন থামবে না লোকটা। তারই ফাঁকে লাথি পড়ছে উরুর উপর। ব্রাঙ্কো এত দ্রুত নড়ছে যে পরিষ্কার দেখতে পেল না ওকে উর্বশী। বারবার মন বলল, একজন লোক মারছে না ওকে, পিটিয়ে চলেছে কয়েকজন মিলে। প্রচণ্ড ব্যথায় উল্টে গেল দুই চোখের মণি। বুঝে ফেলেছে, ওকে খুন করছে ব্রাঙ্কো। বারবার ঝাঁকি লাগছে দেহে, তবে নির্দিষ্ট কোনও ব্যথা নেই।

দেড় মিনিট পর চেয়ারে এলিয়ে পড়ে রইল উর্বশী। ফোলা বেলুনের মত হয়ে উঠেছে চেহারা। দুই গাল, ও ঠোঁট থেকে ঝরছে রক্ত। প্রহরীদের একজন সরিয়ে নিয়েছে কসাই

ব্রাঙ্কোকে। হাতের কাজে বাধা পড়ায় খুনির চোখে লোকটার দিকে চাইল সে।

সার্বের কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল প্রহরী। বাধা পড়ায় এরইমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ব্রাঙ্কোর মাথা। সামলে নিয়েছে নিজেকে। শীতল চোখে অচেতন মেয়েটির দিকে চাইল। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে ব্রাঙ্কো, শিরা হতে বিদায় নিচ্ছে অ্যাড্রেনালিন। দুই কব্জির হাড় মটমট করে ফোটাল, দু'জনের মিশ্রিত রক্ত ঝরছে মেঝের উপর। উর্বশীর ডান চোখের পাতা খুলে পরীক্ষা করল। ওখানে শুধু সাদা অংশ।

পালা করে দুই প্রহরীর দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। 'এক ঘণ্টা পর এসে দেখবে জ্ঞান ফিরেছে কি না। এর পরের বার যদি ভাঙতে না পারি, কোরিন্থ থেকে ওর ভাইকে নিয়ে আসব। ভাইকে পেটালে দেখব কী করে। আমাদের জানতেই হবে এরা কতটা কী জানে!'

গট-গট করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রাঙ্কো। কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই প্রহরী, তারপর পিছু নিল। দরজার কাছে থেমে হোসপাইপ টান দিয়ে খুলে ফেলল। ওটা ঘরের ভিতর ফেলে বন্ধ করে দিল দরজা। মেয়েটির দিকে দ্বিতীয়বার তাকায়নি। তাকালে অন্য কিছু দেখত।

প্রায় বুজে আসা চোখে তাদের চলে যেতে দেখছে উর্বশী। তবে প্রহরীদের পিঠ এদিকে ফিরতেই নড়ে উঠেছে নিজেও। ওই প্রচণ্ড মার খাওয়ার সময় ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চেয়ারটা সামনে-পিছনে সরিয়েছে ও, নিজেও নড়েছে। এর ফলে বেশ ঢিল হয়েছে বাঁধন। এদিকে খেয়াল ছিল না ক্রোধান্ধ ব্রাঙ্কোর। প্রহরীরা ধারণা করেছিল মেয়েটি ঝাঁকি খেয়েছে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে। তবে প্রতিটা কাজ ঠাণ্ডা মাথায় করেছে উর্বশী।

গার্ডরা বেরিয়ে যাবার আগেই চট্ করে উবু হয়ে তুলে নিয়েছে উর্বশী ব্রাঙ্কোর ফেলে যাওয়া কয়েকটা কাগজ। নাকের উপর কপালের আঘাত লাগতেই ব্রাঙ্কোর হাত থেকে পড়ে গেছিল ওগুলো। কাগজগুলো মুচড়ে একটা বলের মত তৈরি করল সে। এবার ধাতব চেয়ারটা সামান্য উঁচু করে তুলে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা শুরু করল উর্বশী। প্রতি পদক্ষেপে দু'তিন ইঞ্চি এগুতে পারল। একবার মাত্র সুযোগ পাবে। আবার যদি পিটাতে আসে ব্রাঙ্কো, বাঁচবে হয়তো, কিন্তু অমলকে রক্ষা করতে গিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে বহু কথা। তার ফল ভাল হবে না।

নিখুঁত হলো উর্বশীর লক্ষ্যভেদ। বন্ধ-প্রায় দরজা ও লকের মাঝখানে পড়ল গোল পাকানো কাগজের বল। ঠিক তখনই দরজা বন্ধ করল প্রহরী। কিন্তু চৌকাঠে আটকাল না লক, কাগজের বলের কারণে খুলে রইল বোল্ট। আস্তে করে চেয়ার সহ বসে পড়ল উর্বশী। আগে কখনও এমন হিংস্র মারের মুখে পড়েনি। দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে আমেরিকানরাও এভাবে অত্যাচার করতে পারেনি। ওরা পেটালে অন্তত একঘণ্টা বিশ্রাম নিত। তারপর আবার ফিরত ইন্টারোগেশন করতে। জিভ দিয়ে মুখের ভিতর অনুভব করতে চাইল উর্বশী। নড়ছে দুটো দাঁত। কপাল ভাল যে ভেঙে যায়নি নাকের হাড়। যে-কোনও তীব্র আঘাতে বিকল হতে পারত হৃৎপিণ্ড, কিডনি বা পাকস্থলী। ওগুলো কাজ করছে ঠিকই।

উরুর ভিতর যেখানে বাইয়োইলেকট্রিক ট্র্যান্সপণ্ডার ছিল, সেখানে চাপা ব্যথা। সে-তুলনায় অনেক গুণ বেশি ব্যথা সারা শরীরে। বুকের পেশিগুলো স্তনসহ ছেঁচে গেছে, এখন বেগুনি হয়ে উঠছে চামড়া। মুখের অবস্থা কী হতে পারে, কল্পনা করার সাহস পাচ্ছে না।

কখনও অত সুন্দরী ছিলাম না, নিজেকে সান্ত্বনা দিল উর্বশী। খচ্ করে লাগল হৃদয়ে। রানার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেছে ও। আর কখনও ওই মায়াবী চোখদুটো ওর দিকে ওভাবে চাইবে? তিক্ত হাসল উর্বশী। ফাটা ঠোঁটের কারণে বেড়ে গেল ব্যথা। নিজেকে দশ মিনিট সময় দেবে, ঠিক করল। এরই ভিতর সামলে নিতে হবে। আর দেরি করলে আড়ষ্ট হয়ে উঠবে মাংসপেশিগুলো। শেষে নড়তেই পারবে না। সারাশরীরে ঝনঝনে ব্যথা, তবু ভাল—সামনে মুক্তির আলো। ভাল হয়েছে লোকটা এখানে আনেনি অমলকে। ওর ভাই কোথায় আছে কে জানে। আবার সেই গ্রিসে? রেসপন্সিভিস্টদের খপ্পরে, তারপরও বোধহয় খানিক নিরাপদ। মনকে সান্ত্বনা দিল উর্বশী, শেষ হয়নি সব আশা।

ওর হিসাব অনুযায়ী পেরিয়ে গেছে ছয় মিনিট। এবার দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা শুরু করল উর্বশী। মোচড়ামুচড়ি করে একটু পরেই বাঁধন থেকে বের করে আনতে পারল দু'হাত। এবার খুলছে বুকে বেঁধে রাখা দড়ির গিঁঠ। শেষে বাঁধন খুলল দুই পায়ের। উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরে রইল চেয়ার, নইলে পড়ে যাবে হুমড়ি খেয়ে। ধীরে ধীরে বিড়বিড় করে বলল, 'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' চেয়ার ছেড়ে নড়ল না। চোখের সামনে সব ঝাপসা লাগছে, ঘুরছে মাথাটা। কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার হলো দৃষ্টি।

মন্থর পায়ে দরজার কাছে চলে গেল উর্বশী, নিঃশব্দে খুলল ভারী কবাট। সামনের হলওয়ে ফাঁকা। কেউ নেই। কংক্রিটের ছাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লুরোসেন্ট ফিক্সচার। দূরে দূরে জ্বলছে নগ্ন আলো। মাঝের অংশে আলো অনেক কম। দু'পাশে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি দেয়াল, কালো ছায়া পড়ছে। নতুন দেয়াল, তবে অযত্নে তৈরি। এবড়োখেবড়ো মনে হলো। দরজার বাইরে পা

রাখল ও।

লকে আবার কাগজের বল গুঁজে দিল উর্বশী। আর বন্ধ হবে না দরজা। একবার চারপাশ দেখে নিল। কুঁজো হয়ে গেছে। বুক-পেটের ব্যথা ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। সামনের হলওয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল। আগেই দেখে নিয়েছে, রক্তের ফোঁটা রেখে এগুচ্ছে না।

প্রথম ইন্টারসেকশনে এসে বামে অস্পষ্ট গলার আওয়াজ শুনতে পেল। কাজেই এগুতে শুরু করল ডানদিকে। একটু পর পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে পিছনে। সামনে একের পর এক দরজা পড়ছে। ঠাণ্ডা ধাতব দরজাগুলোর উপর কান রাখছে, তারপর আবার এগোচ্ছে। এখন পর্যন্ত কারও কণ্ঠ শুনতে পায়নি।

করিডোরে কোনও জানালা নেই। আবহাওয়া ভেজা। এ থেকে মন বলছে, এটা কোনও ভূগর্ভস্থ সেটলমেণ্ট। হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। সব আন্দাজের উপর নির্ভর করে ভাবছে।

আরও দু'বার বাঁক নিল উর্বশী। এই গোলকধাঁধার ভিতর যেন আর কোনও রং নেই, শুধুই ধূসর ও সাদা। সামনে আরেকটা দরজা পড়ল। ওপাশ থেকে আসছে মেশিনারির আওয়াজ। হ্যাণ্ডেল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। সামান্য ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিল উর্বশী। কয়েক গুণ বেড়ে গেল আওয়াজ। ঘরে কোনও আলো নেই। অর্থাৎ, অন্য কেউ নেই। চট্ করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল উর্বশী, পিছনে বন্ধ করে দিল কবাট। নিকষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন লাগছে। দরজার পাশের দেয়াল হাতড়ে সুইচ পেয়ে টিপে দিল।

জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো, ধাঁধিয়ে দিল চোখ। সামনে গুহার মত একটা ঘর। যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার খানিক সামনের মেঝে দু'ফুট নীচ থেকে শুরু হয়েছে। এটা ফ্যাসিলিটির পাওয়ারহাউস, কন্ট্রোল রুম। পুরু কাঁচের ওপাশে মেঝের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো চারটে জেট ইঞ্জিন। সেগুলোর ভিতর ঢুকেছে এক দঙ্গল ফিউয়েল লাইন আর এক্সযস্ট ডাক্ট। ডাক্টগুলোর সঙ্গে জোড়া রয়েছে একটা করে ইলেকট্রিকাল জেনারেটার। প্রতিটি ইউনিট একেকটা লোকোমোটিভের চেয়েও বড়। আপাতত চলছে মাত্র একটা টারবাইন। এপাশের ঘর থেকেও স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে কী পরিমাণ শক্তি নিয়ে চলছে জেট ইঞ্জিন।

ফ্যাসিলিটির পাওয়ারহাউস সত্যিই প্রকাণ্ড, ভাবল উর্বশী। ওর অভিজ্ঞ চোখ আরেকবার চাইল ঘরের চারপাশ। যে শক্তি তৈরি হচ্ছে, তাতে মনে হয় কয়েক হাজার লোককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অথবা, অন্য কোনও কাজে ব্যবহার হয় ওই শক্তি।

দরজা খুলে আবারও হলওয়েতে বেরিয়ে এল উর্বশী।

করিডোরে কোনও ক্যামেরা চোখে পড়ছে না। পাহারা দেয়ার জন্য কোনও গার্ড নেই। অর্থাৎ, ব্রাঙ্কো এখানে নিজেদের নিরাপদ মনে করে। তথ্যগুলো মনের ভিতর গেঁথে নিল উর্বশী। এবার এই পাতালপুরী থেকে বেরুতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর এক দরজার সামনে পৌঁছে গেল। ওটার উপর লেখা: সিঁড়ি। দরজা খুলে ফেলল উর্বশী, তবে হতাশ হতে হলো। সিঁড়ি বটে, তবে নীচের দিকে যাওয়ার!

'হতাশ হোয়ো না,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল উর্বশী, পিছনে দরজা বন্ধ করে নামতে শুরু করল। চলেছে ফ্যাসিলিটির আরও গভীরে।

স্টিলের সিঁড়িগুলো বারবার বাঁক নিয়ে নেমেছে। একের পর এক ধাপ ডিঙিয়ে চারতলা নীচে থামল সিঁড়ি। কম ওয়াটের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। প্রায়ান্ধকার ল্যাণ্ডিং। সামনের করিডোর অন্ধকার। খানিক যাওয়ার পর সামনে পড়ল একটা দরজা। তার ওপাশে মাঝাসমান উঁচু গোল একটা গুহা। উপরতলায় কাঠের গুঁড়ির তৈরি দেয়াল ছিল, এখানে শুধু পাথরের। কালো পাথুরে দেয়ালে খননের দাগ। কোথাও কোনও আলো নেই। কতদূর গেছে এই সুড়ঙ্গ? ছাতের সঙ্গে আঁটা সিরামিক ইনসুলেটারের সঙ্গে বাঁধা তামার পুরু তার। সংখ্যায় এক শ'র বেশি হবে। ওর ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা বলল, উপরের জেনারেটরগুলোর প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ সহজে তারগুলোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা সম্ভব। কিন্তু কোন্ কাজে ব্যবহার হচ্ছে এসব?

'তুমি ঠিক কী করতে চাইছ, ব্রাঙ্কো?' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। মন থেকে কোনও জবাব পেল না।

তারগুলো অনুসরণ করবে কি না, ভাবতে চাইল উর্বশী। সেটা অন্ধের মত এগুনো হবে। বদ্ধ বাতাস যেন ওকে জানিয়ে দিল, সামনে বেরুবার রাস্তা নেই। আরেকটা কথা, ও রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট নীচে। এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ থাকবার কথা নয়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল উর্বশী। প্রতিবাদ করছে সারাশরীর। পা ফেলতে গিয়ে বাড়ছে পেশিগুলোর ব্যথা। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। হাঁপিয়ে উঠছে। আঁকড়ে আসছে বুক। পাঁজরের হাড় হয়তো ভাঙেনি, তবে ক'টায় চিড় ধরেছে কে জানে।

উপরতলার মেঝেতে আবার যখন পৌঁছল, ততক্ষণে বুক জুড়ে দম আটকানো ব্যথা।

দরজার উপর কান পাতল উর্বশী। ও পাশ থেকে শুনতে পেল অস্পষ্ট আওয়াজ। কারা যেন কথা বলে চলেছে। একজন আরেকজনকে বলল, '...আর মাত্র দুই দিন পর পার্লা মোনার..., কাজেই আমাদের এবার...' চলে গেল লোকগুলো। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল উর্বশী, তারপর সাবধানে খুলল দরজা। হলওয়ে আবারও ফাঁকা। মিলিয়ে গেছে লোকগুলোর পদধ্বনি।

নিঃশব্দে এগুতে লাগল উর্বশী। নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। দীর্ঘ এক হলওয়ের মাঝখানে পৌঁছে গেল। ঠিক তখন সামনে থেকে এল লোকজনের আওয়াজ। দ্রুত এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে আসছে। ব্রাঙ্কো বা তার প্রহরী? চমকে গেল উর্বশী। বন্দিশালা চেক করে ফিরছে? বোধহয় তা নয়। বড়জোর তিরিশ মিনিট হয়েছে ও বেরিয়েছে ওখান থেকে। এখন কারও সামনে ধরা পড়লে? শরীরের এই অবস্থায় দৌড়াতেও পারবে না! একমাত্র উপায় এখন, করিডোরের কোনও দরজা দিয়ে ঢুকে পড়া।

পাশেই ধাতব এক দরজা। নব ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল উর্বশী, তবে পুরো বন্ধ করল না দরজা। কবাটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। দ্রুত এল পদধ্বনি। লোকগুলো পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথমবারের মত অন্ধকার ঘরে চোখ বোলাল উর্বশী। একটা টেবিলে জ্বলছে ডিম করা ল্যাম্প। সে আলোয় দেখা গেল দু'পাশের দেয়ালে তিনটে করে ছয়টি কট। ওগুলোর মালিক ক'জন ঘুমে কাদা। দু'জন জোরে নাক ডেকে চলেছে। তবে ছ'জনের মধ্যে একজনের হালকা হয়ে এসেছে ঘুম। হঠাৎ বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে, তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল। আবছা আঁধারে চেয়ে জানতে চাইল, 'ক্যাথি?' মিষ্টি কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' চাপা স্বরে বলল উর্বশী। 'ঘুমিয়ে পড়ো।'

কটে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুমিয়ে পড়ল আবার। স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শ্বাস।

চেপে রাখা দম ফেলল উর্বশী, ধড়ফড় করছে বুক। কয়েক মুহূর্ত ওখানে চুপ করে রইল, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ডরমেটরি থেকে। পিছনে আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজা।

প্রায় একঘণ্টা গোলকধাঁধার ভিতর ঘুরপাক খেল উর্বশী, তারপর সামনে পেল সিঁড়ি। উপরদিকে উঠে গেছে ধাপগুলো। যা ভেবেছে তা-ই, ও রয়েছে মাটির নীচে কোনও সেটলমেন্টে। এটা কোনও ধরনের বেস। প্রতিটি ঘর যে আকৃতির, তাতে আন্দাজ করা যায়, এ ফ্যাসিলিটির আয়তন কমপক্ষে এক লাখ বর্গফুট বা তারও বেশি। এখানে মাটির নীচে কেন এটা তৈরি করা হয়েছে, কে জানে।

উপরে উঠে এল উর্বশী, তারপর সামনে পড়ল একটা দরজা। ধাতব কবাটে কান পাতল। ওপাশ থেকে আসছে সামান্য আওয়াজ। কিন্তু কীসের, বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে দরজা খুলল উর্বশী, সামান্য ফাঁক করে ওদিকে চাইল। যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো সামনে ওটা কোনও গ্যারাজ। বিশ থেকে পঁচিশ ফুট উপরে ধাতব ছাত। একটা র‍্যাম্প চলে গেছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইজের দরজার দিকে। পাথুরে দেয়ালের মাঝে পুরু স্টিলের ব্লাস্ট দরজা। আপাতত বন্ধ। দেখলে মনে হয় এ জিনিস ঠেকিয়ে দেবে নিউক্লিয়ার বোমাকে। গ্যারাজে কোথায় যেন বেজে চলেছে রেডিও। বাজনা শুনে মনে হলো ব্যাগের ভিতর ঢোকানো হয়েছে দুই হুলোবেড়াল, প্রাণপণে ঝগড়া করছে ওরা। নামকরা কোনও নতুন ব্যাণ্ড বোধহয়।

প্রকাণ্ড ঘরে কাউকে চোখে পড়ছে না। প্রায় পিছলে বেরিয়ে এল উর্বশী। একটু দূরে কাঠের ওঅর্কবেঞ্চ, ওটার আড়াল নিল।

পরক্ষণে চমকে উঠল। ইলেকট্রনিক লক মেকানিজম বন্ধ করে দিয়েছে দরজাটা। সম্ভবত, পাম রিডার আর নিউমেরিক কি-প্যাড ধরে ফেলেছে ট্রেসপাস। চাইলেও ও এখন ওপথে ফিরতে পারবে না। আর ফিরেই বা কী হবে? ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো পিটিয়ে মেরে ফেলবে ওকে ব্রাঙ্কো।

গ্যারাজের ভিতর কম ওয়াটের আলো জ্বলছে। তবে দূর দেয়ালের কাছে উজ্জ্বল বাতি আছে। ওখানে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ পিকআপের উপর ঝুঁকে কাজ করছে দুই মেকানিক। এখান থেকে মনে হলো একজন রেডিয়েটর বদল করছে। দ্বিতীয়জন গাড়ির নাকের কাছে ওয়েল্ডিঙের কাজে ব্যস্ত —পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, হু-হু করে বেরিয়ে আসছে অক্সিঅ্যাসেটিলেন টর্চের নীল আভা। বাতাসে ধাতু পোড়ার কড়া গন্ধ। গ্যারাজে কয়েক ধরনের গাড়ি পার্ক করা। তার মধ্যে রয়েছে দুটো ট্রাক ও কয়েকটা ফোর হুইলার। ওই জিনিসের মত একটা নিয়ে রেসপন্সিভিস্টদের গ্রিস আস্তানা থেকে মার্ভেলে পৌঁছায় রানা।

উর্বশীর মন বলছে, খরচ হয়ে চলেছে সময়, এখুনি কিছু করা উচিত। একবার ভাবল, খুব ভাল হতো সঙ্গে রানা থাকলে। সত্যিই অদ্ভুত মানুষ রানা, একপলকে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলে। ওই একই পরিকল্পনা দাঁড় করাতে ওর হয়তো লাগবে অনেকক্ষণ।

বোধহয় কিছুক্ষণের ভিতর ইন্টারোগেশন চেম্বারে ফিরবে ব্রাঙ্কো। তার মানে সবাই জানবে বন্দিনী পালিয়েছে। খুঁজতে শুরু করবে তারা। যেমন করে হোক তার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে।

একবার গ্যারাজের দরজা দেখে নিয়ে সাবধানে এগুতে শুরু

করল উর্বশী। একটা রেঞ্চ তুলে নিল ওঅর্কবেঞ্চ থেকে, আড়াল আবডাল নিয়ে চলেছে পিকাপটার দিকে। আগেই খেয়াল করেছে, বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোনও পথ নেই। বেরুতে হবে গ্যারাজের ওই দরজা দিয়েই। তবে আগে খুলতে তো হবে ওটা। রেডিওর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠবে ধাতব আওয়াজ। কাজেই একমাত্র উপায় এখন...

শক্তি দিয়ে হার মানাতে হবে দুই মেকানিককে!.

যে রেঞ্চ সঙ্গে নিয়েছে, ওটা দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে পনেরো ইঞ্চি। ওজন হবে আট পাউণ্ড। এমন ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে, মনে হবে স্ক্যালপেল তুলে নিয়েছে দক্ষ সার্জন। বারো বছর বয়সে বাবার পেট্রল স্টেশনে একবার হামলা করেছিল দুই ছিনতাইকারী। সেবারই জীবনে প্রথমবারের মত লড়তে হয়েছিল উর্বশীকে। ওদের কাছে ছোরা ছিল। কিন্তু রেঞ্চ হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল ও। নয়টা দাঁত খসিয়ে দিয়েছিল এক শয়তানের। অন্যজন ঝেড়ে দৌড়। পুলিশ এসে দেখল দাঁতগুলোর পাশে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে ছিনতাইকারী। পুলিশবাহিনী থেকে উর্বশীকে একটা সোনার মেডেল দেয়া হয়—অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই সবুজ রং ধরে সে সোনায়। যা-ই হোক, সেসময় যে রেঞ্চ হাতে ছিল, ঠিক তেমনই একটা এখন ওর হাতে।

গ্যারাজের ভিতর নিঃশব্দে চলেছে উর্বশী। বারবার কাভার নিচ্ছে, তারপর আবার সামনে বাড়ছে। খুব সাবধান। মানুষের পেরিফেরাল ভিশন সব সময় কোনাকুনি ভাবে অনেক দূর দেখে। নড়াচড়া চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ। তবে পা ফেলার শব্দ নিয়ে ভয় নেই, সব আওয়াজ ঢেকে দিয়েছে ব্যাণ্ড মিউজিক।

এক মেকানিকের মুখ ঢাকা গাঢ় রঙের ওয়েল্ডার শিল্ডে। কাজেই দ্বিতীয় মেকানিকের উপর মনোযোগ দিল উর্বশী। চিকন

লোক, তবে তাল গাছের মত লম্বা। গালে চাপ দাড়ি। বয়স হবে পঁচিশের মত। চুলে লেগেছে গ্রিজ। ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে হোসপাইপ ঠিক করছে। এ লোক টের পেল না পাশে কেউ পৌঁছে গেছে। মাপা হাতে পাশ থেকে রেঞ্চ চালাল উর্বশী।

মাথার পাশে আঘাত লাগায় বিনা বাক্যব্যয়ে জ্ঞান হারাল লম্বু, হুমড়ি খেয়ে ইঞ্জিনের উপর পড়ল লোকটা। ওখানেই রইল। মাথার উপর তৈরি হয়েছে ডিম। আগামী অন্তত এক সপ্তাহ থাকবে ওটা।

ঘুরে দাঁড়াল উর্বশী। কী কারণে যেন সচেতন হয়ে উঠেছে ওয়েল্ডার। মাত্র সোজা হতে শুরু করেছে সে। একহাতে খুলতে শুরু করেছে মুখোশ। কিন্তু তৈরি উর্বশী, দু'পা সামনে বাড়ল, পরক্ষণে ডানদিক থেকে ঘোরাল রেঞ্চ। ঠিক সময়ে ছেড়ে দিল অস্ত্র। ওটা উড়তে শুরু করে লাগল গিয়ে প্লাস্টিকের ভাইযরে। প্লাস্টিকের ওই মুখোশটাই বাঁচিয়ে দিল লোকটার চেহারা, নইলে নাক-মুখ বলতে কিছু থাকত না। তবে রেঞ্চের গতি বেগ লোকটাকে ছিটকে ফেলে দিল পাশের রোলিং টুলবক্সের ভিতর। তার আগেই সে অজ্ঞান। দীর্ঘ রাবার লাইন নিয়ে উর্বশীর পায়ের কাছে পড়ল ব্লো-টর্চ। নীল আগুন হিসহিস করে বেরুচ্ছে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল উর্বশী। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ছ্যাঁকা লাগল খোলা পায়ে, তাতেই চামড়া পোড়া গন্ধ ছুটল।

তৃতীয় একজন ছিল পিকআপ ট্রাকের ওপাশে, হঠাৎ বাম্পার ঘুরে বেরিয়ে এল সে। অদ্ভুত আওয়াজ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। অজ্ঞান ওয়েল্ডারের দিকে হাঁ করে চাইল সে। চোখ আটকে গেছে টুলবক্সের উপর।

ততক্ষণে লাফিয়ে সামনে বেড়েছে উর্বশী।

লোকটা বুঝতে দেরি করছে। প্রথমে বিহ্বলতা দেখা দিল চোখে, এরপর হঠাৎই বুঝল। চট্ করে রেগে উঠল। তবে পাল্টা আক্রমণের ভাবনা এখনও তৈরি হয়নি মনে। খপ করে ব্লো-টর্চ তুলে নিল উর্বশী, সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে জ্বলছে ওটা। লোকটাকে লক্ষ্য করে ডানদিক থেকে জিনিসটা ছুঁড়ল উর্বশী। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাল মেকানিক, খপ করে ধরতে চাইল ছুটে আসা জিনিস।

ব্লো-টর্চের শিখা জ্বলছে ছ'হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায়। মুহূর্তে দেহ পুড়িয়ে দেবে ওই ভয়ানক নীল আগুন। ব্লো-টর্চ খপ করে ধরল লোকটা, কিন্তু আগুনের শিখা তাক হয়েছে ঠিক বুকের উপর। মুহূর্তে ওভারঅলের বুকে তৈরি হলো ধোঁয়া ওঠা গর্ত, পরক্ষণে বাষ্প হয়ে গেল চামড়া ও পেশি। দেখা দিল সাদা পাঁজরের খাঁচা। এখনও পুড়ছে। এক সেকেণ্ডে কালো হয়ে গেল সাদা হাড়। লোকটার চোখে রইল শুধু অবাক চাহনি। হাত থেকে পড়ে গেল তামার টর্চ।

তিন সেকেণ্ড পর মস্তিষ্ক বুঝল আর চলছে না হৃৎপিণ্ড। অলস ভঙ্গিতে কাত হয়ে মেঝের উপর পড়ল লাশ। মাংস-পোড়া গন্ধে বমি এল উর্বশীর। নিরীহ মেকানিককে খুন করতে চায়নি, তবে নিজেই নিজের মৃত্যু ঢেকে এনেছে সে। ভাইয়ের কথা মনে পড়ল উর্বশীর। ওকে উদ্ধার করতে হবে। নিজেকেও। আর এই কাজে বাধা হয়েছে ওই তিনজন।

টুলবক্সের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়া মেকানিক লম্বায় উর্বশীর সমানই হবে। তার কভারল খুলে নিল ও। তবে লোকটার জুতো অস্বাভাবিক বড়। তৃতীয় মেকানিকের বুট উর্বশীর পায়ে লাগতে পারে। বিকট গন্ধ সহ্য করে বুট খুলতে শুরু করল, লোকটার বুকের দিকে তাকাচ্ছে না।

বুট পরে নেয়ার পর ওয়্যার-কাটার নিয়ে চলে গেল দুই ট্রাকের কাছে। একে একে হুড খুলল উর্বশী, পটাপট কেটে দিল ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপের তার। ওগুলো কালো শুঁড়ের মত পড়ে রইল মেঝের উপর। এবার চলেছে ওয়াড বাইকের দিকে, এমন সময় চোখে পড়ল ওঅর্কবেঞ্চের পাশে এক কফি মেশিন। ফিল্টার, মগ, প্লাস্টিক কন্টেইনারে ক্রিমার পাউডারের পাশেই পাওয়া গেল এক কৌটো চিনি। ওটা নিল উর্বশী, দেরি না করে চলে গেল কাওয়াসাকির পাশে, ফিউল ক্যাপ খুলে ট্যাঙ্কে ঢেলে দিল চিনি। এবার বড়জোর সিকি মাইল এগুতে পারবে এ বাহন। ফিউল লাইন আর সিলিণ্ডার পরিষ্কার করতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা।

একমিনিট পেরুনোর আগেই অবশিষ্ট অপর কাওয়াসাকিতে সওয়ার হলো উর্বশী, ইঞ্জিন চালু করে রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ টিপল। ধীরে ধীরে খুলে গেল গ্যারাজের প্রশস্ত দরজা। বাইরে রাত এখন। বয়ে চলেছে তুমুল ঝড়। চমকে উঠছে বিদ্যুৎ-শিখা। গ্যারাজের ভিতর এসে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট। চমৎকার পরিবেশ, এর বেশি কিছু চায়নি উর্বশী। দরজা খোলা থাকুক, অসুবিধা নেই। ব্রাঙ্কো বুঝে নেবে ও বেরিয়ে গেছে।

কাওয়াসাকি নিয়ে গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে এল উর্বশী। বৃষ্টির ছাঁট প্রায় বুজিয়ে দিতে চাইল দুই চোখ। থ্রটল মুচড়ে দ্রুত গতি তুলে রওনা হয়ে গেল ডানদিকের রাস্তা ধরে। কোথায় চলেছে, জানে না।

পাঁচ

দক্ষ পাঁচ কমাণ্ডোকে ফিলিপিন্সের রেসপন্সিভিস্ট ফ্যাসিলিটির উপর চোখ রাখার জন্য রেখে গেছে ব্রাঙ্কো। কেউ যদি ঘুরে ফিরে দেখতে চায়, তাদের বাধা দেবে না ওরা। তবে কেউ যদি ওটার নীচের ভূগর্ভস্থ টানেলে ঢোকে, সেক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হবে। কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে তারা এই সাইট পাহারা দিয়ে চলেছে। একবার দুই ফিলিপিনি আসে তাদের পুরনো মোটরসাইকেল নিয়ে। কয়েক মিনিট ছিল। সব ঘুরে দেখে বুঝেছে লুঠ করবার মত কিছুই নেই। এরপর নীল ধোঁয়া ছেড়ে মোটরসাইকেল নিয়ে উধাও হয়েছে।

তবে আজ যে দু'জন এল, এদের আচরণ খুবই সন্দেহজনক। সতর্ক হয়ে উঠেছে রেসপন্সিভিস্টদের পাঁচ কমাণ্ডো। এরপর যখন মাঠ পেরিয়ে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ, বুঝতে দেরি হলো না এদের মত লোকদের জন্যই রাখা হয়েছে ওদের পাহারাদারিতে।

সোহেল সিমেন্টের চাপড়ার সঙ্গে নীচে হারিয়ে যেতেই লাফিয়ে পড়েছে রানা নিজেও। দু'সেকেণ্ড পর ধাপের উপর পড়ল ওর ডান পা, পড়তে গিয়েও সামলে নিল। বাতাস বদ্ধ এখানে। পুরু ধুলোর আস্তরণ ভাসছে চারপাশে। কিছুই চোখে পড়ে না। প্রায়

অন্ধের মত ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করেছে রানা। আশা করছে নীচের ধাপ থেকে সরে গেছে সোহেল। হঠাৎ উপর থেকে খসে পড়ল মাথার সমান এক পাথর। কাঁধে লেগে পিছলে গিয়ে নীচে পড়ল ওটা। ব্যথায় কুঁচকে গেল রানার মুখ। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, শেষ কয়েক ধাপ গড়িয়ে নীচে গিয়ে পড়ল। উপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে আসছে পাথর ও সিমেন্টের স্ল্যাব। রানার চারপাশে উড়ছে ধুলো।

শক্তিশালী একটা হাত রানার বুশ শার্ট খামচে ধরল, ওকে টেনে সরিয়ে নিল অ্যান্টি চেম্বারে। অ্যাভালাঞ্চ শুরু হয়েছে সিঁড়ির উপর থেকে।

রানাকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল সোহেল। দু'জনের পোশাক ও মুখ ধূলির কারণে হয়ে উঠেছে ধূসর। যে কাঠের গুঁড়ি সিঁড়ি-ঘর ধরে রাখে, হঠাৎ ধসে পড়ল সেগুলোও। নতুন করে পড়তে শুরু করেছে সিমেন্টের চাপড়া ও কাঠের গুঁড়ি। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল সিঁড়ি। অসংখ্য পাথর এসে থামল অ্যান্টি চেম্বারের মুখে। এ ঘরে এক ফোঁটা আলো রইল না আর। চারপাশে নিকষ অন্ধকার।

হ্যাভারস্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে জ্বালল সোহেল। এতই উজ্জ্বল আলো যে হারিয়ে দেবে গাড়ির যেনন হেডল্যাম্পকে। তবে সেই আলোয় চোখে পড়ল শুধু কংক্রিটের ধূলির মেঘ।

'অন্য কিছু মনে পড়ছে তোর?' শুকনো হাসল সোহেল। 'বছর খানেক আগে জুরিখের এক উকিলকে কিডন্যাপ করতে গিয়ে...'

'হুঁ।' কাশতে শুরু করেছে রানা।

'আমাদের রিসেপশন কমিটির ব্যাপারে কী মনে হয় তোর?'

'গাধা বনে গেছি। আগেই বোঝা উচিত ছিল। কোনও কাজ

এত সহজ হতে পারে না।'

'তোর কথার উপর *আমিন*, শ্যালক আমার।' রুদ্ধ প্রবেশ দ্বারের উপর আলো ফেলল সোহেল। কয়েকটা কংক্রিট স্ল্যাব ওজনে পাঁচ শ' কেজির বেশিই হবে। 'এখান থেকে বেরুতে হলে কয়েক ঘণ্টা খাটতে হবে।'

'আমরা একটা গর্ত তৈরি করি, আর অমনি নেমে আসুক ওরা রাইফেল বাগিয়ে।' সেফটি অন করে কোমরে পিস্তল গুঁজে রাখল রানা। 'আমাদের বাড়তি অস্ত্র নেই। তার উপর এরা দলে বোধহয় ভারী। অ্যাম্বুশের ভিতর গিয়ে পড়বে কে?'

'তো চুপচাপ বসে থেকে ওদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করব?'

'না, অন্য কিছু করব। সঙ্গে রয়েছে কেবল একটা ক্যান্টিন আর কয়েকটা প্রোটিন-বার। এই রসদ নিয়ে ওদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো যাবে না। নিশ্চিন্তে কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব্যাটারা।' কথার ফাঁকে স্যাটালাইট ফোন বের করেছে রানা।

'ফু-চুঙের সঙ্গে যোগাযোগ কর,' পরামর্শ দিল সোহেল। 'চলে আসুক অ্যাসল্ট টিম নিয়ে। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর পৌঁছতে পারবে।'

'তাই চাইছিলাম,' শুকনো স্বরে বলল রানা, 'তবে কোনও সিগনাল নেই।' ফোনের পাওয়ার অফ করে দিল। এখন থেকে বাঁচাতে হবে ব্যাটারির শক্তি।

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'আমি যে কটা কথা বলেছি, সব মাঠে মারা গেছে, এবার তোর আস্তিনের ভাঁজে কী আছে দেখা।'

সোহেলের হাত থেকে আলো নিল রানা। চারপাশ দেখছে। ঢালু হয়ে সামনে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। বহু বছর আগে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে। 'চল্, দেখি গিয়ে সামনে কী।'

'আর ওরা যদি পিছু নেয়?'

'ওরা জানে আমরা কচি খোঁকা নই। অ্যাম্বুশ করতে পারি। সহজে পিছু নিতে চাইবে না।'

'ভেবে দেখ, এখানেই অপেক্ষা করবি কি না।'

'আমি যদি ওই দলের নেতা হতাম, সবাইকে নিয়ে নামার আগে ক'টা গ্রেনেড ফেলতাম এখানে। গুলি করার আগেই কিমা করে দিতাম। এদিকে আমরা যদি গ্রেনেড থেকে দূরে সরে যাই, সুড়ঙ্গের ভিতর হারিয়ে যেতে পারি। সবদিক ভেবে মনে হচ্ছে, আপাতত এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। প্রতিরোধ করা যায় এমন জায়গা খুঁজে অপেক্ষা করব সেখানে। আর ভাল দিক, এরা যদি পিছু নেয়, তার অর্থ এই সুড়ঙ্গের আরেকটা মুখ আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল সোহেল, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। 'চল্, পাতালপুরীর দিকে রওনা হওয়া যাক।'

ঢালু হয়ে নীচের দিকে চলে গেছে সুড়ঙ্গ। একদিকের দেয়াল তৈরি পাথুরে স্ল্যাব দিয়ে। ওখানে মানুষের যন্ত্রপাতির দাগ। দু'জন পাশাপাশি হাঁটছে। ওদের দশ ফূট উপরে এবড়োখেবড়ো ছাত।

'ন্যাচারাল ফিশার,' পাথরের দেয়াল লক্ষ করছে রানা। 'পরে সুড়ঙ্গ আরও দূরে নিয়ে গেছে জাপানিরা।'

'ভূমিকম্পে বোধহয় ফেটে যায় নিরেট পাথর,' সায় দিল সোহেল। 'আর সেই সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হয়েছে, তার উপর ফ্যাক্টরি বা যাই হোক, তাই তৈরি করেছে।'

পাথরের মেঝের উপর আলো ফেলল রানা। এখানে ওখানে কালো ধাবড়া দাগ। কিছু জায়গায় পিচকারি দিয়ে ছিটানোর মত —সবই রক্ত, এখন কালো বর্ণ ধারণ করেছে। চাপা গলায় বলল রানা, 'গুলি করে মেরেছে।'

'শুধু একজনকে না, অনেককে,' বলল সোহেল।

ওদিক থেকে আলো সরিয়ে নিল রানা। থমথম করছে মুখ।

সুড়ঙ্গের ভিতর নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। সেইসঙ্গে বাড়ছে আর্দ্রতা। সুড়ঙ্গ ধরে চলেছে দুই বন্ধু। গম্ভীর হয়ে গেছে, ভাবছে এখানে কী ঘটেছিল। মানুষগুলোকে খুন করা হলো কেন? মেরুদণ্ডের ভিতর শিরশির করছে ওদের। তা তাপমাত্রা কমে যাবার জন্য নয়।

সোজাসুজি যায়নি সুড়ঙ্গ। বারবার বাঁক নিয়ে ক্রমেই নেমে চলেছে। পঁচিশ মিনিট পর দুই মাইল পেরিয়ে সমতল হলো মেঝে। প্রথমবারের মত একটা চেম্বার নজরে পড়ল। পাথর ধসে আংশিক ভাবে বুজে গেছে কুঠুরির প্রবেশদ্বার। বেশ ঝুঁকে নেমে এসেছে সুড়ঙ্গের ছাত। আলগা হয়ে এসেছে পাথরগুলো। যে-কোনও সময়ে ধস শুরু হতে পারে। প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি গুহা, তবে পাথর খুঁড়ে আরও বড় করে নিয়েছে জাপানিজ আর্মি। এ কুঠুরি প্রায় বৃত্তাকার, ব্যাসে পঞ্চাশ ফুটের মত। পনেরো ফুট উপরে ছাত। ঘরের ভিতর প্রায় কিছুই নেই। দেয়ালে রয়েছে শুধু কিছু বল্টু। একসময় ওগুলো ধরে রেখেছে ইলেকট্রিকের কেবল।

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরিয়া,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'তাই মনে হয়।'

সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ পর দু'পাশের দেয়ালে ছোট দুটো গুহা পেল। ভিতরে কিছুই নেই। তবে চতুর্থ গুহার ভিতর পাওয়া গেল আর্টিফ্যাক্ট, ফেলে গেছে জাপানিরা। মেঝের সঙ্গে বল্টু দিয়ে আটকানো বারোটা লোহার বাঙ্ক। এক দেয়ালে ধাতব কেবিনেট, মরচে ধরে খসে পড়ছে এখন। ড্রয়ার টেনে দেখতে শুরু করল রানা।

বেডস্টেড পরীক্ষা করে দেখছে সোহেল। 'তোর কী মনে হয়, জাপানিরা তাদের বন্দিদের বিছানা দিত?'

'এসব ড্রয়ারে কিছুই নেই,' বলল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'কোনওদিন শুনিনি বিছানা দিয়েছে। তবে ভাইরাস দিয়ে যাদের উপর পরীক্ষা করত, তাদের জন্য বিছানা থাকত। একইসঙ্গে টাইফাস, কলেরা বা অন্য কোনও ধরনের বিষাক্ত গ্যাস পরীক্ষা করত মানুষগুলোর উপর। তখন বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখত তাদের।'

ধাতব বাঙ্ক থেকে ঝট করে হাত সরিয়ে নিল সোহেল। বিড়বিড় করে কাকে যেন গালি দিল।

সুড়ঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা, কিছু দূর যাওয়ার পর দু'পাশে পেল চারটে চেম্বার। এগুলো যথেষ্ট বড়। প্রতি গুহার ভিতর চল্লিশটা করে বাঙ্ক। সুড়ঙ্গের পাশে কোমর উঁচু এক গুহা-মুখ চোখে পড়ল। ওটার ভিতর বুক-মাথা ঢোকাল রানা, আলো ফেলে চারপাশ দেখতে চাইল। সামনের মেঝে হঠাৎ উধাও হয়েছে। হাঁ করেছে কালো গহ্বর। নীচের দিকে আলো ফেলল রানা। গুহার মেঝের উপর জমেছে অজস্র জঞ্জাল। প্রায় কিছুই চেনা যায় না। ওখানে আবর্জনা ফেলা হতো। তবে তার ভিতর একটা জিনিস চোখে পড়ল রানার—মানুষের হাড়! কঙ্কালের অংশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বোধহয় ইঁদুরের কাজ। ওখানে কত লোকের লাশ ফেলেছে, বুঝবার উপায় নেই। তবে আন্দাজ করা যায়, কমপক্ষে পাঁচ শ'।

'এটা কসাইখানা ছিল,' পিছিয়ে এল রানা।

'ডেথ ফ্যাক্টরি।' বিড়বিড় করল সোহেল। 'এখানে এই কাজই চালিয়ে গেছে ওরা আঠারো মাস ধরে।'

'মাটির উপর ছিল টিন শেড, নীচে এই ল্যাবোরেটরি। এটাকে গোপন রাখা হয়। ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যবহার করেছে সুড়ঙ্গকে। যদি হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে রোগ, বন্ধ করে দেবে

উপরে ওঠার পথ।'

'সবই ঠাণ্ডা মাথায় করেছে, কোথাও কোনও ত্রুটি রাখেনি,' কর্কশ শোনাল সোহেলের কণ্ঠ। 'নাজিদের বাড়তি কিছু কৌশল শেখাতে পারত জাপানিরা।'

'শেখায়নি তা কিন্তু না,' বলল রানা। 'উনিশ শ' একত্রিশ সালে শুরু হয় ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু। সেটা হিটলার ক্ষমতায় আসার দু'বছর আগে। আর যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত জার্মানি ও জাপান নিজেদের ভিতর আদান-প্রদান করে তথ্য ও প্রযুক্তি। জার্মানি দিয়েছে ইমপেরিয়াল জাপানকে জেট ও রকেট ইঞ্জিন, যাতে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে সুইসাইডাল মিশনে। সঙ্গে দিয়েছে নিউক্লিয়ার মেটারিয়াল। বদলে জাপান সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করবার নানা পৈশাচিক কৌশল শিখিয়েছে জার্মানিকে।'

চুপ রইল সোহেল। এগিয়ে চলেছে ওরা। চারপাশে পাথরের সুড়ঙ্গ, যেন হঠাৎ চেপে আসবে। ওরা শুনতে পেল না সুড়ঙ্গের মুখে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল বেড়ে গেছে বাতাসের চাপ। মনে হলো হঠাৎ পাশ দিয়ে ছুটে গেল কোনও দ্রুতগামী ট্রাক। রেসপন্সিভিস্টরা বোমা বসিয়ে আবর্জনা ও জঞ্জাল সরাতে শুরু করেছে। তার মানে, ঠিক করেছে পিছু নেবে। মেরে রেখে যাবে ওদের।

'ওরা এই সুড়ঙ্গ চেনে, কাজেই দ্রুত আসবে,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'আন্দাজ আধঘণ্টা পাব, তার ভিতর বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। তা যদি না পারি, এমন কোনও জায়গা বাছাই করতে হবে, যেখান থেকে প্রতিরোধ করা যায়।'

'সঙ্গে দুটো পিস্তল আর এগারোটা বুলেট নিয়ে?' শুকনো হাসল সোহেল। 'ওদের কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল আছে।'

'তাতে কী? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

এরপরের মেডিকেল চেম্বার থেকে অনেক কিছুই সরিয়ে নেয়া হয়নি। বাঙ্কের উপর পাতলা ম্যাট্রেস। কেবিনেটগুলোর ভিতর অসংখ্য জার। জার্মান ভাষায় কেমিকালগুলোর নাম লেখা।

জার ও বোতলগুলো দেখাল রানা। 'প্রমাণ হয়ে গেল, জার্মানরা এদের সহায়তা দিয়েছে।'

লেবেল পড়তে শুরু করেছে সোহেল। এক এক করে বলে চলেছে: হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। সালফার ডাইঅক্সাইড। ক্লোরিন। ডিসটিল্ড অ্যালকোহল।

বন্ধুর দিকে চাইল রানা। 'জার্মান শিখে ভাল করেছিস। তুই তো সাইন্সে ছিলি। বের কর বাইকার্বোনেট।'

'আমার মত একই কথা ভাবছিস?' বলল সোহেল। 'কিন্তু হঠাৎ তোর আবার পেটে ব্যথা কেন? ...ভয়ে?' ঠাট্টা করতে চাইল সোহেল, কিন্তু জমল না। ঘাঁটতে শুরু করেছে বোতল ও জার। 'হাইস্কুলে ঘোলাটে চোখঅলা এক স্যর ছিলেন,' কাজের ফাঁকে বলল, 'আড়ালে আমরা ডাকতাম কুমির বলে। কেমিস্ট্রি পড়াতেন। তাঁর শেখানো নিরাপদ কেমিকালগুলোর নাম ভুলেই গেছি। তবে কী ধরনের কেমিকাল দিয়ে অস্ত্র তৈরি করা যায় মনে গেঁথে ছিল। ...তোর শিখতে হয়েছে আর্মিতে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে গিয়ে।'

'হুঁ।'

বাইকার্বোনেট পেয়েছে রানা। সোহেল আরও কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। রানা খুঁজছে অন্যান্য কেমিকাল। একটা একটা করে রাখছে ওরা কেবিনেটের ছাতে।

কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল, 'এবার আমাদের কেমিকাল

ওয়ারফেয়ার শুরু।'

দু'জন মিলে ঠিক করল কোথায় অ্যাম্বুশ করবে। ওদের পছন্দ হলো ছোট এক মেডিকেল ওয়ার্ড। বাণ্ডিল বানিয়ে কিছু ব্ল্যাঙ্কেট ও ম্যাট্রেস নিয়ে এল রানা। শেষ বাঙ্কের নীচে রাখল ওগুলো। শুয়ে পড়া দুই লোকের মত করে সাজিয়ে দিল। সোহেলের ব্যাগ থেকে বেরুল ইলেকট্রিকাল টেপ। দু'জন মিলে কেমিকাল, ক্যান্টিন ও টেপ ব্যবহার করে তৈরি করল বুবি ট্র্যাপ। ফ্ল্যাশলাইটের অনিশ্চিত আলোয় মনে হলো যথেষ্ট ভাল হয়েছে ম্যানিকিন দুটো। রেসপন্সিভিস্টদের মনোযোগ কাড়বে। এবার সেল ফোন দুই মূর্তির মাঝে রাখল সোহেল। আগেই চালু করেছে ওয়াকি-টকি মোড।

ওই কুঠুরি থেকে বেরিয়ে পনেরো ফুট এগুলো ওরা, তারপর উল্টোদিকের কুঠুরির ভিতর ঢুকল। একবার পরস্পরের দিকে চাইল। গোল্ড অভ মার্স জাহাজে রেসপন্সিভিস্টরা যা করেছে, সে তুলনায় খুব বেশি কিছু করছে না ওরা।

এক এক করে মিনিট পেরুতে লাগল। রানার ঘড়ির লিউমিনিয়াস সেকেণ্ডের কাঁটা তিরতির করে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ওর মনে হলো নড়ছে না কাঁটাগুলো। অধৈর্য লাগছে। অপেক্ষা সত্যিই বিরক্তিকর।

আগেও অসংখ্যবার অ্যাম্বুশ করেছে ওরা। ওদের জানা আছে অধৈর্য হওয়া চলবে না। আঁধারে চোখ জ্বেলে অপেক্ষা করছে। সুড়ঙ্গের ভিতর কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। পাথুরে দেয়ালে কান পেতে রইল। সামান্য আওয়াজ পেলে ঠিকই শুনবে।

বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, এরপর শব্দ পেল। অন্ধকারে এগিয়ে আসছে দু'জন। এরপর এল তৃতীয়জনের পায়ের আওয়াজ। রেসপন্সিভিস্টদের সশস্ত্র লোকগুলো সুড়ঙ্গ ধরে দ্রুত

এগোচ্ছে। কোনও আলো জ্বালছে না। রানা-সোহেল বুঝে নিল, লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে ইনফ্রারেড ল্যাম্প, সঙ্গে নাইট ভিশন গগলস। লাল আলোয় সব পরিষ্কার দেখবে।

দু'পাশের কুঠুরির কাছে আসবার আগেই ছোট্টার গতি কমিয়ে এনেছে লোকগুলো।

কোনও অ্যাম্বুশের কথা ভাবছে?

তাদের দেখতে পেল না রানা বা সোহেল। তবে আওয়াজ থেকে আন্দাজ করছে, লোকগুলো কী করছে। হাঁটবার আওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। ওদের পিছনে রেখে আসা মেডিকেল ওয়ার্ডের মুখে পৌঁচেছে তারা। বোধহয় ভিতরে ঢুকবে দু'জন। কাভার দেবে তৃতীয়জন।

পাথুরে মেঝের উপর ঠং-ঠনাৎ করে ঘষটে গেল ধাতব কিছু। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে উঠল কেউ।

'আমি তোমাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মাথার উপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো। তোমাদের কোনও ক্ষতি করা হবে না।'

কুঠুরির প্রবেশ-পথের পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল গার্ডদের একজন, দু'হাতে নিষ্কম্প অ্যাসল্ট রাইফেল। নিশানা স্থির রেখেছে ম্যাট্রেসগুলোর উপর।

সোহেলের পিঠের কাছে মুখ নিয়ে সেল ফোনে নিচু স্বরে বলল রানা, 'যা, মর্ ব্যাটা, জাহান্নামে যা!'

মেডিকেল ওয়ার্ডে সোহেলের ফোনের ভলিউম ম্যাক্সিমাম করা, লোকগুলোর হয়তো মনে হলো কর্কশ স্বরে আপত্তি তুলেছে লোকটা। একইসঙ্গে গুলি শুরু করল দুটো অস্ত্র। মাযল ফ্ল্যাশ হতেই আবছা আকৃতি দেখা গেল তিনজন লোকের। অদক্ষ নয়, পেশাদার কমাণ্ডো। দু'জন কুঠুরির দরজার ঠিক সামনে। একজন কাভার দিয়েছে তাদের। একইসঙ্গে খেয়াল রাখছে সুড়ঙ্গ থেকে

কোনও হামলা হয় কি না।

এত বদ্ধ জায়গায় গুলির আওয়াজে ভোঁ-ভোঁ করছে কান।

কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল গুলি। অপেক্ষা করল রানা-সোহেল। দেখা যাক কী করে এরা। ওই কুঠুরির ভিতর যত গুলি পাঠিয়েছে, সেগুলো দিয়ে অনায়াসে খুন করা যেত বারোজনকে। যে কাভার দিয়েছে সে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। দেরি না করে গগলস খুলে ফেলল তারা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। তারপর যে দু'জন ঘরের ভিতর গুলি চালিয়েছে, তারা সাবধানে সামনে বাড়ল। কোনও ফাঁদ থাকতে পারে, কাজেই তৈরি রইল তৃতীয়জন।

লোকগুলোকে হতাশ করল না রানা ও সোহেল।

যেখানে ওদের শেষ প্রতিরক্ষা-বূহ্য থাকতে পারে, সেটার একটু আগে বেডস্টেডের সঙ্গে ইলেকট্রিকাল টেপ পেঁচিয়ে তৈরি করেছে বাধা। সামনের গানম্যানের পুরো মনোযোগ রয়েছে মৃতদেহদুটোর দিকে, তার চোখেই পড়ল না গোড়ালির কাছে টান খেল টেপ। আরও এক পা এগুলো সে।

ইলেকট্রিকাল টেপ আটকে রেখেছিল ক্লোরিন ও সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের বোতলকে। টেপে টান পড়তেই ঠাস্ করে পড়ে গেল ভঙ্গুর বোতল। ফাটা কাঁচের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কেমিকাল। সব পড়ল ক্যাণ্টিন থেকে ঢেলে দেয়া পানির ভিতর। তার সঙ্গে আগেই কয়েকটি কেমিকাল মিশিয়েছে রানা-সোহেল।

বোতল ভেঙে যেতেই গুলি শুরু করল ওরা। কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ পেয়েই ঝট করে নড়ে উঠেছে তৃতীয় গার্ড, কিন্তু কোনও সুযোগই পেল না সে। একটা বুলেট বিঁধল কাঁধের হাড়ের ঠিক নীচে, পেশি ছিঁড়ল ওটা। দ্বিতীয় বুলেট সরাসরি লাগল কণ্ঠার উপর। এক পাক খেয়ে মেঝের উপর ঝুপ করে

পড়ল লাশ। হাতে তখনও শক্ত করে ধরা ফ্ল্যাশলাইট আর অ্যাসল্ট রাইফেল। আলো গিয়ে পড়ল কুঠুরির দরজার উপর। ওদিক থেকে বেরুতে শুরু করেছে সবজেটে মেঘ।

চেম্বারে কেমিকাল রিয়্যাকশনে তৈরি হয়েছে হাইড্রোক্লোরিক, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড ও অন্য ক'টি কেমিকালের কুয়াশা। লোক দুটো দু'সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল, কোথাও কোনও গোলমাল ঘটেছে। ভীষণ জ্বলতে শুরু করেছে গলা ও ফুসফুস। কণ্ঠনালী ও আশপাশকে আক্রমণ করেছে ঝাঁঝাল ধক। অসম্ভব হয়ে উঠল শ্বাস নেয়া। যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেছে তারা।

কর্কশ ফিউমের কারণে কেশে চলেছে। প্রতি শ্বাসের সঙ্গে দেহের ভিতর মিশছে টক্সিন। শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু ততক্ষণে বেদম কাশছে, প্রায় উবু হয়ে গেল বারংবার ঝাঁকিতে। ফুসফুসের গভীর থেকে বেরুতে লাগল কফ ও তাজা রক্ত।

অতি অল্প সময়ের এক্সপোযার, তবে দ্রুত মেডিকেল চিকিৎসা না পেলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে ওদের। বহু সময় নিয়ে কষ্ট পেয়ে মরবে। রানা বা সোহেল বাধা দেওয়ার আগেই এদের একজন হঠাৎ বুঝে ফেলল কী ঘটেছে, খুলে ফেলল সে হ্যাণ্ড গ্রেনেডের পিন!

এক সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো—পিছনের ছাত খুবই ভঙ্গুর—একমাত্র উপায় এখন ঝেড়ে দৌড় দেয়া। খপ্ করে সোহেলের হাত ধরল রানা, পরক্ষণে ক্ষিপ্র চিতার মত ছুটল। আরেকহাতে জ্বেলে নিয়েছে ফ্ল্যাশলাইট। বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়ে সুড়ঙ্গের দেয়াল ঘেঁষে ছুটছে রানা। পিছনে উড়ে আসছে সোহেল। একইসঙ্গে সেকেণ্ড গুনছে

ওরা, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার আগ-মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে।

সুড়ঙ্গের চারদিকে ছিটিয়ে পড়ল গ্রেনেডের শ্র্যাপনেল। ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আলো, সেই সঙ্গে বিকট আওয়াজ। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ওভারপ্রেশার, যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে সব। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রানা-সোহেল, ছুটল তীরের মত। নতুন এক জোরাল আওয়াজ শুরু হয়েছে, যেন সুড়ঙ্গের ভিতর ছুটতে শুরু করেছে রেলগাড়ি। কানে ধাঁধা ধরল। বিস্ফোরণের ফলে উপর থেকে পড়ছে পাথরের স্ল্যাব। ছাত ও মেঝের বুকে ফাটল ধরছে, উপর থেকে হুড়মুড় করে পড়ছে পাথর, বালি। যে-কোনও সময়ে চাপা পড়বে ওরা। সুড়ঙ্গ ভরে উঠেছে ধুলোয়। চারপাশে পড়ছে ছোট থেকে শুরু করে বড় পাথর। একহাতে মাথা ঢেকে দৌড়ে চলেছে ওরা। পিছনে ধসে পড়ল ছাতের বড় এক অংশ। ছুটতে ছুটতে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা। উপর থেকে নেমে এল ট্রাকের ইঞ্জিন আকৃতির এক পাথর, বিকট আওয়াজ তুলে সামনে পড়ল। লাফিয়ে পাথর টপকে গেল রানা, যেন হার্ডল রেসের প্রতিযোগী। মাথার উপর চড়চড় শব্দে ফাটছে ছাত। তৈরি হচ্ছে অসংখ্য সরু ফাটল। ওগুলো যেন কালো রঙের বিদ্যুৎ-শিখা। বেড়েই চলেছে পাথর পতনের আওয়াজ।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল সব। বিকট গর্জন আর নেই। তবে কখনও একটা দুটো পাথর পড়ছে। ছুটবার গতি কমাল রানা, টের পেল ধুলোর কারণে শুকিয়ে গেছে মুখের ভিতরটা। আরও ক'পা গিয়ে থেমে গেল। ওদিকের সুড়ঙ্গ বুজে গেছে অসংখ্য পাথরে।

'তোর কী হাল?' প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

উবু হয়ে বাম কাফ মাসল পরখ করল সোহেল। ওখানে তীক্ষ্ণ পাথরের একটা টুকরো ছিটকে এসে লেগেছে। ব্যথা করছে, তবে কাটেনি।

'তোর বোনের কপাল ভাল যে মরিনি। তোর কী অবস্থা?'

'এখনও টিকে। এবার চল্, সুড়ঙ্গ থেকে বেরুতে হবে।'

'ভাল দিকটা চিন্তা করে দেখ,' পাশে হাঁটতে শুরু করে বলল সোহেল। 'ওরা আর পিছু নেবে না।'

'হু নোজ?'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা এগিয়ে চলল ওরা ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটির ভিতর দিয়ে। বেশকিছু প্রকাণ্ড ঘর পেল, যেখানে আটকে রাখা হতো এক শ' আশিজন করে বন্দি। সঙ্গে ছিল ল্যাবোরেটরি। কেমিকালগুলো ফেলে গেছে। একটা ইকুইপমেন্ট চিনল ওরা। এ জিনিসকে বলা হয় অ্যাটমসফিয়ার চেম্বার।

'বিস্ফোরণের ডিকমপ্রেশন পরীক্ষা করত,' বলল সোহেল।

চুপচাপ সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। তবে কিছুক্ষণ পর ফুরিয়ে গেল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। পরস্পরের দিকে চাইল রানা-সোহেল। পাথর গেঁথে বন্ধ করা হয়নি পথ, বোমা মেরে দু'পাশের দেয়াল ধসিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গুহাপথ। এসব পাথরে এখনও লেগে রয়েছে বিস্ফোরকের কটু গন্ধ।

'গত কয়েকদিনের ভিতরই করেছে একাজ,' বলল রানা।

'যখন রেসপন্সিভিস্টরা চলে যায়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। নিরাশ হতে রাজি নয়। আলগা পাথরের উঁচু স্তূপ সামনে। সাবধানে ওটার উপর উঠতে শুরু করল। পায়ের নীচ থেকে ঝরঝর করে নীচে পড়ছে ধুলোবালি, পাথরের টুকরো। ঢিবির উপর প্রায় পৌঁছে গেল। পাথরে হেলান দিয়ে উপরের দিকে আলো ফেলল। নীচের

পাথরগুলো ধরে রেখেছে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া ছাতকে। উপর থেকে ডাকল রানা: 'এ গোরস্তানে কিছু নেই যা রেসপন্সিভিস্টদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারি। জাপান আর্মির পরিত্যক্ত পুরনো ফ্যাসিলিটি। ব্যস।'

'কিন্তু এই বাধা পেরুলে কী পেতে পারি?'

'জানি না,' বলল রানা। 'তবে কষ্ট করে এখানে এসেছে ওরা, বন্ধ করে দিয়েছে সুড়ঙ্গ। কাজেই আন্দাজ করতে পারি ওপাশে বেরুবার পথ থাকবে।'

'তাই যদি হয়, তা হলে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

সোহেল স্তূপ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। রানার খানিক নীচে থামল। কাজ শুরু করল দুই বন্ধু।

গ্যাস আক্রমণ সৃষ্টি করতে গিয়ে ক্যান্টিনের পানি শেষ হয়েছে। এরপর ঘণ্টা দুয়েক হেঁটেছে। মুখের ভিতর একগাদা ধুলো। ওদের মনে হলো জিভ যেন বড়সড় শুকনো সন্দেশ। গলা শুকিয়ে কাঠ। আঙুলগুলো থেকে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। অমসৃণ পাথরগুলো সরিয়ে চলেছে। টনটন করছে সারাশরীরের পেশি, খিঁচ ধরছে এখানে-ওখানে। তার পরেও যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে ওরা। তবে মনে মনে জানে, আর বেশিক্ষণ পারবে না, দ্রুত কমে আসছে শরীরের শক্তি।

ধুলো-পাথরের ভিতর একটু একটু করে সামনে বাড়ছে। পাথর সরানোর সময় সাবধানে পরখ করছে ছাত। যে-কোনও সময়ে ওটা মাথার উপর নেমে আসতে পারে। প্রতিবার পা রাখবার আগে সামনের দিকটা দেখে নিচ্ছে। একটা একটা করে পাথর তুলে বাড়িয়ে ধরছে রানা, সেটা নিয়ে নীচে ফেলছে সোহেল।

প্রতি আধঘণ্টা পর পর পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম নিল ওরা।

অনেকক্ষণ পর পাথুরে স্তূপের উপর বন্ধ হলো কাজ। সামনে প্রকাণ্ড এক পাথর। নড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। আরও কয়েকবার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিল।

বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল। 'পারা যায় না?'

'খোঁড়লের ভেতর ডিমের মত বসে আছে, নড়ে না। নীচ থেকে সরে যা তুই। আবার চেষ্টা করে দেখি।' ওটার আশপাশ থেকে মুঠোসমান পাথর সরাতে শুরু করেছে রানা। পাঁচ মিনিট পর মনে হলো এবার নড়বে প্রকাণ্ড পাথর। ঢিবির উপর দু'পা দৃঢ় করল রানা, প্রাণপণে ধাক্কা দিল বোল্ডারকে। মোটেই নড়ল না রক পাখির ডিম।

ওটার উপরের ছাত ফাটলে ভরা। অসংখ্য চিড়। এমনই ছিল পিছনেও। ওই ছাত গ্রেনেড দিয়ে ধসিয়ে দেয় রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা। এসব ছাতকে ঝুলন্ত আঙুরের থোকা বলে খনি-মজুররা। বিনা নোটিসে ওখানে যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে পাথর বৃষ্টি। ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই রানার, তবে এ মুহূর্তে মনে হলো শীতল কোনও হাত খামচি দিয়ে ধরেছে ওর কলজেটা।

'থামলি কেন?' জানতে চাইল সোহেল। 'আমি আসব?'

শুকনো জিভ মুখের ভিতর ঘোরাতে শুরু করল রানা। জিভের আড়ষ্টতা কেটে যেতেই বলল, 'এ পাথর নড়বে না।'

'আমি পাশে এসে চেষ্টা করি। দু'জন মিলে...'

'আয়।'

রানার পাশে উঠে এল সোহেল। ছোট্ট খুপরির মত জায়গা। পিছনে দেয়ালের মত পাথরের বাধা। দেয়ালে পিঠ দিল দু'জন। ডিম আকৃতির পাথরের বুকে পা রেখেছে। প্রাণপণে ধাক্কা শুরু করল। জিমনেশিয়ামে পা দিয়ে এক হাজার পাউণ্ড সরাতে পারে ওরা। সে তুলনায় এ বোল্ডার বড়জোর অর্ধেক ওজনের। কিন্তু

কোলের মত এক জায়গায় বসেছে। পায়ের চাপ আরও বাড়াল ওরা। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই ডিহাইড্রেশনে ভুগছে ওরা। টের পেল পায়ের পেশিগুলো থরথর করে কাঁপছে। তারপর হঠাৎ একটু নড়ে উঠল পাথর। পরক্ষণেই সকেট থেকে বেরিয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে নীচে গিয়ে পড়ল। ওটা ছিল মাড়ির ভিতর বসে থাকা পচা দাঁতের মত।

ধপ করে বসে পড়ল দুই বন্ধু। হাঁপিয়ে গেছে। তবে হঠাৎ চিড় ধরা ছাতের দিকে চেয়ে শুকিয়ে গেল রানার মুখ। বন্ধুর হাত ধরে তাড়া দিল, 'জলদি ওঠ।'

পাথর সরে যেতে দেখা দিয়েছে এক ছোট ফোকর। তার ভিতর ক্রল করে ঢুকল সোহেল, তারপর রানা। বুঝতে পেরেছে সামনে এগোনো যাবে। পাথরের স্তূপের উঁচু অংশ পেরুল দু'জন। নামতে লাগল ওপাশ বেয়ে। পাথরের ভিতর দিয়ে ক্রল করছে। ঢিবির শেষ অংশ হামাগুড়ি দিয়ে পেরুল, তারপর উঠে দাঁড়াতে পারল। পিছনে আলো ফেলল রানা। ঢিবির উপর যে গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ওটা খুবই ছোট।

সুড়ঙ্গের মেঝেতে বসে পড়ল দুই বন্ধু। বিশ্রাম নিতে হবে। নিভিয়ে দিল আলো। ব্যাটারির শক্তি বাঁচানো দরকার। চারপাশে নামল ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রানা, 'গন্ধটা পেলি?'

'তুই যদি বরফ-ঠাণ্ডা বিয়ারের কথা বলে থাকিস, সেই একই দিবাস্বপ্ন দেখছি আমিও। লাগার বিয়ার।'

'নোনা পানি,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। আবার জ্বেলে নিল ফ্ল্যাশলাইট।

সুড়ঙ্গ ধরে এগুতে শুরু করল দুই বন্ধু। এক শ' গজ যাওয়ার পর সুড়ঙ্গ মিশে গেল প্রকাণ্ড এক সামুদ্রিক গুহার সঙ্গে। ওটার

ছাত কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উপরে। ব্যাস দুশো ফুটের বেশি। এক পাশে পাতাল লেগুন। সেখানে কংক্রিট দিয়ে পিয়ার তৈরি করেছিল নিপন আর্মি। গুহার ভিতর দিয়ে গেছে ন্যারো গেজ রেললাইন। এক পাশে মোবাইল ক্রেন। একসময়ে ওটা দিয়ে মালামাল আনলোড করা হতো।

'জাপানিরা এটার ভিতর জাহাজ ঢুকিয়েছে?' প্রায় অবিশ্বাস নিয়ে বলল সোহেল।

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'খেয়াল করে দেখেছি, ফেরি যখন ঘাটে ভিড়ল, ঠিক সেসময়ে জোয়ার পূর্ণ ছিল। তার মানে সাত ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ এখন মরা ভাটা চলছে।' হাতের আলো দেখিয়ে চলেছে পিয়ার। ওটার একপাশ থেকে আরেকপাশ পর্যন্ত দেখল রানা। কংক্রিটের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে সামুদ্রিক শেওলা। তার মানে ভরা জোয়ারের সময় ভেসে যায় ডক। 'জাহাজ না, ওরা মালামাল আনত সাবমেরিন দিয়ে।'

বাতি নিভিয়ে দিল রানা, দু'জন চেয়ে রইল আঁধার পানির দিকে। দেখতে চাইছে এই গুহার ভিতর সূর্যালোক আসে কি না। নেই। না, আছে মনে হয়! পিয়ারের এক অংশে খুব আবছা একটু আলোর আভা। ওখানে পানি কুচকুচে কালো নয়, বরং কিছুটা যেন নীলচে।

'তোর কী মনে হয়?' টর্চ জ্বালল রানা।

'ডুবতে চলেছে সূর্য। আলো মিলিয়ে গেলে গাঢ় অন্ধকার নামবে গুহার ভিতর। আমার আন্দাজ, ওই পাতাল সুড়ঙ্গ কমপক্ষে সিকি মাইল লম্বা। তার বেশিও হতে পারে।' সোহেল বলল না পানির নীচ দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অত দম নেই কারও।

'ঠিক আছে, আয় চারপাশটা ঘুরে দেখি। এমন কিছু থাকতে

পারে, যেটা আমাদের কাজে লাগবে।'

প্রধান এই গুহার ভিতর একপাশে একটা ছোট ঘর। ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল ওরা। ছাত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসছে পানি। ফলে পাথুরে মেঝেতে ছোট একটা পাত্রের মত গর্ত তৈরি হয়েছে। পানি উপচে পড়ছে ওটা থেকে। নিশ্চয়ই মিঠে পানি। বাড়তি পানি সরু একটা ধারায় মিশেছে গিয়ে সাগরে।

'এটা ঠাণ্ডা বিয়ার না হলে কী হবে,' বেসিন থেকে দু'হাতে পানি তুলে কুলকুচি করল সোহেল, 'সত্যিই দারুণ কিছু পেয়েছি।'

ঘরের চারপাশে আলো ফেলছে রানা। একদিকে দেখতে পেল অদ্ভুত কিছু পোড়ামাটির ট্যাবলেট। আর্টিফ্যাক্টগুলোর কারণে তৃষ্ণার কথা ভুলে গেল রানা। প্রতিটি ট্যাবলেট চার ফুট উঁচু, চওড়ায় দুই ফুট, এক ইঞ্চি পুরু। রোদে শুকিয়ে তৈরি। বুঝতে পারছে রানা, এসব ট্যাবলেটের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে লেখা হয়েছে, তারপর কাদা শুকিয়ে নিয়ে পোড়ানো হয়েছে। ওর মনে কোনও সন্দেহ রইল না এগুলো সত্যিকারের অ্যান্টিক। রূঢ় আবহাওয়ার কবলে পড়েনি। সব রাখা হয়েছে যেন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত জাদুঘরে।

তারপর চোখে পড়ল তারগুলো। সরু তার, চলে গেছে এক ট্যাবলেট থেকে অন্যগুলোয়। এসব ট্যাবলেটের মাঝখানের সরু অংশে আলো ফেলল রানা। ট্যাবলেট থেকে পিছনের দেয়ালে চলে গেছে তার। প্রাচীন টেক্সট্-এর পিছনে এক টুকরো করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। সংখ্যায় চারটে। কেবল অনুসরণ করল রানা, ওটা গেছে প্রধান সুড়ঙ্গে। রেসপন্সিভিস্টরা যখন ছাত ধসিয়ে দেয়, তখনই মৃৎ-চিত্রগুলোকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। যে

কারণেই হোক, কাটা পড়ে তার। গুহা পর্যন্ত পৌঁছায়নি সিগনাল। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের টুকরো দিয়ে সহজেই রেসপন্সিভিস্টরা গুঁড়ো করে দিতে পারত ট্যাবলেট।

'কী পেলি?' জানতে চাইল সোহেল। মুখ-হাত ধুয়ে পানি খেয়েছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণের সময় ঘাড় কেটেছে, এখন ওখানে পানি দিয়ে মুছে ফেলল।

'কিউনিফর্ম ট্যাবলেট,' বলল রানা। 'সঙ্গে যথেষ্ট সেমটেক্স। এগুলো গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ওরা।'

মনোযোগ দিয়ে বিস্ফোরক দেখল সোহেল। কাঁধ ঝাঁকাল। জানে, এ জিনিস ছোঁয়া উচিত নয়। তবে যখন ফাটবার কথা ছিল, তখন ফাটেনি। এখন বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

'কী বললি? এগুলো কিউনিফ্লাওয়ার?'

'কিউনিফর্ম। সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো লিখিত ভাষা। সুমেরিয়ানরা ব্যবহার করত। পাঁচ হাজার বছর আগে।'

'তো এসব এখানে কী করছে?'

'জানি না।' সেল ফোন বের করল রানা, ট্যাবলেটের ছবি তুলতে লাগল। 'এটা জানি পরের দিকে কিউনিফর্ম স্ক্রিপ্টগুলো ভীষণ জটিল হয়ে যায়। একের পর এক ত্রিকোণ আর দাঁড়ি। তবে এগুলো দেখে পিকটোগ্রাফ মনে হচ্ছে।'

'পিকপকেট? তার মানে কী রে, বদমাইশ?' ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল সোহেল। 'তুই যা খুশি গালি দিবি, আর তাই শুনতে হবে আমার?'

যেন শোনেইনি রানা। 'মানে হচ্ছে, এই ভাষা তখন মাত্র তৈরি হয়েছে।' ক্যামেরা দিয়ে যেসব ছবি তুলেছে, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। আরও কয়েকটা ছবি নিল। এবার স্পষ্ট

হয়েছে। 'এগুলো সাড়ে পাঁচ হাজার বছর বয়সী। তার চেয়েও বেশি পুরনো হতে পারে। দারুণ অবস্থায় আছে। কিউনিফর্মের যে স্ক্রিপ্ট পাওয়া যায় সেগুলো হাজারো টুকরো অবস্থায় থাকে। বহু বছর খেটে একটা স্ট্যাম্প রিক্রিয়েট করা যায়।'

'এসব তো ভাল কথা, যার খুশি সময় নষ্ট করুক, চিঠি লিখুক, স্ট্যাম্প সেঁটে পোস্ট করে দিক। তুই এবার অন্য দিকে মনোযোগ দে দেখি।'

'কোনদিকে? বলে দে।'

'আমরা যে পরিস্থিতির ভেতর পড়েছি, সেদিকে তোর খেয়াল আছে? এবার গলা ভিজিয়ে নে। তারপর চল্, চারপাশ ঘুরে দেখি।'

বেসিনের পানির কাছে চলে গেল রানা। হাজার ডলারের দামি ওয়াইনও পান করেছে, তবে নির্দ্বিধায় বলবে, পাহাড়ি ঝর্নার এই পানি পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি পানীয়। দু'হাতে পানি তুলে গিলতে শুরু করেছে। সপ্তমবারে তৃষ্ণা মিটল। মনে হলো পেশিগুলোর ভিতর ফিরতে শুরু করেছে প্রাণশক্তি। চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে ক্লান্তির কুয়াশা।

'আমার মনে হয় রেপন্সিভিস্টদের প্রেমকুটিরে হাজির হয়েছি,' বলল সোহেল। একহাত তুলে দেখাল এক বাক্স কণ্ডোম। তার ভিতর দুটো গায়েব। ঘরের একপাশে ট্র্যাশব্যাগ, তার ভিতর ছয়টা খালি ওয়াইনের বোতল।

মাথা নাড়ল রানা। 'ছিহ্, কনডোম পেলি? আমি ভেবেছি তুই দুটো স্কুবা ট্যাঙ্ক আর ডাইভ মাস্ক পাবি।'

'কপাল অতটা ভাল না, রে। সাঁতরে বেরুতে হবে। মনে মনে আশা করতে হবে পানির নীচে যেন মারা না পড়ি।'

'চল, মূল গুহায় যাই। কাছে বিস্ফোরক থাকলে মাথা

খেলতে চায় না।'

'শালা চাপাবাজ। আমি জানি, বোমা দেখলেই নানান দুষ্ট-বুদ্ধি খেলে তোর মাথায়।'

'আমি আর আগের সেই মানুষ নেই রে।'

চলে এল দু'বন্ধু প্রধান গুহার ভিতর।

ভাবতে শুরু করেছে রানা, ট্র্যাশব্যাগ ফুলিয়ে নিলে কেমন হয়? নিজেদের সঙ্গে ওটা টেনে নেবে। সুড়ঙ্গের অর্ধেক পথ যাওয়ার পর ব্যাগের ভিতর নাক ঢুকিয়ে বাতাস নেবে। তবে ভেসে উঠতে চাইবে ওটা, ছাতের সঙ্গে ঘষা লাগবে। সোজা কথা, পাঁচফুট যাওয়ার আগেই ছিঁড়বে প্লাস্টিকের ব্যাগ। উল্টো ওজনের চাপ তৈরি করলে? ব্যাগ টেনে নেয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় লাগবে, ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর কোনও পথ খুঁজতে হবে।

রানার হাতে একটা প্রোটিন-বার ধরিয়ে দিল সোহেল।

পরবর্তী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চিবিয়ে চলল ওরা। যে যার মত ভেবে চলেছে। সমাধান করতে চাইছে সামনের সমস্যা। আবারও আলো নিভিয়ে দিয়েছে রানা। গুহার একপাশ হতে অস্পষ্ট আলো আসছে। মুক্তির আলো জ্বলছে মনে, আবার খানিক পর হয়ে পড়ছে হতাশ। খুবই কাছে মুক্তি ওদের। কিন্তু মাঝখানে যেন জেলখানার প্রাচীর। পেরুবে কী করে? তারপর হঠাৎ রানার মনে জেগে উঠল সম্ভাবনার ঢেউ। এ কাজ তো খুব সহজ! আগে কেন মনে পড়েনি? নিজের উপর বিরক্ত হলো রানা।

'সোডিয়াম ক্লোরেটের জার্মান শব্দ কী, বল তো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটা এক রকম বিষাক্ত লবণ, পোকামাকড় মারতে কাজে লাগে।'

'ন্যাট্রিয়াম ক্লোর। শেষ ল্যাবোরেটরির ভিতর একটা জারের ভিতর দেখেছি।'

'আমিও। তোর সঙ্গে দ্বিতীয় ডেটোনেটর পেন্সিলটা আছে না?'

'আছে।'

'আমরা একটা অক্সিজেন মোমবাতি জ্বালব। আমি চলে যাওয়ার পর রেললাইনের লোহা চেঁছে জমিয়ে রাখবি। দুটো জিনিস যখন মিশে জ্বলে উঠবে, তৈরি হবে আয়রন অক্সাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড আর নিখাদ অক্সিজেন। পানির নীচে সুড়ঙ্গ ধরে অর্ধেক পথ গেলে ওখানে কোনও জায়গা খুঁজে নেব। ওখানে জ্বেলে দেব মোমবাতি। সাগরের পানিকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা নেবে অক্সিজেন। সেখানে পাব আমরা বড়সড় একটা বুদ্বুদ। ওটার ভিতর শ্বাস নেব।'

'আমি ছিলাম সায়েন্সে, আর বাজি মারলি তুই?' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল সোহেল। 'দারুণ আইডিয়া, দোস্ত্!'

'এ জিনিস শিখেছি উর্বশীর কাছ থেকে। আটকা পড়েছিলাম জাপানি এক দ্বীপে। প্রাণ যায়-যায় অবস্থা, তারই মধ্যে আমাকে জোর করে ধরে বুঝিয়েছে কী করে চলে অক্সিজেন জেনারেটার।'

ফ্ল্যাশলাইট ওর লাগবে, কাজেই সোহেলকে রেললাইনের পাশে রেখে রওনা হয়ে গেল রানা। ছুরি দিয়ে লোহা চেঁছে তুলবে এখন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মহা প্রতাপশালী চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ব্রিগেডিয়ার (অব.) শ্রীমান সোহেল আহমেদ।

হাসিমুখে ধসে পড়া ছাতের নীচ দিয়ে ফোকর গলে বেরুল রানা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল ডিসপেনসারি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সামুদ্রিক গুহায় ফিরতে। ততক্ষণে পুরনো রেল

চেঁছে যথেষ্ট লোহার কণা জমিয়েছে সোহেল।

ওদের ফ্ল্যাশলাইট এখন প্রায় নিভু-নিভু। সেই আলোয় কাজ শুরু করল। কেমিকালগুলো ওয়াইনের খালি বোতলের ভিতর ভরল রানা, ভাল ভাবে জড়িয়ে দিল অবশিষ্ট ইলেকট্রিক টেপ। এ সময়ে ডেটোনেটর খুলল সোহেল, কমিয়ে আনল বিস্ফোরকের চার্জ। ওদের কাজ শেষে বোতলের মুখে ডেটোনেটর বসাল রানা। এবার নিজেদের তৈরি অক্সিজেন জেনারেটার রাখল প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর।

ডকের কাছে বুট ও প্যান্ট খুলে ফেলল রানা, তারপর শার্ট। আস্তে করে নেমে পড়ল লেগুনে, বলল, 'পাঁচ মিনিটের ভিতর ফিরব।' পানিটা গোসলের উপযোগী, মৃদু উষ্ণ। শরীর থেকে ধুলো ধুয়ে নামিয়ে নিল সাগর। সহজ ভঙ্গিতে ব্যাকস্ট্রোক শুরু করল রানা। এক হাতে ব্যাগ ও ফ্ল্যাশলাইট, অপর হাতে সাঁতার কাটছে। পাতাল সুড়ঙ্গের দিকে চলেছে। ওদিকটায় রয়েছে মৃদু আলোর আভাস।

ব্যাগটাকে ভাসতে দিয়ে ডুব দিল রানা, খাড়া নেমে চলেছে। ওয়াটারপ্রুফ টর্চ চারপাশের পানিকে হালকা সবজেটে করে দিয়েছে। নোনা পানির কারণে জ্বলে উঠল চোখ, কিন্তু সেটাকে পাত্তা দিল না ও। প্রথমে চোখে পড়ল এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পাথর। সেগুলোর সঙ্গে লেগে রয়েছে বাদামি শেওলা ও শামুক। তবে পনেরো ফুট গভীরতায় পৌঁছে মিলল বড়সড় এক গুহা, বিকট হাঁ করে অপেক্ষা করছে। ওটার ভিতর দিয়ে চলাচল করত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সাবমেরিনগুলো। অনেক দূরে সূর্যালোক। ওদিক দিয়ে বেরুতে হবে ওদের।

আবার ভেসে উঠল রানা, খপ করে ধরে নিল ব্যাগ। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে চলেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড দূর করতে চাইল

সিস্টেম থেকে। বারকয়েক দম নেয়ায় হালকা হয়ে উঠেছে চিন্তা, এবার ঘুরতে শুরু করবে মাথা। আর দেরি না করে ডুব দিল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের সবজেটে আলো নেমে চলেছে। তারপর ঢুকে পড়ল পাতাল সুড়ঙ্গের ভিতর। মনে মনে প্রতি সেকেণ্ড গুনে চলেছে। এক মিনিট পেরুতে সময়টা গেঁথে নিল মগজে। খেয়াল করেছে সূর্যালোক এখন ঢের উজ্জ্বল। সাঁতরে চলেছে রানা, মন থেকে দূর করে দিয়েছে সমস্ত চিন্তা। সুড়ঙ্গের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে। তারপর পেরুল দেড় মিনিট। ছাতের দিকে আলো ফেলল রানা। দশ ফুট সামনে সুড়ঙ্গের ছাত যেন ছাতির মত। প্রাকৃতিক ভাবে উপরের দিকে গেছে। জায়গাটা ব্যাসে পাঁচ ফুট হবে, গভীরতা এক ফুট আন্দাজ।

প্লাস্টিক ব্যাগের ভিতর সামান্য যেটুকু বাতাস, তার কারণে ছাতের সঙ্গে প্রায় লেগে এগিয়ে চলেছে ব্যাগ। প্লাস্টিক হাতড়ে টাইমিং পেন্সিল বের করল রানা, অ্যাকটিভেট করল ডেটোনেটর। ঘুরে রওনা হয়ে গেল ফিরতি পথে। আসবার সময় যে গতিতে এসেছে, ঠিক সেই একই গতি তুলে ফিরছে। তিলতিল করে তিন মিনিট পেরুল, তারপর সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ও। উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। তার দশ সেকেণ্ড পর ডলফিনের মত সমতলে ভেসে উঠল। পানি ছেড়ে উপরে উঠে গেছে বুক ও মাথা। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিয়ে চলেছে।

'ঠিক আছিস তো?' অন্ধকার থেকে জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যাঁ।'

'পানিতে নামব?'

'নামতে পারিস।'

পরক্ষণে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার আওয়াজ পেল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে পৌঁছে গেল সোহেল। ওর কাঁধের দড়িতে ঝুলছে দু'জনের বুট। কোমরের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিয়েছে পোশাক। 'তোর সেল ফোন কণ্ডোমের ভিতর ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছি,' বলল সোহেল। 'প্যান্টের পকেটে পাবি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ধর্ তোর এই ফ্র্যাংকেনস্টাইন এক্সপেরিমেণ্ট ফেলই মারল, অক্সিজেনের বুদ্বুদ পেলাম না—তখন কী? আমরা এগুতে থাকব?'

দুনিয়ার সেরা সাঁতারু মাইকেল ফেল্‌প্‌স্‌ও পেরুতে পারবে না পুরো পথ। অক্সিজেন না পেলে মরতেই হবে। প্রিয় বন্ধুকে মিথ্যে আশ্বাস দিল না রানা, স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'সেক্ষেত্রে মরব আমরা। হ্যাঁ, এগুতে থাকব দু'জন মিলে।'

'বহুবার একসঙ্গে লড়েছি আমরা, দোস্ত,' মৃদু স্বরে বলল সোহেল। 'হয়তো একই সঙ্গে মরব। কী বলিস?'

'হতে পারে। এখন মন থেকে মৃত্যুর চিন্তা দূর করে দে। দেখিস, মরব না আমরা কোনদিন।'

খুদে ডেটোনেটর অনেক দূরে, পানির ভিতর কোনও কম্পন পাবে না ওরা। দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর বলল, 'তুই তৈরি, সোহেল?'

'হ্যাঁ। চল্।'

এতক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিয়েছে ওরা। শেষ ক'বার প্রাণপণে শ্বাস নিল। অতিরিক্ত অক্সিজেনের কারণে ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। একইসঙ্গে ডুব দিল দুজনে, চলেছে পাতাল-সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করে।

খচ-খচ করছে রানার মন। জোয়ার বোধহয় আবার শুরু হলো। সুড়ঙ্গের চওড়া মুখ দেখতে বিশ্রী লাগল। পাথরের প্যাসেজ যেন গিলে নিতে চাইছে ওদের। প্রায় নিভতে চলেছে

ফ্ল্যাশলাইট। সে আলোয় বেশি দূর দেখা যায় না। বাতি নিভিয়ে দিল রানা। দূরের অস্পষ্ট আলোর দিকে সাঁতরে চলেছে দু'জন।

দেড় মিনিট পেরুলে ফ্ল্যাশলাইট আবার জ্বেলে নিল রানা। অক্সিজেনের পকেট খুঁজতে শুরু করেছে। সুড়ঙ্গের কালো ছাত বৈশিষ্ট্যহীন। বুদ্বুদ থাকলে ওটার নীচের অংশ জ্বলজ্বল করবে। মনে হবে পারদ বা রূপা ঝিকঝিক করছে। কিন্তু আলো কিছুই দেখাচ্ছে না। শুধু কালো পাথরের দেয়াল। এগুনোর গতি কমিয়ে নিয়েছে রানা, ভাবছে কোথায় গেল ওর অক্সিজেন বুদ্বুদ। আর বড়জোর দু'চার সেকেণ্ড পাবে। তার ভিতর ঠিক করতে হবে দুঃসাহস নিয়ে সামনে বাড়বে, না বোকার মত খুঁজতে চাইবে সেই ছাতি। যদি না পায় সেই বুদ্বুদ? সেক্ষেত্রে মরতে হবে ওদের।

ছাতের এদিকে ওদিকে আলো ফেলছে রানা। হঠাৎ টের পেল, অনেক ডানে সরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বামে রওনা হলো। ওর সঙ্গে রয়েছে সোহেল। কিন্তু কোনও বুদ্বুদ চোখে পড়ল না।

তিক্ত অনুভূতি হলো রানার, ঠোঁট টিপে হাসল। তার মানে সময় শেষ? এবার মরবে ওরা? ওর অক্সিজেনের জেনারেটার কাজ করেনি। সোহেলকে সঙ্গে নিয়ে এসে মরণের হাতে তুলে দিয়েছে ও? একবার বামহাতে বন্ধুর কাঁধ ধরল রানা, নিঃশব্দে বলল, 'আমি দুঃখিত, দোস্ত। পারলাম না।'

ঠিক তখন পাল্টা খপ্ করে রানার হাত ধরল সোহেল। পরক্ষণে উপরের দিকে হাত তাক করে কী যেন দেখাতে চাইল। ওটা আরও খানিক বামে। ওদিকে আলো ফেলল রানা। মনে হলো ওখানে ঝিকমিকে আয়না। ওটার দিকে রওনা হয়ে গেল দুই বন্ধু। বুদ্বুদ ছেড়ে চলেছে। আর চাপ নেবে না ফুসফুস। খুব সাবধানে ভেসে উঠল ওরা ছাতির ভিতর।

ওদের খেয়াল রইল না কেমিকাল রিয়্যাকশনের ফলে বাতাস গরম। বদ্ধ জায়গায় কটু গন্ধ। যা পেয়েছে তাতেই খুশি হয়ে উঠেছে ওরা। বন্ধুর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল রানা।

'বেঁচেছি রে, শালা!' হেসে উঠল সোহেলও।

তিন মিনিট চলবার মত অক্সিজেন আছে কুঠুরির ভিতর। লোভীর মত শ্বাস নিল ওরা। আড়াই মিনিট পর ঠিক হলো আবার রওনা হবে ওরা। সামনে পড়ে রয়েছে অর্ধেক পথ।

'গুহা-মুখ দিয়ে যে আগে বেরুবে, সে বিয়ার কিনবে,' বলল সোহেল।

'ঠিক আছে,' রাজি হয়ে গেল রানা।

বারকয়েক দম নিল ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল।

পাশে সাঁতরে চলেছে সোহেল। ওর পায়ের পাতা একটু বড়। একহাত না থাকলেও ডেস্ট্রয়ারের মত এগুতে পারে। তবে মনে হলো আলোকচ্ছটা আগের মতই অনেক দূরে। এখন ভাটা চলবার কথা, ওটা ওদের বাইরে টেনে নেবে। অথচ ওদের গতি খুবই কম।

সোহেলের মনে পড়ল বিশ বছর বয়সে চার মিনিট ডুব দিয়ে থাকতে পারত। কিন্তু সে তো প্রায় আট বছর আগের কথা। এতগুলো বছর সিগারেট টেনেছে, মদ্যপান করেছে। এখন ও ডুব দিয়ে পানির নীচে থাকতে পারবে বড় জোর আড়াই থেকে তিন মিনিট। এর বেশি পারবে না। কে জানে রানার অবস্থা কী!

আড়াই মিনিট পেরিয়ে গেছে। স্বচ্ছ নীল পানির ভিতর সাঁতরে চলেছে ওরা পাশাপাশি। গুহা-মুখের আলো অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। তবে মনে হলো, এখনও অনেক দূরে, কোনদিন পৌঁছুতে পারবে না। হঠাৎ কণ্ঠার গোড়ায় টের পেল সোহেল, ওকে শ্বাস নিতেই হবে। পনেরো সেকেণ্ড পর মনে হলো ফুসফুস

ফাটতে চলেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অবশিষ্ট বাতাস। গুহা-মুখ এখনও ষাট ফুট দূরে! বারবার মন চাইল শ্বাস নিতে। দাঁত-মুখ খিঁচে রইল সোহেল। কিছুতেই গিলবে না লোনা পানি।

অদ্ভুত চিন্তা আসতে শুরু করেছে। এখন শেষ অক্সিজেনটুকু খরচ করছে মগজ। সোহেল বুঝতে পারছে, এবার যে-কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। আর চলতে চাইছে না হাত-পা। কেমন যেন অলস ভঙ্গিতে নড়ছে। মনে থাকতে চাইছে না সাঁতার কাটছে। আগেও ডুবতে গিয়ে বেঁচে গেছে সোহেল। কাজেই অনুভূতিগুলো বুঝতে পারছে। তবে এখন কিছুই করবার নেই। বিস্তৃত নীল সাগর যেন ডাকছে ওকে। কিন্তু আর কখনও ওখানে পৌঁছুনো হবে না।

থমকে গেল সোহেল। ঢকঢক করে কয়েক ঢোক পানি গিলে ফেলল। জ্বলে উঠল ফুসফুস। পেটে সামান্য গেলেও বেশিরভাগটা ফুসফুসে গিয়ে ঢুকেছে লবণাক্ত পানি। বমি আসতে চাইল, কিন্তু হলো না। এবার ডুবে মরবে, বুঝল সোহেল। 'বিদায়, দোস্ত্। কখনও ইচ্ছে করে তোর মনে দুঃখ দিইনি, যদি কোনও ভুল করে থাকি, মাফ করে দিস। তোর মতন বন্ধু পেয়েছিলাম, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া! আমি... তোকে... সত্যি বলছি...'

ঠিক তখনই কে যেন খপ্ করে কোমর জড়িয়ে ধরল ওর, টেনে নিয়ে চলেছে সামনে।

রানা টের পেয়েছে, সোহেলের দম শেষ। কাজেই ডান হাতে জড়িয়ে ধরেছে প্রিয় বন্ধুর কোমর। ওর নিজের দমও প্রায় শেষ। তবে দু'পা ছুঁড়তে শুরু করেছে পিস্টনের মত। অন্য হাতে পানি কেটে চলেছে যন্ত্রের মত।

আগে কখনও এত অসহায় বোধ করেনি সোহেল। আবছা

ভাবে টের পেল, ওর বন্ধু ওকে বাঁচাতে চাইছে। এর ফলে হয়তো মরবে ও-ও! অথচ ওকে ছেড়ে দিলে...

রানা যেন মানতে রাজি নয় ওরা মরতে পারে।

হঠাৎ যেন ডালের পানির মত পাতলা হয়ে গেল সাগরের জল। গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। একার শক্তিতে সারফেসে উঠে এল রানা। হড়হড় করে বমি করল সোহেল। তারই ফাঁকে দম নিতে শুরু করেছে। গুহা-মুখের পাথর ধরে ভেসে রইল দুই বন্ধু। চারপাশে কলকল করে বইছে সাগরের স্রোত। মনে হলো জীবনটা বড় মধুর!

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, কোনও কথা বলতে পারল না ওরা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বলবার মত কথা থাকেও না।

'সিগারেট ক'টা খাস?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল সোহেল। 'আমার লাগে পঁচিশটা।'

'আমার দশ।'

'আয় ছেড়ে দিই।'

'চেষ্টা করা উচিত। তবে আগে জরুরি কথায় আসি, বিয়ার খাওয়াবি তুই। তোকে আগে গুহা থেকে ঠেলে বের করেছি, পরে বেরিয়েছি আমি।'

'ঠকিয়েছিস, শালা!'

'আর তুমি শালা যে আমাদের সবাইকে চিট করে মরতে বসেছিলে?'

বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'দেখ্ দোস্ত, তুই জানিস আমি হয়তো বিয়ে-টিয়ে করতে পারি, সেজন্যে মেলা পয়সা লাগবে, তোরা বন্ধু হয়ে যদি এভাবে বাড়তি খরচ করিয়ে দিস...'

'অ্যাইও, চোপ্!' সোহেলকে ভয়ঙ্কর এক ধমক দিল রানা,

'ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড!'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা টিলা বেয়ে এগুলো ওরা। আরও আড়াই ঘণ্টা লাগল জাপানিজ ইনস্টলেশন ঘুরে লুকিয়ে রাখা জিপের কাছে পৌঁছতে। ততক্ষণে সেল ফোনের ছবিগুলো বারকয়েক দেখেছে রানা। ওর মন বলছে, এগুলো কোনও ধরনের জরুরি প্রমাণ। রেসপন্সিভিস্টদের এই গোলমেলে কেস সমাধান করতে হলে এগুলোর খুবই প্রয়োজন।

ছয়

মার্ভেলের জিমনেশিয়ামে ফু-চুংকে পেল আতাসি। চিনাম্যানের পরনে মার্শাল আর্টের ব্যাগি প্যান্ট, তবে শার্ট নেই। দোহারা শরীর থেকে দরদর করে নামছে ঘাম। কারাটে স্টান্স নিয়েছে, প্রতিটি পাঞ্চ ও চপ মাপা। অপেক্ষা করছে আতাসি, খেয়াল করেছে ফু-চুং। শেষ রাউণ্ডহাউস লাথি দিয়ে দুলিয়ে দিল স্যাণ্ড ব্যাগকে।

ইউনিভার্সাল ওয়েইট মেশিনের পাশে বিন, ওটা থেকে সাদা তোয়ালে নিল ফু-চুং, বুক-পেট-ঘাড় মুছল।

'মস্ত ভুল করেছি,' কোনও ভূমিকা ছাড়াই বলল আতাসি। 'মোফিজ বিল্লাহ্ পার্লা মোনার ইন্টারভিউ নেয়ার পর, আবারও ওই টেপ শুনেছি। কম্পিউটার নতুন করে প্রোগ্রামিং করেছি। ক্রিস ক্রিংগল পার্লা মোনার কথা বলেনি। বলেছে পার্ল অভ মুন।

ওটা গোল্ড অভ মার্সের সিস্টার শিপ। মিস্টার অনিল খুঁজে বের করেছেন রেসপন্সিভিস্টদের ওখানে সি রিট্রিট আছে। ওটা নিয়েই কথা বলেছিল ক্রিস ক্রিংগল।'

'ওটা এখন কোথায়?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'পুব মেডিটারেনিয়ানে। শীঘ্রি ইস্তাম্বুলে ডক করবে। ধরুন বিকেলে। তারপর যাবে ক্রিটে।' ফু-চুং কিছু বলবার আগেই বলল আতাসি, 'আমি বসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি। তবে সাড়া দেননি তিনি।'

রানা-সোহেল অন্য অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত, ব্রাঙ্কোর হাতে বন্দি উর্বশী, জাহাজের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে ফু-চুঙের উপর।

'ওই জাহাজে কোনও অসুস্থতার কথা জানা গেছে?'

'এখনও না।'

'গুড।'

'স্বর্ণা, কাশেম আর জলিল ওখানে যেতে চাইছে। আপনি চাইলে পাঠাতে পারেন।'

থমথম করছে ফু-চুঙের মুখ। 'কিন্তু ওখানে যদি কেমিকাল বা বায়োলজিকাল আক্রমণ হয়, ওদের উপর রোগের হামলা হবে।'

'হতে পারে তেমন, তবে এই সুযোগ আমাদের ছাড়া উচিত না। নিজেদের লোক তুলে দিতে পারব ওখানে। ওদের কাছ থেকে তথ্য পেলে সেগুলো জরুরি হতে পারে।'

মস্ত ঝুঁকি, বদলে বড় প্রাপ্তি—এ নিয়ে ভাবতে শুরু করল ফু-চুং।

'ওরা রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট নিয়ে তীরে নামতে পারে,' বলল আতাসি। 'নিসে অপেক্ষা করছে জেট বিমান। চাইলে ওরা ইমার্জেন্সি ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করতে পারে। বেশি সময় লাগবে

না পার্ল অভ মুনে উঠতে। যতক্ষণ বন্দর থেকে জাহাজ রওনা না হয়, নিশ্চয়ই হামলা করবে না রেসপন্সিভিস্টরা। বন্দর ছাড়ার আগেই জাহাজে উঠবে ওরা। চারপাশ ঘুরে দেখবে।'

'পরিকল্পনা মন্দ নয়,' বলল ফু-চুং। ঘুরে রওনা হয়ে গেছে আতাসি, ওকে পিছন থেকে ডাক দিল। 'তবে বন্দর ছাড়ার সময় ওরা যেন জাহাজে না থাকে। পার্ল অভ মুন রওনা হওয়ার আগেই নেমে পড়তে হবে।'

'ওদের বুঝিয়ে দেব। কোন দু'জনকে পাঠাব?'

'স্বর্ণা আর কাশেমকে। জলিল রয়ে যাক। শুনেছি কাশেম আর স্বর্ণা ওয়েপন্স-এর উপর নতুন ট্রেইনিং নিয়েছে। তার ভিতর ছিল কেমিকাল ও বায়োলজিকাল ওয়েপন্স। ওরা বুঝবে কীভাবে ডিসপার্সাল করতে হয়।'

'ঠিক আছে।'

দ্বিতীয়বারের মত বাধা দিল ফু-চুং। 'আরেক প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের কান পাতার কাজ কেমন চলছে?'

ইহুদি ব্যবসায়ী ব্যালফোর জেনকিন্সের বিলাসবহুল ইয়ট মাউন্ট অভ সিনাই সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে মন্টি কার্লো বন্দর থেকে বেরিয়ে গেছে। ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের সঙ্গে রয়েছে সৌদি প্রিন্স ইবনে আল-কাশিম ও তার সুদর্শন দুই কিশোর নোকর। প্রিন্সের ধারণা রূপে তারা বেহেস্তি হুরদেরকেও হারাতে পারে। প্রতিদিন একবার হলেও তাদের সঙ্গে শোয় সে। প্রচুর টাকা ঢালছে প্রিন্স মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলোর পিছনে। জানা গেছে আল কায়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। নিজেই এখন ওই ধরনের আরেকটা সংগঠন তৈরি করতে চাইছে।

এখন পর্যন্ত ওই ইয়টে জরুরি কোনও আলাপ হয়নি। ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাসিনোতে গিয়ে মদ-

জুয়া-সাকী নিয়ে ফুর্তি করছে প্রিন্স। কিন্তু যখন বন্দর থেকে বেরিয়ে এল ইয়ট, চলে এল উপসাগরে, তখন থেকে সত্যিকারের কাজ শুরু করল মার্ভেলের ক্রুরা। ওরা জানে মূল দরদাম চলবে বন্দর থেকে দূরে, সবার চোখের আড়ালে।

ইয়টের বাতির আলো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকগুলো জানে না দিগন্তের ওপাশে অপেক্ষা করছে মার্ভেল। ইজরায়েলি আর্মস ডিলার পুরো বিশ মাইল দূরে সরে মেগা ইয়টের ইঞ্জিন বন্ধ করেছে। তার ধারণা হয়েছে চারপাশের সাগরে কেউ নেই। পিছনের ডেকে জানালার ওপাশে হালকা ডিনারের ফাঁকে প্রিন্সের সঙ্গে দরদাম নিয়ে আলাপ শুরু করেছে ব্যালফোর জেনকিন্স।

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ও জাহাজের থ্রাস্টারের সুবিধা নিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করেছে গগল। ইয়টের সঙ্গে একই তালে সরছে মার্ভেল। ওটার উঁচু মাস্তুলের উপর রাখা সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিকস্ মনিটর করে চলেছে ইয়টকে। স্টেট অভ আর্ট প্যারাবোলিক রিসিভার হাই-রেযোলিউশন ক্যামেরা জানিয়ে চলেছে আমর্স ডিলার ও প্রিন্সের ঠোঁট কীভাবে নড়ছে। ফোকাস করা লেজার বিম ধরছে কে কী সুরে কথা বলে চলেছে। মার্ভেলের ক্রুরা, বিশেষ করে আতাসি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে কী বলা হচ্ছে।

'শেষ শুনেছি ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের কাছ থেকে সিএ-সেভেন গ্রেইল মিসাইল সম্পর্কে জানতে চেয়েছে প্রিন্স।'

'গ্রেইল ফালতু,' বলল ফু-চুং। 'ও জিনিস দিয়ে কোনও যুদ্ধ-বিমান ফেলা অসম্ভব। তবে সিভিলিয়ান বিমান ফেলতে পারে।'

'প্রথম থেকে বলে চলেছে ইজরায়েলি আর্মস ডিলার, সে জানতে চায় না এসব অস্ত্র দিয়ে কী করবে প্রিন্স। এদিকে প্রিন্স জানিয়েছে নীচ থেকে বিমান ফেলবার মত অস্ত্র দরকার তার।'

'আর কিছু?' শার্ট পরতে শুরু করেছে ফু-চুং।

'আল-কাশিম নিউক্লিয়ার অস্ত্রও চেয়েছে। তবে জেনকিন্স জানিয়েছে তার হাতে ওই জিনিস নেই। কখনও যদি হাতে পায়, বিক্রি করবে।'

'বাহ্!'

'আরও বলেছে, তার হাতে যদি জিব্রাইলের মুষ্টি আসত, তা হলে সেটাও বিক্রি করে দিত। ওই অস্ত্র নাকি খুব টেকনিকাল। এরপর আবদার শুরু করে প্রিন্স। তখন আর্মস ডিলার বলে ওটার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এরপর আবার নতুন করে আলাপ শুরু হয় গ্রেইল নিয়ে।'

'জিব্রাইলের মুষ্টি? ওটা কী?'

'জানি না। মিস্টার অনিলের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনিও জানেন না।'

'হয়তো রানা জানে। হাতে আগে তথ্য আসুক, তারপর ঠিক করব কী করা যায়। ডিয়েটস কেসলার বা রানা যোগাযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে লাইন দেবেন আমাকে।'

'আপনার কি মনে হয়, মিস উর্বশী বেঁচে আছেন?'

'জানি না। তবে ওর কিছু হলে ডিয়েটস কেসলার শেষ। তাকে ছাড়ব না আমরা।'

কালচে-ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে রইল ব্রাঙ্কো। দূর থেকে ছুটে আসছে হলদে কপ্টার। ওটা ছাইরঙা মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়েছে। প্রচণ্ড ক্রোধ চেপে রেখেছে ব্রাঙ্কো নিজের ভিতর। এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি ওকে কাঁচকলা দেখিয়ে কীভাবে পালিয়ে গেল ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি। নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে তার। কোনও ব্যাপারে কাউকে কৈফিয়ত

দেবার মত লোক নয় যে, অথচ এখন ঠিক সেই কাজেরই রিহার্সাল দিতে হচ্ছে। চারদিকে বৃষ্টির পানি, তার মাঝে হেলি-প্যাড। ওখানে নামতে শুরু করেছে কপ্টার।

পাইলট ছাড়া ডিয়েটস কেসলারের সঙ্গে রয়েছে আরেকজন লোক। ওই লোকের দিকে চাইল না ব্রাঙ্কো, সমস্ত মনোযোগ কেসলারের দিকে। এই মানুষটাকে পীরের মত মানে সে। কেসলার সবদিক থেকে তার চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সে এই মানুষটিকে। তার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় সে অনেক ক্ষুদ্র। এ মুহূর্তে নিজেকে ঘৃণা করছে ব্রাঙ্কো। ডুবিয়ে দিয়েছে সে তার পীরকে।

কপ্টারের দরজা খুলল কেসলার, ঝড়ো হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে তার উইণ্ডব্রেকার। দুলছে কাঁধের দীর্ঘ চুল। কী করে যেন এই তুমুল হাওয়ার ভিতর নিজেকে সামলে রেখেছে কেসলার। প্রতি পদক্ষেপ মাপা। একটু কুঁজো হয়ে কপ্টারের পাখা এড়িয়ে এদিকে চলে এল। মিষ্টি হাসছে। ব্রাঙ্কো পাল্টা হাসতে পারল না। মন জানিয়ে চলেছে, ওই অদ্ভুত সুন্দর হাসি উপহার পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে সে! চোখ সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, প্রথমবারের মত চাইল দ্বিতীয় প্যাসেঞ্জারের দিকে।

রাগ উধাও হলো তার, বদলে চোখে ফুটে উঠল দ্বিধা।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, জ্যারোন,' কপ্টারের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল কেসলার। বুঝতে পেরেছে বিস্মিত চোখে চেয়ে রয়েছে তার সিকিউরিটি চিফ। কেসলার মৃদু হেসে ফেলল। 'তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ? ভাবছ, এই লোক কেন আমার সঙ্গে?'

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল ব্রাঙ্কো, চোখ সরাল না ডক্টর

চার্চের উপর থেকে। 'জী, স্যর।'

হাতের ইশারা করে ডক্টরকে দেখাল কেসলার, 'সবই বুঝবে। সময় হয়েছে সব জানবার। ভবিষ্যতে এসব ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।'

লিয়োনার্দো সামনে বাড়ল, একহাতে আলতো করে স্পর্শ করল মাথার ব্যাণ্ডেজ। রোমের হোটেলে ওই জখম তৈরি করেছে ব্রাঙ্কো। 'এ নিয়ে কোনও রাগ বা নালিশ নেই আমার। যা হওয়ার হয়েছে, মিস্টার ব্রাঙ্কো।'

দশ মিনিট পর আণ্ডারগ্রাউণ্ড বেসের ভিতর ঢুকে পড়ল তারা, চলে এল দুনিয়ার সেরা বিলাসবহুল সুইটে। সামনের গোলমেলে সময়ে এই সুইটে থাকবে ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রী। এই ফ্যাসিলিটিতে স্থান পাবে রেসপন্সিভিস্ট সংগঠনের সেরা দুশো সদস্য।

এখানে শেষবার যখন আসে কেসলার, তখন ছিল শুধু ন্যাড়া কংক্রিটের চারটে ঘর। চারপাশে চেয়ে অবাক হলো কেসলার। অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে সব। বিশেষ করে এই সুইট। দু'পাশে জানালা, তবে সেগুলো আসলে ফ্ল্যাট-প্যানেল টেলিভিশন। ওগুলোর কারণে বুঝবার উপায় নেই এই সুইট মাটির পঞ্চাশ ফুট নীচে।

'এ তো আমাদের বেভারলি হিলসের বাড়ির মতই সুন্দর,' না বলে পারল না কেসলার। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল দামেস্ক সিল্কের দেয়াল। 'বার্থা খুব পছন্দ করবে এই সুইট।'

অপেক্ষা করছে এক অ্যাটেণ্ডেন্ট, চেহারা চকচক করছে তার সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতিতে। তার কাছে কফি চাইল কেসলার, বসে পড়ল উইংব্যাক চেয়ারে। ফ্ল্যাট-প্যানেল মনিটর দেখিয়ে চলেছে সাগর। পাথুরে উপকূলে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। এই ছবি

আসছে এক ক্যামেরা থেকে। সেটা বসানো হয়েছে বেসের প্রবেশ-পথের কাছেই।

আরামদায়ক এক সোফায় বসে পড়ল ডক্টর চার্চ। একটু দূরে দাঁড়িয়েছে ব্রাঙ্কো, মনোযোগ পুরোপুরি কেসলারের প্রতি।

'বোসো, জ্যারোন।'

একটা চেয়ারে বসল সার্ব, তবে আড়ষ্ট বোধ করছে।

'হয়তো পুরনো একটা কথা শুনেছ, "বন্ধুদের কাছে রাখো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক কাছে রাখো শত্রুদের?"' ভ্যালে কফি ঢেলে দিল কেসলারকে। 'আমাদের সত্যিকারের শত্রু তারা নয়, যারা আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। সমালোচনা করে, না বুঝেই। কিন্তু তারাই আসলে সবচেয়ে বড় শত্রু, যারা আগে বিশ্বাস করত, পরে চলে গেছে দূরে। এরা আমাদের মস্ত ক্ষতি করতে পারে। আমরা বাইরের লোককে গোপন তথ্য দিইনি, কিন্তু যাদের দিয়েছি, যারা নিজেদের লোক ছিল, তারা আমাদের সর্বনাশ করতে পারে। আমি এ বিষয়ে বহুদিন আলাপ করেছি ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেলের সঙ্গে।'

রেসপন্সিভিজমের প্রণেতার কথা শুনে একটু মাথা দোলাল ব্রাঙ্কো, চট্ করে চাইল ডক্টর চার্চের দিকে। নীরবে যেন বলতে চাইল, যে ঘরে ওই পীরের কথা উঠল, সেখানে তুমি মানাচ্ছ না। সাইকিয়াস্ট্রিস্ট পাল্টা চাইল ব্রাঙ্কোর দিকে। ঠোঁটে প্রায় পিতৃ-সুলভ হাসি।

'সাধারণ মানুষের সব সন্দেহের বাইরে, অথচ আমাদের নিজস্ব, বিশ্বস্ত লোক, এমন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছেন ডক্টর চার্চ,' বলল কেসলার। 'ইনি এমন এক সম্মানিত ব্যক্তি যাঁর কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যায় মানুষ। রেসপন্সিভিজমের নীতি থেকে যারা সরে গেছে, নিজ ইচ্ছায় বা পরিবারের চাপে তাদের

একমাত্র আশ্রয়স্থল হচ্ছেন এই ভদ্রলোক। বিনা দ্বিধায় এঁর কাছে চলে আসে তারা সংশোধন ও চিকিৎসার জন্য। জানে না, তাদের সব কথা পাচার হয়ে চলে আসছে আমাদের হাতে।'

শ্রদ্ধার ছাপ পড়েছে ব্রাঙ্কোর মুখে। একবার দেখে নিল ডক্টর চার্চকে। 'আমি এভাবে ভাবিনি আগে!'

'এই প্লটের মূল কথাটা তুমি এখনও জানো না,' বলল কেসলার। 'সত্যিকার ভাবে মাত্র একজনই ছিলেন যিনি এই কাজ হাতে নিতে পারতেন।'

'কে তিনি?' জানতে চাইল ব্রাঙ্কো।

'কেন, আমি, মাই-বয়,' বলল চার্চ। 'প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখ বদলে নিলাম, ব্যবহার শুরু করলাম কন্ট্যাক্ট লেন্স-এর। এভাবে চলল গত বিশ বছর। কাজেই আমাকে চিনতে পারোনি বলে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না।'

ডক্টরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল ব্রাঙ্কো। কিছুক্ষণ পর মিইয়ে যাওয়া কণ্ঠে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে...'

'আমিই লিঙ্ক চ্যাপেল, মিস্টার ব্রাঙ্কো।'

'কিন্তু... আপনি তো মারা গেছেন,' না বুঝেই বলে উঠল সার্ব।

'যে পেশায় রয়েছ, তুমি ভাল করেই জানো, কেউ তখনই মরেছে বলা যায়, যখন তার লাশ পাওয়া যায়—তার আগে নয়। আমি সারাজীবন বহুবার ইয়ট বা বোট নিয়ে সাগরে বেরিয়েছি। ওই ঝড়ে আমার মরবার কথা, তাই না? কিন্তু তা হয়নি। ওই পরিবেশের চেয়ে অনেক খারাপ পরিবেশেও আমি টিকে গেছি।'

'আমি ঠিক...'

বলে উঠল কেসলার, 'তাঁর লেখা দিয়ে রেসপন্সিভিজম প্রতিষ্ঠা করেছেন লিঙ্ক, আমাদের কাজ করবার পথ দেখিয়ে

দিয়েছেন। আজ আমরা যে অবস্থায়, তার সবকিছুর মূলে এই মানুষ—লিঙ্ক চ্যাপেল। তাঁর বিশ্বাস বুকে ধারণ করেছি আমরা।'

'তবে আমি ভাল সংগঠক নই,' বলল চ্যাপেল। 'আমার চেয়ে অনেক দক্ষ সংগঠক আমার মেয়ে আর ডিয়েটস। এরা আমার সব কৃতিত্ব ম্লান করে দিয়েছে। আমি সবার সামনে সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারি না, মিটিং-এ কথা আটকে যায়—কিন্তু ওদের সেরকম কোনও সমস্যা নেই। আমি নিজ চোখে দেখলাম তিলতিল করে বড় হয়ে উঠছে এই সংগঠন। ভিন্ন একটা চরিত্র নিলাম আমি, আমার কাজ ওদের রক্ষা করা। আমি হয়ে উঠলাম রেসপন্সিভিস্টদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরে বাইরে তাই রইলাম। খেয়াল রাখলাম কেউ ক্ষতি করতে চায় কি না এ সংগঠনের।'

'আর যে লোকগুলোকে রিপ্রোগ্রাম করে আমাদের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিলেন, সেটা?' শ্বাস আটকে ফেলেছে ব্রাঙ্কো।

'ওরা এমনিতেই ঝরে যেত,' মৃদু হাসল ডক্টর। 'আমি শুধু ক্ষতি কমিয়ে এনেছি। আমাদের প্রতি খারাপ মনোভাবকে কমিয়ে দিয়েছি। এসব লোক চলে গেছে, তবে তাদের নতুন কোনও তথ্য দেয়া হয়নি।'

'আর রোমে যেটা হলো?'

'খুব বিশ্রী ভাবে সব ঘটল,' বলল চ্যাপেল। 'আমাদের জানা ছিল না অমল দাশার বোন রেসকিউ টিম ভাড়া করতে পারে। যখন জানলাম, সঙ্গে সঙ্গে কেসলারকে জানালাম। এরপর যখন ছেলেটাকে রোমে নিয়ে এল, জানিয়ে দিলাম আমরা কোথায় উঠছি। যাতে তোমরা তৈরি থাকতে পারো। সে ছেলের নাম, হোটেলের নাম ও রুম নম্বর দিলাম। যাতে ছেলেটাকে পাল্টা কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারো। আমরা জানি না এ ছেলে

কতখানি জানে, বা বোনকে কতখানি জানিয়েছে।'

'অন্য প্রসঙ্গে আসি এবার,' বলল কেসলার। 'কতটা জানলে, জ্যারোন?'

কার্পেটের দিকে চোখ নামিয়ে নিল ব্রাঙ্কো। এখন সব খুলে বলতে হবে, তার চেয়ে খারাপ, চোখের সামনে দুনিয়ার সেরা সেই মানুষ, পীর ডক্টর চ্যাপেল, যাঁর ফিলোযফি তার জীবন পাল্টে দিয়েছে—এঁদের কী করে বলবে সে ব্যর্থ হয়েছে?

'জ্যারোন?'

'মেয়েটা পালিয়ে গেছে, মিস্টার কেসলার। জানি না কীভাবে সম্ভব হলো, কিন্তু ও ওর সেল থেকে বেরিয়ে যায়। উঠে যায় উপরে। দুই লোককে আহত করে, এক মেকানিককে খুন করে বেরিয়ে যায় এখান থেকে।'

'এখনও দ্বীপে রয়েছে?'

'একটা এটিভি চুরি করেছে গত রাতে। তখন ভীষণ ঝড় বইছে। মাত্র কয়েক ফুট দেখতে পাওয়ার কথা। খেয়াল করেনি টিলার শেষে সামনে রাস্তা নেই। অনেক নীচে পাথরের ভিতর পাওয়া গেছে গাড়িটা। আমার সার্চ পার্টি অবশ্য লাশ পায়নি।'

'লাশ যতক্ষণ না পাওয়া যায়, নিশ্চিত হওয়া যায় না কেউ মরেছে,' নিচু স্বরে বলল চ্যাপেল।

'আপনার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, স্যর, ওই মেয়ে ঝড়ের ভিতর ভয়ঙ্কর কোনও দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে,' বলল ব্রাঙ্কো। 'সে যখন পালানোর চেষ্টা করে, তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমি মনে করি না সারারাতের ঝড়ে টিকতে পেরেছে।'

'তাই?'

শয়তান মেয়েটির কাছ থেকে পাওয়া বায়োইলেকট্রিক

ইমপ্ল্যান্টের ব্যাপারে একটি কথাও বলল না সে। ওই জিনিস সঙ্গে থাকবার কী অর্থ তা কারও না বোঝার কথা নয়। এসব বলতে গেলে তার নিজের যোগ্যতা খাটো হয়ে যায়। ইজিয়ান সাগরে রেসপন্সিভিস্টদের এই দ্বীপ জুড়ে মেয়েটিকে খুঁজে চলেছে তার সার্চ পার্টি। যদি লাশ পাওয়া যায়, বা তাকে বন্দি করা যায়, সরাসরি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে সার্চ পার্টির লিডার। মেয়েটাকে যদি জীবিত পাওয়া যায়, এবার সমস্ত তথ্য আদায় করবে সে তার পেট থেকে। তারপর সুনাম নষ্ট হওয়ার আগেই তাকে খুন করবে। নিচু স্বরে বলল ব্রাঙ্কো, 'লাশ না পাওয়া পর্যন্ত সার্চ চলবে।'

'গুড,' আস্তে করে মাথা দোলাল চ্যাপেল।

চ্যাপেলের দিকে পুরো মনোযোগ দিল ব্রাঙ্কো, 'স্যর, গত ক' বছর ধরে আপনার হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনার শেখানো পথ আমাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। জীবন সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগে আমি জানতাম না অর্থবহ জীবন কাকে বলে। তাই আমার খুবই ইচ্ছে করছে একবার আপনার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, জ্যারোন। তবে আমার পক্ষে কারও সঙ্গেই হ্যাণ্ডশেক করা আর সম্ভব নয়। দেখতে অনেকটা কম বয়সী মনে হলেও আসলে আমার অনেক বয়স। সত্যি বলতে কী, নব্বুই পেরিয়ে এসেছি অনেক আগে। আমি যখন জেনেটিক রিসার্চ করতাম, সে-সময়ে হঠাৎ করে আমার ডিএনএর জন্য উপযোগী অ্যান্টিরিজেকশন ড্রাগ আবিষ্কার করে ফেলি। ফলে নিজের শরীরে বিভিন্ন লোকের হার্ট, লাংস, কিডনি ও চোখ ট্র্যান্সপ্লান্ট করা সহজ হয়ে যায়। কসমেটিক সার্জারি করে আমার বয়সটা কমিয়ে নিই। কিন্তু আমার হিপের হাড়, হাঁটু ও পিঠের

ডিস্ক সব আর্টিফিশিয়াল। প্রতিদিন ব্যালান্সড ডায়েট নিই, কালেভদ্রে কখনও অতি অল্প পরিমাণে ড্রিঙ্ক করি। জীবনে ধূমপান করিনি। কাজেই আশা করি অনায়াসে এক শ' বিশ বছর পার করে দিতে পারব।' গ্লাভস্ পরা দুই হাত তুলল সে। আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আঁকড়ে রয়েছে, ঠিক যেন প্রাচীন গাছের শিকড়। 'তবে আমার বংশে রয়েছে আর্থরাইটিস, চেষ্টা করেও আমি হাতদুটো অক্ষত রাখতে পারিনি। খুব খুশি হতাম তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে পারলে, কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

'জী, বুঝতে পেরেছি,' চ্যাপেলের ভিতর কোনও দ্বিধা দেখল না ব্রাঙ্কো। যে-লোক পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে চায়, সে নিজে নকল প্রত্যঙ্গ নিয়ে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে জীবনকে।

'আর চিন্তা কোরো না,' বলল চ্যাপেল, 'অমল দাশা গ্রিসে থাকবার সময় তেমন কিছুই জানতে পারেনি। যদি ওর বোন সব জানত, কর্তৃপক্ষের কাছে যেত, তাতেও তারা এত কম সময়ে কিছুই করতে পারত না। মেয়েটিকে ইন্টারোগেট করা ছিল ছোট একটা কাজ। সেটাকে বলতে পারো, ছেঁড়া সুতো বেঁধে নেয়া। এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা কোরো না, জ্যারোন।'

'জী, স্যর,' বিগলিত স্বরে বলল ব্রাঙ্কো।

'এবার আসা যাক অন্য বিষয়ে,' বলল ডিয়েটস। 'আমরা আমাদের টাইম-টেবিল এগিয়ে এনেছি।'

'ওরা অমল দাশাকে তুলে নেয়ার কারণে?'

'খানিকটা তা-ই। বলতে পারো ক্রিস ক্রিংগলের আত্মহত্যার কারণেও। গ্রিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও ঝামেলার মধ্যে পড়িনি আমরা, তবে এথেন্সের কর্তৃপক্ষ কেন জানি হঠাৎ করে আমাদের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। লিঙ্ক আর আমি ঠিক করেছি, এখনই ট্রেইনিদের কাজে নামিয়ে দেয়া উচিত। ওরা সব

জানতে চাইছে, কাজেই দেরি করে লাভ নেই। স্বল্প নোটিসে বাড়তি টাকা দিয়ে টিকেট কিনে নিয়েছি আমরা।' মৃদু হাসল ডিয়েটস। 'টাকা নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই, তুমি তো জানো।'

'পুরো পঞ্চাশটা টিমকে পাঠিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ। ঊনপঞ্চাশটা টিমকে। পার্ল অভ মুনে ইতিমধ্যেই উঠেছে বাকি দলটি। ওরা ট্র্যান্সমিটারের ফাইনাল টেস্ট করবে। কাজেই পঞ্চাশটা দলের জন্য পঞ্চাশটা ক্রুজ শিপ। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে লাগবে তিন থেকে চারদিন। বেশ কিছু জাহাজ এখন সাগরে। অন্যগুলো রয়েছে দুনিয়ার উল্টো দিকে। আমাদের সদস্যরা ফিলিপিন্সে তৈরি চ্যাপেলের ভাইরাস সঙ্গে নেবে। ...এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার কী ধারণা, প্রথম পরীক্ষা করতে কত সময় লাগতে পারে?'

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে ভাবল ব্রাঙ্কো, তারপর বলল, 'ধরুন আজ বিকেল? অন্য ইঞ্জিনগুলোর ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। পুরো পাওয়ার স্ট্যাবিলাইজ করতে হবে। নইলে রক্ষা করা যাবে না অ্যান্টেনা।'

'পার্ল অভ মুনে আমাদের যে টিমকে টেস্ট ভাইরাস দিয়েছি, ওটা খুব সহজ ধরনের, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মত রাইনোভাইরাস। কাজেই আগামী বারো ঘণ্টার ভিতর টের পাব রিসিভার সিগনাল পেল কি না। আজ রাতে যদি তথ্য পাঠানো হয়, তাতেই চলবে। অবশ্য ওই জাহাজে অন্য একটা টিম কাজ করছে। ওরা সত্যিকারের ভাইরাস প্লান্ট করবে।'

'সত্যিই দারুণ এক সময়,' বলল লিঙ্ক চ্যাপেল। 'সব কাজ সারবার পর এবার সত্যিই ঘটতে চলেছে ব্যাপারটা, আমরা গড়তে চলেছি ইতিহাস। কত বছর অপেক্ষা করেছি আমরা? কিছুদিনের মধ্যে নতুন করে জন্ম নেবে পৃথিবী। এ যেন এক

নতুন ভোর। মানবতার বিকাশ ফুলের মত সুবাস ছড়াবে। এমনই হওয়া উচিত ছিল। এক সময়ে অতিরিক্ত মানুষ থাকবে না। খাবার জোটাতে এত কষ্ট হবে না। আয়কর নিয়ে ভাবতে হবে না কাউকে। সবার থাকবে প্রচুর সম্পদ। এক শ' বছরের ভিতর পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা নেমে আসবে দু'চার কোটির ভিতর। মানুষের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পাবে সবাই। দারিদ্র্য থাকবে না। হানাহানি থাকবে না। ক্ষুধা থাকবে না। এমন কী গ্লোবাল ওয়ার্মিংও থাকবে না।

'এতকাল মুখে এসব বলে এসেছে রাজনীতিকরা, তবে আসল কাজ কিছুই করেনি। মানুষ বুঝবে ওদের সব ছিল মিথ্যা আশ্বাস। খবরের কাগজ পড়লে বা টিভির দিকে তাকালেই বোঝা যায় কিছুই আসলে বদলে যায়নি। দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। একটু জমির জন্য পাগল হয়ে উঠছে মানুষ, পানির অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই করছে। শেষ হয়ে আসা খনিজ তেলের জন্য কত লক্ষ মানুষ মরল?

'বিজ্ঞানীদের দিয়ে রাজনীতিকরা বলিয়েছে সব ঠিক হয়ে যাবে, শুধু যদি মানুষ তাদের অভ্যেস বদলে নেয়। কম গাড়ি চালাতে হবে, ছোট বাড়ি তৈবি করতে হবে, খেতে হবে কম, বাতি জ্বালতে হবে কম—আরও কত কী! সব যেন কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। কেউ নিজের সুবিধা ছাড়তে রাজি নয়। মানুষ এমনই হয়। আসলে ছোটখাটো কোনও পরিবর্তন দিয়ে কিছুই হবে না। কেউ আসল সমস্যা নিয়ে ভাবতেই চায়নি। তাই পৃথিবীও বদলে যায়নি। আরও অনেক কম সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে এখন।

'আমরা জানি পৃথিবী রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় জনসংখ্যা কমিয়ে আনা। এবং এই কথা বলবার সাহস আমাদের

আছে। প্রতিমুহূর্তে আরও বড় গোলমালে জড়িয়ে পড়ছে পৃথিবী। তাই আমি লিখেছি: *নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে।* মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা প্রোক্রিয়েশন, অর্থাৎ সন্তান লাভ। প্রকৃতি মানুষ কমিয়ে আনবার জন্য অনেক ব্যবস্থা রেখেছিল। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, খরা, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, দাবানল, হিংস্র প্রাণী—কিন্তু সবকিছুকে হার মানিয়েছে মানুষ। মানুষের মগজ অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক চালু, তারা খুঁজে নিয়েছে নতুন পথ। সবাই মিলে কাঁচকলা দেখিয়েছে প্রকৃতিকে। মাত্র কয়েকটি হিংস্র প্রাণী রয়ে গেল, তাদের আমরা পুরে দিলাম চিড়িয়াখানার খাঁচায়। তখন রইল নির্বোধ মাইক্রোব। সেগুলোর জন্য ভ্যাকসিন ও ইমিউনাইযেশন আবিষ্কার করল মানুষ।

'মাত্র একটি দেশ স্বীকার করেছে তাদের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। চিন। তবে সে দেশও জনসংখ্যার বেড়ে যাওয়া থামাতে পারেনি। আইন করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে তারা, বলেছে একটার বেশি সন্তান নেয়া চলবে না। তাতেও কাজ হয়নি। গত পঁচিশ বছরে তাদের মানুষ দ্রুত বেড়েছে। দুনিয়ার সবচেয়ে কঠোর রেজিমেন্টেশন যেখানে, তারাই যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তা হলে অন্য দেশ পারবে কেন!

'মানুষ বদলে যেতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিই এমন। কাজেই আমরা ঠিক করেছি নিজেরা দায়িত্ব নেব। আমরা উন্মাদ নই। আমি চাইলে এমন ভাইরাস তৈরি করতে পারতাম যা দিয়ে পুরো মানব-জাতিকে শেষ করে দেয়া সম্ভব ছিল। তা আমি চাইনি। এখনও আমরা ভাবছি কয়েক বিলিয়ন মানুষকে খুন করা উচিত হবে না। আমরা ভেবে বের করেছি জনসংখ্যা কমিয়ে

আনবার উপায়। আমি প্রথম যে হেমোরেজিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তৈরি করি, সেটা মানুষকে বন্ধ্যা করে দিতে পারে। এতে এক শ' জনের ভিতর পঁচিশজন মারা পড়ত। তবে পরে অনেক রিসার্চ করে তৈরি করি অন্য ভাইরাস। ওটা একজন মানুষ থেকে ছড়িয়ে গিয়ে বন্ধ্যা করতে পারে লক্ষ লোককে। আর ঠিক তাই দরকার এই পৃথিবীর। আমরা যখন পঞ্চাশটা জাহাজে ছড়িয়ে দেব ভাইরাস, সেই মানুষগুলো সংক্রমিত করবে কোটি কোটি মানুষকে। এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে পুব ইউরোপ, চিন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ভারত আর বাংলাদেশে।

'তাদের সিম্পটম রয়ে যাবে কয়েক মাস ধরে। আশপাশে যে থাকবে, সে-ই বন্ধ্যা হবে। হালকা ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে, জ্বর হবে, তবে মরবে না কেউ। এতে বড়জোর নব্বুইজন বন্ধ্যা হবে। বাকি সবাই অবাক হয়ে ভাববে কেন তারা সন্তান নিতে পারে না। ততদিনে পৃথিবীর নব্বুই ভাগ মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নেই।

'এরপর শুরু হবে ভয়ঙ্কর গোলমাল। রায়ট শুরু হবে, মানুষ তাদের নেতাদের কাছে জানতে চাইবে কেন তারা বন্ধ্যা হলো। কোনও জবাব মিলবে না কারও কাছ থেকে। তবে এসব চলবে বড়জোর ছয়মাস। ততদিনে অর্থনীতির চাকা থমকে যেতে চলেছে। কিন্তু মানুষ ঠিকই বুঝবে তাদের কাজ করতে হবে পেটের তাগিদে। গোলমাল কমে আসবে। এরপর পঞ্চাশ বছরের ভিতর এমন সময় আসবে যখন সম্পদ নিয়ে হানাহানি আর থাকবে না। সবার থাকবে যথেষ্ট। সেটা হবে এমন এক পৃথিবী, যার স্বপ্ন দেখি আমরা।'

'আর শুরুর দিকের গোলমাল যদি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে,

আমাদের উপর যদি হামলা আসে, তা হলে আমরা আমাদের মোক্ষম ভাইরাস ছেড়ে দেব,' বলল ডিয়েটস কেসলার। 'দু'মাসের ভিতরে সাফ হয়ে যাবে শতকরা নব্বই জন, শুধু দশ ভাগ মানুষ থাকবে পৃথিবীতে। আমাদের হাতে রয়েছে ওই ভাইরাসের টিকা, কাজেই থাকছি আমরাও।'

জ্যারোন ব্রাঙ্কোর দুই চোখ থেকে দরদর করে নামছে অশ্রু। চোখ মুছল না সে, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল লিঙ্ক চ্যাপেলের মুখের দিকে। ডিয়েটস কেসলার গত পঁচিশ বছর ধরে লিঙ্ক চ্যাপেলের বক্তৃতা শুনছে, কিন্তু আজ যেন নতুন করে শপথ নিল আবার। অন্তর থেকে চাইল তাদের এই মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হোক।

সাত

জাহাজের গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের দিকে চেয়ে রয়েছে কাশেম, একটু উদাস। মার্ভেল ছেড়ে যাবার সময় ওর কাঁধে হাত রেখেছিল প্রাণের বন্ধু জলিল, বড় করে শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দেখ্, দোস্তো, আমরা তো বহুদিনের বন্ধু, আমাদের কি উচিত অজানা, অচেনা, বিদেশি কোনও মেয়ের জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করা?'

'একই কথা ভাবছি আমি,' বলেছে কাশেম। 'আমি ওই বিশ্রী

প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। তোর ইচ্ছা হলে হেলেনের সঙ্গে...'

মাথা নেড়েছে জলিল। 'না রে, দোস্তো, আমিও নেই।'

'তা হলে আয়, শপথ করি, আর কখনও কারও কথায় নাচব না। খেয়াল করেছিস, আমাদের দুজনের কারও ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি হেলেন জিল।'

ভুরু কুঁচকেছে জলিল। 'আসলে আমাদের দু'জনকে উস্কে দিয়েছিল ওই বাবুর্চি ব্যাটা মোস্তফা আবুল।'

'দু'জন মিলে তাকে শায়েস্তা করতে পারি কি না সেটা এবার ভাবতে হবে।'

মাথা দুলিয়েছে জলিল। 'হ্যাঁ, এই তো ভাল একটা কাজ পাওয়া গেল। হেলেন জিলের জন্য যা ঘটতে যাচ্ছিল, তাতে তো কেউ আমরা হেরে গিয়ে আত্মহত্যাও করতে পারতাম। তাই না? ওর শাস্তি হওয়া উচিত। ভয়ঙ্কর কিছু।'

এরপর ওরা দুই বন্ধু বিদায়ের সময় কোলাকুলি করেছে।

পাশ থেকে এক দম্পতির দিকে ইশারা করল সানজিদা স্বর্ণা। 'ওই পরিবার।'

ক'সেকেণ্ড চেয়ে রইল কাশেম, লক্ষ করছে কপোত-কপোতিকে। পার্ল অভ মুন থেকে নেমে আসছে বহু প্যাসেঞ্জার। তাদের বেশিরভাগই বয়স্ক। মাঝবয়সী রয়েছে কিছু। তবে যাদের লক্ষ করছে স্বর্ণা, তাদের বয়স বড়জোর তিরিশ। দু'জনের মাঝখানে টুকটুক করে হাঁটছে তিনবছরের এক মেয়ে। পরনে গোলাপি পোশাক।

'এ তো শিশুর কাছ থেকে ললিপপ কেড়ে নেয়া, কি বলেন?' বলল কাশেম।

মেয়েটির মা ক্রেডিট কার্ড আকৃতির শিপ আইডি বাড়িয়ে দিল স্বামীর দিকে। জিনিসটা ওয়ালেটে পুরল লোকটা, রেখে দিল সামনের পকেটে।

জাহাজ থেকে নামতে গিয়ে হুড়োহুড়ি করছে সবাই, ঘুরে দেখবে ইস্তাম্বুল শহরটা স্বল্প সময়ে যতটা পারা যায় আর কী। হাগিয়া সোফিয়া, নীল মসজিদ, টপকাপি প্রাসাদ, তারপর কেনাকাটার জন্য বাজার ঘুরে ঠগবাজের পাল্লায় পড়ে একগাদা টাকা নষ্ট করতে হবে না?

পার্ল অভ মুন ঠিক তার সিস্টার শিপের মতই। যতবার ওদিকে চাইছে কাশেম, মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে শীতল অনুভূতি। প্রথম যখন এ মিশন ঠিক হলো, তখন কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু এখন জাহাজে উঠবে ভেবে শিরশির করছে ঘাড়ের পিছনটা।

'চলেছে বাসের দিকে,' যেন মনে করিয়ে দিল স্বর্ণা। দূরে দশ-বারোটা বাস, মেয়েকে নিয়ে সেদিকে চলেছে দম্পতি। ওদিকে এক যাত্রী পাস তুলে দিল অ্যাটেণ্ডেন্টের হাতে।

'এখানেই, না শহরে ঢোকার পর?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'এখানেই। আসুন।'

ওই দম্পতির দিকে দ্রুতপায়ে এগোল ওরা। ঠিক পিছনে পৌঁছুতে হবে। তাড়া আছে, এমন ভাব করে ভিড়ের সঙ্গে চলেছে। তারপর গিয়ে হাজির হলো শিকারের পিছনে। বেচারা জানে না তাকে টার্গেট করা হয়েছে।

'জলদি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণা। 'মনে হচ্ছে ছেড়ে দেবে আমাদের বাস!'

হাঁটবার গতি আরও বাড়িয়ে দিল কাশেম, লোকটার গায়ে হালকা ঘষা দিয়ে ছুটল সামনে। সন্দেহ হয়েছে স্বামী বেচারার, চট্ করে হাত দিয়ে দেখল ওয়ালেট ঠিক আছে কি না। ভদ্রলোক

ঝানু ট্র্যাভেলার, তার প্রথম প্রতিক্রিয়াঃ পকেট সামলাও। ঠিক তখনই পাশ থেকে তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে লোকটার গায়ে ধাক্কা খেল স্বর্ণা। এইবার আর ওয়ালেট সামলে রাখতে পারল না ভদ্রলোক। প্ল্যান করে তাকে বোকা বানানো হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে যখন সে দেখল এক মেয়ে ছুটতে শুরু করেছে, তাকে সন্দেহ করবার কথা মনেও আসেনি তার। দ্বিতীয়বারের মত পরীক্ষা ক'রেনি পকেট। টেরও পেল না স্বর্ণার পেলব হাত কখন তার বুক পকেট থেকে তুলে নিয়েছে ওয়ালেট।

কাজ সারার সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাইত অপেশাদার চোর, কিন্তু ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগোতেই থাকল কাশেম-স্বর্ণা। আরেকটু হলে একটা বাসে উঠেই পড়েছিল প্রায়, তবে তা করতে হলো না। আড়চোখে দেখল, কাছেই আরেকটা বাসে উঠে পড়ল দম্পতি। এবার ভিড় থেকে সরতে লাগল স্বর্ণা-কাশেম। হাঁটছে একটু দূরে পার্ক করে রাখা ভাড়া করা গাড়ির দিকে।

ড্রাইভিং সিটে উঠে পড়ল কাশেম। দরজা না খুলে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল স্বর্ণা। ওর কারণে ভাল করে গাড়ির ভিতরটা দেখতে পাবে না কেউ। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাশেম। মার্ভেল থেকে বিশেষ কিট-বক্স নিয়ে এসেছে। ওটা দিয়ে তৈরি করছে ল্যামিনেটেড আইডেন্টিফিকেশন কার্ড। স্ক্যালপেল দিয়ে তুলে ফেলল কার্ডের উপরের পাতলা স্বচ্ছ প্লাস্টিক, কেটে সরিয়ে নিল ফটো। এবার ওটার বদলে স্বর্ণার সঠিক মাপের একটা ফটো বসিয়ে দিল জায়গামত। কার্ডের উপর চালু করল ব্যাটারিচালিত ল্যামিনেটর। কাজ শেষে দু'হাতে মসৃণ করল কার্ড। ছেঁটে ফেলল বাড়তি প্লাস্টিক।

'এই নিন, মিসেস ক্যাথারিন ওয়াকার,' কার্ডটা বাড়িয়ে দিল

কাশেম।

ওটা নিল স্বর্ণা। 'মাত্র এক ঘণ্টার বিদ্যেয় ভালই দেখালেন।'

'সাতবার কার্ড তৈরি করে তবে পাশ করেছি পরীক্ষায়। তাতেও কত কষ্ট মোফিজ বিল্লাহ্‌র মনে, ভাল করে শেখাতে পারেনি।' কথা বলতে বলতে নিজের কার্ড তৈরিতে মন দিল কাসেম।

'জাহাজে উঠে আপনাকে কোক খাওয়াব। ডিনারও।'

একটু কুঁচকে গেল কাশেমের ভুরু। 'আপনি পার্ল অভ মুন থেকে নামতে চাইছেন না?'

'ঠিক ধরেছেন। যতক্ষণ না ভাইরাস বা ওই ধরনের কিছুর খোঁজ না পাচ্ছি।'

'মিস্টার ফু-চুং কিন্তু বিরক্ত হবেন।'

'হয়তো। আপনি কী বলেন? আমি মিস্টার ফু-চুঙের কোনও নির্দেশ সরাসরি অমান্য করছি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল কাশেম। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ওরকম মনে হতেই পারে। ...অবাক লাগছে? ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারেন আপনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাশেম। 'তা ঠিক চাইছি না।'

'তার মানে আমার সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে একা ছেড়ে নেমে গেলে মারবে মাসুদ ভাই।' দ্বিতীয় আইডির কাজ শেষ করে পরীক্ষার জন্য স্বর্ণার হাতে দিল কাশেম।

'গুড!'

এবার কার্ড দুটো ফিরিয়ে নিল কাশেম, রাখল ইলেকট্রনিক একটা ডিভাইসের ভিতর। ওটার সঙ্গে সংযুক্ত করল ল্যাপটপ কম্পিউটার। নতুন করে রিকোড করল ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ। দশ

মিনিট পর পার্ল অভ মুনের গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে এসে দাঁড়াল ওরা। একটু দূরে জাহাজে ভঙ্গুর সিরামিকের বাক্স তুলছে এক ফর্কলিফট। নামিয়ে দেয়া হচ্ছে বড়সড় খোলা হ্যাচ দিয়ে। ওটার উপর ঘুরে চলেছে সাদা এক সি গাল। হঠাৎ কী মনে করে ঝাঁপিয়ে নেমে এল অনেক নীচে। ঠিক যেন যুদ্ধ-বিমান।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে পার্সার। স্বর্ণা ও কাশেম জাহাজে ফিরবে শুনে জানতে চাইল, 'কোনও সমস্যা, মিস্টার ওয়াকার?'

'সমস্যা আমার বাম হাঁটু,' বলল কাশেম। 'ক'দিন আগে ফুটবল খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ব্যথা বাড়ে।'

'আপনি চাইলে ডাক্তার দেখাতে পারেন, আমাদের জাহাজে সর্বক্ষণ একজন থাকেন।' কার্ডদুটো নিল পার্সার, ইলেকট্রনিক মনিটর দেখে নিল। 'অদ্ভুত তো!'

'কোনও ঝামেলা?'

'না, মানে... হ্যাঁ। আপনাদের কার্ড ভিতরে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাশ করল কম্পিউটার।'

সিকিউরিটির জন্য সমস্ত ক্রুজ লাইন্সে ইলেকট্রনিক আইডি চালু হয়েছে বেশ অনেক দিন ধরে। ওই কার্ড থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নেয় কম্পিউটার, পরীক্ষা করে দেখে জেনুইন কি না। কোনও গোলমাল না থাকলে জানিয়ে দেয় পার্সারকে। চোরাই কার্ড রিকোড করেছে কাশেম, ফলে কিছুই ফুটে ওঠেনি স্ক্রিনে। হয় ওদেরকে বিশ্বাস করতে হবে পার্সারের, নইলে ওদের অপেক্ষা করাতে হবে। এমন কাউকে ডেকে আনতে হবে যে কম্পিউটার ঠিক করবে। তবে আজকাল ক্রুজ শিপগুলোর জন্য কাস্টোমার সার্ভিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেউ চায় না

ক্লায়েন্ট অসন্তুষ্ট হোক। বাড়াবাড়ি করলে শেষে মিলবে না যাত্রী। জাহাজ কর্তৃপক্ষের যন্ত্রের ত্রুটির কারণে দেরি করিয়ে দেয়া যায় না যাত্রীকে।

নিজের এমপ্লয়ী আইডেনটিফিকেশন কার্ড স্ক্যানারের ভিতর দিল পার্সার, সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে ফুটে উঠল ছবি। কাশেম ও স্বর্ণার কার্ডদুটো ফিরিয়ে দিল সে। 'মনে হয় কোন কারণে আপনাদের কার্ড কাজ করছে না। আপনারা কেবিনে ফিরে পার্সারের অফিসে যোগাযোগ করুন। তারা অন্য কার্ড দেবে।'

'বেশ। থ্যাঙ্ক ইউ।' কার্ডদুটো পকেটে রেখে দিল কাশেম, স্বর্ণার কনুই ধরে রওনা হয়ে গেল। র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে, একটু খুঁড়িয়ে চলেছে কাশেম।

জাহাজে উঠে যাওয়ার পর নিচু স্বরে জানতে চাইল স্বর্ণা, 'একটু আগে বাম পায়ে ব্যথা ছিল না? এখন তো দেখছি ডান পা টেনে চলেছেন!'

'এখন আমার দুই পায়েই ব্যথা।'

'সতর্ক হয়ে যান, নইলে ধরা পড়ব।'

পাথরের মত চেহারা করল কাশেম। এ মেয়ে কড়া কথা বলবার ওস্তাদ!

মেইন এইট্রিয়ামে চলে এল ওরা। চারতলা উপরে ছাত। ঘসা কাঁচের তৈরি বিরাট গম্বুজ। দুটো কাঁচ ঘেরা এলিভেটর যাত্রীদের উপর-নীচ করিয়ে চলেছে। প্রতিটি ডেকের কিনারে সেফটি গ্লাসের প্যানেল ঝকঝকে পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো, সিঁড়ির রেইলিঙের নীচে ঝিকমিক করছে ব্রাস-ব্যানিস্টারগুলো। প্রথমতলার মাঝখানে এলিভেটরের সামনে ফোয়ারার মত ছিটকে উপরে উঠছে জলকণা, মার্বেলের দেয়ালে লেগে গড়িয়ে নেমে আসছে আবার। চারপাশে চাইল ওরা। নানান দোকানে বিক্রি

চলছে হরেক রকম বিলাস-পণ্য। দ্বিতীয়তলার নিয়ন সাইন বলছে, সামনে ক্যাসিনো। এখানে সবকিছুতেই সমৃদ্ধির ছাপ, ডলারের গন্ধ।

মার্ভেলে থাকতেই পরিকল্পনা ঠিক করেছে স্বর্ণা-কাশেম, ঘেঁটে দেখেছে ক্রুজ লাইন্সের ওয়েবসাইট। এই ক্রুজ শিপের লেআউট ভাল ভাবে দেখে নিয়েছে। বাড়তি কথা খরচ করতে হলো না ওদের। ঝর্নার পিছনে রেস্টরুমে চলে এল দুজন। কাঁধের ইউটিলিটারিয়ান ব্যাগ থেকে পোশাক বের করল স্বর্ণা। পাঁচ মিনিট পর ওরা হয়ে গেল জাহাজের কর্মী। বুকের উপর সোনালী রঙে ক্রুজ লাইন্সের লোগো। মোফিজ বিল্লাহ্‌র ম্যাজিক শপ থেকে এগুলো পেয়েছে ওরা। ইতিমধ্যে মুখ থেকে মেকআপ তুলে ফেলেছে স্বর্ণা। কাশেমের মাথার উপর বিরাজ করছে বেসবল ক্যাপ। মেইনটেন্যান্স-ক্রুর এই ইউনিফর্মের বদৌলতে পুরো জাহাজ ঘুরতে পারবে কারও সন্দেহ উদ্রেক না করেই।

'আমরা আলাদা হয়ে গেলে কোথায় দেখা করব?' জানতে চাইল স্বর্ণা। পাশে হেঁটে চলেছে।

'ক্র্যাপ টেবিল?' মুচকি হাসল কাশেম। 'দুনিয়ার সবই তো জুয়া।'

'ঠাট্টা বাদ দিন।'

'লাইব্রেরি?'

'হুম্, লাইব্রেরি,' বলল স্বর্ণা। 'ঠিক আছে। এবার কাজে নামা যাক।'

সবসময় জাহাজের গ্যালি দিয়ে পাবলিক অ্যাকমোডেশন এরিয়ায় যাওয়া সহজ। কাজেই ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ডাইনিং রুমে। এখানে অন্তত তিন শ' মানুষ খেতে বসতে পারে। এ মুহূর্তে কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। ভ্যাকিউম ক্লিনার

দিয়ে কার্পেট পরিষ্কার করছে হাউসক্লিনিং ক্রু।

টেবিল পরিষ্কার করবার ভঙ্গি নিল ওরা, তারপর ঢুকে পড়ল কিচেনের ভিতর। রান্না থেকে চোখ তুলে ওদের দিকে চাইল এক শেফ, তবে বলল না কিছু। হনহন করে তাকে পাশ কাটাল ওরা। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে স্বর্ণা। ডাইনিং রুম খালি, কিন্তু কিচেনে ব্যস্ত অনেক স্টাফ। পরবর্তী রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বড়বড় পটে বলকে উঠছে খাবার, সুগন্ধে চারপাশ ম-ম করছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফরা দ্রুত হাতে কাটছে তরকারী ও মাছ-মাংস। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে এখানে তিন শিফটে।

কিচেন পেরিয়ে যে দরজা, সেখান দিয়ে যাওয়া যায় জ্বলজ্বলে আলোকিত এক হলওয়েতে। একটা স্টেয়ারকেস পেল ওরা, দেরি না করে নামতে লাগল। শুরু হয়েছে নতুন শিফট। ওদের পাশ কাটিয়ে গেল ক'জন ওয়েট্রেস। ওদের দিকে মনোযোগ দেয়নি কেউ। জ্যানিটরের কাজ এমনই, দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখে না কেউ। ওরা যেন অদৃশ্য মানব-মানবী।

কাশেম এক বাল্কহেডের পাশে পেল ভাঁজ করা মই। ওটা নিল, ভাব দেখে মনে হবে জরুরি ডাক পেয়ে চলেছে।

পার্ল অভ মুন বন্দরে ডক করায় বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার তীরে নেমেছে, এ মুহূর্তে সবচেয়ে কম খরচ হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই কারণে এখন ফাঁকা ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়া। পরবর্তী দু'ঘণ্টা ওখানে রইল ওরা। প্রতিটি পাইপ, কণ্ডুইট বা ডাক্ট পরীক্ষা করল। এমন কিছু খুঁজল যা অস্বাভাবিক। গোল্ড অভ মার্স জাহাজে চারপাশ দেখবার সময় পায়নি মাসুদ ভাই, তবে ওদের সময়ের অভাব নেই। নিয়ম ধরে চারপাশ তল্লাসী করল স্বর্ণা ও কাশেম। তবে কোনও ফল হলো না। এখানে রাখা হয়নি ভাইরাস।

'কিছুই নেই,' শেষে তিক্ত স্বরে বলল কাশেম। হতাশ হয়ে

একটু রেগে উঠেছে। 'এমন কিছু নেই যা থাকবার কথা নয়। ভেন্টিলেশন সিস্টেমে অন্য কিছু নেই, পানির সাপ্লাই স্বাভাবিক।'

'ভাইরাস ছড়াতে হলে ওগুলো সেরা জায়গা,' স্বীকার করল স্বর্ণা। ন্যাকড়া নিয়ে হাত থেকে তুলছে গ্রিজ। 'এখানে আর কিছু থাকতে পারে?'

'জাহাজের সবখানে স্প্রে-গান দিয়ে অ্যান্টি ভাইরাল এজেন্ট ছড়ানো যায়, আর কী করতে পারি আমরা,' বলল কাশেম। 'আমাদের আর কিছু করার নেই। এখানে যে সময় ব্যয় করেছি, তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছে রেসপন্সিভিস্টরা।' ছাতের সঙ্গে ওভারহেড দেখাল। ওখানে ব্যারেলের মত ডাক্ট। 'আরও দুই ঘণ্টা পেলে ওগুলো পরীক্ষা করা যায়। ভিতরে রাখতে পারে ডিসপার্সাল সিস্টেম।'

মাথা নাড়ল স্বর্ণা। 'ধরা পড়ে যাব। অনেক বড় ঝুঁকি হয়ে যায়। অন্য কিছু করেছে ওরা। দ্রুত ছড়াতে পারে এমন কোনও জায়গায় ভাইরাস রেখেছে।'

'জানি, কিন্তু সে জায়গাটা তো খুঁজে পাচ্ছি না?' খসখস করে মাথার তালু চুলকে নিল কাশেম। বেশি ভাবতে গিয়ে ব্যথা শুরু হয়েছে কপালে। 'মাসুদ ভাই বলেছিলেন উনি গোল্ড অভ মার্সের এয়ার-কণ্ডিশনিং সিস্টেমের মেইন ইনটেক পরীক্ষা করেন। ওখানে হয়তো খুঁজে দেখা যেতে পারে।'

'সেটা কোথায়?'

'উপরের ডেকে। চিমনির আগে। সম্ভবত।'

'খোলা জায়গা,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা।

'রাত নামার পর হয়তো পারা যায়।'

মাথা দোলাল স্বর্ণা। 'পাবলিক এরিয়া পেরুতে হবে। পাল্টে নিতে হবে পোশাক।'

বিশাল ইঞ্জিন-রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা, এগিয়ে চলেছে করিডোর ধরে। আসা-যাওয়া করছে বহু লোক। গেস্ট সার্ভিস ওয়ার্কাররা নানান ইউনিফর্ম পরনে চলেছে নিজেদের গন্তব্যে। ফিরতে শুরু করেছে যাত্রীরা। ইঞ্জিন-রুমের দিকে চলেছে ইঞ্জিনিয়াররা। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ইস্তাম্বুল ছাড়বে জাহাজ।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গেল স্বর্ণা। সামনের ওই দরজা দিয়ে বোধহয় যাওয়া যায় লণ্ড্রি রুমে। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক। বয়স হবে পঁচিশের মত। পোশাক তার স্বর্ণার ইউনিফর্মের মতই। এই লোক, বা তার দাঁড়াবার ভঙ্গি নয়, তার চাহনি লক্ষ করেছে স্বর্ণা। যুবক চট্ করে সরিয়ে নিয়েছে চোখ। শেফকে দেখে গ্যালিতে ঠিক ওভাবেই অন্যদিকে তাকিয়েছিল স্বর্ণা—ভাব ছিল চোর-চোর। এই লোকের ভিতর কী যেন অস্বাভাবিক! ভঙ্গি দেখে মনে হয় তার এখানে থাকবার কথা নয়, অথচ হাজির হয়েছে!

একটু ঘুরে দাঁড়াল যুবক, কয়েক সেকেণ্ড পর কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখল স্বর্ণা এখনও চেয়ে, ঘুরে গেল সে, পরক্ষণে আচমকা শুরু করল দৌড়!

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণা। 'থামো বলছি!' ছুটতে শুরু করেছে। তিন ফুট পিছনে কাশেম।

'না,' তীক্ষ্ণ স্বরে মানা করল স্বর্ণা। 'ওখানে আরও কেউ আছে কি না দেখুন।'

থমকে গেল কাশেম, ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল।

সেদিকে খেয়াল নেই, স্বর্ণা জেদ নিয়ে ধাওয়া করে চলেছে। ওই যুবক বিশ ফুট দূরত্বের সুবিধা পেয়েছে। তা ছাড়া পা-ও তার স্বর্ণার চেয়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা। তবে বাড়তি সুযোগ ধরে রাখতে পারল না। হালকা শরীর নিয়ে উড়ে চলেছে স্বর্ণা। দুই

মিনিট পেরুনোর আগেই দূরত্ব কমিয়ে আনল দশ ফুটে। করিডোরের বাঁক ঘুরবার সময় গতি কমাল না। হরিণীর মত ছুটে চলেছে। যেন শিকারি চিতা।

তবে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠবার সময় সুবিধা পেল যুবক। একেক বারে তিন ধাপ করে উঠতে লাগল। স্বর্ণা উঠছে মাত্র দুই ধাপ করে। দু'জনেব দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে বিস্মিত হয়েছে কর্মীরা। মনে মনে আফসোস করল স্বর্ণা, এদের কাছ থেকে যদি সাহায্য চাওয়া যেত! তা সম্ভব নয়, নিজেই তো ও বেআইনী ভাবে উঠেছে জাহাজে!

একটা দরজা দিয়ে তীরের মত ঢুকল যুবক। দরজার স্বয়ংক্রিয় দুই কবাট বন্ধ হতে চলেছে, এমন সময়ে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল স্বর্ণা। দুই কনুই ঘসা লাগল ধাতব কবাটে। বুঝতেই পারল না কোথা থেকে এল ঘুসিটা। আঘাত লাগল চিবুকের মাঝখানে। ওই যুবক ট্রেইণ্ড ফাইটার নয়, তবে মারে জোর আছে। কট্টাস্ করে ঘাড়ের হাড় ফুটল, ম্যথা ঝাঁকি খেল স্বর্ণার। ধড়াস্ করে বাড়ি খেল দেয়ালে। ওখান থেকে মেঝেতে। ওর পাশে এক সেকেণ্ড থামল যুবক, তারপর ঘুরেই দৌড় শুরু করল আবার।

লড়াই করবার সাধ্য আছে কি না বুঝবার আগেই ধড়মড় করে উঠে বসল স্বর্ণা। এক সেকেণ্ড চেয়ে রইল ছুটন্ত যুবকের দিকে। তারপর লাফ দিয়ে উঠেই ধেয়ে গেল। বনবন করে ঘুরছে মাথা। বিড়বিড় করে বলল, 'যাবি কই, শালা!'

শুরু হয়েছে সুদীর্ঘ প্রধান করিডোর। জাহাজ জুড়ে পথ। কেবিন থেকে শুরু করে প্রতিটি ডিউটি এরিয়া কাভার করেছে। সামনে একটু পর পর একের পর এক হলওয়ে। পাশে প্লেটবোর্ডে একটি করে বিখ্যাত নাম—নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন

থিয়েটারের। দূর থেকে হেঁটে আসছে বেশ কয়েকজন নাট্য-কর্মী।

চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণার সামনের পলায়নরত যুবক, 'সরে যান! ইমার্জেন্সি!' ছুটতে শুরু করেছে থিয়েটার কর্মীদের ভিতর দিয়ে। কারও দিকে চাইবার সময় নেই। সাপের মত পিছলে বেরুতে চাইছে। পিছনের মেয়েটার কাছ থেকে পালাতে হবে।

রাগে ফুঁসছে স্বর্ণা, ভারী লাগছে ওর মাথা। ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। বামের এক দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল যুবক। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামছে। দরজার কাছে পৌঁছতে কয়েক মুহূর্ত লাগল স্বর্ণার। পাঁচ সেকেণ্ড লাগল দরজা আবার খুলে যেতে। নতুন করে শুরু করল ধাওয়া। সিঁড়ি বেয়ে নামতে চাইল না, চড়ে বসল রেলিঙে। তীব্র গতিতে নেমে গেল অর্ধেক তলা। এরপর বাকি রেলিং বেয়ে নামতেই বুঝল, সামনে যাত্রীদের কেবিন। ওই যুবক বুদ্ধিমান হলে, বা জাহাজ আগে থেকেই চেনা থাকলে, চট্ করে ঢুকে পড়বে একটা কেবিনে। সেক্ষেত্রে আর তাকে খুঁজে পাবে না স্বর্ণা।

এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়ল, একটা হলওয়ে পেরিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে যুবক। উপরের ধাপে পৌঁছে গেল। প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক বয়স্কা মহিলা। তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইল সে, কনুই মেরে বসল পাঁজরে। পাশেই হুইলচেয়ারে তাঁর অসুস্থ স্বামী। আপত্তি তুললেন তিনি, নড়ে উঠল হুইলচেয়ার। ওটার চাকার সঙ্গে বেধে হুমড়ি খেতে গেল যুবক। কয়েক সেকেণ্ড লাগল সামলে নিতে। ততক্ষণে কাজ শুরু করেছে অটোমেটিক দরজার মেকানিযম। মাঝখানের তিনফুট উড়ে গেল স্বর্ণা, একবার ডিগবাজি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কড়া চোখে চাইল যুবকের দিকে। ওরা প্রায় চলে

গেছে এইট্রিয়ামের উপরতলায়।

ছুটতে শুরু করেছে যুবক, একবার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল পিছনে। আরও বাড়িয়ে দিয়েছে দৌড়ের গতি। টুইন গ্লাস এলিভেটরের মাঝখানের সিঁড়ির দিকে চলেছে। এইট্রিয়ামের উপরতলায় কেউ নেই বললেই চলে। একতলা নীচে দোকানের সারি। ওখানে ভিড়। স্বর্ণা আগেই দেখেছে জাহাজের গার্ডরা রয়েছে এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি স্টোরের বাইরে। তারা থামাতে পারে। তবে ওই ঝামেলায় জড়ানো চলবে না এখন।

সিঁড়ির উপর ধাপে পৌঁছে গেছে যুবক। দ্বিতীয়বারের মত ঝাঁপ দিল স্বর্ণা। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুবকের কোমর জড়িয়ে ধরতে। ওর আঙুলগুলো খামচে ধরল তার জাম্পসুটের কব্জি। উপরের ফ্লোরে পৌঁছে গেল লোকটা, তবে ধাক্কা খেয়ে পিছলে গেল পা। মসৃণ মেঝেতে লম্বালম্বি রওনা হয়ে গেল দেহ। সরসর করে চলেছে, মাথা দিয়ে জোর গুঁতো দিল গ্লাস-প্যানেল রেলিঙে। এমন বিপদ হতে পারে ভেবেই তৈরি করা হয়েছে প্যানেল, কিন্তু মট্ করে ভেঙে গেল একটা ব্র্যাকেট। খসে পড়ল পুরো প্যানেল। চারতলা নীচে মেঝের উপর প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে পড়ল কাঁচের প্যানেল, মুহূর্তে হাজারো টুকরো হলো। চারপাশ কেঁপে উঠল বিস্ফোরণের আওয়াজে। এইট্রিয়াম জুড়ে শুরু হলো মহিলাদের ভীত চিৎকার।

হাত ফস্কে যাওয়ায় যুবকের কোমর ধরতে পারেনি স্বর্ণা। শেষ সিঁড়ির উপর ধপ্ করে পড়েছে নিজেও। একটু দূরে হড়কে গেছে রেসপন্সিভিস্ট। তার দেহের তলা থেকে উধাও হলো মেঝে। তবে খপ্ করে পিতলের এক ব্যানিস্টার ধরল। চারতলার কিনারা থেকে ঝুলছে। একবার চাইল মেয়েটির দিকে। উঠে দাঁড়িয়েছে স্বর্ণা। চোখদুটো দেখল—আত্মঘাতী

হামলাকারীদের মত। চোখে হতাশা, ব্যর্থতা, গর্ব, সবচেয়ে বড়—প্রচণ্ড ক্রোধ।

কব্জি চেপে ধরবার আগেই ছেড়ে দিল সে হাতদুটো।

চেয়ে রইল বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট।

সাঁই-সাঁই করে নেমে চলেছে যুবক, মুহূর্তে চল্লিশ ফুট দূরত্ব পেরুল। আগেই চিত করে নিয়েছে দেহ। টাইলস করা মেঝের উপর নামল পিঠ দিয়ে। মাত্র এক সেকেণ্ড আগে উপরে চেয়েছে। দেহটা মেঝের উপর ঠাস্ করে নেমে আসতেই ভেজা একটা আওয়াজ উঠল। মড়মড় করে ভাঙল হাড়গুলো, ওগুলো নিয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল পেশি। পোশাকের উপর ভেসে উঠল রক্তের ছোপ। এত উপর থেকেও দেখতে পেল স্বর্ণা, ছোট হয়ে এসেছে যুবকের খুলিটা পিছনের অংশ চ্যাপটা হয়ে যাওয়ায়।

দ্বিতীয়বার ভাববার সময় নিল না স্বর্ণা, ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলো ফিরতি পথে। দুই বুড়োবুড়ি তখনও কিছু বুঝে ওঠেননি। স্বামীকে সোজা করে হুইলচেয়ারে বসাতে চাইছেন মহিলা। পটে রাখা ঝাঁকড়া এক এরিকা পাম গাছের আড়াল নিল স্বর্ণা, খুলে ফেলল ওভারঅল, ওগুলো গুঁজে নিল ব্যাগের ভিতর। ওর নিজের পোশাক ঘামে ভেজা, কিন্তু কিছু করার নেই এখন।

জাহাজের অনেক সামনের দিকে লাইব্রেরি, মুভি থিয়েটারের পাশে। জাহাজের পিছন দিকে রওনা হয়ে গেল স্বর্ণা। ওখানে সুইমিং পুলের পাশে বার ও সফট ড্রিঙ্কের দোকান। এখন দু' মিনিটের ভিতর ওখানে পৌঁছুতে হবে। সামান্য লবণ মিশিয়ে সেভেন-আপ ঢালতে হবে গলায়, নইলে দুপুরের খাবার হড়হড় করে বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে।

একঘণ্টা পরও ওই দোকানে বসে রইল স্বর্ণা। জাহাজের

পাশে থেমেছে এক অ্যাম্বুলেন্স। ওটার মাথায় আলো জ্বলছে-নিভছে, তবে বন্ধ হয়েছে সাইরেন। একটু পর বিকট আওয়াজে বেজে উঠল জাহাজের ভেঁপু। এবার বন্দর ছেড়ে রওনা হবে পার্ল অভ মুন।

আট

প্রতিবার পলক ফেলতে গিয়ে রানার মন বলছে, শিরিষ-কাগজ দিয়ে কেউ ঘষছে ওর চোখদুটো। অতিরিক্ত কফি খেয়ে পুড়ে গেছে পাকস্থলীর দেয়াল। সঙ্গে শুরু হয়েছে তীব্র মাথা-ব্যথা। ওটা দূর করতে চাইলে লাগবে পেইন-কিলার। তাতে কাজ হবে এমনও নিশ্চয়তা নেই। একবারও আয়না দেখেনি, তবে বুঝতে পারছে ওকে লাগছে ঠিক কাউন্ট ড্রাকুলার মত—রক্তশূন্য এক পিশাচ! একবার ডানহাতে আঁচড়ে নিতে চাইল চুল। ভাবল, এবার একটু ঘুমাতে হবে।

সবসময় মনে প্রশান্তি আনে হাওয়া, তবে এ মুহূর্তে তিক্ত লাগছে ওর। হাওয়াকে বাধা দিচ্ছে ওয়াটার ট্যাক্সির উইণ্ডস্ক্রিন, তবু শিউরে শিউরে উঠছে। পরিবেশ ভেজা-ভেজা, স্নিগ্ধ, বাতাসে গাছের পাতা ও ফুলের সুবাস। পিছন-বেঞ্চে ওর পাশে আয়েস করে বসেছে সোহেল। মুখ একটু হাঁ করা। ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে যে সুন্দরী মেয়ে মার্ভেল থেকে ওদের তীরে পৌঁছে দেয়, সে ছুটি নিয়েছে। তার বদলে জাহাজে

পৌঁছে দিতে এসেছে কুস্তিগীরের মত প্রকাণ্ড দামড়া এক লোক। একবার তার দিকে চেয়েছে সোহেল, তারপর মন থেকে তাকে দূর করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এদিকে রানা জেগে রয়েছে শুধু গনগনে রাগের কারণে। ফু-চুঙের নির্দেশ অমান্য করেছে স্বর্ণা-কাশেম। ওদের পইপই করে বলে দেয়া হয় পার্ল অভ মুন রওনা হওয়ার আগেই নেমে পড়তে হবে। তা না করে লুকিয়ে পড়েছে ওরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজেছে রেসপন্সিভিস্টদের ভাইরাস বা টক্সিন।

একবার ওদের সামনে পেলে বাছাই করা কঠোর কিছু বাক্য বলবে, ভেবে রেখেছে রানা। তবে মনে মনে প্রশংসা না করে পারেনি। ওদের কর্তব্যজ্ঞান নিয়ে কথা উঠতে পারে না। তবে ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে অতিরিক্ত। সে-কারণে বকা ওদের প্রাপ্য।

ওর চিন্তা-স্রোতে আবার ফিরে এল উর্বশী। আরও তিক্ত হয়ে গেল মন। একবারও যোগাযোগ করেনি ডিয়েটস কেসলার। এক এক করে মুহূর্ত পেরিয়ে চলেছে। ওই লোক ভাবছে তাকে ছোঁয়ার সাধ্য নেই কারও। হয়তো এতক্ষণে মেরেই ফেলেছে উর্বশীকে। লোকটা নিশ্চয়ই জানে না, ওর কিছু হলে তাকেও মরতে হবে। ওর অন্তর বলে চলেছে, আর নেই উর্বশী!

ইনার হার্বারে আবার ফিরেছে আর্মস ডিলার ব্যালফোর জেনকিন্সের মেগা ইয়ট মাউন্ট সিনাই। নোঙর ফেলেছে তীর থেকে এক মাইল দূরে। মার্ভেলের দিকে চাইল রানা। জাহাজটা ছিল অদ্ভুত সুন্দর। তবে এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হয়। বো ও স্টার্ন স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ, ডেরিকগুলো জানিয়ে চলেছে ওটা কার্গো শিপ। তবে ঠিক ভাবে রং করালে, ডেক থেকে জঞ্জাল সরিয়ে নিলে, ওটা হয়ে উঠবে দুনিয়ার সেরা

একটা জাহাজ।

কাছাকাছি চলে আসতেই চোখে পড়ল হালের মরিচার দাগ। এখানে ওখানে রঙের ছোপ। ক্রেনগুলো থেকে সাপের মত ঝুলছে কেব্‌ল্। বাইরে থেকে মনে হয় ওই জাহাজের ভিতরটা মাকড়সার জালে ভরা। অতি পুরনো এক জাহাজ, কিছু চকচক করে না। এমন কী অ্যামিডশিপে ডেভিট থেকে যে লাইফবোট ঝুলছে, সেগুলোর প্রপেলার পর্যন্ত জং ধরা।

ঝলমলে ট্যাক্সি নাক গুঁজল মইয়ের নীচে। সাগর এত শান্ত যে দক্ষতা লাগল না কুস্তিগীরের। বোটের পাশে ফেলল না রাবারের ফেণ্ডার।

সোহেলের কাঁধে আলতো চাপড় দিল রানা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। মুখ কুঁচকে ফেলল। তুলল মস্ত হাই। চাপা স্বরে বলল, 'ব্যাটা বদমাইশ! স্বপ্নের যেখানটায় ছিলাম, আজ রাতে সেখানে যদি না ফিরতে পারি, বক্সিং মেরে ভেঙে দেব তোর নাক!'

'কী দেখছিলি?'

'জুলিয়া রবার্টস আগ্রহী হয়ে উঠল, মিষ্টি একটা হাসি দিল—তার মাঝখানে তুই কোথাকার কে এসে...'

খপ্ করে সোহেলের হাত ধরল রানা, এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল। 'চল্। ওঠ্!'

যার যার ব্যাগ তুলে নিল ওরা, কুস্তিগীরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর রেলিং টপকে রানার মনে হলো, জয় করেছে এভারেস্ট।

ওদের জন্য অপেক্ষা করছে ডক্টর ফারা। পাশেই ফু-চুং ও অনিল। হল্যাণ্ডের সুন্দরী এক লাখ ওয়াটের হাসি দিল রানা ও সোহেলকে আস্ত দেখে। মৃদু হাসল ফু-চুং ও অনিল। পলকের

জন্য রানার মনে হলো, ওরা উর্বশীর খবর পেয়েছে। কিন্তু তা নয়। সেক্ষেত্রে ফোন করে ম্যানিলা এয়ারপোর্টে ওদের জানিয়ে দিত ওরা।

'তুমি কি জানো তুমি কত বড় একটা জিনিয়াস, মাসুদ রানা?' ভুরু উঁচু করে বলল ফারা।

'তোমার কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে,' ক্লান্ত হাসল রানা।

'ইংল্যাণ্ডের এক ইউনিভার্সিটির অনলাইন ডেটাবেস পেয়েছেন অনিল। সব কিউনিফর্মের উপর। মোবাইল ফোনের ই-মেইলে যে ছবিগুলো পাঠিয়েছ, সব অনুবাদ করেছেন উনি।'

ম্যানিলা এয়ারপোর্টে পৌঁছেই ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল রানা।

'অনুবাদ করেছে কম্পিউটার,' লাজুক স্বরে বলল অনিল। 'আমি তো আর প্রাচীন লেখা পড়তে পারি না।'

'বিষয়টা একটা ভাইরাস নিয়ে,' বলল ফারা। 'যতটা বুঝেছি, ওটা ছিল এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবে এ জিনিস আগে দেখেনি সায়েন্স। ওটার ছিল হেমোরেজিক কমপোনেন্ট। ইবোলা বা মারবার্গের মত। বড় কথা, ওটার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ হেলেন জিল। ওই জাহাজ যখন প্রথম তীরে ভেড়ে, সে জায়গাটা ছিল ওর গ্রামের কাছেই। ওখানে বড় হয়েছে জিল। আমার ধারণা, হেলেন প্রাচীন ওই জাহাজের নাবিকদের কারও বংশধর।'

কী নিয়ে কথা বলছে ফারা, কিছুই বুঝতে পারেনি রানা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু কী নিয়ে আলাপ? জাহাজ? কীসের জাহাজ?'

'নূহ নবীর জাহাজ, আর কী?'

ফারার দিকে ক' মুহূর্ত চেয়ে রইল রানা, তারপর একইসঙ্গে

দু'হাত তুলল মাথার উপর। ভাব দেখে মনে হলো নিঃশর্ত সারেণ্ডার করছে। 'তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লে তো চলে না! শুরু থেকে না বললে... তবে তার আগে আমাকে গোসল করতে দিতে হবে। তারপর দু'পেগ উইস্কি আর খাবার না পেলে কিচ্ছু ঢুকবে না মাথায়। খাবারের অর্ডার দাও, আমি দশ মিনিটে আসছি।'

'মোস্তাফা আবুল তোমাদের জন্য কমলার জুস, দু'বাটি আঙুর, চারটে করে ডিম, শিক-কাবাব আর নান রুটির ব্যবস্থা রেখেছে,' বলল ফারা।

ডিনারের সময় হয়ে এল। রানা ও সোহেল পরস্পরের দিকে চাইল। সত্যি, এখন পেট ভরে খেতে পেলে আর কিছুই চাইবে না ওরা।

'চল্-চল্,' তাড়া দিল সোহেল।

'আগে শাওয়ার,' কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। 'ফারা, ওটা নূহ্ নবীর নৌকা?'

ঘনঘন মাথা দোলাল ফারা। যেন ছোট কোনও মেয়ে, সব বলতে না পেরে পেট ফেটে মরছে।

'এই আসছি বলে।' দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা।

আধঘণ্টা পর খাওয়া শেষ করে সবার উপর চোখ বোলাল রানা। চোখ স্থির হলো অনিলের উপর। অনুবাদ করেছে সে। 'এবার বল্ তো শুনি।'

'কীভাবে অনলাইন আর্কাইভে পাওয়া গেল কিউনিফর্ম, সেসব বলে বিরক্ত করব না।' নড়েচড়ে বসল অনিল। পছন্দের বিষয় পেয়েছে। 'তোরা যে লেখা পাঠালি, সেগুলো অনেক প্রাচীন। ধর্, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের। তবে আসল কথা, আমরা ওগুলো থেকে বহু তথ্য পেয়েছি।'

একই কথা ভেবেছে রানা। হাতের ইশারা করল, চালিয়ে যা।

'কম্পিউটারের হাতে তুলে দিলাম সমস্যা। পাঁচ ঘণ্টা লাগল প্রোগ্রামটার, তারপর শুরু করল কাজ। একের পর এক যুক্তি বাতিল করল। কিছু যুক্তি এড়িয়ে যেতে বাধ্য করায় বাড়ল গতি। কম্পিউটার যখন একটা থেকে আরেকটার তফাৎ বুঝল, একটু সহজ হলো কাজ। ক'বার প্রোগ্রাম চালানোর পর কিছু অদল-বদল করতেই জানাতে লাগল পুরো কাহিনি।'

'আর সেই কাহিনি নূহ নবীর নৌকার?'

'তুই বোধহয় জানিস না কিউনিফর্ম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গিলগামেশের ধারাবাহিক কাহিনি। কাজটা করেন উনিশ শ' শতাব্দীতে এক ইংলিশ অ্যামেচার। তাঁর পাওয়া সেই মহা-বন্যার কাহিনি হাজার বছর পর এসেছে মুসা নবীর তাওরাতে। বহু জাতির ভিতর প্রচলিত রয়েছে: হাজার হাজার বছর আগে একবার পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর এক বন্যা হয়। অ্যানথ্রোপলোজিস্টরা ধারণা করেন, মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে সমুদ্র উপকূল ও নদীর তীরে। আর সেই কারণেই বারবার প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ এসেছে। আর সেই কাহিনি ব্যবহার করেছে যাজক ও রাজারা। সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে: *ঠিক পথে চলো, নইলে কিন্তু...*' শ্বাস ফেলল অনিল, গ্লাস তুলে এক চুমুক পানি খেল। 'এসব কাহিনির শুরুতে রয়েছে বন্যা বা সুনামি। এদের লিখিত ভাষা না থাকায়, কাহিনিগুলো মুখে মুখে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে পৌঁচেছে। মানুষ যা করে, একটু করে যোগ করেছে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। হয়তো কয়েক জেনারেশন পর রইল না শুধু গ্রাম ভাসিয়ে দেয়া বিশাল ঢেউয়ের কথা, কাহিনি ডালপালা মেলে তৈরি হলো অন্য

কিছুঃ সেবার গোটা পৃথিবী ডুবিয়ে দিয়েছিল মহা প্লাবন।'

মাথা দোলাল সোহেল, 'এমনই হয়।'

'তো এই কাহিনি শুরু হয়েছে বন্যা দিয়ে। তবে হঠাৎ করে প্লাবন আসেনি। আশপাশে ভারী বৃষ্টি হয়নি। এসব ট্যাবলেট যারা লিখেছে তারা বর্ণনা দিয়েছেঃ প্রতিদিন বাড়তে লাগল সাগরের পানি। অর্থাৎ একদিনে এক ফুট করে বাড়ল বন্যা। উপকূলের গ্রামবাসীরা সরে গেল উঁচু জমিতে। তবে এই লোকগুলো ধারণা করল শেষ হবে না এই বন্যা। কাজেই বাঁচতে হলে একমাত্র উপায় মস্তবড় নৌকো তৈরি করা। বাইবেলে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে অত বড় জাহাজ তৈরি করা তখন ছিল অসম্ভব। তা ছাড়া, সে ধরনের প্রযুক্তি মানুষের হাতে ছিল না।'

'তার মানে ওটা নূহ নবীর নৌকা নয়?' একটু হতাশ হয়ে জানতে চাইল ফারা।

এতক্ষণ এ তথ্য চেপে রেখেছে অনিল। এবার মাথা নাড়ল। 'না, ওটা সাধারণ একটা নৌকা। তবে বর্ণনার বহু কিছু মেলে। সে সময়ে যেসব লোক বেঁচে গেল, তারা বর্ণনা করেছে কী ঘটেছে। আর এরাই গোড়াপত্তন করেছে গিলগামেশ ও বাইবেলের ওই অত্যাশ্চর্য কাহিনির।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফারা। 'আন্দাজ কত বছর আগে বন্যা শুরু হয়?'

'যিশু আসার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে।'

'যেভাবে বলছেন মনে হয় আপনি দেখেছেন পুরো ঘটনা, দিন-তারিখও মনে আছে!'

'তার কারণ সেই বন্যার ছাপ এখনও রয়ে গেছে দুনিয়া জুড়ে, সেসব বাদ দিলেও লেখা হয়েছে এসব ট্যাবলেট। বন্যা

শুরু হয় প্রথম পৃথিবীর গহ্বরে। ওটা ছিল আসলে বসফরাসের খোঁড়ল। গভীরতা ছিল এত বেশি যে চিন্তা করা যায় না। ওটা ভরে যায় পানিতে। এরপরও বাড়তে থাকে পানি। মেডিটারেনিয়ান সাগরের পাঁচ শ' ফুট নীচে ওখানে তৈরি হয় আর এক সাগর। আমরা এখন ওটাকে বলি কৃষ্ণ সাগর। আর্কিয়োলজিস্টরা আণ্ডারওয়াটার রোভ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, ওই উপকূলে ছিল মানবসভ্যতা। পুরো একবছর লাগে ওই বেসিন ভরে যেতে। অর্থাৎ বোঝা যায় নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনায় বসফরাসে পানি পড়বার ধারা ছিল হাজার গুণ বেশি।'

'ভাবতে গেলে তাক লেগে যায়,' বলল সোহেল।

'মাত্র গত কয়েক বছর হলো এসব জানতে পেরেছি আমরা। সে-সময় মানুষ বলতে শুরু করে, ওই ঐতিহাসিক বিপর্যয় ছিল বাইবেলে লেখা সেই বন্যা। তবে সায়েন্টিস্ট ও থিয়োলোজিয়ানরা জোর গলায় বলছেন, তা হতে পারে না।'

'কার কথা ঠিক তা এখনই কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না,' বলল রানা। 'তর্ক চলতে থাকুক, অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি। এসব ট্যাবলেট তো কিউনিফর্মে লেখা। ওই লেখার জন্ম হয়েছে মেসোপটেমিয়া আর সামারিয়া এলাকায়। কৃষ্ণ সাগর এলাকায় নয়।'

'আগেই বলেছি ওই লেখার ভঙ্গি খুব প্রাচীন। সম্ভবত কৃষ্ণ সাগর এলাকা থেকে সরে যেতে থাকে মানুষ। চলে যেতে থাকে দক্ষিণে। তারা মিশে যায় অন্যান্য জাতির সঙ্গে। মূল কথা: তুই যে ট্যাবলেট পেলি সেগুলোর কারণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বদলে যেতে পারে।'

'আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করি, বাপ,' হাই তুলল

সোহেল। 'খুব ভাল লাগছে! বলে যাও, শুনতে শুনতে ঘুমাই।'

'কৃষ্ণ সাগরের তীরে এক গ্রামের মানুষ ভাবল, পানি বাড়তে থাকবে। ...আগেই বলেছি এক বছর ধরে বেড়ে তীরের সমান হয়েছে পানি। লোকগুলো সহজ হিসাব কষল। তাদের লেখায় আমরা পেয়েছি তারা নৌকো তৈরি করল। ট্যাবলেটে লিখেছে, এরপর নৌকো নিয়ে রওনা হলো তারা। কিন্তু এত মানুষ ঠাসাঠাসির কারণে শুরু হলো ভয়ঙ্কর সব অসুখ-বিসুখ।'

মাথা দোলাল ফারা। 'আজ পৃথিবী জুড়ে যে রিফিউজি পপুলেশন, এর ফলে একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রতিবার শুরু হয় ডিসেন্ট্রি, টাইফাস, কলেরা—ইত্যাদি।'

কাহিনির সুতো আবার বুনতে শুরু করল অনিল: 'বাইবেলের কাহিনির মত ঘটল না, মানুষগুলো তাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলল, সেগুলো দিয়ে তৈরি করল বড় এক নৌকো। তা এমন আকৃতির হলো যে তাতে চার শ' মানুষ এঁটে গেল। সেই নৌকোর আকৃতি কেমন ছিল তা তারা লেখেনি। তবে বর্ণনা দিয়েছে: ওটার কাঠের খোল ঢেকে দেয়া হয় বিটুমেনে। এরপর মুড়িয়ে দেয়া হয় তামা দিয়ে।

'তখন মাত্র শুরু হয়েছে তাম্র যুগ। ওরা যে এলাকায় থাকত সেখানে প্রচুর তামা পাওয়া যেত। কাজেই ওই ধাতু দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হলো নৌকোর খোল। সঙ্গে থাকল গরু-ছাগল-ভেড়া-শুয়োর ও অসংখ্য মুরগি। সেই সঙ্গে তাদের জন্য প্রচুর খাবার। কয়েক মাস চলবার উপযোগী।'

'অন্তত তিন শ' ফুট লম্বা হতে হবে ওই নৌকা, নইলে সব আঁটবে না,' প্রথমবারের মত মুখ খুলল গগল।

'কম্পিউটার তাই জানিয়েছে। ওটার হিসাব অনুযায়ী, তিন শ' আঠারো ফুট। বিম ছিল তেতাল্লিশ ফুট। নীচের ডেকে রাখা

হয় পশুগুলো। মাঝের ডেকে খাবার। উপরের ডেকে গ্রামবাসীরা।'

'প্রপালশান কী ছিল?'

'পাল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'পাল তখনও আসেনি। আরও দুই হাজার বছর পর আসবে পাল।'

টেবিলে রাখা ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে পড়ল অনিল। 'মূল অনুবাদে ফিরছি: *ডেকের দুই মোটা দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো পশুর চামড়া। ওটাই ধরল বাতাস।*' রানার দিকেই চাইল অনিল। 'আমি তো বলব ওটাই পাল।'

'তাই তো দেখছি। বলে যা।'

'এরপর এক সময়ে পানি ভাসিয়ে নিল ওদের নৌকাকে। ওরা তো রওনা হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, রওনা হওয়ার কিছুদিন পর থেমে গেল পানির বৃদ্ধি। ওরা জানত না বলেই ব্ল্যাক সি এলাকা ছেড়ে সরে যেতে চাইল। যাই হোক, ওরা এক মাস নয়, বরং কয়েক মাস ভাসতে লাগল খোলা সাগরে। নানান উপকূলে নামতে চাইল। কিন্তু হয় সুপেয় পানি পেল না, নইলে ওখানকার স্থানীয় লোক আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

'পাঁচ চন্দ্র মাস ও বহু ঝড় পেরিয়ে চব্বিশজন সহযাত্রী হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তীরে ভিড়ল নৌকা। শত চেষ্টাতেও আর ভাসানো গেল না নৌযান।'

'কোথায় গিয়ে থামল?' জানতে চাইল আতাসি।

'সেই এলাকাকে বলা হয়: "পাথর ও বরফের দুনিয়া"।'

রানার চোখে চাইল ফারা। 'হেলেনের গ্রামের কাছে।'

'কিছু ডিডাকশনাল যুক্তি খাটিয়ে কম্পিউটার জায়গার লোকেশন জানাচ্ছে,' বলল অনিল।

'বল্?'

'উত্তর নরওয়ে।'

'নরওয়ে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল অনিল। 'ইম্পিরিয়াল জাপানের ফ্যাসিলিটি থেকে যেসব ট্যাবলেট পেলি, সেগুলো কাজে লাগিয়েছে তাদের ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু। কেন, সেটা তুই জানিস। ওরা বায়োলজিকাল ওয়েপন্স তৈরি করেছে। জার্মানির মত ম্যাস কিলিং করতে কেমিকাল এজেন্ট ব্যবহার করেনি জাপানিজ আর্মি। জাপানিরা সবসময়ই এ ধরনের রিসার্চ করতে অভ্যস্ত।'

'তার মানে ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র হাতে ভাইরাস তুলে দেয় নাজিরা।' চোখের কোণ চুলকে নিল রানা।

'কিন্তু একটা জিনিস মিলছে কই?' বলল সোহেল। 'ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র দরকার পড়ল কেন প্রাচীন লেখার? একটা নৌকা নিয়ে পড়ল কেন?'

সোহেলের দিকে চাইল ফারা। 'নৌকাটা দরকার ছিল। আসলে দরকার ছিল ওটার ভিতরে রয়ে যাওয়া রোগ।'

অনিল একবার মাথা দোলাল। 'আগেই বলেছি, নৌকো থামবার পর শুরু হলো ভয়ঙ্কর সব রোগ। যে বা যারা ট্যাবলেট লিখেছে, তারা বিস্তারিত ভাবে লিখেছে কী রোগে মরছে মানুষ।'

'সেগুলোর ভিতর ছিল এয়ারবোর্ন হেমোরেজিক ফিভার,' বলল ফারা। 'বড় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা। তাদের অর্ধেক মানুষ মরল ক'দিনের ভিতর। এরপর ভাইরাসের আক্রমণ শেষ হলো। এর পরের ঘটনা করুণ। যারা বেঁচে রইল তাদের বেশির ভাগ হয়ে গেল বন্ধ্যা। অল্প কিছু লোক মিশতে

লাগল নিচু জাতির স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। এদের কেউ কেউ পেল সন্তান। অর্থাৎ ওই ভাইরাস বেশিরভাগ মানুষকে স্টেরাইল করে দেয়।'

'তৎকালীন জাপান চেয়েছে মেইনল্যাণ্ড চিনকে দমন করতে,' বলল অনিল। 'এ ধরনের রোগ হাতে পেলে ব্যবহার করত জাপানীরা। ফারা ও আমি ধারণা করি, ওই ট্যাবলেট ছাড়াও, জাপানের হাতে মামিফায়েড লাশ তুলে দেয় জার্মানরা। তারাই আবিষ্কার করেছিল কোথায় রয়েছে ওই নৌকো।'

'একটা জট খুলল,' বলল সোহেল। 'জাপানিরা এসব ট্যাবলেট পেয়েছে জার্মানদের কাছ থেকে। হতেই পারে। নৌকা থেকে পেয়েছে জার্মানরা। ওরা তখন দখল করে নিয়েছিল নরওয়ে। সময়টা ছিল বোধহয় উনিশ শ' চল্লিশ।'

'"পাথর ও বরফের দুনিয়া" বলা হয় আইসল্যাণ্ড বা গ্রিনল্যাণ্ডের কিছু অংশকে,' বলল অনিল। 'তবে ওই দেশগুলো কখনও দখল করেনি জার্মানি। রাশানদের হাতে পড়ে ফিনল্যাণ্ড। নিরপেক্ষ রইল সুইডেন। বাকি রইল নরওয়ে। ওই দেশের উত্তর উপকূলে রয়েছে ফিয়োর্ড। ওখানে লোকবসতি নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ এলাকায় মানুষের পা পড়েনি।'

'ফারা, একটু আগে ডেকে তুমি বলেছ ওই রোগে ইমিউন হেলেন,' বলল রানা।

'যত ভেবেছি, কোনও শক্ত যুক্তি পাইনি। গোল্ড অভ মার্সে আর সবাই ওই ভাইরাসে মরল, কিন্তু কিছুই হলো না হেলেনের। কেন? তারপর বুঝতে পারলাম। ট্যাবলেটে লেখা রোগ কিন্তু বাতাসবাহী। রেসপন্সিভিস্টরা যে ধরনের ভাইরাস তৈরি করে, সেটার বিরুদ্ধে লড়েছে হেলেনের ইমিউন সিস্টেম। যতই সাপ্লিমেণ্টাল অক্সিজেন থাকুক, একটু হলেও শরীরে ঢুকেছে

ভাইরাস। কিন্তু কিছুই হয়নি ওর।

'আসলে ওর কোনও এক পূর্বপুরুষ ওই রোগে পড়ে, এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার ধারণা ওর ডিএনের ভিতর অ্যান্টিবডি কোডে লেখা আছে এই রোগকে কীভাবে পাল্টা আক্রমণ করে ঘায়েল করতে হবে। হেলেন বলেছে ও এসেছে উত্তর নরওয়ের এক ছোট শহর থেকে। তা থেকে ধারণা করছি, ওই নৌকা ওদিকেই কোথাও ভিড়েছিল।'

'ওকে টেস্ট করা যায়?' জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চয়ই। যদি পাই ওই ভাইরাসের স্যাম্পল, তবে।'

ঘুমে জড়িয়ে আসছে রানার চোখ। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'সরি। আমার এবার উঠতে হবে। ঘুমাব। পাযলের আরেকটা অংশ কিন্তু মিলছে না। ধরে নিলাম ওই নৌকা আবিষ্কার করেছে জার্মানরা, অনুবাদও করেছে ট্যাবলেট, জানতে পেরেছে ওই ভয়ঙ্কর রোগের কথা—ওটা ওদের দরকার নেই, কাজেই দিয়ে দিয়েছে বন্ধু জাপানকে। ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু সেই ভাইরাস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছে। কিন্তু সত্যিই কি ওই ভাইরাসকে সক্ষম করে তুলেছিল? ধারণা করতে পারি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোথাও এর প্রয়োগ নেই। আমরা এ ধরনের রোগের ইতিহাস পাই না।'

ফারা ও অনিল চেয়ে রইল।

হাই চাপল রানা। 'তা হলে আমরা কেন ভাবছি ওই ভাইরাস পড়েছে রেসপন্সিভিস্টদের হাতে? ষাট বছর আগে যদি জাপানিরা ব্যর্থ হয়, তো ডিয়েটস কেসলার বা তার স্যাঙাৎরা সফল হয় কী করে?'

'এ নিয়ে আরও ভাবতে হবে,' বলল অনিল। 'তবে অন্য কোনও সূত্র বাদ দিই, রেসপন্সিভিস্টদের ওই সংগঠনের নেতা

ছিল লিঙ্ক চ্যাপেল। যে কিনা ছিল দুনিয়া-সেরা এক ডিযিয রিসার্চার। জাপানের ওই ফিলিপিনি ফ্যাসিলিটি নিজেরাও ব্যবহার করেছে রেসপন্সিভিস্টরা। কীভাবে জানল ওটা ওখানে রয়েছে? যেভাবেই হোক, ওরা জানত ওখানে ভাইরাস নিয়ে কাজ হয়েছে। এই সূত্রগুলো খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'পরের প্রশ্ন, কেন ভাইরাস দিয়ে খুন করল গোল্ড অভ মার্সের সবাইকে?' বলল রানা। 'ভবিষ্যতে ওটা দিয়ে কী করতে চায়?' কোনও কথা বলছে না কেউ। 'ওরা যদি জনসংখ্যার আধিক্যকে মস্ত সমস্যা মনে করে, ওই ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়, তাতে মরবে কোটি কোটি মানুষ। এর ফলে শুরু হবে পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। সামলে নেবে না সভ্যতাগুলো। সোজা কথায়, ওদের হাতে রয়েছে কেয়ামত টেনে আনার অস্ত্র।'

'ওরা যদি ব্যবহার করে?' বলল আতাসি। 'যদি ধরে নেয় সভ্যতা ধ্বংস হোক, তাতে ওদের কী?'

'করতে পারে,' বলল অনিল। 'তবে রেসপন্সিভিস্টদের বিষয়ে কিছু লেখাপড়া করেছি। ওদের বই পড়ে মনে হয় না ওরা অযৌক্তিক মানুষ। ওরা লিখেছে, মানুষ আবার আদিম যুগে ফিরতে পারে। হয়তো ঠিক তা-ই চাইছে, থেমে যাক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইযেশন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি।'

'ক্রুজ শিপে আক্রমণ কেন?' বলল রানা। 'প্রতিটি বড় শহরে ভাইরাস ছড়িয়ে দিলে অসুবিধা কী?'

চুপ করে রইল সবাই।

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা। 'সবাইকে আরও ভাবতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা খুঁজে বের করব কেন-কী করতে চাইছে রেসপন্সিভিস্টরা। আপাতত আমি চললাম, নইলে

এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব। কেবিনে ফিরে একবার যোগাযোগ করব আমার বস্ ও অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। তাঁদের সব জানা দরকার। শুনি কী বলেন তাঁরা।' অনিল ও ফু-চুঙের দিকে চাইল রানা। 'তোদের বসের মাধ্যমে তোরাও জানিয়ে রাখ্ চিন ও ভারত সরকারকে। স্বর্ণা বা কাশেম যোগাযোগ করলে আমাকে জানাবি।'

'ওরা সঙ্গে স্যাটালাইট ফোন রাখেনি,' বলল ফু-চুং। 'পার্ল অভ মুনের শিপ-টু-শোর টেলিফোন ব্যবহার করবে। যোগাযোগ করার কথা...' ঘড়ি দেখে নিল চৈনিক গুপ্তচর। 'আর তিন ঘণ্টা পর।'

'ওদের বলবি আমিও বলেছি, জাহাজ থেকে নেমে পড়তে। দরকার হলে লাইফবোট চুরি করে নেমে পড়ুক।'

রানার মনে হলো এক পলক আগে চোখ বুজেছে। এরইমধ্যে বাজতে শুরু করল ফোন?

'রানা,' খসখসে জিভে জড়িয়ে গেল কথা। পর্দা ভেদ করে সূর্যালোক এসে পড়ছে কপালে। মাথা সরিয়ে নিল রানা।

'বস্, আমি আতাসি। আপনার এখুনি অপারেশন্স সেন্টারে আসা দরকার।'

'কী হয়েছে?' পা ঘুরিয়ে কট্ থেকে নেমে পড়ল রানা।

'আমার মনে হয় একটা ইএলএফ ব্যাণ্ডে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কেউ।'

'ওটা দিয়ে তো সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেভি।'

'তবে এরা নেভি নয়, বস্। আপনি বলেছিলেন আমেরিকা তাদের শেষদুটো ট্র্যান্সমিটার খুলে ফেলেছে দু'বছর আগে। তা ছাড়া এরা ট্র্যান্সমিট করছে সেভেনটি-সিক্স হার্টয-এ। তথ্য

আসছে হাণ্ড্রেড থার্টিন-এ।'

'সোর্স কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'যে-টুকু রিসিভ করেছি, তাতে লোকেশন পিন-পয়েন্ট করা যায়নি। তা ছাড়া ট্র্যান্সমিশন খুব লো ফ্রিকোয়েন্সির।'

'ঠিক আছে। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।' শার্ট-প্যান্ট পরে নিল রানা, জুতো পরতে আধ মিনিট, এক মিনিট গেল দাঁত ব্রাশ করতে। একবার রিস্টওয়াচ দেখল, তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। তবে ওর মনে হলো, সময় পেরিয়েছে বড়জোর তিন মিনিট।

সাড়ে চার মিনিট পর অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল রানা। গুঞ্জন করে চলেছে সুপার কম্পিউটার। এ কামরায় ঢুকলে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয় ওর। এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় গোটা জাহাজ ও অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র। মুহূর্তে হাতে চলে আসে প্রচণ্ড ক্ষমতা।

রানা সিটে বসতেই ধূমায়িত কফির মগ পাশে রাখল মোস্তাফা আবুল। 'মিস্টার আতাসি বললেন, আপনার লাগবে।'

'ধন্যবাদ।' মগে চুমুক দিল রানা। আতাসির মনিটরের দিকে চাইল। 'এবার বলো।'

'আপনি তো জানেন অটোমেটিক্যালি প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করে আমাদের কম্পিউটার। প্রতিটি রেডিওর স্পেকট্রাম। ওটা যখন বুঝল ইএলএফ লেভেলে ট্র্যান্সমিট চলছে, রেকর্ড করতে শুরু করল। তারপর যখন বুঝতে পারল একটা শব্দ ধরতে পেরেছে, আমাকে সতর্ক করে দিল। আমি এখানে আসবার পর এখন পর্যন্ত মাত্র ওই চারটে শব্দ ট্র্যান্সমিট করেছে।' মাথা কাত করে ফ্ল্যাট-প্যানেল দেখাল সে। রানা স্ক্রিনে দেখতে পেল ওখানে লেখা: দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস।

'ব্যস?' তবে রানার কণ্ঠে কোনও হতাশা প্রকাশ পেল না।

ইএলএফ ওয়েভ অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, চলে যায় সোজা বাইশ শ' মাইল উপরে। পুরো পৃথিবী ঘুরে তথ্য পৌঁছে যায় সাগরের গভীরে। আসলে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার পুরো পৃথিবীকে বিশাল এক অ্যান্টেনার মত ব্যবহার করে। এর খারাপ দিক, সাবমেরিনগুলো পাল্টা জবাব দিতে পারে না। তাদের ওই আকারের ট্র্যান্সমিটার থাকে না। এ কারণে পুরো সিস্টেম বাতিল করে দিয়েছে নেভি। এক কথায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে ওটা বাতিল হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে: কেন ইএলএফ সিস্টেম নেই সাবমেরিনে। উত্তর: সেক্ষেত্রে কমপক্ষে লাগবে তিরিশ মাইল দৈর্ঘ্যের অ্যান্টেনা। ওটা মাত্র আট ওয়াট সিগনাল ব্যবহার করে, তবে অতবড় অ্যান্টেনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করবার ক্ষমতা সাবমেরিনের নেই। এমন কী নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের রিয়্যাক্টরও তা পারে না। তবে সবচেয়ে বড় কারণ: এমন এক এলাকায় রাখতে হবে ট্র্যান্সমিটার, যে মাটিতে বিদ্যুৎ চলৎশক্তি খুব কম। যাতে রেডিও ওয়েভ শোষিত না হয়। পুরো পৃথিবী জুড়ে মাত্র কয়েকটি এলাকা রয়েছে, যেখানে ইএলএফ ব্যাণ্ড পাঠানো যায়। সেগুলোর ভিতর নেই কোনও সাবমেরিন।

'লগের কথা বলি,' মনোযোগ কেড়ে নিল আতাসি। 'আরেকটা ইএলএফ ট্র্যান্সমিশন হয়। ওটা একই ফ্রিকোয়েন্সিতে। সময়টা ছিল গতকাল রাত দশটা। মেসেজে ছিল একগাদা এক আর শূন্য। আমি মেইনফ্রেম কম্পিউটারকে কাজ দিয়েছি। ওটা যদি কোনও কোড হয়ে থাকে, বেরিয়ে আসবে।'

আতাসির স্ক্রিনে আরেকটা অক্ষর ভেসে উঠেছে—'আই'। এক মিনিট পর এল একটা 'টি'।

'দাঁতের ডাক্তার যেভাবে আয়েস করে দাঁত তোলে, তার চেয়ে দেরি করে এর নড়াচড়া,' নালিশ করল আতাসি। 'কে তৈরি করে এই কচুর ইএলএফ অ্যান্টেনা?'

'সোভিয়েতরা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ওরা গভীর পানিতে থাকা সাবমেরিনের সঙ্গে বহু দূর থেকে যোগাযোগ করত। এ ছাড়া আর কোনও কারণ ছিল না।' একটা চিন্তা এসেছে ওর। এই ট্র্যান্সমিটার যদি আমেরিকান না হয়, তো হতে পারে রাশান বা ইজরায়েলিদের। শুনেছে গোপনে রাশানদের কাছ থেকে প্রযুক্তি কিনছে ইজরায়েল। ইজরায়েলিরা হয়তো জেনে গেছে, ওরা নজর রাখছে আর্মস ডিলার ব্যালফোর জেনকিন্সের উপর।

'অপেক্ষা করতে হবে বাকি জীবন,' বলল আতাসি। 'হয়তো দশ বা পনেরো মিনিট পর আরেকটা অক্ষর ছাড়বে।'

অপেক্ষা করল ওরা। তবে এক মিনিট পর কম্পিউটারে আরও অক্ষর ভেসে উঠল। সব মিলে রইল দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ইটস উর...

চেয়ে রইল রানা, এরপর একটা একটা করে এল অক্ষরগুলো। বিওএসএইচআই।

অর্থাৎ, বশি?

'এর মানে কী?' বলল আতাসি।

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। 'বলছে, আমি উর্বশী। ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার দিয়ে যোগাযোগ করছে।'

বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিল আতাসি। দ্রুত হাতে কম্পিউটারে আরেকটা উইণ্ডো খুলল। আর্কাইভ থেকে বের করল ওয়ায়ারটেপ। ওটা পাওয়া গেছে ক্রিস ক্রিংগলের অফিস থেকে। 'আগে কেন বুঝলাম না?' নিজের উপর রেগে উঠেছে। স্ক্রিনে

ভেসে উঠল:

আমি মনে করি না... (১:২৭) হ্যাঁ... (২:৫৭) পার্লা মোনা... (১:৩৫) ওই ইল লেফ অ্যাকটিভেট... (:৩৮) কী... (১:০৩) আগামী(কাল).... (৪:২০) তা হবে না... (:৪২) এক মিনি(ট)... (৬:৫৭) বাই। (১:১৪)

'কী বোঝোনি?' জানতে চাইল রানা।

'চতুর্থ শব্দগুলো। ইল লেফ অ্যাকটিভেট মানে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার চালু করতে বলেছে। রেসপন্সিভিস্টদের নিজেদের রয়েছে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার।'

আস্তে মাথা দোলাল রানা। 'ওরা যদি ক্রুজ শিপগুলোর ভিতর ছড়িয়ে দিতে চায় টক্সিন, ইএলএফ বার্তা দিয়ে একইসঙ্গে পুরো দুনিয়া জুড়ে তা জানাতে পারবে।'

অধৈর্য লাগতে শুরু করেছে ওর। উর্বশীর কাছ থেকে অতি ধীরে আসছে বার্তা। এদিকে চেপে ধরেছে ঘুম। হার মেনেছে কড়া কফি। উঠে দাঁড়াল রানা। 'আতাসি, আমি কেবিনে ফিরছি। পুরো বার্তা এলে ঘুম থেকে ডেকো। আরেকটা ব্যাপার, কোথা থেকে ট্র্যান্সমিশন আসছে পিন-পয়েন্ট করো। এটা এখন সবচেয়ে জরুরি। প্রয়োজনে অনিলের সাহায্য নাও।' একবার কম্পিউটারের দিকে চাইল রানা, মনে মনে বলল, 'জানি না কীভাবে যোগাযোগ করলে, উর্বশী, কিন্তু দারুণ দেখিয়েছ!'

নয়

দুনিয়ার সবচে' পুরনো কৌশলগুলোর একটা ওটা, তবে চমৎকার কাজে লেগে গেছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র তীরের ওই পাথুরে ক্লিফটা আবিষ্কার করেছে উর্বশী। এটিভি থেকে নেমে পড়েছে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও পাহাড়ের পায়ে সমুদ্রের মাথা কোটার ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনতে পেয়েছে পরিষ্কার। জায়গাটা ছোটখাট একটা দ্বীপ বলে মনে হয়েছে ওর কাছে। বুঝতে পেরেছে, এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না। পুরোপুরি খুলে দিয়েছে ও এটিভির থ্রটল, যন্ত্রটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে নীচে পাথরের গায়ে, সেখান থেকে সোজা সৈকতে। চারপাশ ছিল নিকষ অন্ধকার, কোথায় গিয়ে পড়ল দেখতে পায়নি ও। ধারণা করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পলাতক বন্দির জন্য চারপাশ খুঁজতে শুরু করবে ব্রাঙ্কো। এবং সহজেই পেয়ে যাবে বিধ্বস্ত এটিভিটা।

পায়ে হেঁটে আবার ফিরে এসেছে ও বাঙ্কারের প্রবেশ-পথে। ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে সার্চ পার্টি। মেডিকেল স্টাফরা শুশ্রূষা করছে আহত মেকানিকদের। সুযোগ বুঝে আবার গ্যারাজে ঢুকে পড়েছে উর্বশী, আবারও নেমে এসেছে পাতাল ফ্যাসিলিটির ভিতর। ধারণা করে নিয়েছে, ব্রাঙ্কো ভাবতেও পারবে না ও এখানে ফিরে আসতে পারে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমপ্লেক্সের ভিতর অসংখ্য লুকানোর জায়গা। উর্বশীর পরনে মেকানিকের পোশাক। সহজে এখানে ওখানে ঘুরঘুর করতে পারবে। নীচে নেমে আগের দেখা কিছু দরজা খুলে দেখেছে। সেগুলোর বেশিরভাগই ডরমেটরি। অসংখ্য বাঙ্কার। প্রতিজনের জন্য রয়েছে পর্দার ব্যবস্থা। বিশাল সব লকার রুমের মত ঘর, সেখানে শাওয়ারের ব্যবস্থা। উর্বশীর বুঝতে দেরি হয়নি, এই ফ্যাসিলিটি অন্তত কয়েক শ' মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। তবে এ মুহূর্তে এক শ'র মত লোক রয়েছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরে ক্যাফেটারিয়া। স্টোভের বার্নার পরখ করল উর্বশী। এখানে কিছুই রান্না হয়নি। আলমারির চেয়েও বড় ফ্রিজারগুলোর ভিতর ঠাসা খাবার। একটা স্টোরেজ এরিয়া পেল, ওটার মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত পানির বোতল ও ক্যান ভরা খাবার।

কোল্ড-ওয়ারের সময়ে এ ধরনের ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছিল আমেরিকা ও রাশা। এটা যেন ঠিক সেগুলোর মত। একজন মানুষের যা যা লাগতে পারে তার সবই রয়েছে। কী নেই? খাবার, পানি, ইলেকট্রিসিটি! হয়তো খুব আয়েশ করে থাকা চলবে না, তবে যুদ্ধ লাগলে নিশ্চিন্তে কাটবে জীবন। এ ফ্যাসিলিটি নতুন, তৈরি করেছে রেসপন্সিভিস্টরা, কাজেই উর্বশী আন্দাজ করেছে, কোনও ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে চলেছে এরা। ওর মনে পড়ল, রানারা গোল্ড অভ মার্সে কী ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য দেখেছে।

বড় এক ক্যান ভরা মটরশুঁটি খেয়ে দূর করল খিদে, তারপর ওখানে দাঁড়িয়েই দু'বোতল পানি শেষ করল উর্বশী। এরপর বুক ও পেটের আহত অংশ বেঁধে নিল কষে। আধুনিক ডাক্তাররা নাকি বলেন চিড় ধরা হাড় না বাঁধতে; তবে প্লাস্টিক

দিয়ে পাঁজর বেঁধে নেয়ার পর ব্যথা অনেক কমল। খাবার ও পানি ওকে বেশ অনেকটা শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে।

ওভারঅলের গভীর পকেটে আরও দুটো পানির বোতল চালান দিল উর্বশী, তারপর নতুন করে শুরু করল অভিযাত্রা। প্যাঁচালো করিডোরে দু'চারজনের সঙ্গে দেখা হলো। তারা সন্দেহ নিয়ে ওর ক্ষতগুলোর দিকে চাইল। তারপর যখন শুনল সেই পলাতক বন্দি ওর উপর হামলা করেছিল, তখন সান্ত্বনা দিল।

ওকে যেখানে রাখা হয়, তার একতলা উপরে এসে উর্বশী টের পেল, এসব করিডোরে আসে না সাধারণ রেসপন্সিভিস্টরা। বুঝতে দেরি হলো না, এটা অভিজাত এলাকা। সেগুলোর ভিতর একটা করিডোরের এই দু'পাশ আবার সেরা। এখানে মুখোমুখি দুটো দরজার উপর সিকিউরিটি কী-প্যাড। ইলেকট্রনিক্সগুলো এখনও পুরোপুরি বসানো হয়নি। মেঝের উপর ছোট এক টুল ও পাশে টুলবক্স। মনে হয় কোনও জরুরি যন্ত্র লাগবে, তাই আনতে গেছে মিস্ত্রি।

একপাশের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল উর্বশী, আগের মত আবারও বন্ধ করে দিল দরজা। মেঝের উপর পুরু সবুজ কার্পেট। দেয়ালে কাঠ ও পাথরের কারুকার্য। বাতাসে এখনও রঙের হালকা গন্ধ। বাতির ফিক্সচার আগের মতই ফ্লুরোসেন্ট, তবে অত্যন্ত দামি। দেয়ালে যে সব ছবি, সব উজ্জ্বল রঙের। সেগুলোর ভিতর রুচির ছাপ নেই যদিও। ডাইনিং ফ্যাসিলিটি নামকরা কোনও রেস্টুরেন্টের মত। দেয়ালে সত্যিকারের জানালার বদলে ফ্ল্যাট-প্যানেল মনিটর। চেয়ারগুলো ভারী, দামি চামড়া দিয়ে মোড়া গদি। বারের উপর অংশ মেহগনি কাঠের।

এই প্রকাণ্ড কমপ্লেক্সে সবই আছে। সেক্রেটারিদের অফিস,

কমিউনিকেশন্স সেন্টার, জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল—কী নেই। কমিউনিকেশন্স রুমে ঢুকল উর্বশী। চোখ খুঁজতে শুরু করেছে ফোন বা কোনও রেডিও। কিন্তু বদলে অন্য কিছু দেখল। জিনিসটা ঠিক বুঝল না। তবে ধারণা করল, এই ছোট ঘরে ধরা পড়তে পারে। ঠিক করল, পরে আবার চারপাশ খুঁজবে।

বেরিয়ে এল উর্বশী। একপাশে এগজিকিউটিভ উইং। ওখানে যেসব বেডরুম, হার মানাতে পারে ফাইভ-স্টার হোটেলকে। প্রতি বেডরুমে মিনি-বার। বিশাল বেডের পাশে টেবিল, সেখানে ধর্মীয় বই নেই, বদলে লিঙ্ক চ্যাপেলের: *নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে।* চারপাশে চল্লিশজন থাকবার মত ঘর, ওখানে থাকতে পারবে দম্পতিরাও। এসব বোধহয় রেসপন্সিভিস্টদের সেরা মানুষগুলোর জন্য, ভাবল উর্বশী। নেতা, বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স ও বিশাল ধনী লোকেরা এখানে থাকবে। এগজিকিউটিভ উইঙের শেষে আরেকটা সুইট দেখল উর্বশী। ওটা বোধহয় ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রীর জন্য। ওটার ভিতর অংশ অন্য যে-কোনও সুইটের চেয়ে অনেক বেশি বিলাসবহুল। শুধু বাথরুমই সাধারণ স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে বড়। বাথটাব দেখে মনে হলো ওটার ভিতর নামলে সাহায্য চাইতে হবে লাইফগার্ডের।

রাতটা কাটাল উর্বশী ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রীর বিছানায়। সকালে উঠে তাদের কারও একজনের জন্য রাখা টুথব্রাশ দিয়ে মেজে নিল দাঁত। তবে কুলি করতে গিয়ে চমকে উঠতে হলো। লিভিংরুম থেকে শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠ। গলার আওয়াজই বলে দিল বিশ্রী ইংরেজিতে কী যেন বলছে ব্রাঙ্কো। তারপর আরেকজন কথা বলে উঠল। মসৃণ ভাবে ইংরেজি বলে। এ বোধহয় ডিয়েটস কেসলার। তারপর শোনা

গেল তৃতীয় কণ্ঠ। এবার আরেকবার চমকে উঠল উর্বশী। আরে! এ লোক তো সেই লিয়োনার্দো চার্চ, সেই ডিপ্রোগ্রামার!

কথাগুলো কান পেতে শুনতে লাগল উর্বশী। একের পর এক তথ্য ওর ভিত কাঁপিয়ে দিল। লিয়োনার্দো চার্চ আসলে লিঙ্ক চ্যাপেল। সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু কাজে লেগেছে—মনে মনে বলল উর্বশী। বুঝতে পারছে এই লোকগুলো যা বলছে সেসব বিশ্বাসও করে নিজেরা। ওদের একটা ধর্ম আছে, আছে পথ দেখানোর মত নেতা, প্রচুর অনুগত কর্মী—তাদের যা-ই নির্দেশ দেওয়া হোক, বিনা দ্বিধায় পালন করবে।

ক্রিস ক্রিংগলের আত্মহত্যা সম্বন্ধে বলল ডিয়েটস কেসলার। উর্বশী বুঝে নিল লোকটাকে আসলে খুন করেছে ব্রাঙ্কো। এরপর লোকগুলোর ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ওরা ছেড়ে দেবে ওদের তৈরি করা ভয়ঙ্কর ভাইরাস। দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষকে স্টেরাইল করে দেবে!

সত্যি পারবে, ভাবতে গিয়ে স্বীকার করে নিতে হলো। দুনিয়া জুড়ে বাইয়োঅ্যাটাক হলে সভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়ত, কিন্তু ওরা যেটা করতে চলেছে তাতে মানব-সভ্যতা টিকবে। অবশ্য সবচে' ভয়ঙ্কর ভাইরাসটা যদি প্রয়োগ না করে, তা হলেই। এক শ' বা দুই শ' বছরের জন্য পিছিয়ে পড়বে মানবসভ্যতা। তবে শেষে সবাই পাবে বিপুল বিত্ত, সর্বক্ষেত্রে অপরিসীম প্রাচুর্য। ইন্টারনেটে লিঙ্ক চ্যাপেলের বই পড়েছে। লোকটা লিখেছে: *দারিদ্র্য কোনদিন মুছত না, যদি না আসত কাল মহামারী। অর্ধেক ইউরোপ খালি হয়ে গেল সেই প্লেগের আক্রমণে। ফলে সম্ভব হলো মানুষের জন্য নতুন এক ভবিষ্যতের দুয়ার উন্মোচন।*

ব্যাপারটা এত সহজ নয়, নিজেকে বলল উর্বশী। ওরা যা খুশি করবে, তা হবে না। যদিও মনে মনে জানে, এখন দুনিয়া

জুড়ে চব্বিশ ঘণ্টা তথ্যের চালাচালি চলছে, যানবাহনের উন্নতির ফলে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চলে যাচ্ছে মানুষ। আর সে কারণেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে মহামারী ও আতঙ্ক। আগামী বিশ বছরের মধ্যেই অনেক হ্রাস পাবে জনসংখ্যা, দ্রুত খালি হয়ে আসবে দুনিয়া। আসলে সুবিধা কাদের হবে? যারা এদের কথা মেনে চলবে, তাদের। তারা বেশিরভাগই হবে শ্বেতাঙ্গ। তারাই পরিচালনা করবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে। বাকিরা থাকবে তাদের দাস হিসাবে।

ওরা সর্বনাশ করতে চাইছে দুনিয়ার সব অশ্বেতাঙ্গ মানুষের। আমারও। রাগে কাঁপতে শুরু করেছে উর্বশী। চ্যাপেল, কেসলার বা ব্রাঙ্কো কোন্ অধিকারে মানবসভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়?

যদি পারত, বাথরুম থেকে বেরিয়ে একাই হত্যা করত উর্বশী ওই লোকগুলোকে। কিন্তু সে সাধ্য ওর নেই। মনকে শান্ত করতে চাইল। মনে মনে বলল, অপেক্ষা- করো, মেয়ে—তোমারও সময় আসবে। ধৈর্য ধরো।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাথরুম থেকে বেরুল উর্বশী, বেরিয়ে এল ওই সুইট থেকে। কাছের এক বেডরুমে ঢুকল, খুঁজে নিল ক্লজিট। আপাতত এটাই ওর আশ্রয়স্থল। চট্ করে কেউ খুঁজে পাবে না। তবে মাথা থেকে দূর করতে পারল না দুশ্চিন্তা। বুক কাঁপছে ওর। লোকগুলো আরও কী করতে চলেছে, কে জানে!

একটা ট্র্যান্সমিটারের কথা বলেছে ওরা। কোঅর্ডিনেট করবে, ছড়িয়ে দেবে ভাইরাস। নিশ্চয়ই সেজন্য রয়েছে কোনও অ্যাকটিভেশন কোড? উর্বশী নিজেই খুঁজে পেল ওর ধারণাতে ভুলটা কোথায়। এরিয়াল ব্রডকাস্ট হলে, তা যতই হোক না শর্টওয়েভ, কেউ না কেউ শুনবে। তা হলে তাদের নিরাপত্তা

বলতে কিছুই থাকবে না। অনেক বেশি ঝুঁকি। নানান বাধা পড়বে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ব্রডকাস্ট করা না-ও যেতে পারে। ঠিক ওই সময়ে থাকতে পারে সানস্পট। সিগনাল ফেইলিয়ার হতে পারে।

না, শর্টওয়েভ হতে পারে না।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাববেসমেণ্টের কথা মনে পড়ল উর্বশীর। ওখানে রয়েছে পুরু তামার তার। কোথায় গেছে সেসব? তারের ভিতর দিয়ে বইয়ে দেয়া যেতে পারে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ।

বিড়বিড় করে বলল উর্বশী, 'তোমরা ইএলএফ অ্যাণ্টেনা তৈরি করেছ।' ওর জানা হয়ে গেল কী করে সতর্ক করবে রানাকে।

অপেক্ষা করে রইল উর্বশী। আগে ইএলএফ অ্যাণ্টেনা টেস্ট করুক ব্রাঙ্কো। রাত গভীর হওয়ার পর সাবধানে আবার বেরুল উর্বশী। পা টিপে চলে এল কমিউনিকেশন্স রুমে। প্রথমে এ ঘরকে তাই ভেবেছিল। ট্র্যান্সমিটার কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা বুঝতে দীর্ঘ বিশ মিনিট সময় লাগল। ফাইন-টিউন করে নিল ফ্রিকোয়েন্সি, তারপর তথ্য দিতে শুরু করল:

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস আমি উর্বশী এরা ভাইরাস আক্রমণ করতে চলেছে কেবল পঞ্চাশটা ক্রুজ শিপে খুন নয় দুনিয়া জুড়ে আরও খারাপ কিছু শীঘ্রি যেভাবে হোক এখানে নিউক ফেলতে হবে > হাতে সময় বাহাত্তর ঘণ্টা

যদি পারত, উর্বশী জানিয়ে দিত কোথায় রয়েছে এই ট্র্যান্সমিটার, কিন্তু ওর কাছে সে তথ্য নেই। মনে মনে আশা করল, এই সিগনাল ট্রেস করবে আতাসি। ইচ্ছে করে লিখেছে নিউক্লিয়ার বোমার কথা। ওর ধারণা, এটা সাধারণ বাঙ্কার নয়। ধ্বংস করতে হলে ফেলতে হবে আণবিক বোমা। নিজে মরতে

রাজি, তবুও ওই পিশাচগুলো যেন দুনিয়ার উপর নরক নামিয়ে আনতে না পারে। ও জানে না, রানার পক্ষে নিউক্লিয়ার বোমার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না। তবে কী প্রয়োজন সেটা রানাকে জানানো ওর কর্তব্য। রানা যদি না পারে তা হলে...

নিজ আস্তানার ভিতর গিয়ে ঢুকল উর্বশী; কয়েকটা প্রোটিন-বার শেষ করে মিনি-বার থেকে নিল বিয়ার। খাওয়া হলে আবার ঢুকে পড়ল ক্লজিটের ভিতর। ও জানে, দ্রুত এগিয়ে আসছে রেসপন্সিভিস্টদের আক্রমণ-দিবস, সুতরাং ব্রাঙ্কোকে নির্দেশ দেবে ডিয়েটস কেসলার—এই ফ্যাসিলিটির প্রবেশপথে থাকবে প্রহরী। ওই পথে বেরুনো অসম্ভব। অন্য কোনও উপায় খুঁজতে হবে। সেজন্য হাতে সময় মাত্র তিনদিন।

অফিসে বসেছে ডিয়েটস কেসলার, সঙ্গে লিঙ্ক চ্যাপেল। জমে উঠেছে আলাপ, এমন সময়ে কে যেন নক করল দরজার উপর। চট্ করে ডেস্ক থেকে চশমা তুলে নিল ডিয়েটস, লুকিয়ে ফেলল। কিছুদিন হলো বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয় চশমা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ব্রাঙ্কো। চেহারা তার সবসময়ই গম্ভীর থাকে, তবে এই মুহূর্তে মনে হলো কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে।

যাই ঘটে থাকুক, তা খারাপ কিছু, বুঝে নিল কেসলার। জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'টিভি নিউজে দেখলাম, ইস্তাম্বুলে ক্রুজ শিপ পার্ল অভ মুনে একজন মানুষ মারা গেছে। আমাদের নিজেদের লোক। চাক গুণ্ডারসন।'

'ওকেই তো দলের নেতা করে পাঠানো হয়েছিল, ঠিক?'

'জী, স্যর।'

'বিস্তারিত কিছু জানা গেছে?' জানতে চাইল চ্যাপেল।

'শুধু জানি এইট্রিয়ামের ব্যালকনি থেকে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।'

'দুর্ঘটনা?'

'খবরে তা-ই বলছে। তবে আমি বিশ্বাস করি না। অতি কো-ইনসিডেন্স। একেবারে টিম লিডারকেই মরতে হবে?'

'তোমার ধারণা যারা অমল দাশা কিডন্যাপিঙের পিছনে ছিল, তারাই এ কাজ করেছে?' কেসলারের কণ্ঠে ব্যঙ্গের আভাস। 'তুমি বেশি বেশি ভাবছ, ব্রাঙ্কো। দুটো বিষয় এক সুতোয় গাঁথা না-ও হতে পারে।'

'আরও আছে,' আড়ষ্ট স্বরে বলল ব্রাঙ্কো। 'এইমাত্র ফিলিপিন্স থেকে আমাদের টিম যোগাযোগ করেছে। জানিয়েছে দু'জন লোক নাকি ভাইরাস ফ্যাক্টরির ভিতর ঢুকে পড়েছিল, আবিষ্কার করে ফেলেছে জাপানিদের গোরস্তান। সাধারণ কোনও টুরিস্ট না। গোলাগুলি হয়। আমাদের অন্তত দুজন মারা গেছে। গুহার ছাত ধসে পড়ায় ওরাও ভেতরে আটকা পড়েছে। কারা ওরা? কী মনে করে ঠিক ওখানেই গিয়ে হাজির হলো লোক দুজন? এসব ভাবনার বিষয় নয়, স্যর?'

থুতনির ভাঁজে আঙুল রাখল কেসলার। 'ঠিক আছে, বুঝলাম ওরা মাটি খুঁড়ছে। তবে কী করে জানবে ওখানে আমাদের ফ্যাসিলিটি ছিল? জানি না তারা কীভাবে টের পেল ওখানে জাপানিজ সুড়ঙ্গ আছে। তবে যা-ই হোক, এখন আর কিছুই যায় আসে না। আটকা পড়ে থাকলে এতক্ষণে মারা পড়েছে তারা। তা ছাড়া, আমরা পিছনে কিছুই রেখে আসিনি। কেউ সন্দেহ করবে না আমাদের। আর করলেই বা কী? আমাদের কাজ তো প্রায় শেষ।'

'আমার ভাল লাগছে না, ডিয়েটস,' বলল চ্যাপেল। একটু

ঝুঁকে এসেছে। 'এসবের ওপর বহু কিছু নির্ভর করছে। তা ছাড়া, আমি কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করি না। শুধু যদি অমল দাশার কিডন্যাপিঙের ফলে তোমাকে হুমকি দেয়া না হতো, আমি ভাবতাম না। কিন্তু এখন একইসঙ্গে দুটো কো-ইনসিডেন্স ঘটেছে। আমাদের দুজন লোককে খুন করে ফিলিপিন্স ফ্যাসিলিটির ভিতর লোক ঢুকেছে, ইস্তাম্বুলে মারা গেছে চাক গুণ্ডারসন। আমার ধারণা, অলরেডি একদল লোক ভালমতই আমাদের পিছনে লেগে গেছে।'

'তা যদি হতো, তা হলে এতক্ষণে ক্যালিফোর্নিয়ার হেডকোয়ার্টারে হামলা করত এফবিআই, চাপ তৈরি করত এথেন্সের ফ্যাসিলিটির উপর।'

রেসপন্সিভিস্টদের সর্বোচ্চ নেতা চুপ করে রইল। কথা ঠিকই বলেছে কেসলার।

'এরা যদি উর্বশী দাশার ভাড়া করা কোম্পানি হয়ে থাকে?' বলল জ্যারোন। 'যাদের দিয়ে ভাইকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে? হতে পারে তারা তদন্ত করছে। আমাদের ভিতরের খবর খুঁজছে। ভাবছে, একইসঙ্গে ওই দুই ভাই-বোনকে উদ্ধার করবে।'

ধীরে মাথা দোলাল লিঙ্ক চ্যাপেল। 'ঠিক তা-ই মনে হচ্ছে। তা হলে হিসাব মিলে যায়।'

'তার মানে আপনি মনে করেন ওরা আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই জানে না?' জানতে চাইল ডিয়েটস।

'হতে পারে,' বলল ব্রাঙ্কো, 'আর তারা যদি চাক গুণ্ডারসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে, সবই জেনে গেছে। সেক্ষেত্রে এতক্ষণে হামলার পরিকল্পনা করছে।'

'এই পরিস্থিতিতে কী করতে বলো, জ্যারোন?'

'আমি চাই পার্ল অভ মুনে গিয়ে উঠতে। কোনও অবস্থাতেই

ওদেরকে ভাইরাস খুঁজে পেতে দেয়া যাবে না। ওটা যদি পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে কর্তৃপক্ষের হাতে। কাজে লেগে যাবে একদল বিজ্ঞানী, হয়তো সিম্পটম থেকে বের করে ফেলবে টিকা। আমি ওখানে যাওয়ার পর চাইব সম্পূর্ণ কমিউনিকেশন ব্ল্যাকআউট। কোনও যাত্রী যেন ইন্টারনেট ব্যবহার বা শিপ-টু-শোর কল করতে না পারে। সেক্ষেত্রে ওই দলের লোকগুলো তাদের বড় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।'

'ওই জাহাজ এখন কোন দিকে চলেছে?'

'ইস্তাম্বুল থেকে ক্রিটের আর্কলিয়োনে। ওটা গ্রিক দ্বীপগুলোর কাছে এলেই আমি উঠতে পারব।'

এ সংগঠনের বাইরের খুব কম লোক জানে ওই জাহাজ কোম্পানির মালিক একজন রেসপন্সিভিস্ট। এ লোক স্ত্রী সহ এই সংগঠনে আসে কারণ ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, কখনও তাদের সন্তান হবে না। এরপর তারা যখন চ্যাপেলের বই পড়ল, নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নিল। তারও বেশি করল, বিশ্বাস করতে লাগল সন্তান না নেয়া মানুষের অন্যতম কর্তব্য। কোটি কোটি টাকা দান করল তারা এই সংগঠনে। খুব কম রেটে ব্যবহার করতে দিল ক্রুজ শিপগুলো। তবে এই শিপিং মোগল কখনও সর্বোচ্চ নেতাদের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। তার জানা নেই, এই জাহাজগুলোকে ব্যবহার করা হবে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য।

'আপনি ওই লাইন্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলুন,' বলল ব্রাঙ্কো। 'বলা যেতে পারে যে দল তাদের গোল্ড অভ মার্সে হামলা করেছে, সেই একই দল এবার পার্ল অভ মুনে হামলা করতে চলেছে। সে আমাকে জাহাজে উঠতে দিক, সেই সুযোগে

সাগরে থাকতেই ভাইরাস ছড়িয়ে দেব আমরা। এর ফলে আমাদের প্রতিপক্ষ সবই বুঝবে, কিন্তু কাউকে কিছু জানাতে পারবে না।'

'হামলার কথা শুনলে পুরো ক্রুজই বাতিল করে দিতে পারে ওদের প্রেসিডেন্ট,' বলল কেসলার।

'তা হলে তাকে বলুন আমাদের জরুরি কাজে জাহাজে ওঠা দরকার। ওখানে আমাদের পঞ্চাশজন রেসপন্সিভিস্ট আছে। ওদের নিয়ে সার্চ শুরু করতে পারি। হাতে যথেষ্ট লোক থাকায় খুঁজতে সুবিধে হবে। সন্দেহজনক কাউকে পেলেই আটক করব।'

লিঙ্ক চ্যাপেলের দিকে চাইল ডিয়েটস। চাইছে তাদের লিডার, রেসপন্সিভিজমের প্রণেতা কিছু বলুক। লোকটার চোখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, যে-কোনও বিষয়ের অনেক গভীরে গিয়ে চিন্তা করতে পারে মানুষটা। যা মুখ দিয়ে বলে, তার সব নিজে বিশ্বাসও করে।

'ডিয়েটস,' বলল সে. 'আমাদের মানব-জাতি ধ্বংস হতে চলেছে। অসংখ্য ক্ষুধার্ত মুখ হাঁ করে রয়েছে। প্রাকৃতিক সমস্ত উৎস শুকিয়ে এল বলে। তুমি জানো, আমিও জানি, পৃথিবী রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় এখন জনসংখ্যা কমিয়ে আনা। নইলে শেষ হবে গত সাত হাজার বছরের সভ্যতা। আমরা যা করছি তা সঠিক। যা করতে হবে, তা করতেই হবে। নইলে ফুরিয়ে যাবে সমস্ত সম্ভাবনা। শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

'পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আমার ধারণা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্যারোন। যেভাবেই হোক, আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম কেউ জেনে ফেলেছে। ভাবতে পারো,

আমি আন্দাজে কথা বলছি। কিন্তু এ মুহূর্তে কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না। আমরা সফলতার খুব কাছে পৌঁছে গেছি। এক সপ্তাহও নেই সব শুরু হতে। ওদের লোক যদি পার্ল অভ মুনে আমাদের ভাইরাস খুঁজতে থাকে, হয়তো পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সব জানিয়ে দেবে ম্যারিটাইম অথোরিটিকে। সবাই জেনে যাবে কীভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে কোন্ ধরনের ভাইরাস। তার মানে সর্বনাশ হবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার। এটা কি হতে দেয়া যায়?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল কেসলার। 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিই ভুল ভেবেছি। ভাবা উচিত হয়নি যে, কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। জ্যারোন, আমি ক্রুজ লাইন্সের সঙ্গে কথা বলব। তোমার যা প্রস্তুতি, নিতে শুরু করো। সঙ্গে নাও প্রয়োজনীয় লোক ও ইকুইপমেন্ট। আমি ব্যবস্থা নেব, যাতে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন তোমার নির্দেশ মত চলে। তবে একটা কথা মনে রেখো: ওই ভাইরাস যেন জাহাজ থেকে সরিয়ে না নেয়া হয়। প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্যর। প্রয়োজনে কঠোরতম ব্যবস্থা নেব।'

'তোমরা টের পাচ্ছ না?' বলল চ্যাপেল। প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে চাইল দুই রেসপন্সিভিস্ট। আশ্চর্য একটা ভাবের ঘোর এসে ভর করেছে চ্যাপেলের মধ্যে। বক্তৃতার ঢঙে বলে চলল, 'আমরা এখানে কালো শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছি। ওটা আমাদের ডিমেনশনাল মেমব্রেন থেকে অনেক দূরের কিছু। এরা হাজার বছর ধরে মানুষকে একটু একটু করে বদলে অমানুষ বানিয়ে দিয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ধ্বংসাত্মক। আমরা জানোয়ার হয়ে উঠেছি। এইসব শক্তি আজ আমাদের মানবতাকে

এ অবস্থায় টেনে এনেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের শেষ করতে চলেছি। তবে এখন আমরা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছি। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছি নিজেদের হাতে। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি পরিষ্কার এটা অনুভব করি। ওরা ভীষণ হতাশ হবে, ওদের বুঝতে হবে, আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করা চলবে না।

'আমরা যখন সফল হব, ওরা মুঠোর মধ্যে আমাদের রাখতে পারবে না। আমরা নতুন এক পৃথিবী তৈরি করব। আর কিছু আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। অচেনা ওই কালো শক্তি আর কখনও অদৃশ্য শেকল পরাতে পারবে না আমাদের হাতে-পায়ে। তোমরা তো জানো, বেশির ভাগ মানুষ বোঝে না কী ক্রীতদাসত্ব বরণ করেছে। এজন্য আমরা বহু কষ্ট সহ্য করেছি। ওরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের সহজাত আচরণের ফলে। আর আজ দেখো সেসব আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার কষ্ট, বাড়তি চাহিদা। এগুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে মেমব্রেন আমাদের শত শত বছর ধরে। আর আজ আমরা সেই শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

'শেষ পর্যন্ত আমি যখন বুঝলাম, কোনও সভ্য-সমাজ এ ভাবে বাঁচতে পারে না; টের পেলাম আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এসবই ঘটছে কারণ বাইরের ইউনিভার্স থেকে আসছে এরা। এরা আমাদের মস্তিষ্ক দখল করে, ভাবনা-চিন্তা সব নিয়ে যায় খারাপ দিকে। আর সে চিন্তাগুলো আজ আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? আমিই প্রথম মানব, যে দেখতে পেল ওইসব প্রাণী আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে। আমার কথা শুনে তোমাদের মত চিন্তাশীল মানুষ বুঝল: পৃথিবী এমন হওয়ার কথা নয়, অথচ নীতিহীন এই বিশ্বে একের পর এক চরম অন্যায় ঘটে

চলেছে। এর মূল কারণ এরা ষড়যন্ত্র করে চলেছে আমাদের বিরুদ্ধে।

'এরা প্রায় সফল হতে চলেছে, এমন সময় বাধা দিতে শুরু করলাম আমরা। এরপর যা ঘটতে চলেছে সেটার উপর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না তাদের। আমাদের সমাজ বদলে যেতে চলেছে। আমরা সঠিক পথ বেছে নিয়েছি। আমরা জেনে গেছি আমাদের ধ্বংস করতে চায় তারা। কাজেই ব্যবস্থা নেব আমরা। তোমাদের শুধু এটুকু বলব, আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় উত্তেজি·· বিশাল এক উত্থান সামনে। আর সেই উত্থানের সময় আমরা সবাই পরস্পরের হাতে হাত রেখে এগুব।'

চ্যাপেলের এই মগজ দখল করে নেয়ার গল্প সব সময় ব্রাঙ্কোকে অস্বস্তির ভিতর ফেলে। তবে কখনও প্রতিবাদ করে না। কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে কালো মানুষদের সংখ্যা। প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হতে চলেছে। ফলাফল: মানব সভ্যতা বিনষ্ট হবে। এগুলো সে ভালই বোঝে। এবং বোঝে বলেই বিশ্বের মানুষকে রক্ষা করতে চাইছে। এটা তো ঠিক, এখনই পদক্ষেপ নেয়ার সঠিক সময়। এজন্যই সে নিজে একাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার প্রথম কাজ এখন শত্রুদের শেষ করা। আর সেই শত্রুদের এক অংশ রয়েছে পার্ল অভ মুন জাহাজে।

দশ

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস।

অপারেশন্স সেণ্টারে নিজের সিটে বসেছে রানা, মনোযোগ দিয়ে শুনছে আতাসির বক্তব্য। রুমে উপস্থিত ফু-চুং, গগল, অনিল, ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, জলিল খান ও আরও ক'জন কমাণ্ডো। অনিলের সহায়তা নিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়েছে আতাসি।

'ম্যাডাম উর্বশী যখন ব্রডকাস্ট করছেন, সে-সময়ে আমার পরিচিত ক'জন অ্যামেচার রেডিও কমিউনিকেশন এক্সপার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা ম্যাডাম উর্বশীর ফ্রিকোয়েন্সিতে নিজেদের রেডিও টিউন করে। আমি তাদের জিপিএস স্যাটালাইট ব্যবহার করতে দিই। আমরা ছিলাম এক শ' ভাগ সিনক্রোনাইযড। প্রতিটি অক্ষর যখন এল, আমি তাদের লিখে নিতে দিলাম। ফলে জানা গেল ঠিক কোন্ সময়ে তথ্য এল। আপনি তো জানেন, বস, বিভিন্ন বস্তুর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন গতিতে বইছে রেডিও ওয়েভ। ...একটু আগে ও পরের সময় আন্দাজ করে নিয়ে হিসাব কষতে হয়েছে। এ বিষয়ে সাহায্যে এলেন মিস্টার অনিল। উনি কম্পিউট করে বললেন কী ডিসক্রেপেনসি হতে পারে। এ কারণে আমরা সঠিক সময় ও দূরত্ব হিসাব কষতে পারলাম। বেরিয়ে এল একটা ত্রিকোণ

ভূমি। তারই ভিতর ওই ট্র্যান্সমিটার থাকতে বাধ্য।'

কম্পিউটারের কী বোর্ডে টাইপ করল আতাসি, এবার বিশাল প্রধান মনিটরে ফুটে উঠল বিরান এক দ্বীপ। দেখতে ওটা অশ্রুর ফোঁটার মত। টিলা দিয়ে ঘেরা চারপাশ। দক্ষিণে পাথুরে সৈকত, তবে ওদিক দিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। ক্রমে উপরের দিকে গেছে জমিন, মিশেছে গিয়ে আরও উঁচু টিলার সঙ্গে। ওখানে সর্বক্ষণ বইছে জোরালো হাওয়া। গাছপালা নেই বললেই চলে। দু'চারটে আঁকাবাঁকা হয়ে কোনমতে টিকতে চাইছে। দু'চার জায়গায় ঘাসের চাপড়া। ব্যস, এ-ই। ছবির নীচের স্কেলে লেখা: আট মাইল দীর্ঘ। চওড়ায় দুই মাইল।

'এটাই ইয়োস আইল্যাণ্ড। তুরস্ক থেকে চার মাইল দূরে ম্যাণ্ডালে গালফে। কয়েক শতাব্দী ধরে ওটার উপর দাবি জানিয়ে আসছে গ্রিস ও তুরস্ক। তবে কেন যে চাইছে তা বুঝবার সাধ্য কারও নেই। কিছুই নেই ওখানে। জিয়োলোজিকালি ওটা প্রি-ক্যামব্রিয়ান বেডরক ছাড়া কিছুই নয়। অ্যাক্টিভ ভলক্যানিক জোন। বেশির ভাগ সময় থাকে না কেউ। এই ছবি চার বছর আগে তোলা হয়েছে।'

উর্বশী ওখানে বন্দি? দ্বীপের দিকে চেয়ে রইল রানা। এবার কাজে নামতে হবে। মার্ভেলের প্রচণ্ড গতি কাজে লাগিয়ে চলে যেতে পারে ওরা ওই দ্বীপে।

স্ক্রিনে অন্য ছবি তুলেছে আতাসি। 'এটা ইয়োস দ্বীপের গত বছরের ছবি।'

দ্বীপের দক্ষিণে বিশাল কয়েকটা হলুদ যন্ত্র মাটি সরাচ্ছে। খোঁড়া হচ্ছে বিশাল এক গর্ত। পাশেই তৈরি করা হয়েছে সিমেন্ট প্লান্ট। সৈকতের আগে থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত গেছে একটা ডক। ওখান থেকে উপরের সাইটে গিয়ে মিশেছে একটা

রাস্তা।

'এ কাজ করে ইটালিয়ান এক হেভি-কনস্ট্রাকশান কোম্পনি। তাদের টাকা পরিশোধ করা হয় কয়েকটা সুইস নাম্বার্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। আন্দাজ করা যায় কে টাকা দেয়। টার্কিশ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় ওখানে বিশাল এক মুভি সেট তৈরি করা হবে।'

আরেকটা ছবি দেখা গেল। 'সাইটের কয়েক মাস পরের ছবি। দেখছেন গর্তের ভিতর কংক্রিট স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে।'

'এক্সকেভেশন ইকুইপমেন্টের দৈর্ঘ্য আমরা জানি,' বলে উঠল অনিল। 'সেই হিসেবে ফ্যাসিলিটির ফুটপ্রিন্ট কম-বেশি পঞ্চাশ হাজার স্কয়্যার ফিট। ছবিতে দেখা যাচ্ছে নির্মাণের এই পর্যায়ে ওখানে তিনতলা তৈরি করা হয়েছে।'

আবার শুরু করল আতাসি, 'আট মাস কাজ চালাবার পর নকল মুভি কোম্পানি জানিয়ে দিল, তাদের ফাণ্ড শেষ। কাজেই প্রজেক্ট বাতিল করতে হয়েছে। তুরস্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়: দ্বীপ যেমন ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় রেখে যেতে হবে। কাজেই নকল মুভি কোম্পানি কী করল দেখুন।'

অন্য ছবি ভেসে উঠল মেইন মনিটরে। প্রকাণ্ড এক্সকেভেশন কর্ম হারিয়ে গেছে। মনে হলো আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে দ্বীপ। মালপত্র, যন্ত্রপাতি যা ছিল সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বুজিয়ে দেয়া হয়েছে গহ্বর। এখন ঠিক আগের মতই চারপাশে প্রাকৃতিক পাথর। শুধু রয়ে গেছে ডক ও সেই রাস্তাটা। সড়ক দেখলে মনে হয় ওটার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মাঝপথে এসে ভুলে গেছে কোথায় যাচ্ছিল।

'এটা অফিশিয়াল টার্কিশ গভর্নমেন্টের এনভায়ার্নমেন্টাল-ইমপ্যাক্ট রিপোর্ট,' বলল আতাসি। 'আন্দাজ করা যায় তাদের

মোটা অংকের ঘুষ দেয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়: ইয়োস দ্বীপ ঠিক আগের মত করেই রেখে গেছে মুভি কোম্পানি।'

'ইএলএফ অ্যান্টেনা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারের নীচে,' বলল অনিল। 'সে কারণে উর্বশী লিখেছে: বাঙ্কারে ফেলতে হবে নিউক্লিয়ার বোমা। বোমা লেখেনি, যেন ট্র্যান্সমিশনে বাড়তি সময় না লাগে। লিখেছে: নিউক।'

'এয়ারফোর্স যেসব বাঙ্কার-বাস্টার বোমা ব্যবহার করে, সেগুলো ফেললে?' জানতে চাইল সোহেল।

'কাজ হবে, সরাসরি অ্যান্টেনা বা পাওয়ার জেনারেটারের উপর ফেলতে পারলে,' বলল রানা। 'তবে সে বোমা আমাদের হাতে নেই।'

'সোজা কথায়, দু' শ' টন টিএনটি লাগবে, নইলে কিছুই করা যাবে না,' বলল কট্টর গগল।

'একমাত্র উপায় কমাণ্ডো রেইড,' বলল ফু-চুং। অপারেশন্স সেণ্টারের পিছন দিক থেকে সামনে চলে এসেছে। 'দক্ষিণের ওই সৈকতে নামতে পারি। তা যদি করতে না চাই, বাইরের দিকের কোনও টিলা বেয়ে উঠতে হবে।'

'মিশন সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিল্,' বলল অনিল। 'ধরে নেয়া যায় ওই ফ্যাসিলিটির প্রবেশপথে কড়া পাহারা থাকবে। আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ডিফেন্স ফোর্স বন্ধ করে দেবে পথ। বাঙ্কের ভিতর রাখা হবে একের পর এক ব্যারিকেড।'

'কাজেই পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে,' বলল রানা। 'ওখানে নিশ্চয়ই ভেন্টিলেশন সিস্টেমের জন্য এয়ার ইনটেক থাকবে। ভিতরের পাওয়ার প্লাণ্টের জন্য থাকবে এগযস্ট ভেণ্ট।'

'আমার ধারণা ওগুলো রয়েছে ডকের নীচে,' বলল সোহেল।

আতাসির দিকে ইশারা করল অনিল। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার স্ক্রিনে এল প্রথম কনস্ট্রাকশান ছবি। 'ওরা তখনও সড়ক তৈরি করছে।'

ছবিটা জুম করে আরও বড় করল আতাসি। ওখানে একটা পেভিং মেশিন অ্যাসফল্ট পেতে চলেছে। মেশিনের ঠিক সামনের পথ সমান করছে গ্রেডাররা। আরেকটু এগুলে দেখা যায় এক্সকেভেটারগুলো গভীর এক ট্রেঞ্চ বুজিয়ে চলেছে।

'রাস্তা যেদিক দিয়ে গেছে, তার তলা দিয়ে গেছে ভেণ্ট পাইপ,' বলল অনিল। 'পরে আবার তার উপর অ্যাসফল্ট ফেলা হয়েছে। আমাদের আন্দাজ করে নিতে হবে, ওসব ইনটেক বা ভেণ্ট পাহারা দেয়া হয়। প্রথম আক্রমণে বন্ধ হবে ফ্যাসিলিটির সব কিছু। কোনও কণ্ডুইট দিয়ে এগুতে পারবে কমাণ্ডো টিম, ভিতরে ঢুকলে ফাঁদে পড়তে হবে।'

একবার সোহেল ও ফু-চুঙের দিকে চাইল রানা। আস্তে করে মাথা দোলাল ওরা।

'একটা ভুল মানে মৃত্যু টেনে আনা,' ফু-চুং বলল, 'তা ছাড়া, আমরা যদি ভিতরে ঢুকেও পড়ি, সামনে এগুতে হবে ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ফেলে। শত্রুপক্ষ আমাদের দেখবে, আর পাখির মত গুলি করে মারবে।'

'অন্য কোনও অপশন?' জানতে চাইল রানা।

'নেই।' কিছুক্ষণ পর বলল অনিল। 'ফু-চুং ঠিকই বলেছে। ওই ফ্যাসিলিটি আমরা চিনি না। ওটার সিকিউরিটি সিস্টেম কী, গার্ড ক'জন—এরকম এক শ' একটা বিষয় না জেনে ভিতরে ঢোকা আর নিজেদের মরণ ডেকে আনা এক কথা।'

নীরবতা নেমে এল অপারেশন্স সেণ্টারে।

'বলতে খারাপ লাগছে, তবে আমাদের প্রথম কাজ ওই ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার নীরব করে দেয়া,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল। 'ওটার কারণে একই সঙ্গে সিগনাল পাবে গোটা দুনিয়া জুড়ে ক্রুজ শিপগুলো। ফলাফল, ভয়াবহ ভাইরাস আক্রমণ।'

'হ্যাঁ, প্রথম কাজ ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার শেষ করা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'কারও কোনও সাজেশন?'

কথা বলছে না কেউ। টিকটিক আওয়াজ তুলছে দেয়াল ঘড়ি। মৃদু গুঞ্জন করছে কম্পিউটার।

'একটা কথা,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল। 'আর উপায় নেই রে, এখন দরকার ইজরায়েলের তৈরি জিব্রাইলের মুষ্টি। তুই ওটার ব্যাপারে জানিস, রানা।'

যেন ঝাঁকি খেল রানা। আস্তে করে হেলান দিল সিটে। 'ওটার কথা মনে আছে তোর?'

'মনে থাকত না, কিন্তু আর্মস ডিল্লার ব্যালফোর জেনকিন্স ও প্রিন্স ইবনে আল-কাশিম ওটার কথা তোলায় চট্ করে একবার কম্পিউটারে চোখ বুলিয়ে নিলাম।'

এসব তথ্য রানার কম্পিউটারেও আছে। তবে এখনও পড়বার সময় হয়নি। তা ছাড়া পড়বার কথাও নয়, ওগুলো যাবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। বস্ ঠিক করবেন কী করতে হবে। ওদের বলা হয়েছে শুধু কান পেতে শুনতে।

'ব্যালফোর জেনকিন্স জিব্রাইলের মুষ্টির ব্যাপারে কী বলে?' জিজ্ঞেস করল অনিল। 'এ নিয়ে আমিও সামান্য রিসার্চ করেছি। ওটার ব্যাপারে কী জানিস বল তো, রানা।'

'তোদের ধারণা ওটা কাজে লাগতে পারে?' নিচু স্বরে বলল রানা।

'একটু খুলে তো বলবি?' বলল ফু-চুং।

কম্পিউটারে দ্রুত টাইপ করতে শুরু করল রানা। মেইন স্ক্রিনে ফুটে উঠল ছবি ও তথ্য। জিব্রাইলের মুষ্টি একটা স্যাটালাইট। আগে কখনও এমন কিছু পাঠানো হয়নি অরবিটে। রকেটের দেহ চুরুটের মত, তবে পেটের কাছে গোল করে ঘিরে সাজিয়ে রাখা আছে লম্বা পাঁচটা ক্যানিস্টার। প্রতিটি দৈর্ঘ্যে তিরিশ ফুট। সেগুলোর উপর ইজরায়েলি পতাকা আঁকা। অস্ত্রের ডিজাইন আমেরিকান।

'ওটার সত্যিকারের কোড নেম: গ্রীষ্মের আকাশ,' বলল রানা। 'আরেকটা নাম দেয়া হয়: জিব্রাইলের মুষ্টি। দু'হাজার সাত সালে মাউন্ট সিনাই থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ওটা অরবিটে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু কীসের জন্য?' জানতে চাইল গগল।

'ওটা একটা ওবিপি,' বলল রানা। 'অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রোজেক্টাইল। এক কথায় ভয়ানক অস্ত্র। এর কথা ভেবেছে আমেরিকা ও ব্রিটেন, শেষে দেয়া হয় ইজরায়েলকে। ধারণা করা হয়, যুদ্ধ না করে জমি পেতে চাইলে ওদের কাজে লাগবে। ওটার আরেকটা নাম: ঈশ্বরের দণ্ড। থিওরি খুব সহজ। এসব টিউবের ভিতর রয়েছে টাংস্টেনের রড। প্রতিটির ওজন আঠারো শ' পাউণ্ড। যদি ফায়ার করা হয়, অ্যাটমসফিয়ারের ভিতর দিয়ে পড়বে। যে এলাকায় তাক করা হবে, সে এলাকা বিধ্বস্ত হবে। নেমে আসবার সময় প্রতি ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল গতি তুলবে। ওটার ম্যাস বহু গুণ হওয়ায় তৈরি হবে কাইনেটিক ফোর্স। তা অ্যাটমিক বোমার শক্তির চেয়েও অনেক বেশি। কোথাও কোনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আক্রান্তদের নিজেদের রক্ষা করার উপায় নেই। ওটা কোনও সাধারণ ব্যালিস্টিক মিসাইল নয় যে ধ্বংস করা যায়। কেউ উপরে তাকালে দেখবে ঝলমলে আকাশে জ্বলে উঠেছে অতি-উজ্জ্বল

তারা। পরক্ষণে নেমে আসবে নরক। সতর্ক হওয়ার উপায় নেই, ব্যর্থ হবে না টার্গেট।

'ইজরায়েল ওটাকে ফার্স্ট-স্ট্রাইক ওয়েপন হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। একই লঞ্জিটিউডাল অ্যাক্সেসে বেশ কিছু মিডল ইস্ট শহরকে টার্গেট করে। দোষ দেয়া যেত বিদঘুটে উল্কার উপর। কোনও রেডিওঅ্যাকটিভ ফলআউট হতো না। ইমপ্যাক্টের ফলে বাষ্পায়িত হতো রডগুলো। কেউ ধারণা করতে পারত না কী ঘটেছে। তাদের হাতে ছিল অ্যাসট্রোনমারদের তোলা মিটিওর শাওয়ারের ছবি। টিভিতে দেখিয়ে দিত আসলে কী ঘটেছে। ততক্ষণে মধ্য-প্রাচ্যের পাঁচটি শহর ও তার আশপাশের বিশ মাইল এলাকা শেষ।'

'মনে হয় তুই জানিস কেন ওরা সফল হলো না?' বন্ধুর দিকে চাইল ফু-চুং।

'একটা মিশন নিয়ে ইজরায়েলের মাউন্ট সিনাই কসমোড্রোমে ঢোকে রানা,' চাপা গর্ব প্রকাশ পেল সোহেলের কণ্ঠে। 'ওই এনার্জি রকেট লঞ্চ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে। ইজরায়েলিদের কম্পিউটারগুলো স্যাবোটাজ করে। এমন ভাবে স্যাটালাইট রিগ করে যে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য আর সিগনাল পাঠানো যায়নি। ওই অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইলে অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজটা করতে হবে।'

'প্যাডের উপর নষ্ট করে দিলে হতো,' বলল অনিল।

'তা হলে আবার তৈরি করে নিত। তা ছাড়া, ওটা ছিল ম্যানড্ মিশন। দুই কসমোনট ম্যানুয়ালি সোনার প্যানেল ডিপ্লয় করবে। তবে তিনদিন পর আবিষ্কার করল তাদের পাখি স্যাবোটাজ করা হয়েছে।'

'আর পৃথিবী থেকে সিগনাল দিলে?' বলল আতাসি।

'ওদের ইলেকট্রনিকস সে চাপ নিতে পারবে না, জ্বলে যাবে।'

'আমেরিকান কোনও স্যাটালাইট দিয়ে সিগনাল দিলে?' বলল অনিল।

'ততদিনে ইজরায়েলিরা জেনে ফেলেছে দুনিয়াময় ফাঁস হয়ে গেছে তাদের পরিকল্পনা। কাজেই ঘুরতে থাকল তাদের উপগ্রহ।'

'ওটা এখনও কাজ করবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'মহাকাশের জঞ্জাল ওটাকে বিধ্বস্ত না করলে, ভাল ভাবেই করবে,' বলল রানা। বুকের ভিতর উত্তেজনা টের পেল। 'সবাই মিলে কিন্তু আবিষ্কার করে ফেলেছে আণবিক বোমার বদলে কী কাজে লাগানো যায়। আমরা যদি স্পেসের ষাট মাইল উপরে ট্র্যান্সমিটার নিই, সহজেই ব্যবহার করতে পারি ওই স্যাটালাইট।'

'অবশ্য আপনি যদি ব্যালফোর জেনকিন্সের কাছ থেকে কোড নিতে পারেন...' কী-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে আতাসি। আরেকটা ছবি ফুটে উঠল।

'ঠিক,' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন সিরাজ। 'আমি উঠে যেতে পারি ওই স্যাটালাইটের কাছে।'

সবাই চুপ হয়ে গেছে, রানা ছাড়া। মৃদু হাসছে ও। 'আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল, ক্যাপ্টেন সিরাজ। আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করব। আশা করি উনি ব্যবস্থা করে দেবেন আপনার ট্র্যান্সপোর্ট।' ফু-চুং, অনিল আর সোহেলের দিকে পালাক্রমে চাইল রানা। 'তোরা একটা পরিকল্পনা তৈরি কর্। আর্মস ডিলারের কাছ থেকে কোড আদায় করতে হবে। যা করার আজ রাতেই। তারপর বন্দর ছাড়ব আমরা।'

'আমরা চলেছি ইয়োস দ্বীপে?' বলল ফু-চুং।

মাথা দোলাল রানা। মনে মনে বলল, 'আমরা এভাবে মরতে দেব না উর্বশীকে।'

এগারো

আয়নার দিকে চেয়ে রইল রানা। ওর চেহারা কেমন হবে, নিজেও জানে না। মেকআপের উপর আরও মেকআপ চড়িয়ে চলেছে মোফিজ বিল্লাহ্। আয়নার বিরাট এক অংশ দখল করে নিয়েছে বড়সড় ফটো। বারবার প্রিন্সের ছবি দেখছে মেকআপ আর্টিস্ট। দু'ঘণ্টা পর রানার মনে হলো, আশ্চর্য! আমিই তো সেই বদমাশ লোকটা! ওকে সঠিক উইগ পরিয়ে দিয়েছে বিল্লাহ্। গোঁফ-দাড়ি যেন ছিঁড়ে এনেছে প্রিন্সের গাল থেকে।

'আরও কিছু?' জানতে চাইল রানা।

'ওই লোক সবসময় চোখে রে-ব্যান সানগ্লাস রাখে, তাই এত না খাটলেও চলত, কিন্তু ঝুঁকি নিলাম না,' বলল বিল্লাহ্। রানার গলা থেকে সরিয়ে নিল কাগজের কলার। একবার দেখে নিল টুক্সেডো শার্ট। সব ঠিকঠাক। গুড! 'আপনার চেহারা এখন অবিকাল ওই নোংরা প্রিন্সের মত।'

বো টাই ঠিক করে নিল রানা, গায়ে চাপিয়ে নিল সাদা ডিনার জ্যাকেট। বেশির ভাগ লোককে দেখতে ভাল লাগে টুক্স-এ, তবে রানার সিক্স প্যাক অ্যাব-এর উপর পুরু করে সাঁটা

হয়েছে একগাদা প্যাডিং। ফলে ও হয়ে উঠেছে ভোঁড়েল (ভুঁড়িঅলা) প্রিন্স। কোমরে, মেরুদণ্ডের পাশে রেখেছে প্রিয় ওয়ালথার।

'মাসুদ ভাই এখন পেটমোটা সিন কনোরি!' ওঅর্ক রুমের আরেকদিক থেকে বলল জলিল।

'আসলেই তাই,' বলল বিসিআইয়ের নতুন এজেন্ট খোরশেদ নবী।

'চোপ!' প্রিন্সসুলভ হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'ব্যাদ্দোব কোথাকার! তোমরা ঝাড়ুদার-মেথর মানুষ, সবসময় মাথা নিচু করে রাখবে। শাহজাদাদের সামনে একটা কথাও বলবে না—হুজুর যা বলেন শুনবে কেবল।'

জ্যানিটর হিসাবে নেয়া হয়েছে ওদের। সঠিক পোশাক পরিয়ে দেয়ায় জলিল খান ও খোরশেদ নবী হয়ে উঠেছে ক্যাসিনো দ্য মণ্টি কার্লোর কর্মচারী। যে-কোনও সময় লাগতে পারে, কাজেই মোফিজ বিল্লাহ ও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট যোগাড় করে রেখেছে শতখানেক ইউনিফর্ম। রাশান জেনারেল থেকে শুরু করে দিল্লির ট্রাফিক পুলিশের ইউনিফর্ম পর্যন্ত রয়েছে তাদের সংগ্রহে। সব ফ্রি সাইজের। প্রয়োজন পড়লে আধ ঘণ্টার ভিতর সরবরাহ করতে পারে যে কাউকে।

জলিল ও নবীর সঙ্গে থাকছে চাকা লাগানো হেভি ডিউটি ট্র্যাশ ক্যান। একহাতে থাকবে মপ বাকেট। সঙ্গে প্লাস্টিকের সাইন, তাতে লেখা: সাবধান! মেঝে পিচ্ছিল!

ডোরওয়েতে দেখা দিল চিফবাবুর্চি মোস্তফা আবুল, থমথম করছে মুখ। সুটের উপর পরেছে সাদা অ্যাপ্রন। হাতে সিল করা প্লাস্টিকের কন্টেইনার। ওটা এমন ভাবে ধরেছে, মনে হয় যেন কেউটে সাপ। সবাইকে দেখে ভীষণ কুঁচকে গেল তার ভুরু।

'আবুল, আপনি জানেন ওটা নকল,' মৃদু হাসল রানা। 'খারাপ লাগার কিছু নেই।'

'স্যর, আমি নিজে বানিয়েছি, কাজেই জানি ওটা একদম আসলের মত।'

'একটু দেখা যাক।'

মোফিজ বিল্লাহ্‌র মেকআপ কাউন্টারের উপর কন্টেইনার রাখল শেফ, ঝট্ করে পিছিয়ে গেল এক পা। বোঝা গেল ওটার মুখ খুলতে রাজি নয়। ক্যাপ খুলল রানা, পরক্ষণে নাক সরিয়ে নিল একপাশে। চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াল্লা!'

'ওরেব্বাপ্‌স্! এমন জিনিস আমার টেবিলে?' হায়-হায় করে উঠল মোফিজ বিল্লাহ্।

'স্যর বলেছেন নকল বমি চাই, কাজেই খুব যত্ন করে তৈরি করেছি। আর জানা কথাই, ওটা দেখতে যেমন হবে, ঠিক তেমনি হবে সুবাস—ঠিক আসলের মত।'

'হেলেন জিলের জন্য যে মাছ রেঁধেছিলেন, অনেকটা তার মত লাগছে না গন্ধটা,' বলল জলিল খান, খোঁচা দিতে পেরে খুশি। এসে চট্ করে বন্ধ করে দিল কন্টেইনারের মুখ। রেখে দিল ওটা মপ বাকেটের ভিতর।

স্কুলের হেডমাস্টার যেমন বজ্জাত ছেলের দিকে তাকান, ঠিক সেভাবে চাইল আবুল। 'মিস্টার খান, আগামী কিছুদিন শুধু রুটি আর পানি পাবেন কিচেন থেকে।'

'আসলে ওই ডিশ সত্যিই ছিল দারুণ,' বড় দ্রুত কথা উল্টাল জলিল। মার্ভেলে জুনিয়ারদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে বাবুর্চি মোস্তফা আবুলের হুমকিকে পাত্তা দেবে না। 'জানতে পারি এটা কী দিয়ে তৈরি?'

'বেস তৈরি হয়েছে পি সুপ দিয়ে, অন্য জিনিসগুলো বলব

না। প্রফেশনাল সিক্রেট।'

'আগে এ জিনিস তৈরি করেছেন?' সন্দেহ নিয়ে চাইল রানা।

'কম বয়সে নেভির এক ডাঁটিয়াল কমাণ্ডারকে দিয়েছিলাম। বেচারা মরতে বসেছিল। গর্ব করে বলত তার পেট লোহা খেয়েও হজম করতে পারে। যেদিন জাহাজে এলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, সেদিন কমাণ্ডারকে খেতে দিলাম। ভাসিয়ে দিল টেবিল। এরপর যা হয়, বহুদিন বেচারা ক্যাপ্টেন হতে পারেনি।'

জোর করে হাসবার চেষ্টা করছে জলিল ও নবী। এই প্রথম এ ধরনের মিশনে চলেছে। টেনশন দূর করতে চাইছে।

'আর কিছু লাগবে, স্যর?'

'না, আর কিছু না। এটুকুই যথেষ্ট, ধন্যবাদ।'

'বেস্ট অভ লাক, স্যর।' দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাবুর্চি। তাকে পাশ কাটিয়ে ম্যাজিক শপে ঢুকল ডক্টর ফারা।

চওড়া হাসি ফুটে উঠল জলিল ও নবীর ঠোঁটে। ম্যাজেণ্টা রঙের স্ট্র্যাপলেস ড্রেস পরেছে ফারা। সেঁটে আছে শরীরের প্রতিটি ভাঁজে। চুলে বরাবরের মত পনিটেইল নেই, ছড়িয়ে আছে মাথা জুড়ে। তাতে কোঁকড়া কোঁকড়া রিং। মুখে প্রচুর প্রসাধনীর ফলে হয়ে উঠেছে এলিজাবেথ টেইলরের যমজ বোন।

'এই যে নাও,' রানার হাতে পাতলা একটা লেদার কেস ধরিয়ে দিল ফারা। ওটা খুলল রানা। ভিতরে প্রোটেকটিভ স্লটে তিনটে হাইপোডারমিক নিডল। 'শিরার ভিতর দিলে পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে।'

'আর ট্যাবলেট?' জানতে চাইল রানা।

প্লাস্টিক পিল বটল বেরুল ফারার পার্স থেকে। বোতলের ভিতর মাত্র দুটো ট্যাবলেট। 'যদি ওই আল-কাশিমের কিডনি

সমস্যা থাকে, বাথরুমে যাওয়ার আগে হাসপাতালে ছুটতে হবে।'

'কতক্ষণ পর কাজ করবে?'

'দশ থেকে পনেরো মিনিট।'

'স্বাদে টের পাবে না?'

মাথা নাড়ল ফারা। পার্স থেকে বের করে নিজের পাসপোর্টটা দেখাল রানাকে। স্থানীয় মেয়েদের ঢুকতে দেয়া হয় না ক্যাসিনোর ভিতর। আইডেন্টিফিকেশন পরীক্ষা করা হয় দরজার বাইরেই।

'সবার সঙ্গে ফোন আছে?' জানতে চাইল রানা। ইয়ারবাড রেডিও বা ল্যাপেল মাইক্রোফোন ব্যবহার করবে না। বদলে ব্যবহার করবে সেল-ফোনের ওয়াকি-টকি মোড। সবাইকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল রানা, 'ঠিক আছে, চলো তীরে যাওয়া যাক।'

বিশ্বখ্যাত আর্কিটেক্ট চার্লস গার্নিয়ার ডিজাইন করেছেন প্যারিস অপেরা হাউসের, ঠিক তেমনই আরেকটি স্থাপত্য তাঁর ক্যাসিনো দ্য মন্টি কার্লো। ধার্মিক মানুষ যেভাবে ক্যাথিড্রালে যায়, ঠিক তার উল্টো লোকে যায় ওই প্রসিদ্ধ জুয়ার আড্ডায়। গার্নিয়ারের সৃষ্টি এই অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছে নেপোলিয়ন থ্রি ডিজাইন অনুসরণ করে। ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকবার আগে দারুণ সব ফোয়ারা, দু'পাশে টাওয়ার। তামা দিয়ে তৈরি ক্যাসিনোর ছাত। অভিজাত এইট্রিয়ামকে ধরে রেখেছে আটাশটা অনিক্স কলাম। প্রতিটি ঘরে মার্বেল ও স্টেইনড গ্লাসের ছড়াছড়ি। ক্যাসিনোর সামনে পৌঁছে দেখল রানা, পোর্টারের দায়িত্বে রাখা হয়েছে তিনটা ফেরারি ও চারটা বেন্টলি। এখানে আসে সমাজের

উঁচু লেভেলের সম্ভ্রান্ত সব মানুষ। পুরুষদের পরনে টুক্সেডো, তাদের সঙ্গিনীদের গলায়-হাতে মহামূল্যবান গহনা। কারও কারও গাউনে খচিত থাকে হীরা-পান্না-চুনি।

বাম হাতের কাফ তুলে সময় দেখে নিল রানা। ব্যালফোর জেনকিন্স ও প্রিন্স ইবনে আল-কাশিম রাত দশটার দিকে পৌঁছুবে। আধ ঘণ্টা আগেই এসেছে ও। এরইমধ্যে বেছে নিতে হবে কোনও জায়গা, যেখানে নিশ্চিন্তে সময় কাটানো যায়। আল-কাশিম থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে, নইলে নকল জিনিস ধরা পড়বে।

টিট-টিট করে উঠল ফোন।

'মাসুদ ভাই, আমরা পজিশনে,' রিপোর্ট করল জলিল।

'কোনও সমস্যা?'

'জ্যানিটরের পোশাকে আমরা প্রায় অদৃশ্য-মানব।'

'আছ কোথায়?'

'লোডিং ডকের কাছে। বুদ্ধি করে কয়েক জগ সয়াবিন তেল ঢেলেছে নবী, এখন ব্যস্ত হয়ে ওটা পরিষ্কার করছি।'

'ঠিক আছে। আমার সিগনালের জন্য অপেক্ষা করো।'

প্রবেশ-দ্বারে নিজের পাসপোর্ট দেখাল রানা, এণ্ট্র্যান্স ফি মিটিয়ে দিল। ভিড় করা লোকগুলো চলেছে ডানদিকে, ওদিকে একের পর এক গেমিং রুম। তাদের পিছু নিল রানা। তবে জুয়া-ঘরের দিকে না গিয়ে উঠে এল দোতলায়, বার-এ। একটা মার্টিনি নিল, তবে ওটাতে চুমুক না দিয়ে চারপাশের পরিবেশ বুঝতে চাইল। চলে এসেছে এক কোনার কিছুটা অন্ধকারমত এলাকায়।

ক'মুহূর্ত পর কল দিল ফারা, জানিয়ে দিল পৌঁছে গেছে। আপাতত থাকছে স্যালোন দ্য এল'ইউরোপ-এ। ক্যাসিনোর

নামকরা একটা গ্যাম্বলিং হল ওটা।

চুপচাপ সময় পার করছে রানা। ভাবতে শুরু করেছে, অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল ফেলবার আগে উর্বশীকে কীভাবে উদ্ধার করবে ইয়োস দ্বীপ থেকে। ওর মনে কোনও দ্বিধা নেই, যদি উর্বশীকে সরিয়ে নিতে না পারে, তবুও ধ্বংস করতে হবে ইয়োস দ্বীপ। বিশাল জুয়া খেলছে ওরা। উর্বশী নিজেও একই সিদ্ধান্ত নিত—কোটি কোটি মানুষকে বিপদে ফেলা যায় না। যেমন করে হোক ওই ইএলএফ অ্যান্টেনা উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর চোদ্দশিকের ওপারে পাঠাতে হবে পালের গোদাগুলোকে।

বারবার ভেবেছে রানা, ইএলএফ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে উর্বশীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না। কোনও উপায় আসলে নেই। ওটা ট্র্যান্সমিটার, রিসিভার নয়। এখন পর্যন্ত অন্তত দশটা পরিকল্পনা করেছে, তবে ভেবেচিন্তে শেষে প্রতিটিকে বাতিল করতে হয়েছে। কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না।

'ওরা পৌঁচেছে,' ফোনে বলল ফারা। বিশ মিনিট হলো বারে বসে আছে রানা। 'এখন যাচ্ছে শেমান দ্য ফেয়ার টেবিলের দিকে।'

'ওরা যাক, দু'চারটে ড্রিঙ্ক নিক, কাজ শুরু কোরো।'

ক্যাসিনোর ভিতর মনোযোগ দুই ভাগে ভাগ করে নিল ফারা, খেয়াল রাখছে টার্গেটের দিকে, একইসঙ্গে দেখছে রুলেত টেবিলের খেলা। ওর সামনে দ্রুত কমে চলেছে চিপস। ধীরে ধীরে বইছে সময়। এদিকে তৃতীয় ড্রিঙ্ক নিয়েছে ইবনে আল-কাশিম।

ভাবতে গেলে অবাক লাগে, এ লোক ধর্মের নামে জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিতে চায় অস্ত্র। অথচ ইসলাম ধর্মে

পরিষ্কার বলা হয়েছে অ্যালকোহল হারাম। লোকটা বোধহয় নিজেকে তাকফির মনে করে, ধর্মের সত্যিকারের অন্ধ অনুসারী। আর মানুষের একটু-আধটু দোষ তো থাকতেই পারে। পশ্চিমা সমাজে এসে আলখেল্লা বাদ দিয়েছে, তো কি, দাড়ি তো আছে! মদ্যপান করলে কিংবা বালক ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করলে কি মাফ করে দেবেন না মহান আল্লাহ্?

'আমার মনে হয় সময় হয়েছে,' ফোনে বলল ফারা। টেক্সট মেসেজ পড়ছে এমন ভঙ্গি নিয়েছে।

'ঠিক আছে। যা করার করো। ...জলিল, অপারেশন ফাইভের জন্য তৈরি থাকো।'

একটু বিরতি নিল ফারা, তারপর ছয় নম্বর স্লটে রুলেত বল পড়তেই হেরে যাওয়া চিপসগুলো নিয়ে নিল ডিলার। তাকে একটা চিপ্ বকশিস দিল ফারা, তারপর অবশিষ্টগুলো নিয়ে সরে এল। পার্স থেকে হাতে চলে ত্রল দুটো ট্যাবলেট, রওনা হয়ে গেল ফারা রাজপুত্রের উদ্দেশে। ফারার দিকে চেয়ে চোখ টিপল কেউ কেউ। তবে বেশিরভাগ মজে আছে জুয়ার ভিতর।

ব্যালফোর ও আল-কাশিম যে টেবিলে খেলছে সেখানে এ মুহূর্তে কোনও বাড়তি চেয়ার নেই। বাধ্য হয়ে প্রিন্সের পিছনে দাঁড়াল ফারা। ঠিক সময়ের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। কিছুক্ষণ পর যখন বড় এক দান পেল ইজরায়েলি, তার পাশে চলে গেল ফারা। ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'কংগ্র্যাচুলেশন্স।' প্রথমে চমকে উঠল আর্মস ডিলার, তারপর সুন্দরী মেয়ে দেখে পাল্টা হাসল।

কিছুক্ষণ পর যখন আরেক খেলোয়াড় বড় দান পেল, তাকেও কংগ্র্যাচুলেশন্স জানাল ফারা। ততক্ষণে সবাই মেনে

নিয়েছে ওকে। অপ্সরীর মত মেয়েটা আশপাশে থাকলে বরং খেলার মজা আরও বাড়বে। এবার দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের স্ট্যাকের উপর সামান্য চিপস রাখল ফারা। ওই লোক যদি জেতে, ও-ও জিতবে।

তবে পরের দানে হারল লোকটা। ফারার দিকে চেয়ে দুঃখ-প্রকাশ করল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিষয়টা উড়িয়ে দিল ফারা। ওর ভাব দেখে মনে হলো, এ কোনও ব্যাপারই নয়।

এবার আল-কাশিমের দিকে চাইল ফারা। নিঃশব্দে ভুরু উঁচু করল। প্রিন্সের চিপসগুলোর সঙ্গে নিজেরগুলো রাখতে চাইছে। বার কয়েক মাথা দোলাল লোকটা। তার ড্রিঙ্কের পাশে এক হাত রাখল ফারা, ঝুঁকে পড়ে টেবিলে চিপস রাখল। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন প্রায় উল্টে যাচ্ছিল গ্লাস। ওটা পড়বার আগেই অবশ্য খপ্ করে ধরল, ততক্ষণে মদের ভিতর পড়েছে দুটো ট্যাবলেট। গ্লাসটা ম্যাটের উপর রাখল।

ওই দুই ট্যাবলেটের ভিতর রয়েছে হোমিওপ্যাথিক কম্পাউণ্ড। ওগুলো দিয়ে অ্যাডিক্টদের শরীর থেকে দূর করা হয় ড্রাগ। এই জিনিসের ব্যাপারে পড়াশোনা করেছে ফারা। আসলে ওটা কোনও কাজই করে না। তবে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে। ওই জিনিস খেলে বারবার ছুটতে হয় প্রস্রাব করতে। আল-কাশিমকে দেয়া হয়েছে যেন সে একটু পর ক্যাসিনোর রেস্টরুমে যায়।

আল-কাশিম কিছুই সন্দেহ করেনি। এ দান শেষে জিতল সে, নেকড়ের মত হাসতে লাগল। হাসি থামতে ফারার জেতা চিপস তুলে দিল ওর হাতে।

'মার্সি, মোসিউ,' বলল ফারা। অন্য এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে বাজি ধরল এবার। এবং হেরেও গেল। অপেক্ষা না করে ওই

টেবিল থেকে সরে বেরিয়ে এল গ্যাম্বলিং হল থেকে। ফিরে এল আকাশ ছোঁয়া এইট্রিয়ামে, ফোনে জানিয়ে দিল ওর কাজ শেষ।

'ঠিক আছে, এমন কোথাও থাকো যেখান থেকে তাকে দেখতে পাও। বাথরুমের দিকে গেলে জানিয়ে দিয়ে মেরিনায় চলে যেয়ো।' স্যালন দ্য এল'ইউরোপ থেকে সবচেয়ে কাছের ল্যাভাটোরির দিকে চলেছে রানা। 'জলিল, নবী, তোমরা পজিশনে চলে এসো।'

'আসছি, মাসুদ ভাই।'

রেস্টরুম থেকে এক দরজা আগে বিল্ডিঙের সার্ভিস করিডোর, ওখানে থাকে জ্যানিটর ও ওয়েটস্টাফ, ক্যাসিনোর পেট্রনদের সেবা দেয়। পৌঁছে গিয়ে একটু দ্বিধা করল রানা, ততক্ষণে খুলে গেল দরজা। ওর দিকে নকল বমির ক্যানিস্টার বাড়িয়ে দিল জলিল খান। ওটা নিয়ে রেস্টরুমে ঢুকে পড়ল রানা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, এতক্ষণে আল-কাশিমের উপর ড্রাগের প্রভাব শুরু হওয়ার কথা।

ক্যাসিনোর আর সব কিছুর মত রেস্টরুমও মার্বেলের তৈরি, এখানে ওখানে সোনার রং। একটু আগে রানা যখন ঢুকেছে, এক লোককে দেখেছে। সে হাত পরিষ্কার করছিল। তবে স্টলগুলোর কাছে পৌঁছতেই বেরিয়ে গেল সে লোক। অসুস্থ হওয়ার ভান করতে হলো না রানার। নিশ্চিন্তে মেঝের উপর ঢালল আবুলের তৈরি বমি। সে দুর্গন্ধ ভয়ানক। নিজেও ঢুকে পড়ল এক স্টলে।

কয়েক মিনিট পর পেট্রনদের একজন বাথরুমে ঢুকল। স্টলের ভিতর রানা বুঝল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এ লোকের জীবন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসিনোর কর্মচারীদের ডাকল সে। ফ্রেঞ্চ

ভাষায় বকে চলেছে। অ্যাটেণ্ডেন্ট তাকে নিশ্চিত করল, এখনই আসবে জ্যানিটরিয়াল স্টাফ। দুটো পায়ের আওয়াজ উঠল। তারপর আরও দুটো পায়ের আওয়াজ। পেট্রন অন্য রেস্টরুমের খোঁজে চুলেছে। স্টলের ভিতর রানা আন্দাজ করল, কাছের সার্ভিস করিডোর লক্ষ্য করে ছুটছে কর্মচারী। করিডোরে দুই জ্যানিটরকে পাবে সে, তারা এসে পরিষ্কার করবে বমি।

দু'মিনিট পেরুল, আবার খুলে গেল রেস্টরুমের দরজা। ঘড়ঘড় করে ভিতরে ঢুকল ট্র্যাশ ব্যারেলের চাকাগুলো। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'কী বুঝলে?' স্টল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'মাসুদ ভাই, মরে গেলে আর বাঁচব না,' করুণ স্বরে জানাল নবী।

'কপাল কাকে বলে,' আফসোস করল জলিল। 'মাসুদ ভাই হলেন রাজপুত্র, আর আমরা হলাম জমাদার! সব কপালের ফের!'

আবার খুলে গেল রেস্টরুমের দরজা। এক লোক ঢুকতেই হাতের ইশারা করল নবী, মাথা কাত করে দেখিয়ে দিল এখানে না থাকাই ভাল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরতি পথ ধরল পেট্রন। ততক্ষণে মেঝে থেকে থকথকে বমি পরিষ্কার করতে শুরু করেছে জলিল।

'এইমাত্র টেবিল ছাড়ল,' রানার উদ্দেশে বলল ফারা। 'বাথরুমের দিকে চলেছে।'

'গুড। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে।' আবার স্টলের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল রেস্টরুমের দরজা, ভিতরে এসে ঢুকল ইবনে আল-কাশিম। দুর্গন্ধ পেয়ে কুঁচকে ফেলল নাক।

তবে তার প্রয়োজন আর্জেন্ট, প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকল একটা স্টলে।

মুতুক শালা, অপেক্ষা করছে রানা। তবে লোকটার কাজ প্রায় শেষ হতে নিঃশব্দে পিছনে গিয়ে হাজির হলো। কে যেন পিছনে, হঠাৎ টের পেল আল-কাশিম, ঘুরে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে চাইল যমজ ভাইয়ের দিকে। তবে বুঝে উঠবার আগেই তার ঘাড়ের পিছনে গেঁথে গেল হাইপোডারমিক নিডল। প্লাঞ্জার দাবিয়ে দিল রানা। চেঁচিয়ে উঠল আল-কাশিম, বিশাল হাঁ করল সাহায্য চাওয়ার জন্য। তবে এক হাতে তার মুখ চেপে ধরেছে রানা। আরেক হাতে ঘাড়। ঝটকা দিয়ে সরতে গিয়ে রাজপুত্রের চোখ থেকে খসে পড়ল সানগ্লাস। আর মাত্র দুই সেকেণ্ড জেগে রইল, তারপর এলিয়ে পড়ল রানার কাঁধে।

দরজার ওপাশ থেকে আরেক পেট্রনকে ফিরিয়ে দিল নবী। ততক্ষণে জলিল ও রানা বড় ট্র্যাশ ক্যানের ভিতর ভরে ফেলেছে আল-কাশিমকে। নিজের ঘড়ি পকেটে রেখে দিল রানা, পরে নিল প্রিন্সের হালকা মোভাডো ও ডানহাতের প্রকাণ্ড আঙটি।

'ঘুমাক, আমি যাই জেনকিন্সের খোঁজে,' একবার নিজেকে আয়নায় দেখে নিল রানা। 'রাজপুত্তুরকে এমন কোথাও রাখবে, যেন কয়েক ঘণ্টার ভেতর কেউ খুঁজে না পায়। কাজ শেষ হলেই ফারাকে সঙ্গে নিয়ে মার্ভেলে ফিরবে।'

'লোডিং ডকের কাছে ইউটিলিটি ক্লজিট দেখেছি,' বলল জলিল। 'রাতের এ সময়ে ওদিকে কেউ থাকবে না।' মপ দিয়ে বমির শেষ অংশ তুলে ফেলল। আবার চকচক করছে মেঝে। বাকেটের ভিতর রেখে দিল মপ।

'পরে দেখা হবে,' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রানা।

তিন মিনিটেই পৌঁছে গেল শেমান দ্য ফেয়ার টেবিলে। শু

থেকে তাস নিয়েছে ব্যালফোর। 'দোস্তো, শরীর এখন কেমন?' ইংরেজিতে বলল।

'পেট কামড়ে চলেছে, আর কিছু না, ব্যালফোর।' প্রিন্স ও আর্মস ডিলার তিন ঘণ্টা আলাপ করেছে, এমন এক টেপ শুনে এসেছে রানা। তাদের কথা বলবার ভঙ্গি ও আচরণ জানে। দ্বিতীয়বার রানার দিকে চাইল না ব্যালফোর।

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিট জুয়া খেলল ওরা। তার ফাঁকে বার কয়েক জানিয়েছে রানা, ভাল লাগছে না ওর শরীর। শেষের দিকে খেলা রীতিমত খারাপ হয়ে উঠল। বোকার মত বাজি ধরল, এক দানে প্রিন্সের দুই লাখ চল্লিশ হাজার ডলারের চিপসের অর্ধেক হেরে গেল।

'সরি, ব্যালফোর,' ডানহাতে পেট ধরে বলল রানা, 'আমার মনে হয় এবার ইয়টে ফেরা উচিত।'

'ডাক্তার লাগবে?'

'অত সিরিয়াস মনে হয় না। একটু শুলে ঠিক হয়ে যাবে শরীর।' নিজে ডিল করবার সুযোগটা নিল না রানা। একটু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। 'আপনারা খেলুন প্লিয। আমি...'

বড় ঝুঁকি নিয়েছে রানা, আর্মস ডিলার যদি মনে করে, ঠিক আছে, আল-কাশিম ফিরে যাক ইয়টে, আমি আরও খেলি—তা হলে বিপদ হবে। এদের দু'জনের কথা থেকে যা বুঝতে পেরেছে, তাতে রানার মনে হয়েছে, এভাবেই কথাটা পাড়ত শাহজাদা।

ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের মনে এ ভাবনা যে আসেনি, তা নয়, তিরিশ হাজার ডলার জিতেছে সে। প্রতিদিন কপাল এমন থাকে না। কিন্তু মুশকিল হলো, আল-কাশিম হয়ে উঠতে পারে তার মস্ত বড় একজন ক্লায়েন্ট।

'এক রাতে এদের যথেষ্ট টাকা নিয়েছি,' ডানের লোকটার দিকে ছয়-ডেক শু বাড়িয়ে দিল জেনকিন্স, উঠে দাঁড়াল। পুরুষ্টু কাঁধের উপর ঝুলছে জ্যাকেট।

চিপসগুলো ফিরিয়ে দিল ওরা, ক্যাসিনো থেকে টাকা না নিয়ে জানিয়ে দিল, আগামীকাল এসে এই দুই অ্যাকাউন্ট চালু করবে। সাজানো এইট্রিয়াম ধরে চলেছে ওরা। সেল-ফোনে ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ করল ব্যালফোর জেনকিন্স। ওরা বেরুবার আগেই ক্যাসিনোর সামনের চত্বরে চলে আসবে লিমাযিন।

এন্ট্রান্সের সামনে থামল লিমাযিন, তবে ড্রাইভিং সিট থেকে নামল না ড্রাইভার। পাশের সিট থেকে লাফ দিয়ে নামল জেনকিন্সের বডি গার্ড, খুলে দিল পিছনের দরজা। দৈর্ঘ্যে লোকটা রানার চেয়ে অন্তত সাত ইঞ্চি উঁচু। শীতল চোখ কাউকে বিশ্বাস করে না। চারপাশ দেখে নিল সে। ব্যালফোর জেনকিন্স পিছনের সিটে বসতেই কঠোর চোখে চাইল সৌদি প্রিন্সের দিকে।

ট্রেইনিং রানাকে জানিয়ে দিল, ওকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। মর্মর মূর্তির মত চাইল রানা বডি গার্ডের দিকে। একটু রাগ নিয়ে জানতে চাইল, 'কোথাও কোনও সমস্যা?'

দৃষ্টি একটু নরম হলো লোকটার। 'না, তেমন কিছু না।'

গাড়ির পিছন সিটে উঠে পড়ল রানা, পাশ থেকে দরজা বন্ধ করে দিল বডি গার্ড। কাছেই মেরিনা। বডি গার্ড সামনের সিটে বসতেই রওনা হয়ে গেল গাড়ি। দু'হাতে পেট চেপে ধরে সিটে এলিয়ে পড়ে থাকল রানা। আসলে চাইছে না লিমাযিনের ভিতর কথা বলতে হোক। পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই চলে এল গাড়ি ওয়াটারফ্রন্টে।

আর্মস ডিলারের ইয়ট থেকে এসেছে প্রাইভেট লঞ্চ, ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়ি থামতেই বেরিয়ে গেল বডি গার্ড, চারপাশ দেখে নিয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল।

'কপাল ভাল যে আজ কোনও মেয়ের পিছনে টাকা খরচ করিনি,' রানার পাশে হাঁটতে শুরু করল জেনকিন্স। সামনের পানিতে ঝিলিমিলি, দুলছে রাজহংসের মত সাদা লঞ্চ।

'পেট যেমন মোচড় মারছে, মেয়েলোক তো দূরের কথা, কচি ছেলেও চাই না এখন। লঞ্চে উঠতে গেলে মাথা ঘুরে উঠতে পারে।'

ভালুকের হাতের মত মোটা হাত রানার কাঁধে ফেলল জেনকিন্স। 'পৌঁছতে পাঁচ মিনিট। হার্বারের পানি শান্ত। ভয় নেই, বমি হবে না।'

লঞ্চের ইঞ্জিন চালু করল বডি গার্ড, লিমোর ড্রাইভার বো ও স্টার্নের লাইন খুলে দিল। ছয় মিনিট পর ইয়ট মাউন্ট সিনাইয়ের চওড়া দিকটায় পৌঁছে গেল লঞ্চ। ইয়টের টিক ডাইভ প্ল্যাটফর্মের পিছনে নামিয়ে দেয়া হয়েছে সিঁড়ি।

'সোজা কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম নিন,' ইয়টের ডেকে উঠবার সময় বলল জেনকিন্স।

সিঁড়ির উপর ধাপে অপেক্ষা করছে এক কর্মচারী, যদি কিছু লাগে ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের! ডেকে উঠে আরও দু'জন গার্ড দেখল রানা। একজন ব্রিজের সানডেকে, অন্যজন পায়চারি করছে ইয়টের পুলের পাশে।

মার্ভেল থেকে রানাকে জানানো হয়েছে এই মেগা ইয়টে রয়েছে কমপক্ষে আঠারোজন ক্রু। আর দশজন আছে সিকিউরিটি দেখবার জন্য।

'আমি বরং আপনার অফিসে বসতে চাই,' বলল রানা।

'খুব জরুরি?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল জেনকিন্স। তার জানা আছে কেউ শুনে ফেলতে পারে। ওরা রয়েছে তীর থেকে খুব কাছে।

'না-না-না,' আল-কাশিমের ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আজ রাতে একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছি।'

বিশাল এই অভিজাত নৌযানের ডেক ধরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। বিশজন বসতে পারে এমন ডাইনিং রুম পেরিয়ে মুভি থিয়েটার। ওখানে বসতে পারে চল্লিশজন। আরও বিশ ফুট যাওয়ার পর একতলা নামল ওরা, সামনে পড়ল জেনকিন্সের অফিস। রানা ভিতরে ঢুকতেই দরজা আটকে দিল ইজরায়েলি আর্মস ডিলার। পাশের সুইচ বোর্ডে হাত রেখে জ্বেলে দিল আলো। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই থমকে যেতে হলো তাকে। তার ঘাড়ের পাশে ওয়ালথার ঠেসে ধরেছে আল-কাশিম। এবং এত জোরে যে, ছড়ে গেল ত্বক।

'একটা আওয়াজ, ব্যস, মরবে,' আরবী টানে বলা ইংরেজি উধাও হয়েছে। রাজপুত্র এখন নিখুঁত ইদ্দিশ ভাষা ছাড়ছে!

নড়ল না ব্যালফোর জেনকিন্স। বুদ্ধিমান লোক, বুঝে গেছে এ যে-ই হোক, ওকে খুন করতে আসেনি। ইচ্ছা করলে আগেই শেষ করতে পারত। এর অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

'কে তুমি?'

কোনও জবাব মিলল না। বগলে হোলস্টার আছে কি না দেখা হলো। কোমরে কিছু নেই। এক হাতে আর্মস ডিলারের দুই কব্জি আটকে দেয়া হলো ফ্লেক্সিকাফে।

'তুমি আমার ভাষা জানো, আরব নও, অন্য কোনও দেশের মানুষ। তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। আমি যখন রিসার্চ করি, বুঝতে পারি ইবনে আল-কাশিমের ব্যাকগ্রাউণ্ড পরিষ্কার।

অর্থাৎ তার পরিচয় নিয়ে এখানে আসা কঠিন ছিল। আমার পরিচিত অনেকে বলেছে, আল-কাশিম সলিড কাস্টমার।'

'আমি ইবনে আল-কাশিম নই,' বলল রানা।

দাঁত খিঁচিয়ে বলল জেনকিন্স, 'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'সে আছে ক্যাসিনোয়, লোডিং ডকে ট্র্যাশ ক্যানের ভিতর। চব্বিশ ঘণ্টা পর জেগে উঠবে। পরে তার সঙ্গে আর্মস নিয়ে আলাপ কোরো।' তিন পা পিছিয়ে গেল রানা। 'ঘুরে দাঁড়াও।'

ঘুরে ওর দিকে চাইল আর্মস ডিলার। সরু হয়ে গেল দুই চোখ। পরিস্থিতি বুঝতে চাইছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে অনিশ্চয়তার ভিতর রাখল রানা, তারপর বলল, 'শুনেছি মণ্টি কার্লোয় এসেই তোমাদের পরিচয় হয়। অবশ্য তাতে আমার কিছু না। আমি এখানে এসেছি অন্য কাজে। তুমি আগে মোসাদে চাকরি করতে। তোমার মালিকদের কাছ থেকে একটা জিনিস চুরি করেছ।'

'আমি তো অনেক কিছুই নিয়েছি,' খানিক গর্ব নিয়েই বলল জেনকিন্স।

এই লোকের ফাইল পড়েছে রানা। ওর বদলে অন্য কেউ হলে এর খুলির ভিতর একটা বুলেট পাঠিয়ে দিয়ে তারপর কথা বলত। তাতে একটু সাফ হতো জগৎ।

'আমি জিব্রাইলের মুষ্টির কোড ফিরিয়ে নিতে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ওর, ঠিক দু'দিন আগে আল-কাশিমকে ওই অস্ত্রের কথা বলেছে জেনকিন্স। আরেকবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'যা চাই তা না পেলে, আমি তোমার মৃত্যুদূত।'

'তোমরা আমার উপর সার্ভেইল্যান্স রেখেছ, না?'

'বেশ কিছুদিন ধরে। বাধ্য না হলে তোমাকে খুন করতে

চাই না। অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রোজেক্টাইল স্যাটালাইটের কোড দেবে। পরে ইবনে আল-কাশিমের সঙ্গে খুশিমত ব্যবসা কোরো, আপত্তি নেই। তবে আজ ওই কোড না দিলে মরবে তুমি।'

মার্ভেল থেকে আসবার আগে বিসিআই চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। উনি জানিয়েছেন, এমন কিছু করবে না যেটা জেনকিন্স ও আল-কাশিমের আর্মস ডিল নষ্ট করে। ওদের ঠিক সময়ে হাতের মুঠোয় পেতে চাই।

ওয়ালথারের হ্যামার কক করল রানা। নীরবে বুঝিয়ে দিল, যা বলছে, তাই করবে।

কড়া চোখে চাইল ইহুদি আর্মস ডিলার। তবে ঠিকই চোখে পড়ল, আঙুলের চাপ বেড়ে গেছে ট্রিগারে।

'ট্রিগার টেপো, ঠিক বিশ সেকেণ্ডে পৌঁছুবে আমার সিকিউরিটি টিম,' পাল্টা বলল সে।

'ততক্ষণে তুমি পৌঁছে গেছ জাহান্নামে,' চাপা শোনাল রানার কণ্ঠ। 'তা-ই চাও? সেক্ষেত্রে জেহোভার কাছে প্রার্থনা করে নাও।'

'তুমি কাদের লোক? মোসাদ?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনকিন্স।

'ঠিকই ধরেছ। ওই কোড ফেরত চাই।' সানগ্লাস খুলে ফেলল রানা। ওর কঠোর, নির্দয় দৃষ্টি বিদ্ধ করল আর্মস ডিলারের চোখ দুটোকে। 'আমরা বিশ্বাসঘাতককে মাফ করি না, তবে বাধ্য না হলে ইহুদি খুনও করি না।'

এ তথ্যে কোনও ভুল নেই। কিন্তু মোসাদ কী করে টের পেল সে সরিয়েছে কোড! কাঁধ ঝাঁকাল ব্যালফোর জেনকিন্স। 'আমি বিশ্বাস করি না তুমি মোসাদের কেউ। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। ওই কোড কখনও কাজে লাগবে না। না আমার,

না কারও। সবই আছে ওই ছবির পিছনের সিন্দুকে।' উলঙ্গ এক যুবতীর ছবি ঝুলছে ওদিকের দেয়ালে।

পাঁচ পা সরল রানা, ওয়ালথারের নল দিয়ে দীর্ঘ হিঞ্জ সরাল। এটা হতে পারে বুবি ট্র্যাপ। তবে তেমন কিছু হলো না, দুই ফুট বর্গাকারের সিন্দুক, তার উপর দশ ডিজিটের ইলেকট্রনিক প্যাড।

'কম্বিনেশন।'

'এক-পনেরো, এক-এক-তিন, এক-নয়-এক-সাত।'

নাম্বারগুলো প্যাডে টিপল রানা, তবে খুলল না সিন্দুক। ওয়ালথার দিয়ে ইশারা করল। 'সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াও।'

ওখানে এসে থামল জেনকিন্স। পাশ থেকে হ্যাণ্ডেলে টান দিল রানা। এ ধরনের সেফের মডেল ওর চেনা। এগুলোতে কোনও ভুল কোড দিলে বিস্ফোরিত হয় স্টান গ্রেনেড। তবে কোনও চালাকি করেনি জেনকিন্স। কোড সঠিক।

সিন্দুকের ভিতর বাণ্ডিল বাঁধা কয়েক শ' হাজার ডলার আর একটা পিস্তল। পিস্তলটা পকেটে রাখল রানা। এ ছাড়া ভিতরে রয়েছে বেশ কিছু ফোল্ডার ও ফাইল।

'ফাইলের নীচের দিকে পাবে,' বলল জেনকিন্স। যত দ্রুত সম্ভব ঝামেলা থেকে মুক্তি চাইছে।

মূল ডকুমেন্ট খুঁজবার সময় আরও দু'চারটে ফাইলে চোখ বোলাল রানা। আমেরিকা থেকে প্রচুর অস্ত্র কিনেছে ইজরায়েল। তার কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়েছে আর্মির এক ব্রিগেডিয়ার। সেই চালান জেনকিন্সের মারফতে গেছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চরমপন্থীদের হাতে। বদলে মিলেছে প্রচুর ওপিয়াম। সেটা আবার বিক্রি হয়েছে ইউরোপে। জটিল লোক

এই ব্যালফোর জেনকিন্স!

সর্বশেষ ফাইলের আগেরটিতে দেখল লেখা: *জিব্রাইলের মুষ্টি*। কয়েকটা পাতা পড়ল রানা, তারপর সন্তুষ্ট হলো। ঠিক জিনিস পেয়েছে। এই কোডকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করবে মার্ভেলের কম্পিউটার। এরপর সেটা চলে যাবে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের হাতে। অনিলের সঙ্গে বসে বুঝে নিতে হবে তাঁর জটিল অঙ্ক ও প্রক্রিয়াগুলো।

একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের ভিতর ফাইল রেখে দিল রানা। একবার চাইল ব্যালফোর জেনকিন্সের দিকে। কড়া কিছু না বলে শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি যখন আল-কাশিমকে পাবে, ওকে বোলো, আজ যা ঘটল তার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি একটা জিনিস চুরি করেছিলে, সেটা আবার বাটপারি করে নিয়ে গেছে আরেকজন। ঠিক আছে, এবার দুই হাঁটুর উপর বসো... নিল ডাউনের ভঙ্গিতে।'

রানা পিস্তল বের করবার পর এই প্রথমবারের মত ভড়কে গেল জেনকিন্স। চোখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক। কাঁপা স্বরে বলল, 'তুমি যা চেয়েছ, তা তো পেয়েই গেছ!'

'না, তোমাকে খুন করব না,' বলল রানা। হাইপোডারমিক কেস থেকে বের করেছে সিরিঞ্জ। উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল সুই। 'ভয় নেই, এই একই জিনিস দিয়েছি ইবনে আল-কাশিমকেও। জাস্ট একটাদিনের জন্য ঘুমাও। কোনও ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবে শরীরের।'

'সুঁই আমি ভয় পাই। তার চেয়ে মাথার উপর পিস্তলের বাড়ি দেয়া...'

এর বেশি কিছু বলবার সুযোগ পেল না সে, ঝট্ করে সামনে বাড়ল রানা, ওয়ালথার উপরে তুলেই জেনকিন্সের মাথার তালুর

উপর নামিয়ে আনল নল। আর মাত্র দুই পাউণ্ড শক্তি ব্যবহার করলে চুরমার হতো হাড়, সঙ্গে সঙ্গে মরত লোকটা। কলা গাছের মত ঝুপ করে পড়ল আর্মস ডিলার। অজ্ঞান। 'তোমার ইচ্ছা পূরণ করলাম,' বলল রানা। ওয়ালথার রেখে দিল মেরুদণ্ডের পাশে, লোকটার ঘাড়ে বিঁধিয়ে দিল হাইপোডারমিক সুঁই। ওষুধ পুরোপুরি দেয়ার পর সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল।

জেনকিন্সের অফিসের এক পাশ ঘিরেছে কাঁচের জানালা। জায়গাটা ইয়টের খোল থেকে বেরিয়ে রয়েছে। ওখানে চলে গেল রানা, খুলে ফেলল জানালাগুলো। উপরের দিকে চাইল। রেলিঙে কেউ নেই। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ গুঁজে নিল শার্টের নীচে, জানালা দিয়ে ফেলে দিল জেনকিন্সের পিস্তল। জুতো জোড়া খুলে নিঃশব্দে জানালা দিয়ে নেমে গেল সাগরে।

ডলফিনের ভঙ্গিতে চলেছে। কালো পানির সঙ্গে মিশে গেছে কালো উইগ। উপর থেকে বুঝবে না সাঁতরে চলেছে কেউ। মেগা ইয়ট মাউণ্ট সিনাইয়ের খোলের পাশ কেটে পৌঁছে গেল নোঙরের শেকলের পাশে। ওখানে ডুব দেবে, শেকলের লিঙ্কগুলো ধরে নীচের দিকে নামবে।

কিন্তু ডুব দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝপাস্ করে পানিতে নেমে এল কে যেন! চারপাশে ছিটকে গেল পানি। কী ব্যাপার, কেউ দেখে ফেলল নাকি? ঠিক তাই। তিন সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল ব্যালফোর জেনকিন্সের বিশালদেহী বডি গার্ড। একহাতে খপ করে ধরতে চাইল রানার চুল। সরতে চাইল রানা, কিন্তু ওর চেয়ে দ্রুত নড়ল লোকটা। ঘুসি বসিয়ে দিল রানার ভুঁড়িতে। ফোলা ফোমের উপর ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল রানা, দু' সেকেণ্ড লাগল পরিস্থিতি বুঝতে। ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে দানব, দু'হাতে টিপে ধরতে চাইল রানার গলা।

আবারও পিছিয়ে গেল রানা, বুঝতে পেরেছে এ লোকের সঙ্গে জোরে পারবে না। সরতে শুরু করেছে শেকলের দিকে। নতুন উৎসাহ নিয়ে ধাওয়া করল লোকটা। কাউকে ডাকছে না, বোধহয় ভাবছে আর্মস ডিলারের সমস্ত প্রশংসা একাই নেবে। শেকলের ওপাশে চলে গেল রানা, তারপর আর পিছাল না। টুক্স জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে নিয়েছে ফ্লেক্সি কাফ।

ওর গালে চাপড় বসাতে চাইল লোকটা। মাথা সরিয়ে নিল রানা, তবে চোখ রেখেছে হাতের উপর, চট্ করে একটা ফেক্সিকাফ আটকে দিল লোকটার ডান কব্জিতে। পরক্ষণে শিকলে আটকে দিল অন্য কাফ। ভীষণ রেগে ঝটকা দিল বডি গার্ড, পরক্ষণে বুঝে নিল ফাঁদে পড়েছে।

'অ্যাই, তোমরা কে কোথায়!' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

চট্ করে দম নিল রানা, পরক্ষণে ডুব দিল। একটু নীচের শিকলে হাত পড়তেই নেমে যেতে লাগল। প্যান্টের পায়া ধরে টেনে নিয়ে চলেছে দৈত্যটাকে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। প্যান্ট ছেড়ে দিতেই লোকটা শেকল বেয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল। হাঁসফাঁস অবস্থা।

খুলতে শুরু করল রানা টুক্স জ্যাকেট। এরপর দ্রুত খুলল শার্ট ও ফোলা ফোম। এখন ওর পরনে কালো স্কিন-টাইট শার্ট।

আধমিনিট পর পেয়ে গেল ও ডাইভিং ইকুইপমেন্টগুলো।

ড্রেইগার রিব্রিদার, ওয়েট্ বেল্ট, মুখোশ, ফিন ও লিউমিনাস কম্পাস আগেই এখানে রেখে গেছে ফু-চুং। ওগুলো সংগ্রহ করে ধীরে সুস্থে পরে নিল রানা, উপরে উঠে যত খুশি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করুক ব্যাটা। তিনমিনিট পর তৈরি হয়ে রওনা হলো ও সাগরের দিকে। মাত্র একমাইল দূরে অপেক্ষা করছে মার্ভেল।

ভাটা চলছে। অনায়াসে এগুতে পারছে ও।

মাথার ভিতর গিজগিজ করছে নানান চিন্তা। প্রতিটা জরুরি।

বারো

ওদের কেবিন নেই, তবে কোনও বিপদে পড়েনি সানজিদা স্বর্ণা ও কাশেম বক্স। দোকান থেকে কিনে নিয়েছে পোশাক ও টয়েলেট্রিজ। জাহাজের ফিটনেস ফ্যাসিলিটির পাশের লকার-রুমে প্রয়োজন পড়লে গোসল করবে। দুপুরের দিকে পুলের ডেক-চেয়ারে পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছে। রাত কাটিয়েছে ক্যাসিনোর ভিতর। ফটোগ্রাফিক মেমোরির কারণে কাশেম হয়ে উঠেছে দক্ষ তাসুড়ে! দু'জন ওরা পাঁচ শ' ডলার নিয়ে জাহাজে উঠেছিল, এখন সেটা বেড়ে চল্লিশগুণে দাঁড়িয়েছে। চাইলে এর দশগুণ আয় করতে পারত, তবে গোপনে চলতে হবে, সবার চোখ পড়ে যাক ওদের উপর তা চায়নি।

তবে দ্বিতীয় দিন হঠাৎ করেই সব বদলে গেল।

জাহাজের শিপ-টু-শোর কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি সাধারণ যাত্রীদের কাছে প্রয়োজনীয় নয়, বাধ্য হলে যোগাযোগ করে। কিন্তু আজ ক'জন ব্যবসায়ী যোগাযোগ করতে চাইলেন নিজ প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু তাঁদের সবিনয়ে মানা করে দিল কমিউনিকেশন অফিসার। এ বিষয়টা অবশ্য বেশির ভাগ যাত্রী খেয়াল করল না।

সতর্ক হয়ে উঠল কাশেম ও স্বর্ণা। আরও কিছু বিষয় বিপদ-সঙ্কেত হয়ে দেখা দিল। ওরা দেখল আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্রু বেরিয়ে এসেছে ডেকে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো মেইনটেন্যান্সের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু লোকগুলো অনেক বেশি নজর দিতে শুরু করেছে যাত্রীদের দিকে। ওদের কাছে এখন পর্যন্ত রুমের চাবি দেখতে চায়নি ক্রুরা, তবে স্বর্ণা ও কাশেম বুঝে নিল সামনে তেমন কিছু ঘটতে পারে।

ওদের মনে কোনও সন্দেহ রইল না, খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে: কেউ গোপনে উঠেছে জাহাজে অবৈধ ভাবে। ক্রুজ লাইন এখন খুঁজছে এক বা একাধিক অনুপ্রবেশকারীকে।

এ খবর তো আছেই, তার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ হয়ে উঠল: বেশ কিছু যাত্রী আক্রান্ত হলো সর্দি-জ্বরে।

দ্বিতীয় দিন সকালে যাত্রী এবং ক্রুরা রুমাল ব্যবহার করতে লাগল। অনেকে হেঁচে চলেছে অনর্গল। পুলের কাছে ও ডাইনিংরুমে যা শুনল, তাতে দুইয়ে দুই চার যোগ করে নিল ওরা। মাত্র গতকাল রাতে মানুষগুলো সুস্থ ছিল, কিন্তু আজ ভোর থেকে হয়ে উঠেছে রোগী। ছুটছে মেডিকেল বে-তে। মাঝরাতের বুফের পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বেশির ভাগ রাঁধুনি ও ওয়েটস্টাফ।

'ওরা ভাইরাস পরীক্ষা করছে,' বলেছে কাশেম।

'ভাইরাস পরীক্ষা করছে তা না-ও হতে পারে,' নাস্তার সময় বলল স্বর্ণা। ওরা বসেছে বিশাল ডাইনিংরুমের এক কোণে।

'দুটো কারণে তা মনে হয়েছে, প্রিয় ম্যাডাম স্বর্ণা।'

'আমি আবার কবে আপনার প্রিয় হলাম?' ভুরু কুঁচকে চাইল স্বর্ণা।

'না-ই বা হলেন প্রিয়, কিন্তু হতেও তো পারতেন। ওভাবেই

বলতে হয় গোয়েন্দা কাহিনির চরিত্রগুলোর।'

'এটা আপনার বট-তলার গল্প নয়, যা বলার সরাসরি বলুন। আমি কখনও আপনার কেউ নই।'

হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল কাশেম। 'যা বলছিলাম, দুটো কারণে সন্দেহ করছি।'

'আপনি বলতে চাইছেন বেশির ভাগ জাহাজে ভাইরাল আউটব্রেক হয় গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ধরনের,' কথা কেড়ে নিল স্বর্ণা। 'আর এই আক্রমণটা রাইনোভাইরাস?'

'দ্বিতীয় কারণ কিন্তু বলেননি, এটা যদি আসল আক্রমণ হতো, এতক্ষণে স্রষ্টার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়ে যেতাম।'

'এখন কী করা উচিত বলে মনে করেন?' প্লেটে সামান্য খাবার তুলে নাড়ছে স্বর্ণা, মুখে তুলছে না।

'এখন প্রথম কাজ নাস্তা শেষ করা। তারপর সতর্ক হতে হবে। কোনও হাতল, রেলিং বা নব হাত দিয়ে ধরা চলবে না। ডাক্তার ফারা তো বলেছেন, আর যাই করুন, চোখ ছোঁবেন না। ওই পথে সবচেয়ে দ্রুত ঠাণ্ডা-জ্বর দেহে বাসা বাঁধে। আমরা প্রতি আধঘণ্টা পর হাত ধোব। অন্য সব নিয়মও মেনে চলব। এখন আমরা জানি কীভাবে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয় গোল্ড অভ মার্সে।'

'আর কিছু?'

'এখন প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি এখানে ধরা পড়ার ঝুঁকি নেব, না জাহাজ ত্যাগ করব?' খাবার শেষ করছে কাশেম।

'আমি জাহাজে থাকছি, প্রথমে খুঁজে বের করব কীভাবে ভাইরাস ছড়াবে।'

'আমরা কিন্তু ভুলও করতে পারি। ওয়াটার সিস্টেম পরীক্ষা করেছি। এয়ারটেকও। বাদ দিইনি এয়ার-কণ্ডিশনিং প্লান্ট। এমন

কী আইস মেকারও বাদ পড়েনি। এখন পর্যন্ত যখন ধরতে পারিনি, তখন আর না-ও ধরতে পারি।'

সামান্য খাওয়া শেষে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল স্বর্ণা। 'আমরা প্রতিবার খুঁজবার সময় আরও সতর্ক হয়ে উঠিনি। ...একটা কথা জানেন, আমরা যখন কিছু হারাই, সেটা পাওয়া যায় ঠিক শেষ জায়গাটাতে।'

'কেন?'

'কারণ, পেয়ে গেলেই তো খোঁজা শেষ। আর খুঁজতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'তা হলে এখন নতুন জায়গা খুঁজতে হয়। নাকি আগের জায়গাগুলো আবার?'

'সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই তা-ই করব। এখন...'

ডাইনিং রুমের দেয়ালের ইনসুলেশনের ভিতর দিয়ে কেমন অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হয়েছে। দু' সেকেণ্ড পর ওরা বুঝল, আসলে আওয়াজ করছে কপ্টারের রোটর। টেবিল ছাড়ল ওরা, বেরিয়ে এল জাহাজের পিছন দিকের ডেকে। ফ্যানটেইলের কাছে রয়েছে এক সুইমিং পুল। তবে এখন ওই নীল পানি ঢেকে দেয়া হয়েছে মোটা কাপড় দিয়ে। ওদিকে কাউকে যেতে দিচ্ছে না ডেক-হ্যাণ্ডরা।

ওই কপ্টার বেল জেটরেঞ্জার, লেজের কাছে জ্বলজ্বলে রঙে লেখা: *মেডিউসা টুর্স।* কয়েক ডেক উপর থেকে পাইলট ও তিন প্যাসেঞ্জারকে দেখতে পেল স্বর্ণা ও কাশেম।

'পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে,' কপ্টারের আওয়াজ ছাপিয়ে বলল কাশেম।

'আপনার কি মনে হয় ওরা আমাদের ধরতে এসেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সাধারণত ক্রুজ শিপে কেউ মরে না।

কিন্তু যখন ওদের কেউ বেকায়দা ভাবে মরল, ডিয়েটস কেসলার সতর্ক হয়ে গেল। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা ক্রুজ লাইনকে রাজি করাল কীভাবে। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ সহজে জাহাজে নামেন, তবে চলন্ত জাহাজে নামা সবসময় খুব বিপজ্জনক।'

'ওদের পয়সার অভাব নেই।'

জ্যাক স্টাফের উপর দিয়ে এল কপ্টার। ডেক থেকে ময়লা জড় করছিল এক ক্রু, সেগুলো সব হাওয়ায় উড়ে গেল। খানিক উপরে ভাসতে লাগল যান্ত্রিক ফড়িং। পাইলট ছুটবার গতি ও বাতাসের গতিবেগ আন্দাজ করে নিল, তারপর পুলের কাভারের দিকে নামতে লাগল। আকাশে ভার ধরে রেখেছে, স্টিডদুটো নেমে এল কাভারের ছয় ইঞ্চি উপর। একের পর এক লোকগুলো নেমে পড়ল কাপড়ের উপর। কাঁধে ঝুলছে নাইলন ব্যাগ। ওজন কমে যেতেই দ্রুত ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করল পাইলট, দরজা বন্ধ হতেই উঠতে শুরু করল। দেখতে না দেখতে সরে গেল জাহাজের উপর থেকে।

'জ্যারোন ব্রাঙ্কোর ব্যাপারে মিস্টার ফু-চুং বলেছিলেন, সে দেখতে খানিকটা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের মত,' থুতনি তাক করে বলল কাশেম।

'সবার মাঝখানের বিশাল লোকটা?'

'এই তো তাকে পেয়েছেন।'

জাহাজের এক অফিসার এসে অভ্যর্থনা জানাল তিনজনকে, তবে কেউ তারা করমর্দন করল না তার সঙ্গে। লোকগুলোর পরনে সাধারণ পোশাক—খাকি প্যান্ট, পোলো শার্ট ও হালকা উইণ্ডব্রেকার। পিঠে ব্যাকপ্যাক।

'ব্যাগে কি থাকতে পারে?' আনমনে বলল স্বর্ণা।

'বাড়তি আণ্ডারপ্যান্ট, মোজা, একটা রেযর। আর, হ্যাঁ,

অস্ত্র।'

ও জিনিস আমাদের নেই, ভাবল স্বর্ণা। গতকাল পর্যন্ত ধরা পড়লে মস্ত কোনও বিপদে পড়ত না ওরা। নানা রকমের ব্যাখ্যা দিতে চাইত। শেষে ওদের তুলে দেয়া হতো কোনও দেশের কর্তৃপক্ষের হাতে। কিন্তু এখন সব বদলে গেছে ওই জ্যারোন ব্রাঙ্কো ও তার লোক চলে আসতেই। ওই যে, দুই ষণ্ডা লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে! যদি ওদের ধরতে পারে, ভীষণ কোনও বিপদে পড়তে হবে। কাশেম আর ওর একমাত্র সুবিধা, ব্রাঙ্কো জানে না কয়জন খুঁজছে ভাইরাস। কিন্তু সে সুবিধা হারাতে হতে পারে। জাহাজের অফিসার বা ক্রুরা খুঁজতে শুরু করলেই ধরা পড়বে ওরা!

'হঠাৎ একটা কথা মনে হলো,' রেলিং থেকে সরে গেল কাশেম।

'হ্যাঁ, বলুন?'

'ব্রাঙ্কো কি নিজে ভাইরাস ছাড়বার সময় থাকবে? পার্ল অভ মুনের সবাইকে খুন করবে?'

'করতে পারে। হয়তো তার ভ্যাকসিনেশন আছে।'

'তা-ই আসলে।'

দুপুর হতে না হতে জাহাজের চার ভাগের তিন ভাগ যাত্রী আক্রান্ত হলো ভাইরাসে। এবং খুবই দুঃখজনক, অতি সতর্ক থাকবার পরও, ঠাণ্ডা-জ্বর ধরে বসল স্বর্ণা ও কাশেমকে!

তেরো

মরুভূমির জোরালো শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে এয়ারফিল্ড জুড়ে। যেন আকাশ ঢেকে দেবে ধুলো-বালির বিশাল মেঘ। রানওয়ের মাঝখানে না নেমে তিরিশ ফুট বামে নামতে শুরু করল চার্টার্ড সাইটেশন জেট বিমান। ক্রস-উইণ্ডে থর-থর কাঁপছে ফিউজেলাজ।

যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে ধপ করে আটকে গেল গিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হলো ফ্ল্যাপগুলো। টার্বোজেট প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে আরও ক' মুহূর্তের জন্য ভাসিয়ে রাখল এয়ারক্রাফট।

কেবিনের একমাত্র যাত্রী এই পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত নন। এর চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর ও খারাপ আবহাওয়ায় ল্যাণ্ডিং করেছেন নিজেই। নিস থেকে সোজা লণ্ডনে পৌঁচেছেন, ওখান থেকে ডালাসে। অপেক্ষা করছিল লিজ নেয়া এগযিকিউটিভ জেট। ওটা রওনা হওয়ার পর থেকে কোলে ল্যাপটপ রেখে কিবোর্ডের চাবি টিপে চলেছেন।

সোহেল আহমেদ যখন ইজরায়েলি ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল ব্যবহারের কথা বললেন, সেটা ছিল আবছা একটা পরিকল্পনা। মাসুদ রানা ছাড়া আর কেউ জানত না ওটা ব্যবহার করতে হলে কী পরিমাণ ডেটা লাগবে। সেগুলো শেষ পর্যন্ত জোগাড় হলো। অর্বিটাল স্পিড, ভেক্টর, পৃথিবীর রোটেশন, টাংস্টেন রডের ম্যাস

ও অন্যান্য হাজারো বিষয় হিসাব জড়িত ছিল। কোড ও অন্য তথ্য সংগ্রহের পর বিভিন্ন কম্পিউটেশন করতে হয়।

এয়ারফোর্স ব্যাকগ্রাউণ্ডের কারণে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তার উপর সাহায্য করলেন মিস্টার অনিল, তাঁরা দু'জন মিলে সমাধা করলেন অঙ্কগুলো। এমনিতেই ক্যাপ্টেনের পছন্দের বিষয় ট্রিগোনোমেট্রি, ফলে সহজ হয়ে উঠেছে হিসাবগুলো। অথচ সাধারণ ক্রুরা ধারণা করেছিল এ কাজে হাত দেয়া কঠিন হবে।

কোনও স্যাটালাইট ও কম্পিউটারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে, তা ঠিক করতে হলে, মাসুদ রানা ছাড়া দ্বিতীয় যৌক্তিক ব্যক্তি ছিল আতাসি। তবে সে আবার কার্নিভেলের রাইড সহ্য করতে পারে না। আর মার্ভেলে থাকতেই হবে মাসুদ রানাকে। কাজেই একমাত্র ভরসা ক্যাপ্টেন সিরাজ।

ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ যে কাজ করতে চলেছেন, সে কাজ পৃথিবীর খুব কম মানুষই করেছে। অবশ্য এ মুহূর্তে তাঁর মনে কোনও উত্তেজনা নেই, শুধু জানেন একের পর এক সংখ্যা টাইপ করবেন। বাড়তি মিলবে নতুন এক মজার অভিজ্ঞতা।

টাচ ডাউন করল চার্টার্ড সাইটেশন জেট, সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক ভাবে দুলতে শুরু করল দুই চাকার উপর। দ্রুত রাডার চেপে ধরল পাইলট। সোজা না হলে মুখ থুবড়ে পড়বে বিমান। ট্যাক্সি করে চলেছে, যেন থামার তাগিদ নেই। এই এয়ারস্ট্রিপ পুরো তিন মাইল দীর্ঘ। তার শেষে রয়েছে বিশাল এক হ্যাঙার। ওটার দিকে ছুটে চলেছে বিমান। দূরে দেখা গেল হ্যাঙারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা এগযিকিউটিভ জেট। জানালা দিয়ে চেয়ে ক্যাপ্টেন সিরাজ ভাবলেন, এসেছেন তা হলে ভদ্রলোক! হ্যাঙারের দরজার উপর বহু আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া

এক এয়ারলাইনের নাম। তাঁরা পৌঁছে গেছেন গন্তব্যে। সাইটেশন জেটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ককপিট থেকে বেরিয়ে এল কো-পাইলট।

'সরি স্যর, এই বালিঝড়ের ভিতর হ্যাঙারে ঢুকবে না প্লেন। তবে চিন্তা করবেন না, আজ রাতেই ঝড় থামবে।'

ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে বেশ কিছু ওয়েদার সাইট দেখেছেন ক্যাপ্টেন সিরাজ। সেখানে লেখা হয়েছে শীঘ্রি এই আবহাওয়া কেটে যাবে। মাঝরাতের পর থেমে যাবে হাওয়া।

ল্যাপটপ বন্ধ করে দিলেন তিনি, সুটকেস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিমানের দরজা খুলে দিল কো-পাইলট, ঝুঁকে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়ছে বালি। ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে টারমাকে। বিশাল হ্যাঙারের পাশের ছোট এক দরজা খুলে অপেক্ষা করছে এক লোক, হাত নেড়ে চলেছে। জগিঙের ভঙ্গিতে মাঝখানের চল্লিশ ফুট দূরত্ব পেরুলেন সিরাজ, দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। হ্যাঙারের মাঝখানে রাখা হয়েছে বড়সড় একটা বিমান, ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। বিমানের আকৃতি আন্দাজ করা গেল না, তবে এ ধরনের জিনিস আগে কখনও দেখেননি সিরাজ।

'ধূলির কারণে ভীষণ ক্ষতি হয় এসব বিমানের,' হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল মানুষটা। 'আপনি বোধহয় ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। আমি চার্লস মার্টিন।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে, কর্নেল,' বললেন সিরাজ। 'সেই কম বয়সেই আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি।'

বয়স ষাট পেরিয়েছে চার্লস মার্টিনের, কুঁচকে গেছে গালের

চামড়া। দেখলে মনে হয় রুক্ষ আবহাওয়ায় থেকেছেন বহু বছর। তবে নীল দুই চোখ ঝিকমিক করছে। অত্যন্ত পৌরুষদীপ্ত, যেন সত্যিকারের কোনও কাউবয়। যে-কোনও সময়ে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে লড়তে বেরুবেন। কঠোর চোয়ালে দু'দিনের রুপালি দাড়ি। পরনে চিনো, ফ্লাইট ইউনিফর্ম শার্ট ও বম্বার জ্যাকেট। হাত যেন লোহার আঁকশি, অন্তর দিয়ে করমর্দন করেন। কপালের উপর বেসক্যাপ। তার উপর বহুকাল আগের এক শাটল মিশনের লোগো। নিজে তিনি ওই মিশনের পাইলট ছিলেন।

'জীবনের সেরা রাইডের জন্য তৈরি?' জানতে চাইলেন মার্টিন। হ্যাঙারের কোণে অফিস, সেদিকে নিয়ে চলেছেন সিরাজকে। কথার টান শুনে বোঝা গেল টেক্সাসেরই লোক।

মৃদু হাসলেন সিরাজ। 'নিশ্চয়ই!'

অফিসে দু'জন বয়স্ক লোক বসে আছেন। তাঁদের একজনকে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বলে ধরে নিলেন সিরাজ। অন্যজনের ছবি দেখেছেন। উনি লিজেণ্ডারি এয়ারক্রাফট ডিজাইনার ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা। অ্যাডমিরালের দিকে চাইলেন সিরাজ। ভদ্রলোকের বয়স সত্তর মত হবে। চোখদুটো যেন অন্তর পড়তে চায়।

'মিস্টার সিরাজ,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'রানার প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সহজে দেখা হয় না আমার।'

অতি-ভদ্রলোক, ভাবলেন সিরাজ। আলত নিয়ে করমর্দন করলেন। 'মিস্টার রানার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি, স্যর।'

'তা-ই?' মৃদু হাসলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ও সত্যি অদ্ভুত এক মানুষ। যেমন দুর্দান্ত সাহস, তেমনি মহৎ ওর হৃদয়, মানুষের

প্রয়োজনে জান বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে যে কোনও বিপদে।'

'ঠিক এই একই কথা শুনেছি মিস্টার রানার মুখে,' বললেন সিরাজ। 'আপনার সম্পর্কে। ...শুনেছি এবং দেখছি এখন; তাঁর কথায় নিজে চলে এসেছেন এই মিশন সফল করতে।'

'আর কোনও উপায় ছিল না,' বললেন হ্যামিলটন।

'তারপরও আমি রাজি হতাম না,' একটু আড়ষ্ট স্বরে বললেন মার্টিন। 'তবে আপনি বলেছেন পাইয়ে দেবেন এফএএ আর নাসার কাজ।'

'আরও অনেক কিছু পাওয়ার যোগ্যতা তোমাদের আছে,' মার্টিনের দিকে চাইলেন হ্যামিলটন। 'তোমাদের এয়ারক্রাফট এখনও সার্টিফাই করা হয়নি। এবং করবে না বলে ঠিক করেছে উঁচু পর্যায়ের অফিসাররা। তাদের মতামত পাল্টে যাবে এই মিশন সফল হবার পর। লাল ফিতা সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করব আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মার্টিন। 'তাতে দেশের উপকার হবে। আপনি যে পারবেন সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমার। আপনার সাহায্য ছাড়া এই ফ্লাইটের জন্য টেম্পরারি সার্টিফিকেট বের করা যেত না।' সিরাজের দিকে চাইলেন তিনি। 'আমরা কোন্ সময়ে আকাশে উঠব?'

'নোরাড থেকে পাওয়া ডেটা অনুযায়ী আমরা ক্যালকুলেশন করেছি। ওই স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট করতে হবে আগামী কাল সকাল আটটা দশ মিনিট ছয় সেকেণ্ডে।'

'ঠিক সময়ে ওখানে হাজির হওয়া যাবে এমন কথা কিন্তু দিতে পারি না। অলটিচিউড পেতেই লাগবে এক ঘণ্টা। তারপর আরও ছয় মিনিট লাগবে বার্নের জন্য।'

'এক মিনিট এদিক ওদিক হলে খুব একটা অসুবিধে হবে না,' বললেন সিরাজ। 'মিস্টার স্ক্যারাম্যাংগা, আপনি দয়া করে গুরুত্ব দেবেন এই মিশনকে, এটা আমার অনুরোধ। আমাদের উপর নির্ভর করছে কোটি কোটি মানুষের জীবন। শুনতে হয়তো আপনার মনে হচ্ছে বাজে কোনও কল্পকাহিনি থেকে সংলাপ বলছি। কিন্তু যা বলছি তা শতভাগ সত্যি। আমরা যদি ব্যর্থ হই, বদলে যাবে ভবিষ্যৎ পৃথিবী। এবং সেটা সবার জন্যই ভয়ানক খারাপ হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' জোর দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

ল্যাপটপ খুললেন সিরাজ, গোল্ড অভ মার্সের ফুটেজ দেখাতে শুরু করলেন অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে। ভয়াবহ দৃশ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে হলো না, সবার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ফুটেজ শেষে সিরাজ বললেন, 'ওখানে যাদের দেখলেন, তাদের বেশির ভাগ লোক নিজেরাই তৈরি করেছে ওই ভাইরাস। কাজ শেষ হতেই তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে চাইলেন স্ক্যারাম্যাংগা। ততক্ষণে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। ধরে নিন, পূর্ণ মনোযোগ দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যর।'

'আগে কখনও বেশি জি ফোর্সে থেকেছেন?' জানতে চাইলেন মার্টিন।

'আমি যখন এয়ারফোর্সে ছিলাম, তখন। তিন বা সাড়ে তিন পর্যন্ত।'

'বমি করেন না তো?'

মাথা নাড়লেন সিরাজ। 'না।'

'চলবে।' বন্ধুর দিকে চাইলেন মার্টিন। 'ফ্রান্সিস?'

'ইন্সুরেন্সের একগাদা ফর্ম পূরণ করতে দেব না তোমাকে। ওদের পয়সা দিতে গেলে ফতুর হয়ে যাব আমরা। তার চেয়ে আমার উপর বিশ্বাস রাখো। ঠিক ভাবে উড়বে আমার পাখি। বরং তোমার শরীর ঠিক রাখো। তা হলে আমার পাখিও ভাল থাকবে।'

সিরাজের দিকে চাইলেন মার্টিন।

'প্রতি ছয় মাসে ফিজিক্যাল করা হয়,' বললেন সিরাজ। 'আমার কোনও ধরনের শারীরিক সমস্যা নেই।'

'তো ঠিক আছে। সকালের আগে নানা ধরনের প্রিপারেটরি কাজ শেষ করতে হবে।' কব্জি ঘুরিয়ে বড়সড় রোলেক্স দেখলেন স্ক্যারাম্যাংগা। 'বিশ মিনিট পর আসবে আমার টিম। তোমাদের গিয়ার পরিয়ে ওজন আর ব্যালেন্স বুঝে নিতে হবে। তারপর নিজের এয়ারক্রাফটে ফিরবেন, সিরাজ। ফ্লাইটের সময় আসার আগে কোনও কাজ নেই আপনার। শহরে দুটো হোটেল আছে, ইচ্ছে করলে ওখানে থাকতে পারে আপনার দুই পাইলট। সেক্ষেত্রে তাদের শহরে রেখে আসবে আমার লোক।'

'বেশ। আরেকটা কথা, মিস্টার স্ক্যারাম্যাংগা।'

'বলুন।'

'একবার বিমানটা দেখতে চাই।'

উঠে দাঁড়ালেন ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা, হাতের ইশারা করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু নিয়ে বেরুলেন জর্জ হ্যামিলটন, মার্টিন ও সিরাজ। ঢেকে রাখা বিমানের পাশে দীর্ঘ এক কর্ডে ঝুলছে টিভি কন্ট্রোল রিমোটের মত কি একটা। ওটার বাটন টিপলেন ফ্রান্সিস, ধীরে ধীরে ছাতের দিকে উঠতে লাগল

তারপুলিন।

বিমানটা বরফের মত সাদা, তাতে নীল নীল খুদে নক্ষত্র। কাঁধের কাছে লেখা: *দ্য রিয়েল কংকর্ড*। এ ধরনের বিমান আগে কখনও দেখেননি সিরাজ। চিলের মত ডানা ওটার, দেখতে খানিকটা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের করসারের মত। তবে ফিউজেলাজ বেশ খাড়া। এয়ারফ্রেম থেকে সোজা মাটিতে নেমেছে ল্যাণ্ডিং গিয়ার। সিঙ্গেল সিট ককপিটের উপর দুটো জেট ইঞ্জিন। দুই ডানার নীচে দুটো দণ্ড। সেগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ত্রিকোণ আকৃতির লেজের অ্যাসেম্বলি।

তবে বিশাল বিমানের নীচে অন্য কিছু মনোযোগ কেড়ে নিল আলম সিরাজের। ওটা রকেট পাওয়ার যুক্ত গ্লাইডারের মত, দেখলে মনে হয় একটা বড় ডানা। ওটার গায়ে লেখা: *রুখ*। বিশাল সেই আরবী পাখি। আসলে বিমানের ফিউয়েল শেষ হলে ওটাকে ছেড়ে আরও উপরে উঠে যায় রুখ। এই গ্লাইডারের গতিবেগ ওঠে দু'হাজার মাইলে। গোটা জিনিসটা একটা সাব-অর্বিটাল স্পেস বিমান। এই প্রথম ব্যক্তিগত ফাণ্ড ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে এ ধরনের জিনিস। এরইমধ্যে এ বিমান অল্টিচ্যুডের রেকর্ড তৈরি করেছে। উঠে গিয়েছিল এক শ' বিশ কিলোমিটার, অর্থাৎ মাটি থেকে প্রায় পঁচাত্তর মাইল উপরে।

দ্য রিয়েল কংকর্ড ওটাকে তুলে দেয় আটত্রিশ হাজার ফুটে। এরপর দুই উড়োজাহাজ বিচ্ছিন্ন হয়, এরপর রুখের রকেট ওটাকে তুলে নিয়ে যেতে থাকে স্বর্গের দিকে। নীচে পড়ে থাকে নীল পৃথিবী। আরও ষাট মাইল উঠবার পর ধীরে ধীরে গ্লাইড করে ফিরতে থাকে বাড়ির উদ্দেশে।

ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা ও তাঁর দলের বিজ্ঞানীরা চান এই

সাব-অর্বিটাল ডানা ব্যবসায়িক ভাবে ব্যবহার করতে। বহু কোটিপতি চাইবেন এই বিমানে উঠে ভারশূন্য স্পেসের স্বাদ পেতে। আর সেই অভিযানে প্রথম পয়সা খরচ করতে চলেছে মাসুদ রানা ও তার সহযোগীরা। তবে উত্তেজনার জন্য এই অভিযানে আসেননি আলম সিরাজ। সঠিক সময়ে এই ডানায় ভর করে পৌঁছে যাবেন তিনি ইজরায়েলি অস্ত্র প্ল্যাটফর্মের ক্ষতিগ্রস্ত অ্যান্টেনার কাছে। ব্যালফোর জেনকিন্সের কাছ থেকে পাওয়া কোড অনুযায়ী স্যাটালাইটের দিক পাল্টে দেবেন তিনি। ফলে একটা প্রজেক্টাইল খসে পড়বে ইয়োস দ্বীপের উপর। আঠারো শ' পাউণ্ডের টাংস্টেন রড তৈরি করবে ভয়ঙ্কর কাইনেটিক এনার্জি, মুহূর্তে বাতাসে মিশে যাবে কেসলারের সমস্ত পরিকল্পনা, সুখস্বপ্ন।

'দেখতে খুবই বদখত, তা-ই না?' গর্ব করে বললেন ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা। ফিউজেলাজে হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন।

'উড়বার সময় কেমন লাগে?' জানতে চাইলেন সিরাজ।

'আমি নিজে উঠিনি, তবে দারুণ হওয়ারই কথা।'

টেস্ট পাইলট মার্টিন বললেন, 'মনে হবে কোনওদিন সত্যিকারের রোলার কোস্টারে ওঠেননি।'

খুকখুক করে কেশে উঠলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'জেন্টলমেন, এবার ফিরতে হয় আমার।' একে একে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন তিনি। এ বয়সেও শক্ত করে ধরেন হাত। 'তা হলে থাকুন, সবাই। আর, মিস্টার সিরাজ, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ফিরবার আগে দু'চারটে ব্যাপারে আলাপ সেরে নিই।'

'নিশ্চয়ই।'

দু'জন হাঁটতে শুরু করলেন হ্যাঙারের দরজার দিকে।

'আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে একটা তথ্য জানানো হয়েছে নুমাকে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটা ইএলএফ ট্র্যান্সমিশন ধরতে পেরেছে। সেটা ছিল সম্ভবত রানার কলিগ উর্বশী দাশার। তার সামান্য আগে আরেকটা মেসেজ পাঠানো হয়। বিপুল টাকা খরচ করতে হয় এসব ট্রান্সমিটার তৈরি করতে, কাজেই সতর্ক হয়ে উঠেছি আমরা। আপনারা যা জানতে পেরেছেন তা আর কেউ জানতে পারেনি। জানি রানা কঠোর ব্যবস্থা নেবে। সবসময় যে আইন মেনে চলতে হবে, তা-ও নয়।' অ্যাডমিরালের পাশে হাঁটছেন সিরাজ, কিছু বলতে চলেছেন, এমন সময় আবার মুখ খুললেন অ্যাডমিরাল, 'জানি কখনও কখনও আইন মেনে চলা যায় না। তবে আমি চাইব, রানা যতটা পারা যায় আইন মানবে। অর্থাৎ ডিয়েটস কেসলার ও তার দলের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিয়ে লড়বে।

'আমি আপনাদের এই অভিযান সফল করতে সময় দিয়েছি, সেজন্য মস্ত কোনও ক্ষতি হতে পারে আমার। তবে তা নিয়ে ভাবছি না। আপনারা যদি রেসপন্সিভিস্টদের মুখোশ খুলে দিতে পারেন, তারা যদি সত্যিই এ ধরনের দানব হয়ে উঠে থাকে, আমরা তাদের রুখতে কাজে নামব। তবে আগে হাতে পেতে হবে শক্ত প্রমাণ। সেটা আগে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমরা সে-কাজ করছি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন,' বললেন সিরাজ। 'আইনের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক। তবে, এখন যদি আইন মেনে চলি, কোটি কোটি মানুষকে মরতে হবে। আপনি নিজেও দেখেছেন ওই জাহাজে অতগুলো মানুষকে কী নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে ভাইরাস দিয়ে।'

বেশ কঠোর স্বরেই বলেছেন ক্যাপ্টেন।

মৃদু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝতে পারছি যোগ্য লোক সংগ্রহ করেছে রানা। সবসময় সাহস ও যোগ্যতা খুঁজে বের করে। ওকে বলবেন, ডিয়েটস কেসলারের বিরুদ্ধে তথ্য খুঁজতে শুরু করেছি আমরা। আশা করি ততক্ষণে ধ্বংস হবে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার।' হ্যাঙারের দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন দু'জন। বাইরে তুমুল হাওয়া, কাজেই যা বলবার এখানে বলতে হবে। 'ওই স্যাটালাইট ব্যবহার করার কথা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

'মিস্টার রানার বন্ধু সোহেল আহমেদের। আমরা ভাবছিলাম আণবিক বোমা না পেলে ইএলএফ অ্যান্টেনা নষ্ট করা সম্ভব হবে না।'

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। ক্যাপিটোল হিলে কিছু গুজব শুনেছেন তিনি। ওই ইজরায়েলি স্যাটালাইট নষ্ট করে দেয় এক দুর্ধর্ষ গুপ্তচর। এমন কী হতে পারে, সে মাসুদ রানা?

একই সময়ে মাসুদ রানার কথা ভাবলেন আলম সিরাজ। সোহেল আহমেদের কাছে জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, ওই স্যাটালাইট নষ্ট করবার জন্য পনেরো দিন ব্যয় করেন মাসুদ রানা। ওই ফ্যাসিলিটির ভিতর ঢুকে বনে যান ইউরি ক্রামোস নামের এক টেকনিশিয়ান। সিনাই কসমোড্রোমের ওই কঠোর সিকিউরিটির ভিতর আণ্ডারকাভার অবস্থায় থাকাটা ছিল নরকে থাকবার মত। মিশন শেষে ফিরে এসে তাঁকে ডাক্তারি পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। তবে তাঁদের নোটে লেখা ছিল: 'আমাদের দেখা সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ এই মাসুদ রানা।'

মিস্টার সোহেলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সিরাজ,

'সত্যিকারের ইউরি ক্রামোসের কী ঘটে?'

'খুন করেছিল কি না জানতে চান? না। সে লোককে তারই কোয়ার্টারে বন্দি করে রেখেছিল।'

আরেকবার হাত বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'এবার ফিরব আমি। আপনাদের সাফল্য কামনা করি।'

'ধন্যবাদ।' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিলেন সিরাজ। 'ভাল থাকুন।'

ধারালো ছুরি যেমন কাটে নীল মখমলকে, ঠিক সেভাবে মেডিটারেনিয়ান সাগর চিরে ছুটছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। যখনই সুযোগ মিলছে পরিত্যাগ করছে শিপিং লেন, ব্যবহার করছে প্রচণ্ড শক্তিশালী ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন। যেন উড়ে চলেছে জাহাজ। মাত্র একবার গতি কমাতে হয়েছে স্ট্রেইট অভ মেসিনা পেরুনোর সময়। সে-সময় ইতালির বুট থেকে বিচ্ছিন্ন সিসিলি দ্বীপকে পাশ কাটিয়েছে। চমৎকার আবহাওয়া সহায়তা করছে। সাগর শান্ত, সামান্যতম হাওয়া নেই। তীব্র গতি তুলে আইয়োনিয়ান সাগর পেরিয়ে ইজিয়ান সাগরে ঢুকেছে মার্ভেল।

ঘুমের সময় ছাড়া বেশির ভাগ মুহূর্ত কাটছে রানার অপারেশন্স সেন্টারে। মেইন ভিউয়িং মনিটরের উপর অংশে পিছিয়ে চলেছে ডিজিটাল ঘড়ি। বড়জোর আঠারো ঘণ্টা, তারপর পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে ইয়োস দ্বীপ।

যদি উদ্ধার না করা যায়, দ্বীপের সঙ্গে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে উর্বশী নামের সুন্দর মনের দুঃসাহসী মেয়েটি।

গগল হেলম-এ, অনিল ওয়েপন্স সিস্টেম পরীক্ষারত। ফু-চুং ঘরের পিছনে এক চেয়ারে। কাছের বেঞ্চ সিটে ক'জন কমাণ্ডো। আতাসি রেডিও কন্সোল নিয়ে বসেছে। কিন্তু উর্বশী নিজের সিটে

নেই। নেই স্বর্ণা ও কাশেমও। হাই-টেক এ ঘরের পরিবেশ যেন বদলে গেছে।

'কিছু নেই, বস্,' স্টেশন থেকে বলল আতাসি, হতাশ।

পুরো তিন দফা সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু যোগাযোগ করেনি স্বর্ণা বা কাশেম। ক্রুজ লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আতাসি, তারা জানিয়েছে পার্ল অভ মুন জাহাজে কোনও কমিউনিকেশন সমস্যা নেই। আতাসি ওই জাহাজের কমিউনিকেশন সেন্টারে যোগাযোগ করেছে, জানিয়েছে ওর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ওদের বাবা মৃত্যু-শয্যায়। সহানুভূতি ছিল সেক্রেটারির কণ্ঠে, জানিয়েছে সে নিজে কেবিন সি-১৩৩-এ খবর পৌঁছে দেবে। এরপর অনেক সময় পেরিয়েছে, কিন্তু ওই যাত্রী যোগাযোগ করেনি। আগেই হয়তো মারা গেছে তার বাবা। বিরক্ত হয়ে ভেবেছে, নিষ্ঠুর কোনও বন্ধু মশকরা করতে চেয়েছে। ওই একই বুদ্ধি কাজে লাগবে না, সুতরাং সে-চেষ্টা করেনি আতাসি। তা হলে রিসেপশনিস্ট সন্দেহ-প্রবণ হয়ে উঠত।

মার্ভেলের বিপুল অস্ত্র ও দুনিয়ার সেরা কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও, রানার কিছুই করবার নেই। এখন বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আগে ইয়োস দ্বীপ রেঞ্জে আসতে হবে, এরপর ভাল কোনও সুযোগ খুঁজতে হবে। শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রয়েছে উর্বশী, যোগাযোগও করেছে, কাজেই হয়তো কোনও কৌশল খাটিয়ে বেরিয়ে আসবে সে। সে-সময় ধারেকাছে থাকতে চায় রানা। মার্ভেল এখন ছুটে চলেছে ওই দ্বীপ লক্ষ্য করে।

এদিকে বিশ্রী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে স্বর্ণা ও কাশেমকে নিয়ে। রানা জানে না পার্ল অভ মুনে কী ঘটছে। শুধু আন্দাজ

করতে পারছে, গোপনে জাহাজে উঠে পড়া মানুষদের খুঁজতে শুরু করেছে ক্রুরা। হয়তো বন্দি হয়ে গেছে ওরা। আর ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে কেসলার। এদিকে মার্ভেলের ওরা এখনও বুঝে ওঠেনি কী জানাতে চেয়েছে উর্বশী। মৃত্যুর চেয়ে খারাপ কী? যাক সে ভাবনা, এখন ওদের প্রথম কাজ হয়ে উঠেছে ওই ট্র্যান্সমিটার ধ্বংস করা। এদিকে পার্ল অভ মুনে ভাইরাস আক্রমণ হলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হবে স্বর্ণা আর কাশেমও।

কম্পিউটারে একটা নির্দেশ দিল রানা। মেইন মনিটর থেকে উধাও হলো ডিজিটাল ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা। বড় বেশি দ্রুত চলছিল ওটা! যেন বারবার বলছিল, আর কিন্তু কিছুক্ষণ পর... এখন ঘড়িতে শুধু ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা। ওগুলো থাকাই যথেষ্ট।

চোদ্দ

'আমাদের বেভারলি হিলসের বাড়িতে রেইড করেছে এফবিআই!' পাথরের নীচে তৈরি করা অ্যাপার্টমেণ্টে লিঙ্ক চ্যাপেলের উদ্দেশে বলল ডিয়েটস কেসলার। ভয়ের চাপে ভেঙে গেল তার কণ্ঠস্বর। কেশে উঠল।

সোফায় বসেছে চ্যাপেল, পা নাচিয়ে চলেছে। 'কী বললে, ডিয়েটস?'

'আমাদের বেভারলি হিলসের বাড়িতে, মানে, আমাদের হেড-কোয়ার্টারে রেইড করেছে এফবিআই। কয়েক মিনিট আগে। স্যাটালাইট ফোনে যোগাযোগ করেছে আমার সেক্রেটারি। এফবিআইয়ের হাতে সার্চ অ্যাণ্ড সিইযার ওয়ারেন্ট ছিল। আমাদের সমস্ত ফিনানশিয়াল রেকর্ড জব্দ করেছে। সেই সঙ্গে সদস্য তালিকা। ওদের কাছে আরেকটা ওয়ারেন্ট ছিল। বার্থা আর আমার নামে আয়কর ফাঁকি দেয়ার অভিযোগ। কপাল ভাল যে বার্থা ওর বোনের কাছে বেড়াতে গেছে। কিন্তু বিগ বিয়ার থেকে ওকে গ্রেফতার করতে পারে। এই অবস্থায় কী করব আমরা? ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে, লিঙ্ক। জেনে ফেলেছে সব।'

'শান্ত হও! ওরা কিছুই জানেনি। এফবিআই গেস্টাপোদের মত একই কৌশল নিয়েছে। ওরা যদি আমাদের পরিকল্পনা জানত, ক্যালিফোর্নিয়ায় যারা রয়ে গেল, সবাইকে গ্রেফতার করত। শুধু তাই নয়, টার্কিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ফ্যাসিলিটিতেও হামলা করত।'

'কিন্তু সব ফাঁস হতে চলেছে, আমাদের গলা টিপে ধরছে ওরা,' বলল ডিয়েটস। ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে, দু'হাতে ঢেকে ফেলেছে মুখ।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, বাছা। বড় কিছু ক্ষতি হয়নি।'

'এসব কথা আপনার মুখে মানায়,' রাগী-জেদি শিশুর মত বলে উঠল কেসলার। 'কেউ আপনাকে গ্রেফতার করছে না। আড়ালে লুকিয়ে আছেন, সব দোষ তো এসে পড়বে বার্থা আর আমার উপর।'

'চুপ করো, কেসলার! আমার কথা মন দিয়ে শোনো। এফবিআই জানে না আমরা কী অর্জন করতে চলেছি। ওরা

বড়জোর ভাবছে কিছু একটা করতে চাইছি। তার মানে কী? মানে, ওরা কিছুই জানে না। ছেঁড়া জাল দিয়ে সাগর থেকে মাছ ধরতে চাইছে। আমাদের রেকর্ডগুলো পাওয়ার জন্য সাধারণ ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে। আশা করছে ওগুলোর ভিতর এমন কিছু থাকবে, যেটা আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু আমরা জানি, ওসবে আসলে কিছুই নেই।

'আমরা প্রথম থেকেই সমস্ত রেকর্ড পরিষ্কার রেখেছি। রেসপন্সিভিস্টদের সংগঠন একটা মুনাফাহীন প্রতিষ্ঠান। কাজেই আমরা আয়কর দিই না। তবে নিজেদের আর্থিক বিবরণী নিয়মিত আইআরএস-কে সরবরাহ করি। তুমি আর বার্থা যদি বড় ধরনের ভুল না করে থাকো, তোমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা। তোমরা যে বেতন নাও, নিশ্চয়ই সেজন্য আয়কর দাও? সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। এখন প্রশ্ন: ঠিক ঠিক আয়কর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। প্রতিবছর।'

'তা হলে মন থেকে ফালতু চিন্তা দূর করে দাও। ওই বাড়ির ভিতর এমন কিছু থাকবার কথা নয়, যেটা আমাদের ধরিয়ে দেবে। ওরা বড়জোর আবিষ্কার করবে আমরা ফিলিপিন্সে কাজ করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব, ওখানে ফ্যামিলি-প্ল্যানিং ক্লিনিক ছিল। ওই দেশের বেশির ভাগ মানুষ ক্যাথোলিক হওয়ায়, যথেষ্ট ক্লায়েন্ট পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার এই মুহূর্তে রেইড হওয়া!'

'কো-ইনসিডেন্স।'

'আমি তো শুনেছি আপনি এসব বিশ্বাস করেন না।'

'করি না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস করছি। এফবিআই কিছুই জানে না, ডিয়েটস। আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারো।'

কেসলারের মুখের ভাব পাল্টে না যাওয়ায় আবার বলল, 'মন দিয়ে শোনো। তুমি সাংবাদিক ডেকে প্রেস রিলিজ দেবে। তাদের জানাবে অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ভাবে তোমাদের নামে বিশ্রী কুৎসা রটানো হয়েছে। এবং তোমরা দাবি করছ, এফবিআই যেন বেআইনী ভাবে তোমাদের ব্যক্তিগত এবং নাগরিক অধিকার বিনষ্ট না করে। যে ভাবে তোমাদের ভোগান্তির ভিতর ফেলা হয়েছে, তোমরা ঠিক করেছ আইনের আশ্রয় নেবে। আমি কী বলছি সেটা ভাল করেই বুঝতে পারছ। ...এখন, আমরা দ্বীপে লোক আনবার জন্য যে কপ্টার রেখে এ, ওটা এখানে রয়ে গেছে। সেই কপ্টার নিয়ে ইযমার যাব আমি, ওখানে জেট প্লেন অপেক্ষা করছে আমার জন্য। বার্থাকে বলবে সে যেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বেরিয়ে আসে। ফিনিক্সে আমার দুই মেয়ের সঙ্গে দেখা করব, ফিরিয়ে নিয়ে আসব এখানে। ...আমরা ঠিক করি মূল ভাইরাস আক্রমণের আগে বাঙ্কারে যেতে হবে না, তবে দু'চার মাস আগে হলেও খুব অসুবিধে হওয়ার কিছু নেই। আর ওই ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার পর পাগল হয়ে উঠবে প্রতিটি দেশের সরকার। আমেরিকান ফেডারাল গভার্নমেন্ট তখন তোমার ওই সামান্য অভিযোগের দিকে ফিরে চাওয়ার সময় পাবে না।'

'আমরা টিভি সাংবাদিকদের ডাকতে পারি।'

'তা করতেই পারো।' সোফা ছেড়ে কয়েক পা এগুলো চ্যাপেল, কোঁচকানো হাত রাখল ডিয়েটসের কাঁধে। 'ভয় নেই, সব ঠিক চলবে, ডিয়েটস। পার্ল অভ মুনে আমাদের যে লোক খুন হয়েছে, তার খুনিদের খুন করবে তোমার লোক ব্রাঙ্কো। অল্প কয়েক ঘণ্টার ভিতর আমাদের পঞ্চাশটা টিম ভাইরাস নিয়ে তৈরি থাকবে। ধরে নাও গন্তব্যে পৌঁছে গেছি আমরা। সময় হয়ে এল

মহাক্ষণের। কাজেই সামান্য ওই রেইড নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। এখন ভেবে দেখো, ওরা যদি ওই বাড়ি আর তার ভিতরের সব জব্দ করে, তাতেই বা কী? আমরা পৌঁছে গেছি দুনিয়ার সেরা সময়ের কাছে, সাফল্যের কাছে। আমাদের কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। দুনিয়ার কারও পক্ষে এখন আমাদেরকে ঠেকানো অসম্ভব।'

শ্বশুরের দিকে চাইল ডিয়েটস কেসলার। লিঙ্ক চ্যাপেলকে দেখতে লাগছে সবে প্রৌঢ়, কিন্তু আসলে নব্বুই পার হয়ে গেছে বয়স। এই মানুষটা তার শ্বশুর, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় কিছু। এমন এক সাধু, এমন এক পয়গম্বর, যিনি স্বর্গীয় শক্তি নিয়ে এসেছেন তাকে পৃথিবীতে সাফল্য এনে দিতে। এই মানুষটা যখন প্রতিষ্ঠার শীর্ষে, তখন সরে দাঁড়িয়েছেন নিজের কাজ থেকে, বাইরে থেকে রক্ষা করেছেন নিজের সংগঠনকে। তার চেয়েও বড় কথা, নিজ পরিচয় ত্যাগ করে ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছেন আজকের এই পর্যায়ে।

আমি আগে কখনও কোনও কারণে লিঙ্ক চ্যাপেলকে সন্দেহ করিনি, ভাবল ডিয়েটস কেসলার। এখন মনের ভিতর বিচ্ছিন্ন চিন্তা আসছে, কিন্তু ওগুলো উড়িয়ে দেব। আমি চিনি এই মানুষটা আমাকে সঠিক পথে এগিয়ে নেবেন। উঠে দাঁড়াল কেসলার, হাত রাখল তার কোঁচকানো হাতের উপর।

'দুঃখিত, লিঙ্ক। এই দুর্বলতা আমি কাটিয়ে উঠব, এগিয়ে যাব গন্তব্যের দিকে। কী-ই বা হবে আমাকে গ্রেফতার করলে? ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া হবে গোটা দুনিয়া জুড়ে। মুহূর্তে থমকে যাবে বাড়তে থাকা জনসংখ্যা। আর আপনি যা বলেছেন, মানুষ নতুন করে ফিরে পাবে স্বর্ণযুগ।'

'দেখবে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর আমাদেরকে বলা

হবে দুনিয়ার সেরা মানব। আমাদের মস্ত সব মূর্তি তৈরি করবে ভবিষ্যতের মানুষ। আসলে আমরাই তো অল্প কয়েকজন মানুষ যারা সঠিক পথ দেখিয়েছি।'

'লিঙ্ক, কখনও কি ভেবেছেন, এমন হওয়ার বদলে ওরা আমাদের চরম ঘৃণা করবে? কোটি কোটি মানুষকে বন্ধ্যা করে দেয়া...'

'একদল লোক ঠিকই এখন আমাদের ঘৃণা করবে, তবে কয়েক যুগ পর মানসিকতা বদলে যাবে। মানুষ তো এখনই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এমন চলতে পারে না। ঠিক তেমনই একটা বিষয় জনসংখ্যা। তুমি হয়তো বলতে পারো, আমরা কোন্ অধিকারে এত মানুষের জীবন বদলে দেব?' চকচক করছে চ্যাপেলের দুইচোখ। 'আমি শুধু বলব, আমরা যৌক্তিক মানুষ, আবেগ দিয়ে চলি না।

'আমরা এটা করতে পারছি এজন্য যে, আমরা সঠিক কাজ করছি। এর কোনও বিকল্প নেই। জোনাথান সুইফটের এ মডেস্ট প্রোপোজালের কথা শুনেছ তুমি। তখন সতেরো শ' উনত্রিশ। পুরো ইংল্যাণ্ড ছেয়ে গেছে এতিম ছেলে-মেয়ে দিয়ে। উচ্ছন্নে গেছে দেশ। উনি বলেন, আমাদের উচিত এসব বাচ্চাগুলোকে খেতে শুরু করা। তাতে অনেক সমস্যা দূর হবে। তার আশি বছর পর বিখ্যাত টমাস ম্যালথাস প্রকাশ করলেন তাঁর পপুলেশন গ্রোথের উপর রচনা। তিনি লেখেন: মানসিক ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নইলে মানুষের সংখ্যা আরও দ্রুত বাড়তে থাকবে।

'তবে মানুষ তা মানবে না। কয়েক যুগ হলো কম পয়সায় দেয়া হয়েছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বড়ি ও কণ্ডোম। কিন্তু তারপরও বেড়েই চলেছে মানুষের সংখ্যা। আমি লিখেছি, আমরা নিজেদের

বদলে নিতে পারি না। সত্যি তা প্রমাণ হয়েছে। কাজেই ভেবেছি, জাহান্নামে যাক মানুষের যৌন প্রবৃত্তি। সেটা আমরা রুখতে পারব না। বদলে জনগণের জন্ম-দান ক্ষমতা কমিয়ে দেব। এটাকে তুমি বলতে পারো আমাদের নিজেদের রক্ষা করার একমাত্র উপায়। পৃথিবী রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আগামী এক শ' বছরের ভিতর এই পৃথিবী হয়ে উঠবে অপরূপ এক স্বর্গীয় উদ্যান।'

লিঙ্ক চ্যাপেলের কণ্ঠ সাপের মত হিসহিস করে উঠল, 'আর সত্যি বলতে, এশিয়া ও আফ্রিকার নিচু জাতের লোকগুলো কী ভাববে, তাতে আমাদের কী যায় আসে? ওরা যদি এতই বুঝত, তা হলে অতিরিক্ত জন্ম দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করতে চাইত না। ওদের মত অর্ধ-মানুষদের নিয়ে ভাবলে আমাদের চলবে না। আমরা মেষপালকের মত, ভেড়াগুলোকে সঠিক পথে নিয়ে যাব। তোমার কি মনে হয়, ডিয়েটস, ভেড়া কী চিন্তা করে তা নিয়ে ভাবে মেষপালক? আমরা ওদের চেয়ে ঢের বেশি বুঝি, ডিয়েটস। আমরা ওদের চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ের লোক।'

পনেরো

স্টেক ও ডিম অ্যারোনটদের বিখ্যাত নাস্তা, তবে ওগুলো খেতে বিশেষ আগ্রহ বোধ করলেন না ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ।

সামনের এই সাব-অর্বিটাল ফ্লাইটের জন্যও কোন উত্তেজনা বোধ করছেন না। মনের ভিতর কাজ করছে ভয়, যদি বিফল হন! বাইরের মরুভূমির মত বারবার শুকিয়ে আসছে বুক। বুঝতে পারছেন এটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় একাকী মিশন। হয়তো ভবিষ্যতে কখনও এমন মিশন আর মিলবে না। একটু পর তিনি গোটা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

মন থেকে সব ভাবনা দূর করতে চাইছেন। বার বার মনে পড়ছে উর্বশীকে। ইয়োস দ্বীপে বন্দি মেয়েটা—বড় ভদ্র, নম্র। তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চলেছেন তিনি। রাতেও ভাল ঘুমাতে পারেননি এই কথা ভেবে।

'আপনার কোনও সমস্যা হয়নি তো?' হ্যাঙার অফিসের ভিতর ফ্লাইট সুট পরবার সময় জানতে চাইলেন চার্লস মার্টিন। তাঁরা যে স্পেস বিমানে উঠবেন, সেটার কেবিন প্রেশারাইযড, কাজেই পোশাক ঢিলাঢালা ওভারঅল। 'আপনার মুখ ফ্যাকাসে লাগছে।'

'নানান চিন্তা আসছে, কর্নেল,' বললেন সিরাজ।

'ফ্লাইটের ব্যাপারে মোটেই ভাববেন না,' বললেন প্রাক্তন শাটল পাইলট। 'ঠিকই উপরে উঠব। আবার ফিরেও আসব।'

'ফ্লাইটের জন্য আমি ভাবছি না। ভাবছি কাজটা সঠিক ভাবে করতে পারব কি না।'

এক টেকনিশিয়ান উঁকি দিল অফিসে। 'জেন্টলমেন, হাতে সময় নেই। তৈরি হয়ে নিন। ফ্লাইট ডিরেক্টর বিশ মিনিটের ভিতর দ্য রিয়েল কংকর্ডকে রওনা করিয়ে দেবেন।'

লকার থেকে তাড়াহুড়ো করে হেলমেট তুলে নিলেন মার্টিন। 'তা হলে তো সময় নেই!'

পাঁচ মিনিট পর বিশাল কংকর্ডের নীচে রুখ নামের

গ্লাইডারের ডানার কাছে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। ভোরের আগ থেকে কাজে ব্যস্ত ছিলেন সিরাজ, নিজের সিটের পাশে রেখেছেন ল্যাপটপ কম্পিউটার ও পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটার। এবার গ্লাইডারে উঠে পড়লেন তাঁরা। সামনের পাইলট পজিশন এড়িয়ে পিছনের সিটে বসলেন সিরাজ। বুকের কাছে হাত তুলে রেখেছেন। টেকনিশিয়ানরা তাঁকে আচ্ছামত আটকে দিল বেল্ট দিয়ে। দু'জন তাঁরা যেন গ্রাঁ প্রি'র ড্রাইভার। সামনে চেয়ে একটু উপরের দিকে জোড়া জানালা দেখলেন সিরাজ। ওখান দিয়ে দেখা যায় উপরের বিশাল মাদার শিপ। দু'পাশে খুদে জানালা। সামনের সিটে বসেছেন মার্টিন, আলাপ করছেন ফ্লাইট ডিরেক্টর ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগার সঙ্গে।

কমিউনিকেশন পোর্টে হেলমেটের জ্যাক দিলেন সিরাজ, অপেক্ষা করলেন। মার্টিনের আলাপ শেষ হলে রেডিও চেক করবেন ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সির, এরপর পাল্টে নেবেন অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে। তখনও এক কানে শুনবেন পাইলটের বক্তব্য।

'আপনার কী খবর, ক্যাপ্টেন? সব ঠিকঠাক? ওভার।' ভেসে এল আতাসির কণ্ঠ।

'রিডিং ফাইভ বাই ফাইভ। ওভার।'

'টেলিমেট্রি রিসিভ করবার জন্য তৈরি থাকুন। শুরু হলো: থ্রি, টু, ওয়ান, মার্ক।' ল্যাপটপের কি টিপলেন সিরাজ। এবার পুরো ফ্লাইট মনিটর করবে আতাসি। ইজরায়েলি স্যাটালাইট ঠিক কোথায় তা জানা যাবে মার্ভেল থেকে। সিরাজকে দেয়া হয়েছে ওয়েবক্যাম, ওটার কারণে মার্ভেলের সবাই সব দেখতে পাবে। 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন, সিগনাল স্বাভাবিক। ওভার।'

'বেশ, আর দশ মিনিট পর রওনা হব সময় মত আপডেট

পাবেন। ওভার।'

'রজার। গুড লাক। ওভার।'

খটাং-খটাং আওয়াজ তুলে খুলে গেল বিশাল হ্যাঙারের দরজা। ভিতরে এসে পড়ল নতুন দিনের লালচে আলো। ওয়ার্কাররা ঠেলে নিয়ে চলেছে দ্য রিয়েল কংকর্ডকে, বের করে আনা হলো হ্যাঙার থেকে। রানওয়ের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরানো এক মোবাইল হোম। ওটা ফ্লাইট ডিরেক্টরের কন্ট্রোল সেন্টার। ওটার ছাতের উপর একগাদা অ্যান্টেনা ও দুটো ঘুরন্ত ডিশ।

'পিছনে আপনার অবস্থা কী?' কাঁধের উপর দিয়ে চাইলেন মার্টিন।

সিরাজ কিছু বলবার আগেই কংকর্ডের ফিউজেলাজের উপর গর্জে উঠল দুই টার্বো জেট। ঝালাপালা হয়ে গেল কান। এবার রেডিওতে ওই একই প্রশ্ন করলেন মার্টিন।

'সামান্য উত্তেজিত,' বললেন সিরাজ।

'একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার কন্সোলে লাল একটা বাতি জ্বলে উঠবে। তখন বুঝতে হবে দশ সেকেণ্ড পর বার্ন শেষ হবে। পাঁচ সেকেণ্ড থাকতে বাতি হবে হলুদ। বাতি সবুজ হওয়ার মানে থেমে গেছে রকেট মোটর। ঠিক সে সময়ে আমাদের উচ্চতা হবে আন্দাজ পঁচাত্তর মাইল। তবে মোটর থেমে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে নামা শুরু হবে। কাজেই যা করার তাড়াতাড়ি করবেন।'

'বেশ।'

চাকা গড়িয়ে চলেছে কংকর্ডের। বললেন মার্টিন, 'তা হলে রওনা হয়ে গেলাম।'

ঝোলানো ডানা নিয়ে ধীরে চলেছে মাদার শিপ, চলে এল

রানওয়েতে, স্থির হলো সেন্টার স্ট্রিপের উপর। পরক্ষণে বাড়তে লাগল গতি। পুরো পাওয়ার দেয়া হয়েছে ইঞ্জিনগুলোতে। এমন ভাবে কংকর্ড তৈরি, রুখকে তুলে দেবে আটত্রিশ হাজার ফুট উপরে, তবে নিজে ওটা ভাল ডাইন্যামিক এয়ারক্রাফট নয়। প্রায় সম্পূর্ণ রানওয়ে খরচ করে অলস ভঙ্গিতে ভেসে উঠল বাতাসে। উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। পাশের জানালা দিয়ে মরুভূমি চোখে পড়ল, সেখানে বিমানের বিশাল ছায়া। দেখলে মনে হয় সায়েন্স ফিকশন সিনেমা থেকে নেয়া হয়েছে ভিনগ্রহের ছবি।

একঘণ্টা ঘুরে উচ্চতা পেল কংকর্ড। এ সময় আরেকবার ইকুইপমেণ্ট পরীক্ষা করলেন সিরাজ। মার্টিন চুপচাপ নিজ সিটে বসে রইলেন, কখনও খেললেন ফ্লাইট সিমুলেটর গেমস।

সিরাজের হিসাব অনুযায়ী দশ মিনিট আগে পৌঁচেছেন তাঁরা। কাজেই বাংলা অঙ্কের চারের মত আকাশে একই উচ্চতায় ঘুরতে লাগল বিমান। তাঁদের অনেক উপরে ইজরায়েলি স্যাটালাইট দ্রুত ছুটে চলেছে। শাটল বা ইণ্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ইকুয়েটার ধরে চলে, কিন্তু অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল অস্ত্রটি পৃথিবীর এক পোল থেকে শুরু করে অন্য পোল পর্যন্ত ঘুরতে থাকে। এর ফলে প্রতি চোদ্দদিনে পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি কাভার করে। এ মুহূর্তে ওটা রয়েছে ওয়াইয়োমিঙের উপর, প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার মাইল গতি তুলে ছুটছে। বর্তমান অর্বিটাল ট্র্যাক অনুযায়ী ওটা যাবে না ইয়োস দ্বীপের উপর দিয়ে। সেজন্য লাগবে আরও এক সপ্তাহ। আর সে কারণেই একটা সিগনাল পাঠাবেন সিরাজ। ম্যানুভারিং রকেট ফায়ার করলে পাল্টে যাবে স্যাটালাইটের গতি-পথ। তখন, সব যদি ঠিকমত চলে, ওই স্যাটালাইটের রেঞ্জে পড়বে ইয়োস দ্বীপ। ঠিক আট ঘণ্টা পর টাংস্টেন রড ছুটবে ওটার

দিকে।

'আর এক মিনিট,' জানালেন ফ্লাইট ডিরেক্টর ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা। 'প্রতিটি বোর্ড সবুজ।'

'রজার। ষাট সেকেণ্ড বাকি।'

সিরাজের কন্সোলে উল্টো সময় গুনছে এক ঘড়ি। এদিকে ড্যাশবোর্ডের ডিজিটাল স্পিড ইণ্ডিকেটর জানিয়ে চলেছে বর্তমান গতিবেগ ঘণ্টায় চার শ' মাইল।

'বিশ সেকেণ্ড... দশ... পাঁচ... চার... তিন... দুই... এক। সেপারেশন করুন।'

মাদার শিপের পাইলট লিভার টান দিতেই কংকর্ডের পেটের নীচ থেকে সরে গেল রুখ। কয়েক সেকেণ্ডে পিছিয়ে গেল স্পেস প্লেন, কংকর্ডের সঙ্গে তৈরি হলো দূরত্ব, তারপর লিকুইড রকেট মোটর চালু করলেন মার্টিন।

সিরাজের মনে হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয় একই সঙ্গে আপত্তি করে উঠেছে। ওঁরা যেন দাঁড়িয়েছেন জলপ্রপাতের নীচে, প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে রকেট ইঞ্জিন। বুকের ভিতর ধুপ-ধাপ লাফিয়ে চলেছে হৃৎপিণ্ড। থর-থর করে কাঁপছে এয়ারফ্রেম, বাধ্য হয়ে দুই হাতে দু'পাশের হাতল চেপে ধরলেন সিরাজ। মনে হলো কেউ তাঁকে গেঁথে দিতে চাইল সিটে। ত্বকের নীচে শিরশিরে অনুভূতি, যেন শিরিষ কাগজ ঘসে চলেছে কেউ। মুখের ভিতর শুকিয়ে গেল। শিরার ভিতর ছুটছে অ্যাড্রেনালিন। স্পিডোমিটারের দিকে চাইলেন সিরাজ, এ মুহূর্তে তাঁরা পৌঁছে গেছেন প্রায় সাউণ্ড ব্যারিয়ারের কাছে।

সিটের সঙ্গে তাঁকে ঠেসে ধরেছে জি ফোর্স। বিমানের নাক উপরে তুলে দ্রুত উঠে চলেছেন মার্টিন। ভয়ানক ভাবে কাঁপতে লাগল বিমান। সিরাজের মনে হলো যে-কোনও সময়ে

এয়ারফ্রেম চুর-চুর হয়ে ভেঙে পড়বে। তারপর হঠাৎ সাউণ্ড ব্যারিয়ার পেরুলেন তাঁরা। উধাও হয়ে গেল প্রচণ্ড আওয়াজ, রইল শুধু ইঞ্জিনের কম্পন ও কড়কড়ে একটা শব্দ।

রকেট মোটর মাত্র এক মিনিটে তাঁদের তুলে নিয়ে গেছে এক লাখ ফুট উপরে। সামলে নিতে শুরু করলেন সিরাজ। ধীরে ধীরে কমছে হৃৎস্পন্দন। অন্তরে অনুভব করলেন স্পেস বিমানের প্রচণ্ড শক্তি। স্বাভাবিক হতে শুরু করলেন।

এয়ারস্পিড গজ জানিয়ে দিল তাঁরা প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার মাইল গতিতে ছুটে চলেছেন। উপরের জানালার দিকে চাইলেন সিরাজ। দ্রুত নিভে আসছে আলো, কালো হয়ে আসছে আকাশ। অ্যাটমসফিয়ার চিরে সগর্জনে ছুটে চলেছে রকেট ইঞ্জিন। তারপর জাদুর মত দেখা দিল একের পর এক নক্ষত্র। প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর উজ্জ্বল হলো ক্রমে। কখনও একসঙ্গে এত বেশি তারা দেখেননি সিরাজ। সংখ্যা আরও বাড়তে লাগল। একটু পর মনে হলো অন্ধকার কাটছে, বদলে মিটমিট করছে অজস্র দীপ। দেখলে মনে হয় হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়।

হঠাৎ সিরাজের সামনের ইণ্ডিকেটর লাল হয়ে উঠল। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না দেখতে না দেখতে কেটে গেছে চার মিনিট। জি ফোর্সকে কাটিয়ে হাত নড়ে উঠল সিরাজের, কোলের উপর ল্যাপটপ।

'দশ সেকেণ্ড,' মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন সিরাজ। আতাসি যদি জবাব দিয়ে থাকে, তা হারিয়ে গেছে রকেট ইঞ্জিনের আওয়াজে।

অল্টিমিটারে দ্রুত ঘুরছে সংখ্যাগুলো। হলুদ বাতি জ্বলে উঠতে পৌঁছে গেলেন তাঁরা তিন লাখ পঁচানব্বুই হাজার ফুটে। পরের পাঁচ সেকেণ্ডে আরও এক মাইল উপরে উঠল রুখ। জ্বলে

উঠল সবুজ ইণ্ডিকেটর, পৌঁছে গেছেন তাঁরা চার লাখ ফুট উপরে।

কি বোর্ডে কমাণ্ড টাইপ করলেন সিরাজ। ঠিক তখন শেষ ফিউল খরচ করে বন্ধ হয়ে গেল মোটরের স্লাইকোনিক পাম্প। কোথাও রইল না সামান্যতম আওয়াজ। এতক্ষণ জি ফোর্স তাঁদের গেঁথে রেখেছিল সিটে, সেটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল। হঠাৎ সিরাজ টের পেলেন, তিনি ভারশূন্য হয়ে গেছেন। কখনও এমন লাগে রোলার কোস্টারে। ভাবতে অবাক লাগল, পৌঁছে গেছেন মহাশূন্যে, এখানে বলতে গেলে কোনও মাধ্যাকর্ষণ নেই।

ককপিটে চার্লস মার্টিন আর্মেচার অ্যাক্টিভেট করলেন। রুখের ফিউজেলাজের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে উঁচু হয়ে উঠল ডানা। বাড়তি ড্র্যাগ ও নতুন এই ডাইন্যামিক কনফিগারেশনের ফলে অবিশ্বাস্য স্থির রইল বিমান। ধীরে নামতে শুরু করল পৃথিবীর দিকে। বহু পথ পেরিয়ে আবারও ফিরবে টেক্সাসের হানাহান এয়ারফিল্ডে।

'কী মনে হয়?' জানতে চাইলেন মার্টিন।

'এক মিনিট, স্যর।'

মার্টিন ধারণা করলেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সিরাজ, কাজেই কাঁধের উপর দিয়ে চাইলেন। না, কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে পড়েছে বাঙালি ক্যাপ্টেন। জীবনের সেরা রাইড পেয়েছে, এখন মন দিয়েছে কাজে। মানুষটার মনোযোগ দেখে মনে মনে প্রশংসা করলেন মার্টিন। তাঁর জীবনের প্রথম শাটল মিশনের কথা ভাবতে লাগলেন। সেবার প্রথম এক ঘণ্টা শুধু মহাশূন্যের দিকে চেয়ে ছিলেন।

'আবার একবার বলুন, ক্যাপ্টেন সিরাজ। ওভার।'

'স্যাটালাইটের অনবোর্ড টেলিমেট্রির কনফার্মেশন পেয়েছি।

রকেট ফায়ার হয়েছে। ম্যানুভারিং থ্রাস্টারগুলো অর্বিট পরিবর্তন করছে। ওটার কম্পিউটারকে তথ্য দিয়েছি। ফায়ার করবার আগে তালিকা চেক করছে। হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে!'

মনের ভিতর কেমন যেন অনুভূতি, সিরাজ শুধু মনে মনে ভাবলেন, আমার কাজ শেষ করেছি। এই পরিকল্পনা কাজে লেগেছে। এবং সেজন্য ইজরায়েলি বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করতে হ । তারা জানত কী করতে হবে।

'তা হলে কাজ শেষ, ওভার অ্যাণ্ড আউট,' জানিয়ে দিল আতাসি।

'কী মনে হয়?' জানতে চাইলেন মার্টিন।

'কাজ হয়েছে। আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে স্যাটালাইট।'

'আমি তার কথা বলছি না। আমি জানতে চাইছি এই ফ্লাইটে কী বুঝলেন।'

'কর্নেল, আমার জীবনে আগে কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়নি,' বললেন সিরাজ। টের পেলেন ফিরছে মাধ্যাকর্ষণ। স্বাভাবিক হয়ে আসছে পেটের পেশি।

'এই অভিযাত্রার কোনও রেকর্ড থাকবে না, তবে আপনার জানার জন্য, আমরা ভেঙে দিয়েছি অল্টিচ্যুডের রেকর্ড।'

হাসতে পারলেন না সিরাজ, চুপ করে রইলেন। চট্ করে মনে পড়ল, ইয়োস দ্বীপে আটকা পড়েছে উর্বশী দাশা। মরতে চলেছে মেয়েটি।

ষোলো

মাথা খাটিয়ে চলেছে উর্বশী, কিন্তু মাটির নীচে তৈরি করা এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও বুদ্ধি পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে মাত্র একটাই পথ রয়েছে। গতকাল রাতে আবার বেরিয়েছিল, তখন দেখেছে গ্যারাজে উঠবার সিঁড়ির সামনেটা পাহারা দিচ্ছে তিনজন গার্ড। তাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। চড়-ঘুসি দিয়ে ওর মুখ ফুলিয়ে দিয়েছে ব্রাঙ্কো। এই চেহারা নিয়ে গার্ডদের সামনে গেলে সন্দেহ করে বসবে। ওদের হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

ওই সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। গোপনে বেরিয়ে যেতে হবে পিছনের কোনও দরজা দিয়ে।

এগযিকিউটিভ উইঙের ক্লজিট ছেড়ে আবার রওনা হয়েছে উর্বশী জেনারেটর রুমের দিকে। করিডোরে দু'চারজন পাশ কাটাল ওকে। প্রতিবার মুখ ঢেকে রাখল উর্বশী। যে রুমে জেট ইঞ্জিন ঘুরিয়ে চলেছে টারবাইনগুলোকে, সেই ঘরের কাছে পৌঁছে গেল। ওখান থেকে সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় এই ফ্যাসিলিটিতে। গতবার ওদিকে কাউকে দেখেনি উর্বশী, কিন্তু এবার করিডোরের কোনা ঘুরতে গিয়ে চমকে গেল। ওখানে পাহারা দিচ্ছে ব্রাঙ্কোর গার্ড। মাপা পা ফেলে পায়চারি করছে। তরুণের বয়স হবে বড়জোর বিশ। পরনে পুলিশের নীল

ইউনিফর্মের মত পোশাক। বেল্টে ঝুলছে মোটা ডাণ্ডা। উর্বশীকে এগুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

দশ ফুট থাকতে খুশি-খুশি স্বরে বলল উর্বশী। 'কী করো? কী, মুখ দেখে চমকে গেলে? ওরা হ্যামবার্গার বানিয়ে দিয়েছে মুখটা।'

'কারা?'

'সিয়েটলে, অ্যাণ্টিঅ্যাবর্শন র‍্যালির ভিতর কয়েকটা গোঁড়া ক্যাথোলিক মেয়ে ছিল। ওদের হাত থেকে বেঁচে যে ফিরেছি, সে-ই বেশি। আজই এখানে এলাম। দারুণ জায়গা, তাই না?'

'ক্লিয়ারেন্স ব্যাজ ছাড়া এখানে ঢোকা নিষেধ,' গম্ভীর হয়ে বলতে চাইল তরুণ। তবে কণ্ঠে তেমন কর্তৃত্ব ফুটল না।

'তাই? এখন পর্যন্ত ইশ্যু করা হয়েছে শুধু এ-দুটো,' ওভারঅলের গভীর পকেট থেকে পানির বোতল বের করল উর্বশী। 'লাগবে একটা?'

ছোকরাকে সুযোগ দিল না উর্বশী, সে মানা করবার আগেই একটা বোতল ভাসিয়ে দিল তার উদ্দেশে। বেকায়দা ভাবে বোতলটা ধরল গার্ড। কড়া চোখে চাইল উর্বশীর দিকে। বোকার মত হেসে ফেলল ইন্দোনেশিয়ান নেভি কমাণ্ডার। মোচড় দিয়ে খুলছে নিজের বোতলের ক্যাপ। কাজটা শেষ করে বামহাতে স্যালিউট দিল।

সিকিউরিটি ট্রেইনিঙের অভাব তরুণের, তা ছাড়া গলাও শুকিয়ে এসেছে পানির অভাবে। নিজের বোতলের ক্যাপ খুলে ফেলল সে, ডানহাতে পাল্টা স্যালিউট দিল উর্বশীকে। মাথা হেলিয়ে ঠোঁটে তুলল বোতল। আর ঠিক তখনই অলিম্পিক ফেন্সারদের মত সামনে বাড়ল উর্বশী, তিন সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল

তরুণের সামনে—ডানহাতের আঙুলগুলো ভাঁজ করে আঘাত হানল ছেলেটার কণ্ঠার উপর।

মুখ দিয়ে বলকে বেরুল পানি, বন্ধ হয়ে গেছে শ্বাস-নালী। কাশতে চাইল তরুণ, কিন্তু গলার ভিতর থেকে বেরুল শুধু গড়গড়ার মত আওয়াজ। চোখদুটো হয়ে উঠেছে পিং-পং বলের সমান। দু'হাতে ধরল গলা, যেন তাতেই মিলবে অক্সিজেন। বাম চোয়ালে পড়ল এবার প্রচণ্ড ঘুসি। মেঝের উপর ধড়াস্ করে পড়ল তরুণ। ঘাড়ের পাশে লাগল জোরালো লাথি। ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করল উর্বশী, ঠিক ভাবে চলছে শ্বাস। তবে কণ্ঠনালী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাকি জীবন ফিসফিস করে কথা বলতে হবে তাকে।

জেনারেটর রুমের দরজা খুলল উর্বশী। কেউ নেই কন্ট্রোল রুমে। ডিসপ্লে দেখে বোঝা গেল আপাতত একটা জেট ইঞ্জিন বিদ্যুৎ তৈরি করছে। তরুণ গার্ডকে ছেঁচড়ে ঘরের ভিতর নিয়ে এল উর্বশী, ঠুঁসে দিল একটা লোহার ডেস্কের নীচে। তারই ফ্লেক্সিকাফ দিয়ে আটকে দিল হাতদুটো। কষ্ট করে আর মুখ বাঁধল না। এ ছেলে দু'ঘণ্টার ভিতর জাগবে না।

ইঞ্জিনগুলো স্যাবোটাজ করবে কি না একবার ভেবেছে উর্বশী। পরে বাদ দিয়েছে ভাবনাটা। রেসপন্সিভিস্টরা ইএলএফ দিয়ে ট্র্যান্সমিট করতে পারবে না এমন নয়। এই ফ্যাসিলিটির ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও রয়েছে পুরো চার্জ করা ব্যাকআপ ব্যাটারি। ওগুলো যদি খুঁজে বের করা যেত, তো কিছুক্ষণের জন্য তাদের বাধা দিতে পারত। তার ফলে এক বা দুই দিন পিছিয়ে যেত ভাইরাসের আক্রমণ। তবে ব্রাঙ্কো জেনে যেত এই ফ্যাসিলিটির ভিতরই রয়েছে উর্বশী। এখন ওকে নিয়ে ভাবছে না রেসপন্সিভিস্টরা, ধরে নিয়েছে বাইরে গিয়ে মারা পড়েছে।

স্যাবোটাজ করতে গেলে সতর্ক হয়ে উঠবে সিকিউরিটি টিম, পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করবে আবার।

উর্বশী জানে, সেক্ষেত্রে ব্রাঙ্কোর হাতে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরতে হবে ওকে।

মন বলছে ওব বার্তা পেয়ে গেছে রানা। এবার নিশ্চয়ই কিছু করবে ও। যেমন করে হোক ধ্বংস করে দেবে ট্র্যান্সমিটার। কেসলারদের সিগনাল দিতে দেবে না। আর বলা যায় না, হয়তো নিজেই এসে হাজির হবে এখানে, ওকে উদ্ধার করবে এই বিপদ থেকে। এসব ভেবেই স্যাবোটাজের পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে উর্বশী। ঠিক করেছে, এখন ওর প্রথম কাজ হওয়া উচিত এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

চারটে ইঞ্জিন পাশাপাশি বসানো হয়েছে, সেগুলোর ভিতর ঢুকেছে মোটা ডাক্ট। ওগুলো বাতাস পৌঁছে দেয়ার। উল্টো দিক দিয়ে গ্যাস বের করে দেয়ার জন্য এগযস্ট পাইপ। এসব ডাক্টের চারটে পাইপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মিলেছে বিশাল এক ডাক্টে। সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস বের করে নেবে। পাইপগুলো একইসঙ্গে যুক্ত হওয়ার জায়গায় রয়েছে একটা হিট এক্সচেঞ্জার, ওটা তপ্ত গ্যাস ও ধোঁয়া ঠাণ্ডা করে, তারপর বের করে দেয় ফ্যাসিলিটি থেকে। ওটার উল্টো কাজ করে এয়ার ইনটেক, বিশাল এক কণ্ডুইট ঢুকেছে পাওয়ার প্লান্টে, ভাগ হয়ে চলে গেছে টারবাইনগুলোর ভিতর। ওদিক দিয়ে বেরুতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু ওই কণ্ডুইট গেছে মাথার দশ ফুট উপর দিয়ে। বড় মই না পেলে ওদিক দিয়ে বেরুনো অসম্ভব।

'রানা যদি জাহাজের চিমনি দিয়ে বেরুতে পারে, তো আমি কেন পারব না ডাক্ট দিয়ে?' মনে মনে বলল উর্বশী।

ওঅর্ক বেঞ্চের সামনে চলে গেল, খুঁজে নিল দরকারী টুলস ও এয়ার প্রোটেক্টর। ফিরে এল কন্ট্রোল রুমে, ঢুকে পড়ল পাওয়ার প্লান্টের মেইন ফ্লোরে। কান ঢেকে নিতেই অনেক কমল ইঞ্জিনের গর্জন। কাজ শুরু করবার আগে খুলল লাল কেবিনেট, ওটার ভিতর দরকারি জিনিস আছে কি না দেখে নিল। ওগুলো না থাকলে উত্তপ্ত এগযস্ট ডাক্টে ঢুকলে মরতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

ওই চারটে এগযস্ট পাইপের সঙ্গে একটা করে বিশাল পোর্ট, ওগুলো সরাতে হলে বল্টু খুলতে হবে। কাজে নেমে পড়ল উর্বশী, একটা পাইপের হ্যাচে লাগানো তিন ইঞ্চি দীর্ঘ বল্টুগুলো খুলতে লাগল একে একে। খেয়াল করছে বল্টু যেন না হারায়। ওর মনে পড়ল বারো বছর বয়সে প্রথমবার একা গাড়ির ইঞ্জিন খুলেছিল। তখনই বুঝতে পারে ওর উচিত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। দ্রুত হাতে কাজ করে চলেছে উর্বশী। প্রায় সব খোলার পর একটা বল্টু ঠিক জায়গায় রেখে দিল। তবে ঢিলা করে নিয়েছে। অনায়াসে এবার উপরে ঘুরিয়ে খুলতে পারবে ঢাকনি। যে এগযস্ট ডাক্টের হ্যাচ খুলেছে, সেটার ইঞ্জিন এখন নীরব। তার পরও অন্য পাইপ থেকে আসছে ধোঁয়া ও গ্যাস। চোখ থেকে দরদর করে পানি পড়তে লাগল।

কন্ট্রোল রুমের ড্রয়ারগুলো হাতড়ে দেখল, বেঁটে কিছু বল্টু পেয়ে নিয়ে এল। হ্যাচের বোল্টের ফুটোর চেয়ে একটু চিকন ওগুলো। তবে গুঁজে রাখলে চট্ করে কেউ বুঝবে না হ্যাচ খোলা হয়েছে। অবশ্য এই টারবাইন যখন চালু হবে, ওটার প্রচণ্ড চাপে বল্টুগুলো হ্যাচ থেকে বুলেটের মত ছিটকে বেরুবে। সেটা উর্বশীর সমস্যা নয়। টুলগুলো আবার গিয়ে কন্ট্রোল রুমে রাখল উর্বশী, একবার পরীক্ষা করে দেখল গার্ড এখনও অচেতন কি না।

লাল কেবিনেটে রয়েছে ফায়ারফাইটিং গিয়ার—কুঠার, হিট ডিটেক্টর, এবং তার চেয়েও জরুরি এয়ার ট্যাঙ্ক ও মুখোশ। জেনারেটর রুমে কোনও ভাবে আগুন ধরলে দপ করে জ্বলে উঠবে জেটের কেরোসিন, ফলাফল ভয়াবহ আগুন ও বিস্ফোরণ। কেবিনেটের ভিতর রয়েছে রুপালি রঙা এক পিসের ধাতব সুট। সঙ্গে হুড, ওটা প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করবে গলা মুখ ও মাথা।

জেনারেটিং রুমে ঢুকেই এগুলো দেখে নিয়েছে উর্বশী, তখনই ঠিক করেছে কীভাবে বেরুবে এই ফ্যাসিলিটি থেকে। একটা সুটের হুড কেটে মাথায় পরে নিল। এবার পরল দ্বিতীয় সুট। দুটোর কারণে দ্বিগুণ ইনসুলেশন থাকবে। বুটজোড়া ঢিলা হলো, তবে চলে। মাথায় পরে নিল হেলমেট। খোলা পোর্টের কাছে নিয়ে এল দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার। সুটের ফলে রোবটের মত নড়ছে ও। সুটের হোসের সঙ্গে আটকে নিল ট্যাঙ্কগুলো। ওর উরুর কাছে ঝুলতে লাগল ভালভগুলো। সঙ্গে আরও অক্সিজেন নিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় আর বাড়তি ওজন চাপানো সম্ভব নয়।

ট্যাঙ্কগুলো ডাক্টের ভিতর রাখল উর্বশী, ওগুলোর পর উঠে পড়ল নিজেও। বলতে গেলে নড়াচড়ার জায়গা রইল না। তবে একবার প্রধান ডাক্টে পৌঁছুতে পারলে বাড়তি জায়গা পাবে। চিত হয়ে শুয়েছে উর্বশী, আগেই দুই হাতে পোর্টের ঢাকনি নামিয়ে দিয়েছে। শুধু মাত্র একটা বল্টু আটকে রেখেছে হ্যাচকে।

উপরের সুটের হুড আটকে নিল উর্বশী, একটু খুলে দিল এয়ার ট্যাঙ্ক। শ্বাস নিয়ে দেখল, গন্ধটা বিশ্রী ও ধাতব। উপায় নেই, এই বাতাসেই শ্বাস নিতে হবে। কে জানে কতদূর যাওয়ার পর মাটির উপর উঠেছে ডাক্ট। শেষ মাথায় যাওয়ার পর কী ঘটবে তাই বা কে জানে! তবে আপাতত ছেঁচড়ে উপরের দিকে

যেতে হবে ওকে।

ট্যাঙ্কদুটো গড়িয়ে সামনের দিকে নিতে শুরু করল উর্বশী, প্রতিবারে তিন-চার ইঞ্চি করে এগুতে পারছে। পাইপের ভিতর ঘন আঁধার, মাথা ধরিয়ে দিল চালু টারবাইনের প্রতিধ্বনি।

মুখ-বুক-পেটের ব্যথা খুব বেশি কষ্ট দিচ্ছে না। তবে ভোঁতা ব্যথা শরীরে। তা না হয় সময়ে চলে যাবে, কিন্তু সামনে বিপদে পড়তে চলেছে। প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে হবে বোধহয়। ব্যথা সবসময় মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়, নিজেকে বলল উর্বশী। কিন্তু আমার নিজের কাজে পুরো মনোযোগ দিতে হবে।

হিট এক্সচেঞ্জারের মেঝের উপর দিয়ে এগুতে শুরু করল উর্বশী, কিছুক্ষণ পর সামনে চলে এল বিশাল ডাক্ট। ওখানে এসে মিশেছে চার এগযস্ট। প্রটেক্টিভ সুট থাকবার পরও চমকে গেল উর্বশী। প্রচণ্ড তাপ জোর একটা ঝাঁকি দিল ওকে। যেন দাঁড়িয়েছে হাপরের মুখে। বুঝতে পারছে মেইন ডাক্টে ঢুকলে আরও অনেক বেশি তাপ-গ্যাস ও ধোঁয়া সইতে হবে। এগযস্ট গ্যাস তৈরি হচ্ছে কমপক্ষে তিরিশ ফুট দূরে, আসছে কুলিং ডিভাইসের ভিতর দিয়ে, কিন্তু ওর মনে হলো শুয়ে আছে ট্রাকের উত্তপ্ত ইঞ্জিনের নীচে।

এগযস্ট যেন ধেয়ে আসা কোনও সাইক্লোন। সুট ও অক্সিজেন না থাকলে দু'মিনিটের ভিতর ওকে মেরে ফেলত কার্বন মোনোঅক্সাইড। হয়তো ততক্ষণ লাগত না, প্রচণ্ড তাপে ভাজা হয়ে যেত শরীর। ডাবল থার্মাল প্রোটেকশন রয়েছে, তারপরও দরদর করে ঘামতে শুরু করল উর্বশী। যেন গরম ইস্ত্রি দিয়ে শরীরটা পুড়িয়ে দিচ্ছে কেউ।

প্রধান ডাক্ট ব্যাসে ছয় ফুট, একটু একটু করে উপরের দিকে গেছে। এবার বোধহয় হেঁটে এগুতে পারবে। একটা ট্যাঙ্কের

ফ্লেম রিটারডেন্ট হার্নেস কাঁধে আটকে নিল উর্বশী, অন্য ট্যাঙ্ক পায়ে ঠেলে এগুতে শুরু করে ভয় পেয়ে গেল। টারবাইনের তপ্ত হাওয়া না উড়িয়ে নিয়ে যায় ওকে। পায়ের তলা থেকে ছিটকে বেরুল ট্যাঙ্ক, বুলেটের মত উড়ে গেল পাইপের ভিতর দিয়ে। জেট ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে এল জোরাল ঠং-ঠনাৎ আওয়াজ।

হাঁটতে চাইল উর্বশী, কিন্তু পিঠে ঝুলন্ত ট্যাঙ্কের ওজন অতিরিক্ত। প্রতি পা ফেলতে গিয়ে টলমল করতে হচ্ছে। তার উপর তীব্র তপ্ত হাওয়া ট্যাঙ্কের মত উড়িয়ে নিতে চাইছে ওকেও। বসে পড়ল উর্বশী, হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে শুরু করল। বেরিয়ে যেতে চাইছে এই আঁধার বাঙ্কার থেকে। হাই-টেক সুট ও গ্লাভস রয়েছে, কিন্তু প্রচণ্ড তাপ পোড়াতে শুরু করেছে হাঁটু ও হাত। তার উপর ভারী ট্যাঙ্ক যেন গুঁড়িয়ে দেবে পিঠ ও পাঁজর। বিশেষ করে পাঁজর, ওগুলো যেন ঠুনকো কাঁচের তৈরি।

ডাক্ট ধরে কিছু দূর যাওয়ার পর কমে এল তাপ। তবে গরম হাওয়া এসে ঝাপটা দিতে লাগল পিঠে ও পায়ে। সুটের ভিতর জ্বলছে ত্বক। তবে নতুন করে আর ফোস্কা পড়ছে না।

'ব্যথাকে পাত্তা দেব না, অন্য দিকে মন দেব,' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। স্লথ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ইয়োস দ্বীপ রেঞ্জে আসতে এয়ারিয়াল ড্রোন আকাশে তুলতে বলল রানা। ক্যাপ্টেন সিরাজের কন্সোলের সামনে বসল অনিল, পাঁচ মিনিট পর ভেসে উঠল ইউএভি। ফু-চুং চলে গেল বোট গ্যারাজে। তৈরি রাখবে রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট। ওর নির্দেশে রওনা হবে পাঁচজন কমাণ্ডো।

ইয়োস দ্বীপে মাত্র একটা ডক। ওরা ধারণা করছে ওটা কড়া

পাহারা দেয়া হয়। হয়তো ওই ডক দিয়েই উঠতে হবে দ্বীপে। উড়ন্ত ইউএভির ভিডিও ফিড এলে ওরা আগেই বুঝবে কী ধরনের বাধার মুখে পড়বে। যদি প্রয়োজন পড়ে, তাই ডাইভ টিম প্রস্তুত রাখছে ডিসকভারি-১০০০-কে। তৈরি রাখা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ও ইকুইপমেন্ট। প্রয়োজনে পানির নীচ দিয়ে গিয়ে হামলা করবে দশজন ডাইভার। মার্ভেলের বেশির ভাগ ক্রু এখন সশস্ত্র। জাহাজের প্রতিটি অস্ত্র পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রতিটির ভিতর পুরো লোডেড অ্যামিউনিশন। একটু আগে ড্যামেজ কন্ট্রোল থেকে রিপোর্ট এসেছে, তারাও তৈরি। মেডিকেলে অপেক্ষা করছে ফারা, কোনও জরুরি প্রয়োজন পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাওয়া যাবে।

ক্যাপ্টেন সিরাজ নেই, কপ্টারের উপর কাজ করে চলেছেন বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের এক অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আশা করছেন কিছুক্ষণের ভিতর ঠিক হবে রবিনসন-৪৪। ওটার প্রতিটি মেকানিকাল সিস্টেম আলাদা ভাবে কাজ করছে, তবে জানিয়ে দিয়েছেন, সঠিক টেস্ট ছাড়া কিছুই বলা যায় না। হয়তো মাঝ আকাশ থেকে খসে পড়বে কপ্টার। ওটাকে এলিভেটরে তুলে ডেকের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন ইঞ্জিন চালু করে গরম করা হচ্ছে। রানা জানিয়েছে, পাঁচ মিনিটের নোটিসে আকাশে উঠতে হতে পারে। সে-সময়ে ওটা চালাবে ফু-চুং।

প্রধান ভিউ স্ক্রিনে ডিজিটাল কাউন্টডাউনের দিকে চাইল রানা। আর মাত্র এক ঘণ্টা ছয় মিনিট, এর ভিতরে খুঁজে বের করতে হবে উর্বশীকে। নইলে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হবে দ্বীপ থেকে। বোধহয় ওই পরিমাণ সময়ও নেই। অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল যখন আঘাত হানবে, সাগরে তৈরি হবে বিশাল ঢেউ।

হিসাব কষে অনিল জানিয়েছে ওই ঢেউ আঘাত হানবে আশপাশের সবগুলো দ্বীপে। গালফ অভ ম্যাণ্ডালায় লোকবসতি নেই বললেই চলে, কাজেই প্রাণহানির সম্ভবনা খুব কম। তবে ইয়োস দ্বীপের বিশ মাইলের ভিতর প্রবল ঢেউয়ের মুখে পড়বে প্রতিটি জাহাজ।

ইয়োস দ্বীপ থেকে পনেরো মাইল দূরে থাকতে মেইন মনিটরে ফিড এল। চারপাশে সুনীল সাগর, তার ভিতর ভেসে উঠল ধূসর দ্বীপ। তিন হাজার ফুট উপরে ভাসছে ড্রোন। নীচ থেকে ইঞ্জিনের আওয়াজ পাবে না কেউ। আকাশে চোখ তুললেও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। পুরো আট মাইল দৈর্ঘ্য পেরিয়ে গেল খুদে বিমান। পাথুরে টিলা ও প্রান্তর ছাড়া কিছুই নেই দ্বীপে। এখানে-ওখানে দুয়েকটা দুর্বল পাইন গাছ। ড্রোন ঘুরিয়ে নিল অনিল, আবার ফিরে এল রেসপন্সিভিস্টদের বাঙ্কারের উপর। ওখানে দেখবার মত কিছু নেই। যদি কোনও প্রবেশদ্বার থেকে থাকেও, তা ভাল ভাবে ক্যামোফ্লেজ করা। এত উপর থেকে সেসব দেখা গেল না। বাঙ্কার যে আছে সেটার প্রমাণ বলতে শুধু পেভ করা রাস্তা। ওটা গিয়ে মিশেছে নিচু এক টিলার সঙ্গে।

'অনিল, কয়েকটা স্টিল ফটো তোল্, ওগুলো বড় করে দেখা,' বলল রানা। 'দেখি রাস্তার মুখে কোনও দরজা বা গেট আছে কি না।'

'তুলছি। আরেকবার ঘুরে আসছি।'

'আমি ওই সৈকত আর ডক দেখতে চাই।'

জয়স্টিক নেড়ে সাগরের উপর খুদে বিমান নিয়ে গেল অনিল, ডকের একমাথা থেকে অন্য মাথায় যাবে। পিছনে সূর্য, কাজেই সহজে বিমানটাকে দেখবে না কেউ। লম্বায় সৈকত তিন

শ' ফুটের মত। নরম সাদা বালির বদলে পাথরের নুড়ি। সৈকতটাকে দু'পাশ দিয়ে ঘিরেছে এক শ' ফুট উঁচু টিলা। মনে হলো না ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া ওঠা যাবে। তাতেও লাগবে অন্তত এক ঘণ্টা।

সৈকতের ঠিক মাঝখানে ডক। সেখানে এল্ শেপের জেটি বেরিয়ে গেছে সাগরের বুকে। আশি ফুট যাওয়ার পর থেমে গেছে। ওখানে ছোট ফ্রেইটার ভিড়তে পারে। ফ্যাসিলিটি বানানোর সময় ওভাবেই মালামাল আনা হয়েছে। মনে হলো খুব মজবুত করে তৈরি। ওদিক দিয়ে নেয়া হয়েছে এক্সকেভেটর ও সিমেন্ট মিক্সারগুলো। জেটির মুখে সড়কের পাশে করগেটেড ধাতব বাড়ি। ছাত ঘিরে রেখেছে প্যারাপেট। কেউ ইচ্ছে করলে চারপাশে নজর রাখতে পারবে। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে ঠেকিয়ে দিতে পারবে এক দল সৈনিককে। সাগর-পথে গোপনে আসতে পারবে না কেউ। এই গার্ডহাউসের পাশে পার্ক করা আছে একটা পিকআপ ট্রাক।

ছাতের উপর হাই পাওয়ার্ড বিনকিউলার হাতে দুই গার্ড। পাশে ঠেস দিয়ে রেখেছে অটোমেটিক রাইফেল। একজোড়া গার্ড পাহারা দিচ্ছে জেটি। আরও দু'জন রয়েছে সৈকতের পাহারায়।

ফ্যাসিলিটির সঙ্গে এদের যোগাযোগ করবার জন্য যে তার থাকবার কথা, সেগুলো রয়েছে পাথরের নীচে। আচমকা গিয়ে এদের ঘায়েল করা কঠিন। ব্রাঙ্কো নিজে এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা নিয়েছে। নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়েছে, কিছু সন্দেহজনক মনে হলে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে বাঙ্কারে। সেক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাবে প্রবেশদ্বার।

'থার্মাল ইমেজিং দেখা।'

মনিটরের দৃশ্য পাল্টে গেল, শুধু রইল গার্ডদের দেহের তাপ। দু'পাশের টিলার উপর আরও চারজন গার্ড, আগে খেয়াল করা যায়নি।

'টিলার উপরের ওই দু'জনের পাশের ট্রেস সিগনালগুলো কীসের?' আনমনে বলল অনিল।

'কোনও ছোট ইঞ্জিন, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে,' বলল রানা। 'বোধহয় এটিভি বা ওই ধরনের কিছু। চালাতে মজা, যদি কেউ গুলি শুরু না করে।' গার্ডদের দেহের তাপ নয়, অন্য ব্যাপারে নজর ফেলল রানা। রাস্তার উপর থেকে সিগনাল মিলছে। সড়কের নীচ দিয়ে গেছে ফ্যাসিলিটির পাওয়ার প্লান্টের উত্তাপ। লোকগুলো চমৎকার ভাবে লুকিয়ে ফেলেছে সেটা। প্রশিক্ষিত কমাণ্ডোর চোখেও কিছু পড়বে না। মনে হবে সাধারণ রাস্তা। রোদ পড়েছে, কাজেই তপ্ত হয়েছে। তবে থার্মাল স্ক্যানে দেখা গেল সড়ক পেরিয়ে জেটির নীচ দিয়ে গেছে তাপদাহ, চলে গেছে সেই ডকে।

ওই উত্তাপ সামনে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে, ভাবল রানা। নইলে থার্মাল ইমেজিঙে ধরা পড়ে যাবে বাড়তি তাপ।

কোথাও কোনও এয়ার-ইনটেক চোখে পড়ল না।

ফু-চুং আছে এখন বোট গ্যারাজে, মনিটরে দেখছে এরিয়াল রেকনিস্যান্স। ইণ্টারকমের বাটন টিপল রানা, 'তোর কী মনে হয়?'

চৈনিক গুপ্তচর কিছু বলবার আগেই বুঝতে পারছে রানা।

'সৈকতে নামতে চাইলে বিরাট ঝামেলা,' বলল ফু-চুং। 'তুই ওই রাস্তার দুই মাথার ছবি পেলি?'

'অনিল তুলছে।'

'ছবি স্ক্রিনে আসছে,' বলল অনিল।

মনিটর জুড়ে ভেসে উঠল স্থির ছবি। সবার চোখ খুঁজতে লাগল টিলার দুর্বলতা। রাস্তা হঠাৎ করে গিয়ে থেমে গেছে টিলার কোলে। ওখানে কোনও দরজা বা গেট থাকবার কথা। তবে নেই। থাকলে খুব ভাল ভাবে ক্যামোফ্লাজ করা।

'এরা কতটা সশস্ত্র তার উপর নির্ভর করছে আমরা ঢুকতে পারব কি না,' ফু-চুঙের কণ্ঠে যেন নিরাশা।

'জানা নেই কয়েক আউন্স সি-ফোর চাই, না ক্রুজ মিসাইল,' বলল অনিল।

'আমরা ডিসকভারিতে উঠে কাছে চলে যেতে পারি,' বলল ফু-চুং। 'তারপর খুঁজে নেয়া যায় এয়ার ইনটেক ডাক্ট। পাইপের অন্য মাথা দিয়ে ফ্যাসিলিটির ভিতর ঢুকতে হবে। সঙ্গে টর্চ লাগবে। হাতে সময় থাকলে ভাল হতো। সূর্য ডুববার পর রওনা হতে পারতাম।'

ইজরায়েলি স্যাটালাইটের অর্বিটাল ট্র্যাকের কারণে সময় হয়ে গেছে সীমিত। আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা। আর বাকি মাত্র ষাট মিনিট! এরই মধ্যে আক্রমণ করে উদ্ধার করতে হবে উর্বশীকে।

'ডকের উপর দুই গার্ড কী করছে?' বলে উঠল অনিল। ড্রোনের ক্যামেরা আবার ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

'কাজে ফাঁকি দেবে বোধহয়,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল রানা।

'মনে হয় না, পানির কাছে অন্য কিছু। ইউএভি আবারও ঘুরিয়ে ভাল ভাবে দেখতে হবে।'

চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। একটা যদি টর্চ থাকত, ভাবল উর্বশী। ট্যাঙ্কে কতটুকু বাতাস রইল জানা দরকার। আন্দাজ বিশ মিনিট ধরে ক্রল করেছে। ধীরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করেছে। জানে,

অক্সিজেন ফুরালে মরতে হবে। শেষ যেন নেই এই পাইপের। সুড়ঙ্গের মত, একটু আলো নেই কোথাও।

আরও দশ মিনিট এগুনোর পর বুঝল, কঠিন হয়ে উঠছে শ্বাস নেয়া। বোধহয় খালি হয়ে এল ট্যাঙ্ক। একটু পর সুটে আটকে থাকা বাতাসটুকু টেনে নিতে হবে। তারপর তা-ও থাকবে না, শুরু হবে বুকের ভিতর প্রচণ্ড কষ্ট। আগেও মনে হয়েছে, ও মরবে পানির ভিতর শ্বাস আটকে। তবে এখন টের পেল পানিতে নয়, ডাঙাতেই দম আটকে মরবে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে।

অলস ভঙ্গিতে ক্রল করে চলেছে উর্বশী। চারবার হাত ফেললে এক ফুট পেরুতে পারছে। ওর বাইরের সুট প্রায় পুড়ে গেছে। ছোট টুকরোগুলো একটু একটু করে খসে পড়ছে এখন। বিশেষ করে হাঁটু থেকে। কপাল ভাল, ভিতরের সুট নষ্ট হয়নি। ওটা ওকে রক্ষা করতে যথেষ্ট।

অমল ভাল আছে এবং থাকবে, ভাবল উর্বশী। কোনও সন্দেহ নেই, আবারও ওকে উদ্ধার করবে রানা। এরপর অন্য কোনও ডিপ্রোগ্রামারের কাছে নেবে। কেন-কীভাবে-কী ঘটেছে তা জানে না রানা, তবে একই ভুল কখনও দ্বিতীয়বার করে না। ও হয়তো ধারণা করে নিয়েছে বিশ্বাসঘাতক ছিল ডক্টর লিয়োনার্দো চার্চ। রানার জানার কথা নয় ওই লোক আসলে কে। নিজের কানে শোনার পরও ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায়নি উর্বশীর।

ছোট ভাইটাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরতে চলেছি, মনে মনে বলল উর্বশী। কমবয়সীদের রক্ষা করতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অমল কি জানতে পারবে, ওকে ভাল করার জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছে ওর বোন?

'ব্যথাকে পাত্তা দেব না, অন্য দিকে মন দেব,' মনে মনে বলল উর্বশী। ধীর গতিতে ক্রল করে চলেছে।

মন বলছে এভারেস্ট জয় করবার জন্য পাহাড় বেয়ে উঠছে। প্রতিবার শ্বাস নিতে গিয়ে জোরে বাতাস টানতে হচ্ছে। খচ্ করে লাগছে পাঁজরে। যত জোরে শ্বাস নিতে চাইছে, বাড়ছে বুকের ব্যথা, কিন্তু ভরছে না ফুসফুস।

অন্ধকারে কী যেন হাতে বাধল। ওর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা হোঁচট খেল। এ ধরনের এগযস্ট শাফট সবসময় খোলা রাখা হয়। নইলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টারবাইনের দক্ষতা। সামনের জিনিসটা হাতড়ে দেখল উর্বশী, তারপর হেসে ফেলল। ওটা ওর সঙ্গে নিয়ে আসা সেই হারিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্ক। বাতাসের তোড়ে বুলেটের মত উড়ে গিয়েছিল পাইপ বরাবর। এখানে এসে থেমেছে।

দ্রুত হাতে নিজের ট্যাঙ্ক খুলে ফেলল উর্বশী, পিঠে আটকে নিল দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক। ভালভ খুলতে পাওয়া গেল সেই বিশ্রী ধাতব বাতাস। তা-ই এখন বুক ভরে টানতে পেরে খুশি হয়ে উঠল মন।

পনেরো মিনিট পর সুড়ঙ্গের শেষমাথায় আলো দেখল উর্বশী। ওই আলো যেন অনেক দূরে। সামনের ডাক্ট চওড়া ও চাপা হয়ে এসেছে। ডিফিউজারের কাজ করছে। গরম বাতাস শীতল করে থার্মাল ইমেজিং লুকাবে। একটু পর মিলিয়ে গেল তপ্ত হাওয়া, পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক খুলে ফেলল উর্বশী, উপুড় হয়ে ডিফিউজারের ভিতর দিয়ে শুরু করল ক্রল। শেষ মাথায় গিয়ে বাধা পেল। ডাক্টের মুখে সরু গ্রিল।

কয়েক ইঞ্চি দূরে মুক্তি। আট ফুট নীচে খলবল করছে সাগর। এখন বোধহয় জোয়ার চলছে। এত উপরে ওঠে না

পানি। নইলে ভেসে যেত ডাক্ট। ঝড়ের সময় নিশ্চয়ই এই ভেন্ট ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। ওই রডগুলোর ফাঁক দিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়। ডাক্টের ডানে-বামে কী থাকতে পারে জানা নেই। একবার বেরুতে পারলে কপালের উপর নির্ভর করে এগুতে হবে।

আবার ডিফিউজারে ঢুকে ট্যাঙ্ক নিয়ে এল উর্বশী। ওটা দিয়ে গুঁতো দেবে রডগুলোর উপর। কাত হয়ে পিঠে আটকে নিল ট্যাঙ্ক, জোরে গুঁতো দিল রডগুলোর উপর। যথেষ্ট জোর পাওয়া গেল না। একটু পিছিয়ে গেল উর্বশী, ট্যাঙ্ক সহ ধাক্কা দিল গ্রিলে। থরথর করে কাঁপছে গ্রিল। একের পর এক ধাক্কা দিয়ে চলেছে উর্বশী। লবণাক্ত হাওয়া ও বিষাক্ত এগযস্টে দুর্বল হয়ে এসেছে রডগুলো। পঞ্চম গুঁতোয় পট করে ভাঙল একটা রড। আরও চার মিনিট পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রড ভেঙে গেল।

যথেষ্ট জায়গা পাওয়া গেছে, রডগুলো একে একে বাঁকিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে দিল উর্বশী। এবার ডাক্ট থেকে মাথা বের করল। ডিফিউজারের নীচে সরু প্ল্যাটফর্ম, ওখান থেকে সোজা উঠে এসেছে লোহার মই। আরও উপরের দিকে গেছে ওটা। বামদিকে চোখ পড়ল উর্বশীর, আর ঠিক তখনই কে যেন খপ্ করে ধরল ওর কাঁধ। শাফট থেকে টেনেহেঁচড়ে বের করে নেয়া হলো ওকে। সব এত দ্রুত ঘটল যে নড়তে পারল না উর্বশী। ধুপ করে পড়ল ডকের উপর। ওর দু'পাশে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে দুই গার্ড। কাঁধ থেকে ঝুলছে সাব-মেশিনগান। উর্বশী জেনারেটর রুমের বাইরে যে ছোকরাকে অজ্ঞান করে এসেছে, তেমন নয়—চেহারাই বলে দিল এরা পেশাদার গুণ্ডা।

'বলো তো এখানে কী করছ, ডারলিং?' লোকটার উচ্চারণ

বলে দিল সে ইংরেজ।

এতক্ষণ ডাক্টের ভিতর হেলমেট পরে ছিল, প্রচণ্ড আওয়াজে এখনও ঝাঁ-ঝাঁ করেছে কান। শুধু ঠোঁট নড়া দেখল উর্বশী, কিছুই শুনতে পেল না কানে। দু'হাতে হেলমেট খুলতে চাইল। খেয়াল করল ট্রিগারের উপর চেপে বসেছে দুই গার্ডের তর্জনী। একজন সঙ্গীকে কাভার দিতে পিছিয়ে গেল। প্রথম লোকটা একটানে উর্বশীর হেলমেট খুলে নিল। কড়া সুরে বলল, 'এখানে কী তোমার?'

'হ্যালো, বয়েজ,' মিষ্টি করে বলল উর্বশী। 'আমি এসেছি ওল্ড চিমনি'জ কোম্পানি থেকে। আমাদের কাজ পাইপ পরিষ্কার করা।'

সতেরো

'ওই যে উর্বশী ম্যাডাম!' বলে উঠল আতাসি। এইমাত্র রুপালি সুট পরা মানুষটির পাশে দাঁড়িয়েছে দুই গার্ড।

ঝট্ করে ইন্টারকম তুলল রানা। 'ফু-চুং, তৈরি হ'। রওনা হতে হবে!'

কন্সোলে একটা সুইচ টিপল অনিল। এখন পাঁচ মাইল ব্যাস নিয়ে দ্বীপের উপর ঘুরতে থাকবে ড্রোন। কেউ নিয়ন্ত্রণ না নিলে ফিউল শেষ না হওয়া পর্যন্ত উড়বে। নিজের ওয়েপন্স কন্সোলে ফিরল অনিল।

ক্যামেরাগুলো দিয়ে ডক দেখিয়ে চলেছে আতাসি।

ছুটতে শুরু করে অপারেশন্স সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা, চলেছে মেইন ডেক লক্ষ করে। থমথম করছে মুখ। ওর পরনে কালো ফেটিগ, এটা ব্যবহার করেছিল গ্রিসে। কব্জির সঙ্গে সেলাই করা ফ্লেক্স-স্ক্রিন প্যানেল। ওর সঙ্গে এফএন ও ফাইভ সেভেনএন পিস্তল, কোমরের হোলস্টারে ওয়ালথার। কপ্টার ঠিক ভাবে না-ও উড়তে পারে, কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না, কাজেই সঙ্গে বাড়তি অস্ত্র নিয়েছে রানা। হিপ পকেটে হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি মেশিন পিস্তলের ছয়টি ম্যাগাজিন। অস্ত্রটা আগেই তুলে দেয়া হয়েছে রবিনসনে।

'কী করতে চলেছে ও?' পিছন থেকে আনমনে বলল অনিল। 'আর উর্বশীই বা কীভাবে বেরিয়ে এল?'

ডেকে উঠে ছুটতে লাগল রানা, কমব্যাট রেডিওতে বলল, 'কমিউনিকেশন চেক। কথা শোনা যায়?'

'জী,' বলল আতাসি।

'হেলমস্, ওয়েপন্স, কপি।'

অনিল ও তার অ্যাসিস্টেন্ট সাড়া দিল। এরপর গগল।

'অনিল নিজের কন্সোল থেকে ড্রোন হাতে নে,' বলল রানা। 'চালু কর্ লেজার ডেযিগনেটর। ওটার ক্যামেরা ব্যবহার করব আমি, তোদের জানিয়ে দেব টার্গেট কোথায়। ফায়ার করবি ওয়ান টোয়েন্টি দিয়ে।'

ইজিস নেভি ক্রুজারের ব্যাটল স্পেস কম্পিউটারের কাছাকাছি সফিস্টিকেটেড মার্ভেলের ফায়ার কন্ট্রোল। ড্রোনের নাকের কাছে রয়েছে খুদে লেজার, ওটা উজ্জ্বল করে তুলবে টার্গেটকে। কম্পিউটার অটোমেটিকালি জিপিএস কোঅর্ডিনেট ক্যালকুলেট করবে, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের এক শ' বিশ এমএম

কামান উপরে উঠবে বা নীচে নামবে, গোলা ছুঁড়বে।

'গগল হেলমস-এ তুমি, দ্বীপের আরও কাছে নিয়ে যাও,' বলল রানা। অ্যাকটিভেট করল ফ্লেক্স-স্ক্রিন প্যানেল। ওটাতে দেখা গেল ডকের উপর পড়ে আছে উর্বশী। হাতে সময় নেই, ওকে টেনে তুলে পিকআপে ওঠাবে গার্ডরা, নিয়ে যাবে বাঙ্কারে।

এদিকে তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে মার্ভেল। জাহাজের ডেকের উপর যেন বইছে হারিকেন। ছুটতে ছুটতে রবিনসনের পাশে পৌঁছে গেল রানা। একই সময়ে পৌঁছুল ফু-চুংও। ওর জন্য দরজা খুলে দিল দু'জন ক্রু। রানার দরজা আগেই খুলে নেয়া হয়েছে। ফোকর দিয়ে উঠে পড়ল ও। একটু আগে পরীক্ষা শেষ করে কপ্টারের ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়েছে। কাজেই ফু-চুং সুইচ টিপতেই গর্জে উঠল ওটা। ট্র্যান্সমিশন এনগেজ করে স্টার্ট দিতেই ঘুরতে শুরু করল রোটর। ততক্ষণে হেডসেট পরে নিয়েছে ফু-চুং, বেঁধে নিয়েছে সিট বেল্ট।

'গগল, ফু-চুং বলছি। উড়াল দিতে তৈরি। গতি কমান।'

মার্ভেলের পাম্প জেট বিরতি নিল, পরক্ষণে উল্টো ঘুরতে লাগল। জাহাজের সবার মনে হলো এইমাত্র একটা টর্পেডো ঢুকেছে বোর ভিতর। মার্ভেলের ড্রাইভ টিউবগুলোর সামনে বিস্ফোরিত হলো পানির দেয়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল জাহাজ। এই আকৃতির জাহাজ থামাতে হলে অন্তত এক মাইল পেরুতে হয়, কিন্তু মার্ভেলের রেভোলিউশনারি প্রপালশন সিস্টেম প্রায় স্পোর্টস কারের মত থামিয়ে দিল জাহাজকে।

এলিভেটর প্ল্যাটফর্মের এক কোনায় রাখা হয়েছে ইলেকট্রনিক অ্যানিমোমিটার, ওটা জানিয়ে দিল বাতাসের বেগ নেমে এসেছে ঘণ্টায় বিশ মাইলে। এবার কপ্টারের ইঞ্জিনকে

শক্তি যোগান দিল ফু-চুং। সঙ্গে সঙ্গে ডেক ছেড়ে আকাশে উঠতে লাগল রবিনসন।

'আমরা উঠে গেছি,' স্কিডগুলো স্টার্ন রেলিং পেরুতেই বলল ফু-চুং।

সঙ্গে সঙ্গে প্রপালশন রিভার্স করল গগল, গতি তুলতে শুরু করল মার্ভেল। পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই তীব্র গতি পেল অতবড় জাহাজটা।

'ওয়েল ডান, গগল,' বলল রানা। ওর জানা আছে, গগলের বদলে কেউ এই ম্যানিউভার এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না।

'প্র্যাকটিস,' আর কিছুই বলল না গগল।

'রানা, ওয়েপন্স থেকে অনিল। কম্পিউটার বলছে আট সেকেণ্ড পর ওয়ান টোয়েন্টি রেঞ্জে আসবে।'

'তিনটা ফ্লেয়ার ফায়ার কর,' বলল রানা। 'উর্বশী বুঝুক ক্যাভালরি পৌঁছে গেছে।' ফু-চুঙের দিকে চাইল রানা। 'ইটিএ কখন?'

'আমি তো আর ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করিনি, ঠিক জানি না, তবে ধরে নে পাঁচ মিনিট।'

অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল যখন আঘাত হানবে, সেই সময়ের সঙ্গে নিজের ডিজিটাল ব্যাটল ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছে রানা। আর মাত্র পঞ্চান্ন মিনিট বাকি, তারই ভিতর উর্বশীকে উদ্ধার করে মার্ভেল নিয়ে সরে যেতে হবে।

'উঠে দাঁড়াও,' ধমকে উঠল ইংরেজ গার্ড। উঠতে গিয়ে দেরি করছে উর্বশী। ওর কোমরে কষে একটা লাথি লাগাল লোকটা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল উর্বশী, দু'পাশে ঝুলছে দু'হাত। নিচু স্বরে বলল, 'হাত উপরে তুলব? পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক নামাতে

চাই।'

ভাল ভাবে কাজ করছে না উর্বশীর মাথা। যদি কাজ করত, একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ত সাগরে। ওর সুট পুরোপুরি এয়ারটাইট। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের কারণে পাথরের মত টুপ করে ডুবত। দূরে গিয়ে সৈকতে উঠতে পারত। সাগরের দিকে চোখ পড়তেই কী যেন দেখল। ডুবন্ত সূর্যের পাশে ওটা কী? বলের মত! তার নীচে আরও কিছু বিস্ফোরিত হলো! তারপর তৃতীয়বার!

আন্তর্জাতিক প্রচলিত নিয়ম, কোনও শিকারী জঙ্গলে হারিয়ে গেলে তিনবার গুলি ছুঁড়ে সার্চ পার্টির কাছে সাহায্য চাইবে। ওই ফ্লেয়ারগুলো কোনও জাহাজের ডিসট্রেস কল নয়, ওগুলো দিয়ে রানা উর্বশীকে জানাতে চেয়েছে, ওকে উদ্ধার করতে পৌঁছে গেছে মার্ভেল।

উর্বশী কখনও হতাশ হয়নি, কাজেই খুব অবাকও হলো না। চেহারা থাকল স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে পিঠ থেকে নামাল ট্যাঙ্ক, ছিঁড়ে নামাতে লাগল থার্মাল ইনসুলেশন সুট। ওটার অবস্থা করুণ। সামনের দিক রুপালি, কিন্তু পিঠের দিকে ঝুলকালি, প্রচণ্ড তাপে পোড়া।

এক গার্ড ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ করেছে। উঁচু পর্যায়ের কেউ তাকে নির্দেশ দিল।

'ন্যাট, মেয়েটাকে দেখতে চান মিস্টার কেসলার। আমরা দরজার কাছে পৌঁছলে খুলে দেয়া হবে গেট।' অস্ত্রের নল দিয়ে উর্বশীর পিঠে খোঁচা দিল দ্বিতীয় গার্ড। 'সামনে বাড়ো।'

টলতে টলতে এক পা সামনে বাড়াল উর্বশী, তারপর ধুপ করে পড়ে গেল ডকের উপর। 'পা ফেলতে পারি না! সারা পথ ক্রল করে ক্র্যাম্প ধরেছে।' আহত ফুটবলারের মত এক হাঁটু

টিপতে লাগল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো এইমাত্র ওকে ফাউল করা হয়েছে।

ন্যাট নামের লোকটা ডকে উর্বশীর মাথার পাশে গুলি করল। 'কী বুঝলে, ডারলিং? তোমার খিঁচ সারছে?'

লোকটার বক্তব্য বুঝতে পেরেছে উর্বশী, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। দুই গার্ডের সামনে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তীরের দিকে চলেছে। একটু ধীরে হাঁটতে গেলেই গুঁতো দেয়া হচ্ছে পিঠে।

তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে হাজির হলো কালো রবিনসন কপ্টার, ডকের উপর দিয়ে ধেয়ে এল শিকারের আশায়। কাঠের জেটির উপর নাক নিচু করে থমকে গেল ওটা, চারপাশে শুরু হলো তুমুল ঝড়। গার্ড পিছন থেকে ধাক্কা দিল, ধপ করে পড়ে গেল উর্বশী। পাশে শুয়ে পড়েছে লোকদুটো। তাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল কপ্টার।

দুই টিলার উপর অভজার্ভেশন পোস্ট থেকে চেয়ে রইল গার্ডরা, পরক্ষণে সৈকত লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল। কপ্টার নাচিয়ে চলেছে ফু-চুং, যেন মুষ্টিযোদ্ধার ঘুসি এড়াতে চাইছে মোহাম্মদ আলী দ্য গ্রেট। গার্ডদের কাছে ট্রেসার বুলেট নেই, লক্ষ্য নির্ধারণ কঠিন হয়ে দাঁড়াল ওদের জন্য।

'উর্বশীকে সৈকত থেকে সরিয়ে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'নইলে ক্রস ফায়ারের মুখে পড়বে।'

সূর্য ডুবতে চলেছে, দীর্ঘ হয়েছে ছায়া। সৈকতের গার্ডদের দেখা গেল না, তবে অটোমেটিক রাইফেলের মাযল ফ্ল্যাশ ধরিয়ে দিল তাদের। যোগ দিয়েছে এই মহাযজ্ঞে।

ডকে গার্ডরা উর্বশীর দুই হাত দু'পাশ থেকে ধরে টেনে তুলল, হিঁচড়ে নিয়ে চলল। আশা করছে গার্ডহাউস ও সৈকত

থেকে পাল্টা হামলা হবে কপ্টারের উপর। এগুতে চাইছে না উর্বশী, তবে বাধা দেয়ার শক্তি সামান্যই।

গ্রিনল্যাণ্ডের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ইজরায়েলি অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল স্যাটালাইট। এইমাত্র সমস্ত সিস্টেম চেক শেষ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গেছে আঠারো শ' পাউণ্ডের টাংস্টেন রডগুলো লঞ্চ করতে। এক্সটার্নাল কেসের ভিতর টেলিফোন পোল আকৃতির প্রজেক্টাইল ঘুরতে শুরু করেছে এক হাজার আরপিএম-এ। অ্যাটমসফিয়ারে নামবে স্থির ভঙ্গিতে। ওটার স্যাটালাইটের টার্গেটিং কম্পিউটার আধুনিক নয়, তবে কাজ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট। এ মুহূর্তে অপেক্ষা করছে, সঠিক কোঅর্ডিনেট লক্ষ্য করে স্যাটালাইট উড়িয়ে নেবে।

স্যাটালাইটের একটা ম্যানুভারিং রকেটের ভিতর সামান্য কমপ্রেসড গ্যাস নিঃসরণ হলো। নিখুঁত ভাবে ঠিক করে নিল কোর্স। লঞ্চ টিউব থেকে ধীরে সরে যেতে লাগল কাভার। দেখাল প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের মত। প্রথমবারের মত টাংস্টেন কোর পেল স্পেসের ছোঁয়া।

স্যাটালাইট দ্রুত ছুটে চলেছে, নীচে ধীরে ঘুরছে পৃথিবী। প্রতি সেকেণ্ডে আরও কাছে চলে আসছে টার্গেট। স্যাটালাইট ফায়ারিং পজিশনে চলে এল। কারও জানবার কথা নয়, নীচে জমে উঠেছে কী নাটক।

'ওয়েপন্স থেকে অনিল বলছি, রানা,' ট্যাকটিকাল রেডিওতে শুনতে পেল রানা। 'আমরা রেঞ্জে পৌঁছে গেছি।'

'পুবের টিলার ওপর অ্যান্টিপারসোনেল রাউণ্ড ফ্যাল,' বলল রানা।

সাগরে আট মাইল দূরে স্টোর থেকে এল-৪৪-এর জন্য প্রয়োজনীয় রাউণ্ড নিল অটোফিডার, ভরে দিল কামানের ব্রিচে। এই কামান গোপনে রাখা হয়েছে মার্ভেলের বো-র কাছে। ক্যারিজ প্রায় এক শ' আশি ডিগ্রি কাভার করে। বাইরের দরজা নেমে গেলেই বেরিয়ে এল ব্যারেল। ড্রোনের লেজার পাইপ বিম টিলার উপর তাক করতেই জাহাজের টর্গেটিং কম্পিউটার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বুঝে নিল. মার্ভেলের খোল থেকে বেরিয়ে এল নল, প্রস্তুত হলো গোলা ছুঁড়তে। ঠিক তখন বড় ঢেউ পেরুতে শুরু করল মার্ভেল। বুম্ করে গর্জে উঠল বিরাট কামান।

ওয়েপন্সের কম্পিউটার এতই নিখুঁত যে, মাইক্রো সেকেণ্ড হিসাব কষে। ব্যারেল থেকে গোলা বেরিয়ে যাওয়া, পৃথিবীর ঘূর্ণন ও প্রজেক্টাইলের গতি সবই হিসাবের ভিতর থাকে।

কামান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দশ সেকেণ্ড পর ফাটল শেল, চারপাশে ছিটকে গেল পেলেটগুলো। যেন গুলি করা হয়েছে শটগান দিয়ে, বিস্ফোরিত হলো টিলার মাথা। ধুলোর মেঘ ভেসে উঠল আকাশে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দুই রেসপন্সিভিস্ট গার্ড।

'এবার পশ্চিমের টিলা,' জানাল রানা।

উর্বশীকে তুলে নিয়ে চলেছে দুই গার্ড, তবে বিস্ফোরণের আওয়াজে ভড়কে ফেলে দিল হাত থেকে।

মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উর্বশী, দৌড়াতে শুরু করেছে। তবে মাত্র কয়েক পা যেতে পারল, তারপর পিছন থেকে ট্যাকল করল এক গার্ড। ল্যাং খেয়ে এলোমেলো পা ফেলে কয়েক কদম এগিয়েই উপুড় হয়ে পড়ল ও।

রুক্ষ অ্যাসফল্টের উপর পড়ে গুঙিয়ে উঠল উর্বশী। রাইফেল দিয়ে আঘাত করা হলো মাথার পিছনে। মনে হলো দপ করে নিভে গেল সূর্য। ওর চোখের সামনে অন্ধকার নামছে। জোর

করে সচেতনতা ধরে রাখতে চাইল উর্বশী।

সৈকত কেঁপে উঠল প্রচণ্ড আওয়াজে। বিস্ফোরিত হয়েছে আরেক রাউণ্ড গোলা। পশ্চিম টিলার স্নাইপারদের আখড়ার খানিক নীচে গিয়ে পড়েছে। ছিটকে উঠল হাজারো টুকরো পাথর।

'অনিল...'

রানা বলবার আগেই বলল অনিল, 'জানি।' বারো সেকেণ্ড পর পশ্চিমের টিলার উপর পড়ল দ্বিতীয় গোলা। মনে হলো বিস্ফোরিত হলো চারপাশ।

দুই গার্ড পিকআপ ট্রাকের পিছনে ছুঁড়ে ফেলল উর্বশীকে। একজন উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। অন্য লোকটা সাবমেশিন গানের নল ঠেসে ধরল উর্বশীর মাথায়। মাত্র পঞ্চাশ ফুট এগিয়েছে পিকআপ, এমন সময়ে সরাসরি গার্ডহাউসের উপর পড়ল হাই-এক্সপ্লোসিভ শেল। চারপাশে ছিটকে গেল করগেটেড ঘর। মনে হলো আগুন দিয়ে তৈরি গোলাপ ফুটেছে ওখানে। কংকাশনের ফলে সামনের দিকে লাফ দিল পিকআপ। নিয়ন্ত্রণ হারাল ড্রাইভার, তবে হুইল ঘুরিয়ে আবার ফিরে এল রাস্তার উপর।

সৈকতের দুই গার্ড ধরে নিল এবার পালাতে হবে। দেরি না করে উঠে পড়ল এটিভির উপর। মনে হলো ধাওয়া করে ধরতে চাইছে পিকআপ ট্রাককে।

কপ্টার নিয়ে তিন চাকার গাড়ির বামে চলে এল ফু-চুং, সুযোগ করে দেবে রানাকে।

'ওই ট্রাকের সামনে রাস্তার উপর অ্যাণ্টি পারসোনেল ফ্যাল,' বলল রানা। 'সমানে একের পর এক ফেলতে থাক্, গতি যেন কমাতে বাধ্য হয়।' অনিলের জবাব মোটেও শোনা গেল না।

হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি মেশিন পিস্তল দিয়ে গুলি শুরু করেছে রানা।

এটিভির ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে তাকে টার্গেট করা হয়েছে, কাজেই এঁকেবেঁকে এগুতে শুরু করল। দক্ষ স্নাইপার রানা, কিন্তু উড়ন্ত কপ্টার থেকে ছুটন্ত কাউকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব। বামহাতে পাল্টা গুলি করল ড্রাইভার। গুলি খুব কাছ দিয়ে গেছে, আপাতত সরে গেল ফু-চুং। ধাওয়া বন্ধ করে সরিয়ে নিল কপ্টার।

এক শ' ফুট সামনে হঠাৎ উধাও হলো পিকআপ ট্রাক। সড়কের উপর পড়েছে আর্মার ভেদ করা ইউরেনিয়াম কোর রাউণ্ড। আগেই অ্যাণ্টিপারসোনেল রাউণ্ড চেয়েছে রানা। নইলে অন্য যে-কোনও আর্সেনাল ছিঁড়েখুঁড়ে দিত ট্রাকটা।

কষে ব্রেক করল ড্রাইভার, বনবন করে ঘুরিয়ে নিল চাকা। সামনের পথে গর্ত তৈরি হয়েছে। ধপ করে ওখানে নামল পিকআপ ট্রাক। আবার গতি বাড়িয়ে গর্ত থেকে উঠে আসতে চাইল সে।

সুযোগটা খেয়াল করেছে রানা, দ্রুত বলল, 'ওই যে ওখানে চল্, ফু-চুং!'

কপ্টার ঘুরিয়ে নিল ফু-চুং, ধেয়ে গেল পিকআপ ট্রাক লক্ষ্য করে। যে গার্ড উর্বশীকে আটকে রেখেছে অস্ত্র তুলল সে, তবে লাথি দিয়ে তার হাত থেকে সাবমেশিন গান ফেলে দিতে চাইল উর্বশী। বাধ্য হয়ে বন্দির দিকে মনোযোগ দিল লোকটা। নতুন ম্যাগাজিন ভরবার সময় নেই, অস্ত্রটা কপ্টারের ভিতরে ছেড়ে দিল রানা, খুলে ফেলল সেফটি হার্নেস।

কপ্টারের পাখার কারণে প্রচণ্ড ধুলো উঠছে। আবছা দেখা গেল পিকআপ ট্রাক। তবে এয়ারস্পিড কমিয়ে এনে ট্রাকের

উপর পৌঁছে গেল ফু-চুং। সামনের ঢাল উঠে গেছে টিলার দিকে।

দেরি করল না রানা, দশ ফুট উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ট্রাক লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় গার্ড ক্যাবের উপর ধমাধম বাড়ি দিয়ে বোঝাতে চাইল আকাশ থেকে নামছে শত্রু। ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে, বনবন করে ঘোরাতে শুরু করল স্টিয়ারিং হুইল।

পিকআপ ট্রাকের কোনায় নেমেছে রানা, এক হাঁটু গেড়ে সামলে নিতে চাইল ভারসাম্য, তবে ট্রাকের তীব্র গতির কারণে কাত হয়ে রাস্তার দিকে পড়তে লাগল। খপ্ করে গার্ডকে ধরতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না। দু'হাতের আঙুল খামচে ধরল ট্রাকের বেডের শেষ অংশ। সড়ক ধরে ছেঁচড়ে এগুল দুই পা। নিজেকে ট্রাকের উপর তুলতে চাইল রানা।

হঠাৎ ওর মাথার কাছে হাজির হলো দ্বিতীয় গার্ডের মুখ, টিটকারির হাসি হাসছে। ডান হাত ছেড়ে দিল রানা, কোমরে থাবা দিয়ে বের করে আনতে চাইল ওয়ালথার। তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সাবমেশিন গানের বাঁট নেমে এল ওর বামহাতের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল হাত।

ধপ্ করে রাস্তার উপর পড়ল রানা, গড়িয়ে দিল দেহ। পরক্ষণে বলের মত গোল হয়ে গেল। দু'হাতে রক্ষা করতে চাইছে মাথা। কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে থামল। ততক্ষণে ঢালের উপর পৌঁছে গেছে ট্রাক, গতি বাড়িয়ে নেমে যেতে লাগল।

উঠে দাঁড়াল রানা, টলছে। পতনের ফলে আঘাত লেগেছে মাথায়, বুঝতে দেরি হলো কী ঘটছে। মাথা নেড়ে চিন্তাগুলোকে স্বাভাবিক করতে চাইল। উপরে চোখ পড়তে ফু-চুংকে দেখতে পেল। নেমে আসছে ওকে তুলে নিতে। রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটে

আসছে এটিভি দুটো। ওগুলো পাহাড়ি পথে চালাতে হলে দুই হাতই ব্যবহার করতে হয়।

রেঞ্জ অনেক বেশি, তবে ঝুঁকি নিল না রানা। লোকগুলো অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে হামলা করতে পারে। ওয়ালথার রেখে ফাইভ-সেভেন দুটো বের করে নিল রানা, ড্রাইভারদের দিকে ছুঁড়তে লাগল গুলি। চমকে গেছে লোকগুলো। বিশটা গুলি পাঠিয়ে দিয়েছে রানা ছয় সেকেণ্ডে। ডানদিকের ড্রাইভারের দেহে বিঁধল আটটা বুলেট। ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুক। একটা বুলেট উড়িয়ে নিল করোটির অর্ধেক। কাত হয়ে পড়ে গেল লাশ।

ধোঁয়া ওঠা পিস্তলগুলো ফেলে দিল রানা, মেরুদণ্ডের দু'পাশ থেকে তুলে নিল আরও দুটো। নতুন করে গুলি শুরু করল দ্বিতীয় গার্ড লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় গার্ড এক হাতে কোয়াড বাইক চালাতে চাইছে, অন্য হাতে পিঠ থেকে খুলে নিল একে-ফোরটিসেভেন। গতি না কমিয়ে ছুটে আসছে। যেন খেয়ালই নেই আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুলেট। দু'তিনটে ফায়ার করল সে, তারপর প্রথম বুলেট আঘাত হানল তার দেহে। উরুর ভিতর নালা তৈরি করল বুলেট। পাল্টা গুলি করতে চাইল সে, কিন্তু প্রতিপক্ষ লোকটার যেন ভয়-ডর বলতে কিচ্ছু নেই, পাত্তা দিচ্ছে না ওর গুলিকে।

রানার কানের পাশ দিয়ে গেল দুটো বুলেট। শান্ত ভাবে পাল্টা গুলি করল রানা। ওর তৃতীয় ও চতুর্থ বুলেট ছিঁড়ে দিল গার্ডের গলা। কাইনেটিক ইমপ্যাক্টের ফলে লোকটার মাথা ছিটকে যেতে চাইল। গলার পেশি থেকে ছিঁড়েই গেল মাথা। গাড়িটা এখনও উঠে আসছে। মনে হলো চালিয়ে আনছে এক মস্তকবিহীন ঘোড়সওয়ার। কোয়াড বাইক কাছে চলে আসতেই লাথি দিয়ে লাশটা ফেলতে চাইল রানা। লোকটার হাত এখনও

ধরে রেখেছে থ্রটলটা।

গতি কমে এসেছে বাইকের, ঠেলে লাশ ফেলে দিল রানা। নিজে সিটে চেপে গতি তুলতে শুরু করল। পিছু নিতে হবে উর্বশীর। সিকি মাইল এগিয়ে গেছে পিকআপ ট্রাক।

ঠিক তখন ওটার সামনে পড়ল আর্মারভেদী এক স্যাবট গোলা। ব্রেক চাপল ড্রাইভার, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে সড়কের আরেক দিক দিয়ে এগুতে চাইল। এই সুযোগে দূরত্ব কমিয়ে আনল রানা।

আঠারো

আগে কখনও এত খারাপ লাগেনি কাশেমের। নাক হয়েছে করমচার মত লাল, সেই সঙ্গে ব্যথা। ছোঁয়া লাগলে ছ্যাঁৎ করে উঠছে। ওর মনে হচ্ছে, খসে পড়বে এবার। হাঁচির পর হাঁচি চলছে। একটা হলে সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক চলতে থাকে। কপালের ব্যথায় মন চাইছে, মাথাটা খুলে টেবিলে রেখে দেয়! বুকের ভিতর সর্বক্ষণ ঘড়ঘড় আওয়াজ।

ওর একমাত্র সান্ত্বনা, জাহাজের প্রায় প্রতিটি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অবশ্য স্বর্ণা অনেকের চেয়ে ভাল আছে। যদিও ভাইরাল ইনফেকশন থেকে রক্ষা পায়নি। একটু পর পর শীতে শিউরে উঠছে। বেশিরভাগ যাত্রী যে যার কেবিনে আশ্রয় নিয়েছে। গ্যালি থেকে পাঠানো হচ্ছে গ্যালনকে গ্যালন মুরগির

সুপ। মেডিকেল স্টাফরা হাতে তুলে দিচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট।

কাশেম-স্বর্ণা আপাতত লাইব্রেরির ভিতর একাকী। মুখোমুখি বসে মাথা নিচু, কোলের উপর বই। কেউ দেখলে ভাববে, এদের মত জ্ঞানপিপাসু পাঠক লাখে একটাও মেলে না! টেবিলের উপর টিশ্যু, একটু পর পর নাক ঝাড়ছে।

'আমি এখন জানি কেন ক্রুজ শিপে ভাইরাস ছড়িয়েছে,' বলল কাশেম।

'কারণটা শুনি?'

'নিজেদের দিকে চেয়ে দেখুন। আমরা তো ইঁদুরের মত আটকা পড়েছি, নিজেদের সর্দির খাঁচায়। ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ভাইরাস, সবাই শেষে আক্রান্ত হবে।'

তিক্ত হাসল স্বর্ণা। 'তা-ই আসলে। জাহাজে আছে মাত্র এক ডাক্তার আর এক নার্স। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের কিছুই করবার নেই।'

'এটা যদি কোনও শহর হতো, হাসপাতাল থাকত, ইনফেক্ট হওয়া মানুষগুলোকে সরিয়ে নেয়া হতো। আউটব্রেক হলেও সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোকে কোয়ারান্টাইন করা যেত।'

'তাই আসলে।' আলাপে মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে উঠেছে স্বর্ণার পক্ষে। তারপরও বলল, 'চলুন, আরেকবার খুঁজে দেখি। চারপাশে কোথাও ভাইরাসের বোতল থাকতে পারে। বা ওইরকম কিছু।'

'অন্তত এক শ' বার খুঁজেছি,' বলল কাশেম। 'এয়ার-কণ্ডিশনার, ওয়াটার সিস্টেম, খাবার বা অন্য কোথাও নেই। বহুবার ডাবল চেক করেছি। এখন দরকার ছিল জন-শক্তি। পুরো জাহাজ খুঁজতে হলে দরকার একদল ইঞ্জিনিয়ার, নইলে

পাওয়া যাবে না ডিসবার্সাল ডিভাইস।'

জাহাজ জুড়ে খুঁজে কিছুই পায়নি ওরা। অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন বসে থাকাই কঠিন হয়ে উঠেছে। তবুও হাল ছাড়তে চাইল না স্বর্ণা, বলল, 'চলুন আমার সঙ্গে। ভেবে বের করতে হবে কীভাবে ছড়িয়ে দিল ভাইরাস। এটা তো আসলে ভাসমান এক শহর। এখানে রয়েছে খাবার, পানি, সেপটিক, আবর্জনা সরানোর জায়গা আর ইলেকট্রিসিটি। এর ভিতরই কোথাও থাকবে ডিসবার্সাল ডিভাইস।'

'আর্বজনার ভিতর ভাইরাস দেবে?' মাথা নাড়ল কাশেম। 'আসুন মাথার ব্যথা নিয়ে চুপচাপ বসে গজর গজর করি।'

'অন্য ভাবেও ভাবা যায়।' বলল স্বর্ণা, 'ক্রুজ শিপ আসলে কোনও হোটেল। আর এই হোটেল চালু করতে হলে কী লাগে?'

'সব শহরের মত। পকেটে মোটা টাকা।'

'আপনি কিন্তু সহায়তা করছেন না।'

'আমি সে চেষ্টা করিনি, কারণ, এভাবে কিছুই খুঁজে পাব না।'

ঝট করে চেয়ার ছাড়ল স্বর্ণা। 'বুঝেছি! আসুন!'

'আপনার মোটা টাকার ভিতর ভাইরাস?'

'না। প্রতিটি কেবিনে ঢোকে মেইড। কাজ কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা।'

'করুক।'

'বিছানার চাদর থেকে শুরু করে সব পাল্টে দেয় তারা। আপনার মনে পড়ে, মাসুদ ভাই যখন অমল দাশাকে উদ্ধার করলেন, তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াশিং মেশিন দেখেন। তবে ওগুলোর সঙ্গে ড্রায়ার ছিল না। লোকগুলো ওখানে ট্রেইনিং নিয়েছে। ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে লণ্ড্রির মাধ্যমে। প্রতিদিন নতুন

চাদর পাল্টে দেবে মেইড। তার সঙ্গে থাকতে পারে ভাইরাস। তা না হলে হতে পারে ডাইনিং রুমের ন্যাপকিন। নিখুঁত পরিকল্পনা। প্রতি বেলা পরিষ্কার ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মোছে সবাই। তার সঙ্গে ভাইরাস। বারো ঘণ্টা ওয়াশিং মেশিনের ভিতর ভাইরাস রাখলে, জাহাজের সবাই আক্রান্ত হতে বাধ্য।'

দু'হাতে মাথা টিপতে শুরু করেছে কাশেম। 'আমরা আগে ভাবলাম না কেন? ওভাবে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া সবচেয়ে সোজা!' উঠে দাঁড়াল সে। 'চলুন লণ্ড্রি রুমে গিয়ে দেখা যাক।'

রুক্ষ প্রান্তরে চলবার জন্য তৈরি করা হয়েছে কোয়াড বাইক, সঙ্গে দেয়া হয়েছে বাড়তি দৈর্ঘ্যের শকঅ্যাবজর্ভার ও স্প্রিং। এ মুহূর্তে ইঞ্জিনটার কাছ থেকে সমস্ত শক্তি আদায় করতে চাইছে রানা। ধেয়ে চলেছে পিকআপ ট্রাক ধরতে। ট্রাকের নাকের কাছে পড়ছে একের পর এক গোলা। বাধ্য হয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে ড্রাইভার। আর সে কারণে ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেল রানা সহজেই।

'বস্, আতাসি বলছি,' ভেসে এল আতাসির কণ্ঠ। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট হওয়ার ওয়ার্নিং এটা। রিপিট করছি: পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ইমপ্যাক্ট।'

'শুনেছি,' বলল রানা। নিরাপদে সরে যাওয়ার জন্য যে সময় ওরা রেখেছিল, তা পেরিয়ে গেছে। 'না শুনলেই ভাল হতো। আর গোলা ফেলিস না, অনিল। ফু-চুং, ট্রাকের পিছনের লোকটাকে ব্যস্ত রাখ্। আমি কাছে পৌঁছতে চাই।'

'বেশ।'

পিকআপ ট্রাকের পিছনের গার্ড অস্ত্রের নল গেঁথে রেখেছে উর্বশীর পিঠে। চারপাশে কী ঘটছে কিছুই জানে না বেচারি।

তবে হঠাৎ অস্ত্র সরিয়ে নেয়া হলো। পরক্ষণে বৃষ্টির মত গুলি চলল। মাথা কাত করে দেখতে চাইল উর্বশী। আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে গার্ড। হঠাৎ কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে রবিনসন, নেমে এল ট্রাকের একটু উপর। বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গার্ড।

সুযোগটা নিল উর্বশী, কনুই দিয়ে গুঁতো দিল লোকটার পাঁজরে। জোরে লাগল না, ফলে কিছুই হলো না। অস্ত্রটা ঝট করে ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি করতে চাইল গার্ড। তবে দু'হাতে নল সরিয়ে দিল উর্বশী। আঁধার আকাশে ছুটে গেল বুলেট। পোড়া গান-পাউডারের কণা ছিটকে লেগেছে দুই চোখে, তারই ফাঁকে প্রতিপক্ষের দিকে চাইল উর্বশী, পরক্ষণে গায়ের জোরে কনুই চালাল ওর সোলার প্লেক্সাসে। নির্বিকার ভঙ্গিতে ব্যথা হজম করল গার্ড, তারপর পাল্টা ঘুসি মারল উর্বশীর গালে। পাত্তা দিল না উর্বশী, মনে হলো নতুন করে শক্তি ফিরে পেয়েছে, লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। দু'হাতে ঘুসি মেরে চলেছে।

পিকআপ ট্রাকের বেড সংকীর্ণ জায়গা, ওখানে রাইফেল ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে বিপদে পড়ল গার্ড। একহাতে গায়ের উপর থেকে সরাতে চাইল মেয়েটাকে। দু'পা পিছিয়ে গিয়েই ঘুরে লাথি মারল উর্বশী, লাগল লোকটার নিতম্বে, নিজেও পড়ল ধপাস্ করে। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল উর্বশী, এক হাতে রেলিং ধরে ভারসাম্য রাখতে চাইল।

পিকআপ ট্রাকের রিয়ার বাম্পারের দু'ফুট পিছনে পৌঁছে গেল রানা। হ্যাণ্ডলবার ধরে ঝুঁকে পড়েছে, পিছনে চেয়ে ওকে দেখবে না ড্রাইভার। রানার ঠোঁট নড়তে দেখল উর্বশী। ওকে বলছে, কপ্টারের পাইলটকে, না মার্ভেলকে?

সোজা হয়ে গার্ডের মুখে ঝেড়ে লাথি ছুঁড়ল উর্বশী। পরক্ষণে সামনে বেড়ে কনুই বসিয়ে দিল গলার উপর। বিস্ফারিত হলো লোকটার দুই চোখ। শ্বাস আটকে যাওয়ায় বিশাল হাঁ করল। হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেল। ওটা হাতে পেতে চাইল উর্বশী।

ঠিক তখন মার্ভেল থেকে এল কামানের গোলা, সোজা এসে নামল পিকআপ ট্রাকের নাকের সামনে। বামে সরতে শুরু করল ড্রাইভার, আর সে সুযোগে পাশে পৌঁছে গেল রানা। চেঁচিয়ে উঠল, 'লাফিয়ে পড়ো, উর্বশী।' নিজে সিটের সামনের দিকে সরে বসল।

রিয়ার গেট পেরিয়ে বাম্পারে নামল উর্বশী, এক পা বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে লাফিয়ে পড়ল স্যাডল সিট লক্ষ্য করে। ধপ করে নেমে এল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর।

রিয়ারভিউ মিররে সব দেখেছে ইংরেজ গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এটিভির দিকে চেপে আসতে লাগল। তখনই কষে ব্রেক চেপে সরে গেল রানা। পরক্ষণে বাড়িয়ে দিল গতি। দুই আরোহী নিয়ে দ্রুত এগুতে লাগল কোয়াড বাইক। পিছু নিল পিকআপ ট্রাক। সর্বোচ্চ গতি তুলেছে রানা ও ড্রাইভার, এরপর আর দূরত্ব পেরুতে পারল না কেউ। ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে সামনের ওই বাইকের কারণে গোলা পড়বে না।

'আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে,' কাঁধের উপর দিয়ে চাইল রানা। মাত্র পাঁচ গজ পিছনে ট্রাকের ইঞ্জিনের গ্রিল। 'লোকটা ধাওয়া করছে। ...আর তোমার মুখ ফুলে গেছে উর্বশী।'

'মুখ যে আছে তা-ই বেশি!' রানার কানের কাছে বলল উর্বশী। 'রীতিমত অসুস্থ লাগছে আমার।'

'দু'হাতে কোমর ধরে থাকো,' সাবধান করল রানা। সড়কের

পাশে সরে গেল, তারপর টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। খানিক গিয়ে ঘুরিয়ে নিল বাইক। আবার ফিরতে শুরু করেছে ডকের দিকে। এখন অ্যাক্সিডেন্ট হলে ঘাড় মটকে মরবে দু'জন। হ্যাণ্ডলবার ঘুরিয়ে সড়কে নেমে এল রানা। পিকআপ ট্রাকের ড্রাইভার টিলা থেকে নামতে সময় নিল। ততক্ষণে পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে গেল এটিভি। এ সুযোগে মার্ভেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইল রানা। পিকআপ ট্রাকের গতি এটিভির চেয়ে বেশি, মসৃণ রাস্তার উপর দ্রুত কমে আসবে দূরত্ব।

'অনিল, আমি বললে ডকের উপর হাই-এক্সপ্লোসিভ গোলা ফেলবি।'

'ঠিক আছে।'

'কী করতে বললে, রানা?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল উর্বশী।

'আবার সেই সি প্ল্যান।'

রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এটিভি, তবে কমিয়ে আনা হয়েছে গতি। ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি শেষ করতে চাইছে না রানা। জ্বলন্ত গার্ডহাউসটাকে পাশ কাটাল। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে করোগেটেড প্লেট। ডকে উঠে পড়ল রানা, মুচড়ে খুলে দিল পুরো থ্রটল। একইসঙ্গে গতি, দূরত্ব ও সময়ের হিসাব কষছে।

'এবার ফায়ার কর্!'

পিকআপ ট্রাকের গার্ড পিছিয়ে গেছে, বুঝল না কেন ধরা পড়তে চাইছে এটিভির ওরা। একবার পিয়ারে উঠলে কোণঠাসা হবে তারা। তবে ড্রাইভার যখন বুঝল সামনের এটিভির গতি কমছে না, নতুন করে আবার ধাওয়া শুরু করল।

'ফু-চুং!' রেডিওতে বলে উঠল রানা। 'তৈরি থাক, আমাদের পানি থেকে তুলে নিবি।'

বদলে কী যেন বলল ফু-চুং, তবে জোর হাওয়ায় কথাগুলো হারিয়ে গেল।

প্রচণ্ড গতি তুলে পুরো ডক পেরিয়ে গেল রানা-উর্বশী, ছুটে চলেছে পঞ্চাশ মাইল বেগে।

এবার বুঝতে পেরেছে উর্বশী, কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা, তুমি একটা প্যাগওওও...'

ডকের শেষে উড়াল দিল এটিভি, পুরো বিশ ফুট গিয়ে ঝপাস্ করে নামল সাগরের কোলে। প্রায় কাত হয়ে পড়েছে এটিভি। ডকের শেষে থামল গার্ড, দরজা খুলে নেমে পড়ল অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে। পিকআপ ট্রাকের সাসপেনশন তখনও নাচছে। অপেক্ষা করল সে, শত্রুরা ভেসে উঠলেই গুলি করবে।

ঠিক তখন শুনল তীক্ষ্ণ শিস, তবে সময় পাওয়া গেল না।

এক্সপ্লোসিভ শেল ট্রাকে লাগল না, তবে পড়ল ডকের উপর। ফলাফল একই হলো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হলো ডক ও ট্রাক। সব ছিটিয়ে গেল সাগরে।

উর্বশীকে এক হাতে ধরে ভেসে উঠল রানা, একবার চাইল বিধ্বস্ত ডকের দিকে। অর্ধেক ডক হাওয়া। বাকি অংশের টিমবার ফেটে গেছে, ধ্বংস হয়েছে পাইলিং।

'এটা খুব জরুরি ছিল?' সাঁতরাতে শুরু করেছে উর্বশী।

'তোমাকে একবার একটা স্যাটালাইটের কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, একটা ইজরায়েলি স্যাটালাইট।'

'ওটা অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রোজেক্টাইল,' ঘড়ি দেখে নিল রানা। 'ওটা আসছে এই দ্বীপ উড়িয়ে দিতে। বাকি মাত্র আটত্রিশ মিনিট। কাজেই এখন এখান থেকে লেজ তুলে ভাগতে হবে।'

'তোমার আছে, জানি,' হাসল উর্বশী, 'কিন্তু আমার যে ওটা নেই!'

হাসল রানাও। এই বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে মেয়েটা। জানে না, ওকে পেয়েই মুহূর্তে সব বিপদ তুচ্ছ হয়ে গেছে মেয়েটির কাছে।

টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল রবিনসন, ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দ্রুত ডক পেরুল ওটা। একটু আগে কী যেন বলেছে ফু-চুং, ভাবল রানা। বোধহয় বলতে চেয়েছে, বিধ্বস্ত হবে কপ্টার! রানা ও উর্বশীর মাথার কাছে নেমে এল রবিনসন, সাগর থেকে ছিটকে উঠল কুয়াশার মত, মিহি জলকণা। আরও নেমে এল ফু-চুং, রবিনসনের স্কিডকে ধুইয়ে দিল সাগরের পানি। উর্বশীকে উঠতে সাহায্য করল রানা, ফড়িঙের বুকে উঠে গেল মেয়েটি। তবে সেণ্টার অভ ব্যালান্স হারাতেই কাত হয়ে গেল রবিনসন।

উর্বশী উঠবার পর নিজেও উঠতে গিয়ে থমকে গেল রানা, একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ শুরু হয়েছে কপ্টারের ইঞ্জিনের ভিতর। 'রওনা হয়ে যা, ফু-চুং!' দুই হাতে স্কিড ধরে রইল ও।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না ফু-চুংকে, ডকের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিল কপ্টার, রওনা হয়ে গেল। সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে আরেকটা পিকআপ ট্রাক। ড্রাইভার ছাড়াও পিছনে দুই গার্ড, হাতে একে-ফোরটিসেভেন।

চার হাত-পায়ে রবিনসনের স্কিড পেঁচিয়ে ধরল রানা। প্রচণ্ড হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইল ওকে। ভেজা পোশাক যেন পরিণত হয়েছে বরফে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে ঝুলে রইল রানা। আর মাত্র দুই এক মাইল দূরে

মার্ভেল। এই অবস্থায় ফু-চুংকে বলা উচিত হবে না, আমাকেও তুলে নে।

ফু-চুং বোধহয় মার্ভেলে রেডিও করেছে, দূরে দেখা গেল জাহাজের সমস্ত বাতি জ্বলে উঠেছে। ডেকের উপর ছোটাছুটি করছে ক্রুরা। রবিনসনকে ল্যাণ্ড করতে সাহায্য করবে। গগল এরই ভিতর দ্বীপের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়েছে মার্ভেলের বো। যে-কোনও সময়ে রওনা হবে জাহাজ।

মার্ভেলের ফ্যানটেইল অনেক নীচে রেখে ডেকের উপর চলে এল রবিনসন। জ্বলছে বেশ কিছু ওয়ার্নিং বাতি, সেইসঙ্গে ককপিটের ভিতর বেজে চলেছে সতর্ক-ধ্বনি। তপ্ত ট্রান্সমিশনের ভিতর পুড়ে চলেছে তেল। উচ্চতা কমিয়ে আনল ফু-চুং।

ডেকে কয়েকটা হাত সরিয়ে নিল রানাকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপ্টারের দিকে চাইল রানা। যথেষ্ট জায়গা পেয়ে নামতে শুরু করেছে কপ্টার।

হেলিপ্যাডে স্কিড ধপ করে নেমে আসতেই রেডিও করল রানা। 'গগল, গতি তোলো।' কপ্টারের দিকে চাইল। ওটার আয়ু শেষ। ইঞ্জিনের কাউলিং থেকে ভলকে বেরিয়ে আসছে কমলা আগুন। অপেক্ষারত ক্রুরা হোসপাইপ দিয়ে কেমিকাল স্প্রে করছে। তারই ভিতর দিয়ে নেমে এল উর্বশী ও ফু-চুং। রানার পাশে এসে থামল ওরা।

'আরেকটা কপ্টার কিনে দিতে হবে মিস্টার পাপাগোপালাকে,' বলল ফু-চুং।

'আগেই বলে রেখেছেন, কিছু কিনতে হবে না,' বলল রানা। 'দরকার পড়লে আবার কিনে দেবেন। শর্ত একটাই: তাঁর কোনও বিপদ হলে পাশে থাকতে হবে।'

বাড়ছে বাতাস। যেন শুরু হয়েছে ঝড়। ডেক থেকে সরে

গেল ওরা, ঢুকে পড়ল সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর। তীব্র গতি তুলছে গগল। পিছনে নিশ্চিন্ত চিত্তে রইল বিশ্রী চেহারার ইয়োস দ্বীপের লোকগুলো। জানে না, একটু পর হারিয়ে যাবে দ্বীপটা দুনিয়ার বুক থেকে।

উনিশ

কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠছে না ডিয়েটস কেসলার। ডকের গার্ডরা রিপোর্ট করেছে। উর্বশী মেয়েটা ফ্যাসিলিটি থেকে এগযস্ট ভেন্ট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর ধরাও পড়েছে। কিন্তু তখনই কোত্থেকে কালো এক হেলিকপ্টার এসে হামলা শুরু করে। প্রথমে ভয় পেয়েছে কেসলার, বোধহয় এই হামলার পিছনে রয়েছে মার্কিন সরকার। তাদের ওই ধরনের কালো হেলিকপ্টারের বহর আছে। ওয়াকি-টকিতে কিছু কথা তার কানে এসেছে, তারপর সব থেমে গেছে। গার্ডহাউসের উপর বসানো ক্যামেরাগুলো কাজ করছে না। বাধ্য হয়ে নিজের লোককে নির্দেশ দিয়েছে সে, 'যাও, পিকআপ ট্রাক নিয়ে দেখে এসো ডকে কী ঘটছে।'

'ওরা পালিয়ে গেছে, মিস্টার কেসলার,' কিছুক্ষণ পর গার্ডদের ক্যাপ্টেন যোগাযোগ করেছে। 'উর্বশী দাশা আর সঙ্গে এক লোক। ধ্বংস করে দিয়েছে গার্ডহাউস। সঙ্গে ডক। আমাদের বেশ ক'জন গার্ডকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ওদের কেউ রয়ে যায়নি তো?'

'আমরা চারপাশ তল্লাসী করছি। তবে মনে হয় ওই একজন লোকই এসেছিল।'

'সে মাত্র একজন, তোমার এত গার্ডকে খুন করল কী করে?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল কেসলার। 'একাই ধ্বংস করে দিল ডক?'

'এ মুহূর্তে কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারব না, মিস্টার কেসলার।'

'বেশ, চারপাশ খুঁজে দেখো। নতুন কোনও অস্বাভাবিকতা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

চুলের ভিতর আঙুল চালাল কেসলার। লিঙ্ক চ্যাপেলের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। আরও দুই ঘণ্টা পর সিগনাল পাঠিয়ে দেবে সে। কিন্তু সত্যি যদি আরও বড় কোনও হামলা আসে? দেরি করা মানেই কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি নেয়া। এ দিকে, সে যদি আগেই সিগনাল পাঠিয়ে দেয়, এমনও হতে পারে পঞ্চাশটা ক্রুজ শিপে ভাইরাস ছড়ানো গেল না। লঞ্চি মেশিনের ফিড লাইনে যদি যুক্ত না হয় ভাইরাস?

তার পীরের কাছে ফোন করতে মন চাইল কেসলারের। তবে বুঝতে পারছে, এই সিদ্ধান্ত তার নিজের নিতে হবে। দুই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়ে গেছেন চ্যাপেল। ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার পর মেয়েদের নিয়ে ইয়োস দ্বীপে পৌঁছবেন তিনি। বহুদিন হলো রেসপন্সিভিস্টদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে কেসলার। ঠিক যেমন বাবার কাছ থেকে ব্যবসা বুঝে নেয় ছেলে। তবে সে টের পেত, তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় তার উপর। আসলে কখনও নেতৃত্বে ছিল না সে। কখনও ভোলেনি যে তার যে-কোনও সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে পারেন চ্যাপেল। এবং সেজন্য কোনও ব্যাখ্যাও দেবেন না তিনি।

এ নিয়ে বেশি ভাবেনি কেসলার। বেশির ভাগ সময় নাক গলাননি চ্যাপেল। তবে এ মুহূর্তে কেসলারের মনে হলো, এই বিশাল জুয়া খেলবার সময় চ্যাপেল থাকলে ভাল হতো। উনি জানিয়ে দিতে পারতেন কখন কী করতে হবে।

কী হবে ক'টা ক্রুজ শিপে ভাইরাস ছড়াতে না পারলে? চ্যাপেলের হিসাব অনুযায়ী মাত্র চল্লিশটা জাহাজে ভাইরাস ছড়িয়ে দিলেই ইনফেক্টেড হবে দুনিয়াজুড়ে মানুষ। বাড়তি দশটা জাহাজ ছিল ইনস্যুরেন্সের মত। চ্যাপেল যখন জানতে চাইবেন কেন বাকি দশটা জাহাজে ভাইরাস হামলা হলো না, সে বলতে পারবেঃ ওসব জাহাজে ডিসপার্সাল ডিভাইস ঠিকমত কাজ করেনি।

'ব্যস, আর ভাবব না,' উরুর উপর চাপড় দিল কেসলার, উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার রুমের দিকে।

ঘরে ঢুকে দেখল সাদা ল্যাব কোট পরা এক টেকনিশিয়ান কন্ট্রোলের সামনে বসা। 'এখনই সিগনাল পাঠিয়ে দেয়া যায়?' জানতে চাইল কেসলার।

'আমাদের শিডিউল অনুযায়ী আরও দু'ঘণ্টা পর পাঠানোর কথা।'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি,' কড়া স্বরে বলল কেসলার। তার সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ। কাজেই এখন নির্দেশ দেবার সময়।

'ব্যাটারিগুলোকে ডাবল চেক করতে লাগবে কয়েক মিনিট। এগযস্ট সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাওয়ার প্লান্ট এখন অফ লাইনে।'

'যা করার দ্রুত করবে।'

ইন্টারকমে ফ্যাসিলিটির অন্য এক কলিগের সঙ্গে আলাপ শুরু করল টেকনিশিয়ান। সায়েন্টিফিক কী সব যেন, ওগুলো বুঝবার চেষ্টা করল না কেসলার।

'আর কয়েক মিনিট, তারপর সিগনাল পাঠানো যাবে, মিস্টার কেসলার।'

ইজরায়েলি স্যাটালাইটের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময়ে সিদ্ধান্ত নিল। ঘণ্টায় সতেরো হাজার মাইল গতি তুলে ইউরোপের উপর ছুটছে স্যাটালাইট। দ্রুত ট্র্যাজেকটরির হিসাব নেয়া হলো, এবং সঠিক সময় আসতেই সিগনাল পৌঁছে গেল সেন্ট্রাল প্রসেসারে। সেখান থেকে লঞ্চ টিউবে। মহাশূন্যে আওয়াজ নেই, কাজেই কোনও শব্দ হলো না। তবে বিস্ফোরিত হলো কমপ্রেসড গ্যাস, ওটা টিউব থেকে খসিয়ে দিল টাংস্টেনের রড। জিনিসটা নামতে লাগল দ্রুতবেগে।

সামান্য একটু কাত হয়ে পৃথিবীর দিকে নামছে টাংস্টেনের রড। ওটার নির্মাতারা এভাবেই চেয়েছে। কেউ আকাশে চোখ মেললে দেখবে, নেমে আসছে কোন উল্কাপিণ্ড। অ্যাটমসফিয়ারের শুরুতে মলিকিউলগুলোর কারণে প্রতিক্রিয়া হলো, সামান্য গরম হয়ে উঠল রড। তবে ওটা আরও নামতে শুরু করলে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পুরো দণ্ড হয়ে উঠল লাল রঙের আগুন। তারপর হলুদ। শেষে হয়ে উঠল জ্বলজ্বলে সাদা বজ্রের মত।

প্রচণ্ড তাপ তৈরি হয়েছে রড ও তার আশপাশে, তবে টাংস্টেন গলানোর মত তাপমাত্রা আসতে দেরি আছে। সেটা তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাটি থেকে অনেকেই দেখতে

পেল ওই উজ্জ্বল সাদা দণ্ড, প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মেসেডোনিয়া ও উত্তর গ্রিসের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মনিটরের ডিজিটাল ঘড়িতে এখন মাত্র একটা সংখ্যা দেখা যায়। উর্বশীকে উদ্ধার করবার আগে পর্যন্ত ওই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেনি রানা। এখন চোখ সরাতে পারছে না। উর্বশী কিছুতে মেডিকেলে যেতে রাজি হয়নি। আগে দেখবে ইয়োস দ্বীপে কী ঘটে। বাধ্য হয়ে ওষুধপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে ফারা। চিকিৎসার কাজও চলুক, আবার ছায়াছবিও দেখা হোক। সাগর আয়নার মত স্থির, কাজেই নিজের কাজ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ফারার।

পুবদিক তাক করে পূর্ণ গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল।

ইঞ্জিনগুলোর স্পিডোমিটারে দেখা যাচ্ছে লাল সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে গতি। সাধারণ অবস্থায় আপত্তি তুলত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার উর্বশী, তবে এখন একটি কথাও বলছে না। অপারেশন্স সেন্টারে সবাই চুপ। যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি মার্ভেল। এদিকে সময় ঘনিয়ে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের। ওরা যদি পারত, জাহাজের পিছনে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে আরেকটু গতি বাড়াতে চাইত।

একটানে ইয়ারফোন খুলে ফেলল আতাসি, কাকে যেন অভিশাপ দিল।

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ইএলএফ ব্যাণ্ডে সিগনাল পেলাম। আসছে ইয়োস থেকে। ট্রিগার কোড পাঠাতে শুরু করেছে ওরা।'

থমথম করছে রানার মুখ। সোহেল চেয়ে রইল ওর দিকে।

'কথা শেষ করতে পারবে না ওরা,' নিচু স্বরে বলল উর্বশী।

'ওয়েভলেংথ অনেক লম্বা, পুরো কোড পাঠাতে লাগবে বহু সময়।'

'অথবা ইএলএফ সিগনাল পেলেই ছড়িয়ে দেবে ভাইরাস,' শুকনো গলায় বলল অনিল।

একবার মনিটরের দিকে চাইল রানা। ভাবতে শুরু করেছে, বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন যদি ব্যর্থ হতে হয়, আফসোসের শেষ থাকবে না। আরেকবার ডিজিটাল ঘড়ি দেখল রানা। ঘনিয়ে আসছে চরম সময়।

পার্ল অভ মুনের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে স্বর্ণা ও কাশেম, নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে। মনে করতে চাইছে জাহাজের লণ্ড্রি কোথায়। আশপাশে দু'চারজন ক্রু দেখল। তবে তারা সবাই অসুস্থ, কারও দিকে চাইবার বা প্রশ্ন ছুঁড়বার মত অবস্থা তাদের নেই।

কিছুক্ষণ করিডোর ধরে এগুনোর পর শুনতে পেল ওরা ড্রায়ারের আওয়াজ। হাঁটবার গতি বাড়িয়ে দিল স্বর্ণা-কাশেম। বামের ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্প। ঘরের বাতি কম ওয়াটের। তারই ভিতর যে যার কাজে ব্যস্ত চাইনিজ কর্মীরা। কোনও দ্বিধা না করে লণ্ড্রির ভিতর ঢুকে পড়ল স্বর্ণা-কাশেম।

দরজার পাশে লুকিয়ে ছিল এক লোক, সে খপ করে ধরে ফেলল স্বর্ণার বামহাত। 'এখানে কী?' কড়া স্বরে জানতে চাইল।

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল স্বর্ণা। ওই লোককে চিনতে পেরেছে কাশেম, এ হেলিকপ্টার থেকে নেমেছে ব্রাঙ্কোর সঙ্গে। এখানে পাহারা থাকবে আগেই বোঝা উচিত ছিল, ভাবল কাশেম। ঝট্ করে ঘুরেই লোকটার দিকে পা বাড়াল। তবে

থমকে যেতে হলো। পিস্তল বের করে নলটা স্বর্ণার কপালে ঠেসে ধরেছে সে। কাশেমকে লক্ষ্য করে বলল, 'নড়বে না, নইলে মরবে তোমার সঙ্গিনী।'

যা ঘটছে সবই দেখছে চাইনিজ কর্মীরা, তবে কোনও সাহায্য করতে চাইল না। জামা-কাপড় ভাঁজ করছে, গুছিয়ে রাখছে চাদর, আরও ক'জন ইস্ত্রি করছে শার্টে।

'আমরা জরুরি কাজে এসেছি,' দু'পা পিছিয়ে গেল কাশেম। 'ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম রেডি হলো কি না দেখতে পাঠিয়েছেন।'

'তোমার আইডি ব্যাজ দেখি।'

ওভারঅলের সামনে থেকে আইডি খুলে নিল কাশেম। মোফিজ বিল্লাহ জানে না ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্সের কর্মীদের কী ধরনের আইডেনটিফিকেশন কার্ড দেয়া হয়। তবে নকল দিয়ে কাজ চালাতে পারার কথা। ব্রাঙ্কোর লোক নিশ্চয়ই জানে না তফাৎ কোথায়। 'এই যে, স্যর। আমি কাশেম বক্স।'

হঠাৎ দরজা জুড়ে হাজির হলো জ্যারোন্ ব্রাঙ্কো। 'কী হচ্ছে এখানে?' জানতে চাইল নিজের লোকের কাছে।

'এরা বলছে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম নিতে এসেছে।'

এক টানে উইণ্ডব্রেকার থেকে পিস্তল বের করল ব্রাঙ্কো। 'আমি ক্যাপ্টেনকে আগেই বলেছি, শুধু লণ্ড্রি ওঅর্কার ছাড়া কেউ যেন এখানে না ঢোকে। ...তোমরা কারা?'

'জাহাজের ক্রু, স্যর,' নরম স্বরে বলল কাশেম।

'সেক্ষেত্রে আসতে না। তোমরা ওই দলের কেউ।'

ধরা পড়তেই হবে, কাজেই বরফ-শীতল স্বরে জানাল স্বর্ণা, 'তোমাদের খেলা শেষ, ব্রাঙ্কো।' লোকটাকে চমকে দিয়েছে। 'আমরা ভাইরাসের ব্যাপারে সবই জানি। এ-ও জানি তোমরা

ক্রুজ শিপে ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়াবে। আমাদের লোক পৌঁছে গেছে প্রতিটি জাহাজে। এবার একে একে বন্দি হবে তোমরা। ডিসপার্সাল ডিভাইস সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখনও যদি বুঝতে না পারো, আরেকবার বলছি, অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করো। নইলে এ জীবনে বেরুতে পারবে না জেল থেকে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই, মেয়ে,' বলল ব্রাঙ্কো। 'তবে এই নাম আমার নয়। আমার আসল নাম ডার্কো বোজান। ইউগোস্লাভ যুদ্ধে এ নাম বারবার এসেছে পত্র-পত্রিকা ও সাধারণ মানুষের মুখে, দুনিয়ার অন্যতম গণহত্যাকারী হিসাবে। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার ভাল করেই জানা আছে, ধরা পড়লে আমার আসল নাম বেরিয়ে আসবে। কোনদিনই আর জেল থেকে বেরুতে পারব না।'

'তোমার মাথার ঠিক আছে?' স্বাভাবিক স্বরে বলল কাশেম। 'রেসপন্সিভিস্টদের এই ফালতু পরিকল্পনার জন্য নিজেও মরতে চাও? গোল্ড অভ মার্সে কী ঘটেছে আমরা দেখেছি। মরতে হবে তোমাকেও।'

'সব তোমরা জানো না,' বলল খুনি ব্রাঙ্কো। 'মিথ্যার পর মিথ্যা আউড়ে চলেছ নিজেদের বাঁচাতে। ওগুলোর ভিতর রয়েছে ভাইরাস,' হাতের ইশারা করে বিশাল ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখিয়ে দিল সে। 'গোল্ড অভ মার্সে যেগুলো ছাড়ি, সেগুলো আর এগুলো এক জিনিস নয়। একই স্ট্রেইন থেকে তৈরি, তবে এটা মানুষের প্রাণ নেবে না। বলতে পারো, বদলে দেবে মানুষকে।'

'আট শ' মানুষকে খুন করেছ তুমি, আর বলছ...' রাগে কাঁপছে স্বর্ণা।

হেসে ফেলল লোকটা। 'যা খুশি ভাবতে পারো। তবে ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল কিন্তু সত্যিই নিপাট ভদ্রলোক। তাঁর এই ভাইরাস শুধু জ্বর এনে দেবে, সঙ্গে সামান্য প্রতিক্রিয়া। বন্ধ্যা হয়ে যাবে মানুষ। আগামী কয়েক মাসের ভিতর দুনিয়ার বেশির ভাগ লোক সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হারাবে।'

স্বর্ণার ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপর। তারপর যা হয় হোক!

জ্বরের ভিতর টলে উঠল কাশেম। প্রথমে ভাবল ভুল শুনেছে। পরক্ষণে বুঝল, সব নিজ কানে শুনেছে। ডাইভ দিতে চাইল ও সার্বের উপর। কিন্তু পাশ থেকে লোকটার সাগরেদ মাথার উপর নামিয়ে আনল পিস্তলের বাঁট। ধড়াস করে পড়ল কাশেম, জ্ঞান হারিয়েছে।

দু'হাতে স্বর্ণার দুই কাঁধ ধরল ব্রাঙ্কো, মেয়েটির মুখ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে থামল দয়ামায়াহীন দুই চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমরা শীঘ্রি ভাইরাস ছাড়ব। চাইলে প্রথম শিকার হতে পারো।'

জবাবে লোকটার মুখে থুতু দিল স্বর্ণা।

সার্চ করতে গিয়ে হঠাৎ কাজ বন্ধ করল ইয়োস দ্বীপের গার্ডরা, চোখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। প্রথমে মনে হলো খুব উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হলো পুরো আকাশ জুড়ে ওটা। প্রথমে অস্বস্তির ভিতর ছিল তারা, তবে দ্রুত সেটা পরিণত হলো তীব্র আতঙ্কে। মহাশূন্য থেকে নেমে আসছে কী ওটা? হঠাৎ এই দ্বীপের দিকে কেন? লোকগুলো দৌড়াতে শুরু করল আড়াল পাওয়ার আশায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সতর্ক-ঘণ্টি বাজাচ্ছে। কিন্তু পালাবে কোথায়?

ট্র্যান্সমিটিং রুমে টেবিলের খাটো একটা পায়া ঠকর-ঠকর আওয়াজ করছে, অধৈর্য লাগছে ডিয়েটস কেসলারের। ডিসপ্লেতে দেখছে খুব বেশি ধীরে সিগনাল দিতে শুরু করেছে ইএলএফ। পুরো পৃথিবী ঘুরে নির্ভুল তথ্য পৌঁছে দেবে গন্তব্যে। তবে আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর শুরু হয়ে যাবে কাজ। ভ্যাকিউম-সিল্ড কন্টেইনার থেকে ভাইরাস মিশবে ওয়াশিং মেশিনের পানিতে। তারপর সেই পানি সংক্রামিত করবে চাদর, তোয়ালে ও ন্যাপকিনকে। প্রতি লণ্ড্রির সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। যতক্ষণ না শেষ হয় কন্টেইনারের ভাইরাস।

মৃদু হাসি ফুটল ডিয়েটস কেসলারের ঠোঁটে।

ইয়োস দ্বীপের প্রায় মাঝখানে আঘাত হানল টাংস্টেনের প্রজেক্টাইল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্যাসিলিটি থেকে ঠিক তিন মাইল দূরে। ওটার প্রচণ্ড গতি ও ওজনের কারণে সৃষ্টি হলো ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণের।

মুহূর্তে উধাও হলো দ্বীপের মাঝখানটা। গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে গেল প্রকাণ্ড সব পাথরখণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে বিশাল এক ছাতার মত ছিটিয়ে গেল চারপাশে। তৈরি হলো ভয়াবহ শকওয়েভ। দ্বীপের আকাশে উঠে গেল কয়েক শ' হাজার টন পাথর। বিশাল সব খণ্ড গলে গেল জেলির মত, লাল হয়ে জ্বলতে লাগল লাভার মত। তারপর হিসহিস আওয়াজে নেমে এল সব শীতল সাগরের বুকে।

মুহূর্তে ছাই হলো আতঙ্কিত গার্ডরা, মিশে গেল ধূলির সঙ্গে।

এরপর শকওয়েভ আঘাত হানল ফ্যাসিলিটির উপর। কঠিন ফেরোকংক্রিট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, যেন পোর্সেলিন। ধসে পড়ল না দালান, বরং গোটা দালানটাকে টেনে তোলা হলো

মাটির গভীর থেকে। ছুঁড়ে দেয়া হলো উপরে। দেয়াল, ছাত ও মেঝেগুলো রুটির মত চ্যাপটা হলো, সেসবের সঙ্গে মিশে গেল মানুষগুলো। পুরো ফ্যাসিলিটি ধ্বংস হলো মুহূর্তে। মাইলের পর মাইল জোড়া ইএলএফ অ্যান্টেনার মোটা তামার তার উপড়ে এসে প্রচণ্ড তাপে গলে নেমে গেল সাগরে।

থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি, টিলাগুলো একের পর এক ধসে পড়তে লাগল সাগরে। দ্বীপের এপিসেন্টারে অসংখ্য ফাটল তৈরি হলো, শকওয়েভ থেমে যাবার পর রইল একটার বদলে সাতটা অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

ইয়োস দ্বীপে অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল আঘাত হানার ফলে সাগরে তৈরি হলো বিশাল এক ঢেউ। তবে ওটা সুনামি নয়, ছুটছে সামনের পথ ধরে, ক্রমে বাড়তে লাগল উচ্চতা। পানির বিশাল প্রাচীর ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটল চারদিকে, মাথার উপর পাক খেতে লাগল ফেনা। ওটা যেন তৈরি হয়েছে পাতাল নরকে, কপাট খুলে দিতেই উঠে এসেছে পৃথিবীতে—সাগরের বুক চিরে প্রচণ্ড গতি তুলে ছুটছে জল-প্রাচীর। খুব বেশিক্ষণ থাকবে না এই ঢেউ, গতি ও উচ্চতা হারিয়ে একসময় মিলিয়ে যাবে সাগরের বুকে। তবে যতক্ষণ ওই আকার নিয়ে বিরাজ করবে, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

চল্লিশ মাইল দূরে ছুটছে মার্ভেল। ইঞ্জিনগুলো সর্বোচ্চ গতি তুলেছে। প্রতিটি হ্যাচ পরীক্ষা করে আটকে দেয়া হয়েছে। ক্রেডলে তুলে বেঁধে দেয়া হয়েছে সাবমারসিবল দুটো। খুচরো যন্ত্রপাতিসহ ছোটোখাটো সবকিছু রেখে দেয়া হয়েছে ক্লজিট ও ড্রয়ারে। সবাই জানে ওই ঢেউ থেকে সহজে রক্ষা পাবে না ওরা।

অপারেশন্স সেন্টারে অপেক্ষা করছে সিনিয়ররা।

'ঢেউ কখন আসছে?' জানতে চাইল রানা।

'আন্দাজ পাঁচ মিনিট,' হেলমস থেকে বলল গগল।

জাহাজের পিএ সিস্টেম চালু করল রানা। 'মাসুদ রানা বলছি। সবাই শক্ত কিছু ধরে থাকুন। ওই ঢেউ জাহাজটাকে নিয়ে খেলবে। আর বাকি মাত্র পাঁচ মিনিট।'

মাস্তুলের ক্যামেরা পিছন দিক দেখাচ্ছে। চালু করা হয়েছে নাইট ভিশন মোড। ওই ঢেউ কীভাবে আসছে দেখবে ওরা। ওটা আদিগন্ত জুড়ে আসবে। তা ভেদ করে বেরুতে পারবে না কেউ। দমাতে পারবে না। ওটার মাথার উপর মুকুটের মত জ্বলজ্বল করবে ফসফরাস, দেখে মনে হবে সবুজ আগুন।

'ওটার মাথা দেখা যাচ্ছে,' হঠাৎ বলে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, আসছে,' থমথমে স্বরে বলল গগল। খেয়াল করেছে একটু বাঁকা পথে চলেছে মার্ভেল, দ্রুত হাতে রাডার নিয়ন্ত্রণ করল সে। সোজা করে নিল জাহাজ। ওই বিশাল ঢেউয়ের প্রাচীর থেকে রক্ষা পেতে হলে নাক বরাবর সামনে থাকতে হবে। যেন সরাসরি স্টার্নের উপর পড়ে ঢেউ। তা যদি না করা যায়, এক পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দেবে মার্ভেলকে। তরল প্রাচীর যখন সরবে, ততক্ষণে কয়েক গড়ান দিয়ে তলিয়ে গেছে জাহাজ।

'সাবধান!' বলল রানা। 'চলে এসেছে ওটা!'

সবার মনে হলো উঠেছে এক্সপ্রেস এলিভেটরে। প্রচণ্ড লাফ দিয়ে উঠল স্টার্ন। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো জাহাজের নীচে সাগর নেই। ঢেউয়ের বিকট আওয়াজের উপর দিয়ে ভেসে এল মার্ভেলের খোলের করুণ গোঙানি। সাগরের বুকে নাক ডুবিয়ে দিল বো। ইঞ্জিনের পাওয়ার বন্ধ করে দিল গগল, নইলে

আরও দ্রুত ডুববে প্রাউ। পরক্ষণে এক হ্যাঁচকা টানে মার্ভেলকে গ্রাস করল তরল প্রাচীর। জাহাজ এত দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে যে সিটে ঝাঁকি খেল সবাই। প্রাচীরের উপর চড়তে লাগল মার্ভেলের স্টার্ন, কিন্তু বো তাক হলো পাতালের দিকে। চট্ করে ওয়াটার স্পিড দেখে নিল গগল। একই কাজ করেছে রানাও। মাত্র চার নট গতিতে নড়ছে মার্ভেল। তবে খোলের তলের গতিবেগ ঘণ্টায় আশি মাইলের বেশি!

দানবীয় ঢেউয়ের ভিতর গেঁথে গেল স্টার্ন, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। ভেসে গেল ডেক। জাহাজের স্কাপারগুলো দিয়ে ছুটতে লাগল ফেনায়িত পানি। ড্রাইভ টিউব দিয়ে ঢুকছে ধবধবে সাদা নিরেট জেট। স্টার্নের শেষ ষাট ফুট ঝুলে রইল ঢেউয়ের পিছনে, তারপর নাক তুলতে শুরু করল বো। প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে তরল প্রাচীর। ওটার পিছনে নেমে যেতে লাগল মার্ভেলের স্টার্ন। কিছুই রইল না জাহাজের নীচে!

ইঞ্জিনগুলোর সমগ্র শক্তি কাজে লাগাতে চাইল গগল, নীচে পেতে চাইল সাগরকে। তারপর পানির ভিতর ছুরির মত নেমে এল মার্ভেলের স্টার্ন। ইঞ্জিন চালু না থাকলে চারপাশের সাগর চেপে ধরবে জাহাজটাকে। মুহূর্তে ডুববে বো, সাগরতল লক্ষ করে রওনা হবে মার্ভেল।

ষাট ডিগ্রি কোণ তৈরি করে পিছনে হেলে গেল জাহাজ, বিক্ষুব্ধ সাগরে ঝপাস করে নেমে এল ফ্যানটেইল, সামনে থেকে টান দিল তরল প্রাচীর। তারপর কেটে যেতে লাগল সমস্ত প্রভাব। তবে পিছন কার্গো হ্যাচের উপর চেপে বসল সাগর। হ্যাচের উপর পুরু রাবার সিল না থাকলে ভেসে যেত হেলিকপ্টার হ্যাঙার।

'বাহ্, লক্ষ্মী মেয়ে!' আদুরে স্বরে বলছে গগল। 'সামনে শান্ত

পানি। আমি জানি তুই পারবি!'

ধীরে সোজা হতে শুরু করেছে মার্ভেল, তারপর দানবীয় ঢেউ থেকে বেরিয়ে এল বো। হঠাৎ জাহাজের স্টার্ন ডুবে যাওয়া থেমে গেল। স্টার্ন ও বো সোজা হচ্ছে, তবে ডুবছে না, আবার ভেসেও উঠছে না। যেন খোড়লের ভিতর পড়েছে মার্ভেল। চারপাশ থেকে প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে প্রকাণ্ড ঢেউগুলো। মার্ভেলের লোহার খোল গোঙাচ্ছে অবিরাম। ইঞ্জিনগুলো এগারো হাজার টন নিয়ে ভাসতে চাইছে।

মনিটরের দিকে চেয়ে রইল সবাই।

কিছুক্ষণ পর বলে উঠল রানা, 'ভেসে উঠছি!'

ডেক থেকে সরতে শুরু করেছে পানি। জেগে উঠল স্টার্নের হ্যাচ। সাগর-সমাধি থেকে জাহাজটাকে তুলতে চাইছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন! তারপর দেখা গেল জ্যাক স্টাফ থেকে ল্যাগ-ব্যাগ করছে ভেজা তাইওয়ানি পতাকা। হৈ-হৈ করে উঠল জুনিয়ার ক্রুরা। ইঞ্জিনের পাওয়ার কেটে দিল গগল।

'এ সম্ভব শুধু আমাদের গগলের পক্ষে!' সবার আগে বলে উঠল অনিল।

'আমার চেয়ে ঢের বড় ওস্তাদ এখানে আছে,' বলল গগল। আঙুল তাক করল রানার দিকে। 'ওই লোক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি কখনও মার্ভেলকে নিয়ে কসরৎ করিনি, তুমি ওকে বুঝেছ, কাজেই আজ তুমি না চালিয়ে নিলে তলিয়ে যেত এ জাহাজ।'

দুই পুরুষ পরস্পরের প্রশংসা করছে, এমনি এমনি নয়। সবাই বুঝতে পারছে, এরা যে যার কাজে সেরা।

'এবার আমরা কী করব?' দশ সেকেণ্ড পর জানতে চাইল

উর্বশী।

'স্বর্ণা আর কাশেমকে খুঁজতে হবে,' বলল রানা। 'তবে তুমি থাকবে ফারার মেডিকেলে।'

বিশ

পার্ল অভ মুন।

ডিয়েটস কেসলারকে রেডিওতে না পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল ব্রাঙ্কো। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে! মানুষটা কোনও সাড়া দেবে না কেন! এমন কী, একবার ফোন পর্যন্ত করেনি।

রেডিও রুমে বেতারের সুইচ বন্ধ করে দিতে বলেছে ব্রাঙ্কো। তবে বিশ মিনিট পর জাহাজে এল স্যাটালাইট-নিউজ ব্রডকাস্ট। দক্ষিণ ইউরোপে উল্কাপিণ্ড দেখা গেছে। ওটার ওজন হতে পারে এক টনের বেশি। তুরস্কের তীরের কাছে আঘাত হেনেছে ওটা। ফলে তৈরি হয়েছে বিশাল এক সুনামি। একটা গ্রিক ফেরি থেকে সে ঢেউ দেখা যায়। তবে তখন মাত্র কয়েক ফুট উঁচু ছিল। কাজেই বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা ছিল না।

ওটা উল্কাপিণ্ড নয়, অন্তরের গভীরে টের পেল ব্রাঙ্কো। জিনিসটা ছিল কোনও পারমাণবিক বোমা। ওর দুই বন্দি মিথ্যা বলেনি। এরা যে দলের লোক তারা সবই বুঝতে পেরেছে। এবং যে ভাবে হোক যোগাড় করেছে নিউক্লিয়ার বোমা। মানুষজন ইউরোপের দক্ষিণে যে আলো দেখেছে, তা এসেছে কোনও ক্রুজ

মিসাইল থেকে। ওটার ওঅরহেড আঘাত হেনেছে ইয়োস দ্বীপে।

টেলিভিশনের মিউট বাটন টিপল ব্রাঙ্কো। স্ক্রিনের মেয়েটি এবার বকতে থাকুক। এসব জানবার প্রয়োজন নেই ব্রাঙ্কোর। এখন পরিস্থিতি বুঝে কাজে নামতে হবে। ওই দল থেকে দু'জন অপারেটিভ উঠেছে পার্ল অভ মুন জাহাজে। এ থেকে বোঝা যায় তারা জানে সে নিজেও এই জাহাজে উঠেছে। না, বোধহয় যুক্তি সঠিক হলো না। ও নিজে এসেছে কারণ, আন্দাজ করে নিয়েছে ওদের লোক জাহাজে থাকবে। তার মানে ওরা জানে না সে এখানে। সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হওয়া উচিত, ওই দুই বন্দিকে খুন করা। তারপর প্রথম সুযোগেই জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া।

পরের বন্দর ক্রিটানের রাজধানী ইরাকলিয়ন।'

'তৈরি থাকবে ওরা,' বিড়বিড় করে বলল ব্রাঙ্কো।

যে দল এই দু'জনকে পাঠিয়েছে—এরা সম্ভবত সিআইএ, তাতেই বা কী যায় আসে—তাদের লোক থাকবে বন্দরে, দেখা করতে চাইবে এদের সঙ্গে। এখন প্রথম কথা: ও নিজে তাদের জাল কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে? ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে? তার চেয়ে ঢের ভাল হয় জাহাজ থামিয়ে একটা লাইফবোট নিয়ে সরে পড়া। ইজিয়ানে হাজার খানেক দ্বীপ আছে। একটায় লুকিয়ে থাকতে পারবে। পরে ভাববে কী করা যায়।

তবুও একটা কথা রয়ে যায়। ওই দুই বন্দির কী হবে? খুন করবে, না জিম্মি হিসাবে নেবে? ঝামেলা তৈরি করবে ওই লোকটা। মেয়েটাও কম নয়। এদেরকে বিপজ্জনক মনে হয়েছে ওর। ভাল হয় খুন করলে, পরে ঝামেলা করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে একা উধাও হবে সে।

আরেকটা বিষয় রয়ে গেল। ভাইরাসের কী হবে?

ক্যানিস্টারের ভিতর মাত্র কয়েক সপ্তাহ টিকবে ওই জিনিস।

তার মানে ওগুলো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েও সুবিধা হবে না। এখন যদি ছড়িয়ে দেয়া যায়, হাজার খানেক মানুষকে ইনফেক্ট করবে। তারা বাড়ি ফিরে আক্রান্ত করবে আরও বহু মানুষকে। কিন্তু... না, তা হবে না, জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই কোয়ারাণ্টাইন করা হবে যাত্রীদের। কয়েক সপ্তাহ পর তারা আর ছড়াতে পারবে না রোগ।

তবে কিছু না পাওয়ার চেয়ে তো ভাল?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্রাঙ্কো, চলে এল ব্রিজে। পুরোপুরি রাত নেমেছে। ঘরের ভিতর কন্সোল ও রাডার রিপিটারগুলোর সামান্য আলো। ওয়াচে রয়েছে দুই অফিসার ও দুই হেলমস-ম্যান। ব্রাঙ্কোর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বিয়ারম্যান দাঁড়িয়েছে ফ্লাইং ব্রিজে, আরাম করে ফুঁকে চলেছে একটার পর একটা সিগারেট।

'এ জাহাজের সবার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে, স্যর,' বলল বিয়ারম্যান। 'তার মানে এক নম্বর ভাইরাস ছড়িয়ে সবাইকে প্রিপেয়ার করে রেখে তারপর মারা পড়েছে চাক গুণ্ডারসন। এবার আমরা দুই নম্বরটা ছড়িয়ে দিলেই তো এই নরক থেকে নিশ্চিন্তে কেটে পড়তে পারি।'

'ঠিক বলেছ। তুমি লণ্ড্রি রুমে যাও,' তাকে নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো। 'ম্যানুয়ালি ছড়িয়ে দাও ভাইরাস।'

'ট্র্যান্সমিটারে কোনও সমস্যা?'

'তোমাকে জানানোর মত তেমন কিছু না। সোজা লণ্ড্রি রুমে যাও, যা বলছি করো। তারপর লিয়ার্ডকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে এখানে। আমরা জাহাজ থেকে নেমে যাব।'

'সমস্যাটা কী?'

বিরক্ত হলো ব্রাঙ্কো। 'শুধু জেনে রাখো, আমরা ক্রিটে পৌঁছলে আমাদের গ্রেফতার করা হবে। তাই লাইফবোট নিয়ে

আমরা আগেই নেমে পড়ব সাগরে।'

অফিসারদের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'আরেহ্, ওটা কোত্থেকে এল! লোকটা পাগল নাকি, কী করে! ক্যাপ্টেনকে এখানে আসতে বলো। কলিশন অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও!' উল্টো দিকের ফ্লাইং ব্রিজের দিকে পা বাড়াল সে।

'আমার পাশে থাকো,' বিয়ারম্যানকে নতুন নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো। অফিসারের পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। সরাসরি পার্ল অভ মুনের দিকে আসছে বিশাল এক ফ্রেইটার। মনে হলো ওটা ভুতুড়ে কোনও জাহাজ। বাতি জ্বলছে না একটাও। ঘণ্টায় বিশ নট গতি তুলে তেড়ে আসছে গোঁয়ারের মত।

ব্রিজের সবার উদ্দেশে ধমকে উঠল অফিসার, 'তোমরা এখানে বসে বসে কী করছ? রেইডারে দেখোনি ওটাকে?'

'শেষবার যখন দেখেছি, ওটা দশ মাইল দূরে ছিল,' বলল জুনিয়ার অফিসার। 'কসম খেয়ে বলতে পারি, সেটা মাত্র কয়েক মিনিট আগের কথা।'

'অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও।'

পার্ল অভ মুনের কান ফাটানো হর্ন কোনও কাজে এল না। সরাসরি ক্রুজ শিপের দিকে এগিয়ে আসছে ফ্রেইটার। মনে হলো ক্রুজ শিপকে মাঝখান থেকে কেটে দু'ভাগ করতে চাইছে। যখন মনে হলো সংঘর্ষ এড়ানো গেল না, ঠিক তখন বাঁক নিতে শুরু করল ফ্রেইটার। আগে কখনও এ ধরনের জাহাজ পরিচালনা দেখেনি পার্ল অভ মুনের অফিসাররা। ঠিক পাশে চলে এল ফ্রেইটার। মাত্র বারো ফুট দূরে রইল দুই জাহাজ। এত রেগে না গেলে হৈ-হৈ করে প্রশংসা করত দুই অফিসার।

খবরের কাগজের একটা রিপোর্টের কথা মনে পড়ল ব্রাঙ্কোর। বিশাল এক জাহাজ বে-আইনী ভাবে কোরিন্থ ক্যানেলে

ঢুকে আরেক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেইরাতে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অমল দাশাকে। সব সময় ব্রাঙ্কোর মনে হয়েছে, ওই দুই দুর্ঘটনার ভিতর সম্পর্ক থাকতে পারে। আর আজ এই কাল-রাতে আবার হাজির হয়েছে বিশাল এক ফ্রেইটার। নিজেকে কোণঠাসা ইঁদুরের মত লাগল ব্রাঙ্কোর। পরিষ্কার বুঝছে, ওকে ধরতে এসেছে ওরা!

আবার ব্রিজে ঢুকল ব্রাঙ্কো, সরে গেল ক্রুদের কাছ থেকে। চারপাশে এত লোহা-লক্কর, ভাল কাজ করবে না ওয়াকি-টকি। লিয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। এবার পাওয়া গেল তাকে। একইসঙ্গে কপ্টারে করে এসেছে তারা তিনজন।

'লিয়ার্ড, ব্রাঙ্কো বলছি। একটা কথা মন দিয়ে শোনো, ইঞ্জিন রুম থেকে সবাইকে সরিয়ে দেবে তুমি। নিজে দরজা বন্ধ করে থাকবে ওখানে। কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

বিয়ারম্যানের মত বাড়তি প্রশ্ন তুলল না লিয়ার্ড। 'ঠিক আছে, বস্, ইঞ্জিন রুম থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে দরজা আটকে বসে থাকব। এই তো?'

'হ্যাঁ।' উইণ্ডব্রেকারের তলা থেকে পিস্তল বের করল ব্রাঙ্কো। 'বিয়ারম্যান, বেরিয়ে যাও, সঙ্গে নিয়ে আসবে সাত-আটটা মেয়ে। তারা ক্রু না যাত্রী, সে নিয়ে ভাববে না। জলদি যোগাড় করে আনো। আর হ্যাঁ, আমার কেবিন থেকে বাড়তি অস্ত্রগুলোও নিয়ে আসবে।' আবারও প্রশ্ন তুলবে বিয়ারম্যান, কাজেই ব্যাখ্যা দিল ব্রাঙ্কো, 'ডিয়েটস কেসলার মারা গেছে। আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এসবই করেছে ওই ফ্রেইটারের লোকগুলো। এবার দৌড় দাও! জলদি!'

'ইয়েস, স্যর!'

বিয়ারম্যান বেরিয়ে যেতেই পিস্তলের মুখে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, ব্রিজের কাউকে সুযোগ না দিয়ে গুলি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল দুই ক্রু ও এক অফিসার। জাহাজের হর্নের নীচে চাপা পড়ল মৃদু আওয়াজ। ফ্লাইং ব্রিজে দ্বিতীয় অফিসার জানে না কী ঘটেছে। ব্রিজের দরজা বন্ধ করে দিল ব্রাঙ্কো। ঠিক তখন এসে ঢুকল অফিসার, রক্তাক্ত দেহগুলো দেখে বিস্ফারিত হলো চোখদুটো। একবার ব্রাঙ্কোর দিকে চাইল, পরক্ষণে তার ইস্ত্রি করা সাদা ইউনিফর্ম শার্টের বুকে ভেসে উঠল দুটো রক্ত গোলাপ। নিঃশব্দে কী যেন বলতে চাইল সে, নড়তে লাগল চোয়াল। তবে তা দু'সেকেণ্ডের জন্য, ধাক্কা খেল বাল্কহেডে, পিছলে পড়ল লাশ ডেকের উপর।

ওই ফ্রেইটার থেকে ক্রুজ শিপে লাইন ফেলতে পারে, উঠে আসতে পারে কেউ, কাজেই ব্রিজের কণ্ট্রোলের সামনে চলে গেল ব্রাঙ্কো। ওখানে রয়েছে ডায়াল, ইঞ্জিনের গতি বাড়ানো বা কমানোর জন্য। পাশে জয়স্টিক, গুটাই রাডার কণ্ট্রোল। ব্রিজ থেকে আধুনিক এই বিশাল জাহাজ চালাতে এদুটোর বেশি কিছু লাগে না।

সর্বোচ্চ গতি পেতে থ্রটল ঘুরিয়ে দিল ব্রাঙ্কো, নাড়তে শুরু করল জয়স্টিক। মরচে ধরা ফ্রেইটার থেকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে ক্রুজ শিপকে। মাত্র দু'বছর হলো সাগরে নামানো হয়েছে পার্ল অভ মুনকে। আয়েশ করতে তৈরি, প্রচণ্ড গতির জন্য নয়—তবে ব্রাঙ্কো জানে, এ জাহাজ দৌড়ে হারিয়ে দেবে ফ্রেইটারকে।

দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে পার্ল অভ মুন, তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর পিছু নিল ফ্রেইটার। দেখতে দেখতে কাছে চলে এল। অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হলো ব্রাঙ্কো। ওই জাহাজ দেখলে মনে হয় যেকোন মুহূর্তে খসে পড়বে, কিন্তু

দৌড়ে হারাতে চলেছে এই প্রমোদ-তরীকে! ডায়ালের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। চট্ করে পড়ে নিল লেখাগুলো। ডায়ালে আরও মোচড় দিলে মিলবে ইমার্জেন্সি পাওয়ার।

তা-ই করল ব্রাঙ্কো, টের পেল বাড়তে শুরু করেছে গতি। ব্রিজের জানালা দিয়ে চাইল। পিছিয়ে পড়ছে ফ্রেইটার। নাক দিয়ে সন্তুষ্টির আওয়াজ বেরুল তার। দুই জাহাজের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি হতে দু'ঘণ্টা লাগবে, তারপর পার্ল অভ মুন থেকে লাইফবোট নিয়ে নেমে পড়বে সে।

কিন্তু ওই ফ্রেইটার যেন খেলতে চাইছে ওকে নিয়ে! কীভাবে যেন আবারও গতি পেয়েছে! পার্ল অভ মুনের তিরিশ ফুট বামে এগিয়ে চলেছে সমান গতিতে! একবার ডায়াল দেখে নিল ব্রাঙ্কো। শান্ত সাগর চিরে ছত্রিশ নট গতিতে চলেছে প্রমোদ-তরী! সাধারণ কোনও ফ্রেইটার এ গতি পেতেই পারে না! অতি সহজে পার্ল অভ মুনের পাশে পাশে ছুটছে!

হতাশা চেপে ধরল ব্রাঙ্কোকে, তবে ক'মুহূর্ত পর রূপান্তরিত হলো তা প্রচণ্ড রাগে। ব্রিজের পাশের করিডোর থেকে ভেসে এল আগ্নেয়াস্ত্রের হুঙ্কার। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার। হুইলহাউসের দরজার কাছে চলে গেল ব্রাঙ্কো, একহাতে খুলল বল্টু, দড়াম করে খুলে দিল কপাট। অন্য হাতে তৈরি পিস্তল। কার্পেট মোড়া ডেকের উপর দেখল ক্যাপ্টেনকে, বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। প্যাসেজওয়েতে লুকাতে চাইছে আরও চার অফিসার। এরা বিয়ারম্যানকে ঠেকাতে গিয়ে ব্যর্থ। তাদের পিছনে দেখা গেল ব্রাঙ্কোর স্যাঙাতকে, অস্ত্র তাক করে হুমকি দিয়ে চলেছে। খানিক দূরে সাতটি মেয়ে, থরথর করে কাঁপছে।

'মেয়েগুলোকে ভিতরে আনো,' পিস্তল নেড়ে ধমকে উঠল ব্রাঙ্কো।

জটলা তৈরি করেছে মেয়েগুলো। দু'চারজন ফুঁপিয়ে উঠছে। সবাই পিছন থেকে তাড়া খেয়ে হুড়মুড় করে ব্রিজে এসে ঢুকল।

'বন্ধ করুন পাগলামি,' এক সিনিয়র অফিসার বলে উঠলেন।

জবাবে তার কপালে গুলি করল ব্রাঙ্কো, অন্যদের দিকে না চেয়ে বন্ধ করে দিল ধাতব দরজা। এক মেয়ের কনুই খপ করে ধরল। কৃষ্ণকেশি মেয়েটিকে আগে দেখেছে ডাইনিং রুমে, ওয়েট্রেস। তাকে হেঁচড়ে নিয়ে এল হেলম-এ। সামনের ফ্রেইটার ও নিজের মাঝখানে রাখল মেয়েটিকে। জীবন্ত বর্ম। ওই ফ্রেইটারে স্নাইপার থাকলে হতাশ হবে। এরই ভিতর সে খেয়াল করেছে, আবারও চেপে এসেছে ফ্রেইটার। দুই জাহাজের মাঝে দূরত্ব বড়জোর দশ ফুট।

'মাছের মত আমাকে খেলিয়ে তুলতে চাও?' বিড়বিড় করে বলল ব্রাঙ্কো। থাবা দিয়ে নাড়ল রাডার কন্ট্রোল। পোর্টের দিকে নিয়ে চলেছে জাহাজটাকে।

তীব্র গতিতে সরতে শুরু করেছে প্রমোদ-তরী। ওটার বো গিয়ে গুঁতো দিল ফ্রেইটারের পাশে। বিকট ধাতব আওয়াজ হলো। লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে ছিঁড়ছে প্লেটিং। স্টারবোর্ডে কাত হয়ে গেল পার্ল অভ মুন। তৈরি ছিল, তবুও ডেকে পিছলে পড়তে গিয়ে সামলে নিল ব্রাঙ্কো। বো'র রেলিং চুরমার, পরস্পরের উপর চেপে বসতে চাইছে দুই জাহাজ। পার্ল অভ মুনের দামি কেবিনগুলোর বারোটা ব্যালকনি ছিঁড়ে পড়ল সাগরে। ক্রু-যাত্রীরা ছিটকে পড়ল এখানে-ওখানে। আহত হলো অনেকে।

পার্ল অভ মুনকে একটু সরিয়ে বাঁক নিতে শুরু করল ব্রাঙ্কো। পাশে রইল ফ্রেইটার, তবে আগের চেয়ে কিছুটা বেশি দূরত্ব

রাখছে। ওটার ক্যাপ্টেন চাইছে না আবার সংঘর্ষ হোক।

হঠাৎ একটা চিন্তা এল ব্রাঙ্কোর, তাতে খুব সহজে এই খেলা শেষ হবে। হেলম থেকে সরে গেল সে, হোলস্টারে পিস্তল রেখে মেঝে থেকে তুলে নিল এক অফিসারের লাশ। ওটাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। নিজের সামনে রাখল মৃতদেহ, এক হাতে ধরেছে লাশের বেল্ট, অন্য হাতে ঘাড়—দূর থেকে দেখলে মনে হবে পিস্তলের মুখে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ড থামল ব্রাঙ্কো, নিশ্চিত হলো ফ্রেইটার থেকে ওদের দেখা গেছে। এবার দ্রুত পায়ে চলে গেল ফ্লাইং ব্রিজ রেলিঙের পাশে, রেলিং পার করিয়ে দিল লাশটাকে।

নিজে লুকিয়ে পড়ল রেইলের আড়ালে, দেখতে পেল না দশ তলা থেকে সাগরে গিয়ে পড়েছে লাশ। ফ্রেইটারের লোকগুলোর দেখবার কথা। নিশ্চয়ই চাইবে না নীরিহ মানুষ ডুবে মরুক? লাশ উদ্ধার করতে কমপক্ষে একঘণ্টা। হেসে ফেলল ব্রাঙ্কো। ব্যাটারা ধাওয়া রেখে এখন উদ্ধার করবে লাশ!

'ড্যামেজ রিপোর্ট,' দুই জাহাজ সরে যেতেই বলে উঠল রানা।

'ক্রুরা দেখতে গেছে,' জানাল সোহেল।

ওরা যখন ক্রুজ শিপের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করতে পারল না, ঠিক করল লাউডস্পিকারে ক্রুদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ওদের ধারণা, ডিয়েটস কেসলারের সঙ্গে জড়িত ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্সের মালিক, তবে সে-লোক নিশ্চয়ই সব অফিসারকে কিনে নেয়নি। একবার যদি তাদের জানানো যায়, ব্রাঙ্কো জাহাজে কী করতে চলেছে, তারাই বাধা দেবে।

রানার ধারণা ছিল শিপ মাস্টার জাহাজ সরিয়ে নেবে, ভাবতে পারেনি ইচ্ছে করে মার্ভেলে গুঁতো দেবে লোকটা।

পৃথিবীতে এমন কোনও ক্যাপ্টেন নেই যে নিজের জাহাজের ক্ষতি করবে, বা ক্রুদের বিপদে ফেলবে।

একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছল রানা। 'পার্ল অভ মুন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'তা-ই আসলে। এবার কী করতে চাস?'

'আবার পাশে যেতে হবে, ফেলতে হবে গ্র্যাপলিং হুক। আমাদের জানা নেই ব্রাঙ্কোর সঙ্গে ক'জন, তবে আন্দাজ বারো-চোদ্দজন থাকতে পারে। কাবু করতে বেশি সময় লাগবে না।'

'তুই তো দেখি ব্লাডি মর্গান স্টাইলে কথা শুরু করলি,' বলল অনিল।

'ঈ, মেট।'

'ওই লোক যদি আবারও চড়াও হয়, তোমরা থাকবে দুই জাহাজের মাঝে,' বলল গগল। 'ফলাফল?'

'আমরা যাতে না মরি তা দেখবে তুমি,' বলল রানা। 'ফু-চুংকে বলতে হবে আমরা ক'জন কমাণ্ডো নিয়ে ওই জাহাজে উঠব।' ইন্টারকমের বাটন টিপতে গেল রানা।

তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল আতাসি, 'কে যেন উইং ব্রিজ থেকে একজনকে ফেলে দিয়েছে!'

'কী বললে?' একই সঙ্গে জানতে চাইল রানা ও সোহেল।

'একলোক, কালো উইণ্ডব্রেকার, এইমাত্র এক অফিসারকে ছুঁড়ে ফেলেছে পানিতে!'

'গগল, ফুল রিভার্স,' বলল রানা। ইন্টারকমে জানাল, 'ম্যান ওভারবোর্ড! আবারও বলছি, ম্যান ওভারবোর্ড! এটা কোনও ড্রিল নয়। বোট গ্যারাজে চলে যাও রেসকিউ টিম। বোট নামানোর জন্য তৈরি থাকো।'

'লোকটার নোংরা কৌশল,' মন্তব্য করল অনিল।

'ওই খেলা আমরাও জানি। অনিল, তুই পার্ল অভ মুনের ব্রিজে গান ক্যামেরা তাক কর। মেইন স্ক্রিনে ছবি দেখতে চাই।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে ইমেজ ফুটে উঠল। মার্ভেলের থেকে ক্রুজ শিপ অনেক উঁচু, ফলে মাস্তুলের ক্যামেরা ব্যবহার করতে হচ্ছে। লো-লাইট মোড দিতেই ব্রিজের ভিতর অংশ পরিষ্কার দেখা গেল। পোর্টসাইডের প্রতিটি জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে জিম্মি মেয়েগুলোকে। সতর্ক ব্রাঙ্কো নিশ্চিত, কোনও শার্প-শুটার তাকে লক্ষ্য-ভেদ করবে না। একটা আকৃতি হেলমের সামনে কুঁজো। সম্ভবত জ্যারোন ব্রাঙ্কো। এক মেয়েকে এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে।

'কোনও ডামি না,' বলল অনিল। 'নিজের সামনে জিম্মি করে রেখেছে মেয়েটাকে, এই অবস্থায় গুলি করার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়।'

'রানা, আমি ফু-চুং। গ্যারাজের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ওরা লঞ্চ করতে পারে। আমি এদিকে তৈরি।'

'বিশ মিনিট পর চলে আয় ডেকে,' বলল রানা।

মার্ভেলের স্পিড দেখে নিল গগল। জানিয়ে দিল, 'একটু অপেক্ষা করতে হবে।' নিরাপদ গতিতে নেমে আসতে মার্ভেলের লাগল দশ সেকেণ্ড। এবার জানাল গগল, 'এবার যাও তোমরা।'

টেফলন-কোটেড র‍্যাম্প দিয়ে দ্রুত সাগরে নেমে গেল রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট। দেরি না করে পোর্টের দিকে সরতে শুরু করল। বিক্ষুব্ধ পানির ভিতর দিয়ে ছুটে চলল বোট। আধ মিনিট পর দলের নেতা বলল, 'আমরা সরে গেছি।'

ওদের সঙ্গে রয়েছে থার্মাল ডিটেকশন গিয়ার, সহজেই খুঁজে

নিতে পারবে অফিসারকে। আবার গতি তুলল মার্ভেল।

'গগল, আগের গতির নাইন্টি পার্সেন্ট আনো,' বলল রানা। 'লোকটা যদি বাঁক নিতে শুরু করে, বা গতি কমায়, এগিয়ে যেয়ো না।' রানার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফেলল সোহেল। 'আগে একটা বোর্ডিং পার্টি দরকার। চাই না লোকটা ভাবুক কাউকে ফেললে কাজ হবে।'

'তুই চলাল কোথায়?' জানতে চাইল সোহেল।

'ওই জাহাজে উঠতে। তুই এখানে থাক।'

প্রায় ছুটতে শুরু করে অপারেশন্স সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা, তিন মিনিট পর পৌঁছে গেল নিজের কেবিনে। দ্রুত হাতে পরে নিল উপযুক্ত পোশাক। তখনই ইন্টারকমে যোগাযোগ করল আতাসি। সেই অফিসারকে পেয়েছে নাবিকরা। লোকটার বুকে দু'বার গুলি করা হয়েছে। রানার কণ্ঠে কোনও আবেগ রইল না, তবে জানিয়ে দিল রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট সাগরে থাকুক। জীবিত কাউকে ফেলতে পারে ব্রাঙ্কো।

রানার মাথার ভিতর গনগন করে জ্বলছে রাগের আগুন। ওরা লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেছে, তবে সেকারণে কোনও আফসোস নেই। নতুন করে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করল রানা, ওই লোক পালাতে পারবে না, দরকার পড়লে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করবে ও। নিজের উপর রাগ, উচিত হয়নি ওভাবে ষাঁড়ের মত তেড়ে যাওয়া। নিশ্চয়ই অন্য কোনও উপায় ছিল জ্যারোন ব্রাঙ্কোকে ধরবার। কিন্তু সে পথটা কী? ভাল কোনও পরিকল্পনা থাকা উচিত ছিল ওর।

ইন্টারকম বেজে উঠল। 'ফারা বলছি, রানা। সোহেলের সঙ্গে কথা হলো।'

'বলো।'

'আপাতত ওসব নিয়ে ভাবা উচিত নয়,' সরাসরি জানিয়ে দিল ফারা।

'কী বলছ?'

'এই মাত্র শুনলাম কী ঘটেছে। বেশ বুঝতে পারছি নিজেকে দোষ দিয়ে চলেছ। ভুল পথে ভাবছ। ইয়োস দ্বীপে যা ঘটেছে তাতে মাথা গরম হয়ে গেছে জ্যারোন ব্রাঙ্কোর। নিজেকে ভাবছে আটকা পড়া ইঁদুর। ভয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আর সেই ভয় থেকে খুন করেছে অফিসারকে। ওই মানুষটা খুন হওয়ার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি ভুল করোনি, কাজেই নিজেকে দোষ দিয়ো না। ...কী বলেছি বুঝতে পেরেছ?'

'তোমাকে কে বলেছে আমি এসব ভাবছি?'

'সোহেল আর আমি তোমাকে চিনি। তাই ফোন করেছি। এবার রওনা হয়ে যাও। খুন করো ওই পিশাচটাকে। দেখবে ভাল লাগছে মন।'

'ডাক্তারের নির্দেশ?'

'ঠিক তা-ই।'

পনেরো মিনিট পর ডেকে জড় হলো কমাণ্ডোদের একটা দল। তাদের দুটো গ্রুপে ভাগ করল রানা। ফু-চুং থাকল এক অংশের দায়িত্বে। দ্বিতীয় গ্রুপ রানার সঙ্গে থাকবে। ক্রুজ শিপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিজে লোক রাখবে ব্রাঙ্কো। আরেক দল থাকবে ইঞ্জিনরুমে। নইলে বহু আগেই ক্রুরা বন্ধ করে দিত ইঞ্জিনগুলো। ফু-চুঙের দলের দায়িত্ব ওখানে। রানা নিজে ব্রিজে মুখোমুখি হবে ব্রাঙ্কোর।

ওদের প্রত্যেকের পরনে কালো আউটফিট, নীচে কেলভার বডি আর্মার। তবে এমন ভাবে তৈরি, অনায়াসে নড়াচড়া করতে পারবে। পায়ে নরম রাবারের সোলওয়ালা বুট। সবার সঙ্গে

একটা করে গ্যাস মাস্ক। নিয়েছে টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড। পার্ল অভ মুনের ভিতর অংশে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে, কাজেই প্রতি দলে মাত্র একজন করে নিল নাইট ভিশন গিয়ার।

ওই জাহাজে যাত্রী রয়েছে, কাজেই রানা জানিয়ে দিয়েছে অ্যামিউনিশন নেবে যার ভিতর মাত্র অর্ধেক লোড আছে। কোনও বুলেট যেন প্রথমজনের দেহ ভেদ করে দ্বিতীয় কাউকে আঘাত না হানে। এফএনএস বা গ্লক পিস্তলের বদলে রানা নিয়েছে ওয়ালথার। তবে বুলেটগুলোর ভিতর বারুদ কম।

শটগানের মত একটা যন্ত্র দিয়ে ছুঁড়ে দেয়া হবে গ্র্যাপলিং হুক। পিছনে ছুটবে সরু, হালকা তবে অত্যন্ত শক্ত লাইন। ফলে বেয়ে ওঠা কঠিন হবে। কাজেই ওরা পরে নিয়েছে বিশেষ গ্লাভস, সঙ্গে মোনোফিলামেণ্ট আঁকড়ে ধরার মেকানিকাল পিন্সার।

'শুনছ, গগল?' থ্রোট মাইকে বলল রানা।

'হ্যাঁ।'

'গতি তোলো। তবে আগেই বোটের সবাইকে জানিয়ে দাও।'

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর অস্বাভাবিক বাড়তে লাগল মার্ভেলের গতি। প্রচণ্ড হাওয়ায় সরু হয়ে গেল রানার চোখ। পার্ল অভ মুন চার মাইল সামনে। কুচকুচে কালো সাগরে জাহাজের সাদা অংশ হীরার মত জ্বলজ্বল করছে। ফসফরেসেন্সের কারণে স্বর্গীয় লাগছে ওটার পিছনে ফেলে যাওয়া দীর্ঘ স্রোত।

ক্রুজ শিপের চেয়ে কমপক্ষে আড়াই গুণ গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল। দেখতে না দেখতে চলে গেল প্রমোদ-তরীর কাছে।

'এতক্ষণে উন্মাদ হয়ে গেছে ব্রাঙ্কো,' বলল ফু-চুং। 'আমরা প্রচলিত কানা পয়সার মত, হাতে চট্ করে উঠে আসি। লোকটা

যেদিকে চোখ ফেলছে, দেখছে সেই আমাদের।'

'আরেকজনকে ফেলল,' রেডিওতে বলল আতাসি। 'এবার একটা মেয়ে। জীবিত।'

'বোটের ক্রুদের জানিয়ে দাও। অনিল, গ্যাটলিং গান দিয়ে বুলেট পাঠিয়ে দে উইং ব্রিজের পাশ দিয়ে। লোকটা বুঝবে আবারও ওখানে প্লা ফেললে কয়েক টুকরো হতে হবে।'

স্টারবোর্ড থেকে গুটিয়ে গেল আর্মার্ড প্লেট, নাক বের করল গ্যাটলিং গান। ছয় ব্যারেল নিয়ে ঘুরতে লাগল মোটর। পরক্ষণে জোর যান্ত্রিক গুঞ্জন শুরু হলো। মনে হলো কী যেন ছিঁড়ে পড়ছে। মার্ভেলের পাশ থেকে ছিটকে বেরুল বিশ ফুটি লেলিহান আগুন। আকাশ চিরে ছুটল দুই শ' ইউরেনিয়াম বুলেট। ফ্লাইং ব্রিজের এত কাছ দিয়ে গেল, কয়েকটা বুলেট রেলিঙের গা থেকে রং তুলে নিয়ে গেল। বুলেটগুলো জাহাজের সামনের সাগরে ফোয়ারা তৈরি করে নাক গুঁজল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরতে লাগল পার্ল অভ মুন।

'ব্যাটা কাঁপছে ভয়ে,' মন্তব্য করল ফু-চুং।

প্রমোদতরী থেকে এক শ' ফুট দূরত্ব রেখে চলেছে গগল। বার কয়েক চেপে এসে হামলা করতে চাইল ব্রাঙ্কো। প্রতিবার বো থ্রাস্টার দিয়ে সরে গেল মার্ভেল।

'গগল, সময় হয়েছে,' জানিয়ে দিল রানা। 'অনিল, গুলি ছুঁড়তে তৈরি থাক্। তবে জাহাজে লাগাতে হবে না।' কমাণ্ডোদের নিয়ে মার্ভেলের রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়েছে রানা ও ফু-চুং। সবাই কাঁধে তুলে নিয়েছে গ্র্যাপলিং-হুক গান। 'সবাই মেইন ডেক লক্ষ্য করে ছুঁড়বে। ...গগল, আমরা তৈরি!'

পার্ল অভ মুনের পাশে যেন চেপে আসতে শুরু করেছে মার্ভেল। পঁচিশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই মাঝে রইল মাত্র

পঞ্চাশ ফুট সাগর।

'ফায়ার!' বলে উঠল রানা।

আবারও যান্ত্রিক আওয়াজ তুলল গ্যাটলিং গান, একইসঙ্গে গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ল কমাণ্ডোরা।

মাঝের সাগর পেরুল বারোটা হুক। আবার যখন ওরা লাইন টেনে আনতে চাইল, টের পেল রেলিঙের ওপাশে আটকে গেছে হুকগুলো। ক্রুজ শিপের কাছাকাছি হলো মার্ভেল, দেখতে না দেখতে মাঝে রইল মাত্র দশ ফুট। এবার ওই জাহাজে উঠতে গিয়ে আহত হওয়ার ঝুঁকি কম। পার্ল অভ মুনের ব্রিজের সামনে দিয়ে ছুটতে লাগল গ্যাটলিং গানের ইউরেনিয়াম বুলেট।

'এবার চলো!' শক্ত হাতে লাইন ধরল রানা, লাফিয়ে উঠল রেলিঙে, মুহূর্তে পেরুল মাঝখানের দূরত্ব। পরক্ষণে দুই জাহাজের মাঝে দেখা দিল সরু সাগর। দ্রুত সরে যেতে শুরু করেছে মার্ভেল। সঠিক দূরত্ব ও ঠিক জায়গা বেছে নিয়েছে রানা, একটু উপরে একসারি বড়সড় জানালা—কাঁচে ঠাস করে লাগল ওর সবুট দুই পা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। ওপাশে দেখা গেল জনশূন্য ডাইনিং রুম। লাইন বেয়ে উঠবার ঝামেলায় গেল না রানা, ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ওর দলকে আগেই বলা আছে, ওরা কেউ যদি আলাদা হয়ে যায়, অপেক্ষা করতে হবে ব্রিজের কাছে।

কাঁধের স্লিং থেকে এমপি-ফাইভ খুলে নিল রানা, সাবধানে এগুতে শুরু করল। কাঁধে রেখেছে অস্ত্রের বাঁট, মুহূর্তে দেখবে সাইট পিকচার। টেবিলগুলো এড়িয়ে দরজার দিকে চলল।

এইট্রিয়ামের নীচতলায় নেমে এল। জটলা করছে যাত্রীরা। এখনও বুঝে ওঠেনি কেন দুই জাহাজে সংঘর্ষ হলো। এক লোক '

শুয়ে সিঁড়ির নীচের ধাপে, আহত। দুই মহিলা তার শুশ্রূষা করছে। এক বয়স্কা মহিলা তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়লেন রানাকে দেখে।

সাব-মেশিনগানের নল উপরের দিকে তাক করল রানা, বোঝাতে চাইল কারও ক্ষতি হবে না। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এই জাহাজ হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমি ইউনাইটেড নেশনস-এর হোস্টেজ-রেসকিউ টিমের লোক। দেরি না করে যে যার কেবিনে ফিরে যান। যাওয়ার পথে অন্যদের বলবেন কেবিনে ফিরতে। শীঘ্রি এই জাহাজ মুক্ত করব আমরা।'

কর্তৃত্ব-পরায়ণ এক বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। 'আমি জর্জ হ্যারিসন, এ জাহাজের সেকেণ্ড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। আমি কিছু করতে পারি?'

'বলুন দ্রুত কীভাবে যাওয়া যায় ব্রিজে। যাত্রীদের বলুন নিজেদের কেবিনে ফিরুক।'

'পরিস্থিতি কতটা খারাপ?'

'কখনও ভাল হাইজ্যাকিঙের কথা শুনেছেন?'

'না। বোকার মত বলেছি। দুঃখিত।' ভদ্রলোক বাড়তি কথা বাদ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে ব্রিজে যেতে হবে। তবে অফ লিমিট এলাকার জন্য লাগবে ম্যাগনেটিক পাস। ওটা রানাকে দিলেন তিনি।

রওনা হয়ে গেল রানা। পাঁচ মিনিট পর পৌঁছে গেল একটা *নো অ্যাডমিটান্স* লেখা দরজার সামনে। পাশের রিডারে ম্যাগনেটিক পাস দিতেই খুলে গেল দরজা। প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকে টবে লাগানো একটা বড়সড় ফার্ন গাছের পাশে আড়াল নিল রানা, যোগাযোগ করল দলের সঙ্গে। জানা গেল, তারা কাছেই

আছে, সাত মিনিটে পৌঁছে যাবে এখানে।

ওরা ব্রিজে আসুক, ভেবে রওনা হয়ে গেল রানা। একটা করিডোর ধরে এগুলো। দু'পাশে একের পর এক কেবিন। করিডোর শেষে পেল সিঁড়ি, তিন মিনিটে উঠে এল ব্রিজে যাওয়ার হলওয়েতে। লেযার সাইট চালু করল, ধীর পায়ে এগুলো ব্রিজের দরজার দিকে। তবে থমকে যেতে হলো। খানিক সামনে এক কেবিন থেকে আসছে চাপা কণ্ঠ।

'ক্যাপ্টেন?' নিচু স্বরে ডাকল রানা।

কণ্ঠগুলো থেমে গেল। দরজা দিয়ে উঁকি দিল একজন। বিকট হাঁ করল মেয়েটি রানার চোখের লেজার পিস আর সাব-মেশিন গান দেখে।

'কোনও ভয় নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি ওদের ঠেকাতে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন আছেন?'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি, পরনে ইউনিফর্ম। স্ট্রিপ দেখে বোঝা গেল সে পার্ল অভ মুনের ফার্স্ট অফিসার। ববকাট চুল, বাদামি চোখে ভয়। বয়স হবে ত্রিশ। 'না নেই, ওই কসাইগুলো ক্যাপ্টেন আর থার্ড পার্সারকে খুন করেছে। আমি ফার্স্ট অফিসার, লোলা প্যাপেস।'

কেবিনের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখানে চলুন, কথা আছে।'

মেয়েটির পিছু নিয়ে কেবিনে ঢুকল। চোখ পড়ল কটের পাশে। বড়সড় দুটো বস্তার মত। রক্তাক্ত চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে দুটো লাশ। কেবিনের আরেক পাশে দাঁড়িয়েছে তিনজন অফিসার।

পরিচয় করিয়ে দিতে চাইল লোলা, তবে বাধা দিল রানা। 'পরে আলাপ হবে। এখন বলুন ব্রিজে কী ঘটেছে।'

'ওখানে ঢুকেছে তাদের দু'জন,' বলল লোলা। 'একজনের নাম জ্যারোন ব্রাঙ্কো। অন্যজনের নাম জানি না। এদের সঙ্গের আরেক লোক গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ইঞ্জিনরুম।'

'আপনি শিয়োর যে ইঞ্জিন-রুমের ভিতর শুধু একজন?' মেয়েটি মাথা দোলাতে রেডিও করে তথ্যটা ফু-চুংকে জানিয়ে দিল রানা। 'কাজে নেমে পড়ু।'

'আমরা ইস্তাম্বুল ছাড়ার পর কপ্টারে করে এসেছে। হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুম এসেছে, জ্যারোন ব্রাঙ্কোর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। আমাদের বলেছে দু'জন ক্রিমিনাল উঠেছে এ জাহাজে। তারা এক যাত্রীকে খুন করেছে।'

'ওই দু'জন আমাদেরই টিমের,' বলল রানা। 'কাউকে খুন করেনি। বলতে পারেন ওরা এখন কোথায়?'

এ পরিস্থিতিতে কোনও প্রশ্ন তুলল না ফার্স্ট অফিসার। 'তাদের ধরে ফেলে এরা। ক্যাপ্টেনের ডে অফিসে আটকে রাখে। জায়গাটা ব্রিজের পিছনে।'

'ঠিক আছে। জরুরি আর কিছু?'

'যখন ব্রিজ দখল করে নিল এরা, ব্রিজে ছিল দু'জন সি-মেন আর দু'জন অফিসার। বোধহয় মেরে ফেলেছে ওদের। মহিলা যাত্রীদের আটকে রেখেছে। আপনি কে? কোথা থেকে এলেন?'

'এটা ইউনাইটেড নেশনসের মিশন। আমরা এই টেরোরিস্ট সেলের পিছু নিয়েছি বেশ কিছুদিন হলো। ধরা পড়ত, কিন্তু এ জাহাজে উঠে পড়ে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। কাজেই দ্রুত কাজে নামতে হয়েছে। আপনাদের আগে জানানো সম্ভব ছিল না। যা ঘটেছে সেজন্য আমরা দুঃখিত। ঠিক করা হয় আগেই ব্রাঙ্কোকে বন্দি করা হবে, কিন্তু ইউএনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা সম্ভব হয়নি।'

হঠাৎ হাজির হলো রানার দলের কমাণ্ডোরা, লেযার সাইট দিয়ে দেখে নিল কেবিনের ভিতর।

'ঠিক আছে, আমি এখানে,' ভিতর থেকে বলল রানা। সাব-মেশিনগান নিচু করল কমাণ্ডোরা।

লোলা প্যাপেসকে ব্রিজের ডায়াগ্রাম এঁকে দিতে অনুরোধ করল রানা। সেই অবসরে সব খুলে বলল নিজের দলকে। কথা শেষে রেডিওতে বলল, 'সোহেল, পরিস্থিতি জানা।'

'মেয়েটাকে পানি থেকে তোলা হয়েছে। হিস্টেরিকাল হয়ে গেছে। ব্রাঙ্কো এখনও হেলম-এ। তিন জিম্মিকে দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখেছে। তার আরেক লোককে দেখেছি। তবে আপাতত তাকে দেখা যাচ্ছে না। অন্য তিন মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে জানালাগুলোর সামনে।'

'এ জাহাজের সামনে চলে যেতে বল গগলকে। ব্রিজের সবকিছু পরিষ্কার দেখতে হবে। স্বর্ণা আর কাশেম বন্দি হয়েছে ব্রিজের পিছনের এক অফিসে। ওদের দেখতে পাস কি না দ্যাখ্।'

'বেশ।'

যোগাযোগ করল ফু-চুং। ওরা পজিশনে পৌঁছে গেছে। এবার উড়িয়ে দেবে ইঞ্জিন-রুমের দরজা। তবে অপেক্ষা করতে বলল রানা, ওরা দুই দল একইসঙ্গে আক্রমণ হানবে।

আবার রেডিও করল সোহেল। 'ব্রিজের পিছনে একটা দরজা দেখেছি। আপাতত বন্ধ। মেইন ব্রিজ উইঙ্গের সামনে তিন মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ব্রাঙ্কো। তার চ্যালা গেছে স্টারবোর্ডের ছোট এক করিডোরে। বোধহয় মেইন এন্ট্রান্স।'

ফার্স্ট অফিসারের আঁকা শেষ, বাড়িয়ে দিল কাগজটা। ওটা নিয়ে ব্রিজে কে কোথায় রয়েছে চিহ্ন দিয়ে নিল রানা। ওর

দলকে বুঝিয়ে দিল পরিস্থিতি কেমন হতে পারে।

নাইন/ইলেভেনের পর বহু বিমানের ককপিটে ও ক্রুজ শিপের ব্রিজের দরজা রিএনফোসর্ড করা হয়েছে। নিজ হাতে পার্ল অভ মুনের ব্রিজের দরজায় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বসাল রানা। কাজ শেষে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর। রেডিওতে ফু-চুং ও সোহেলকে জানিয়ে দিল, আর তিরিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে দরজা।

নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড বাকি থাকতে ডান হাত উপরে তুলে একটা একটা করে আঙুল বন্ধ করতে লাগল। শেষ আঙুল বন্ধ হয়ে যেতেই চাপ দিল রিমোটের সুইচে।

বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হলো। সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলি ঢেকে দিল হলওয়ে। শকওয়েভ সরে যেতেই এক সেকেণ্ডের ভিতর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, পাক খাওয়া ধোঁয়ার ভিতর পথ দেখাল রক্তিম লেযার রশ্মি।

রানা ব্রিজে ঢুকবার পরক্ষণে দরজা পেরিয়ে ঢুকল দলের সবাই। একবারও কেউ চাইল না মেঝের উপর পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন বিয়ারম্যানের অবশিষ্ট।

'সবাই শুয়ে পড়ো! জলদি!' ধমকে উঠল রানা। ওর দলের সবাই অস্ত্রের নল তাক করতে শুরু করেছে হেলমসের দিকে।

তবে রানা ভাবতেও পারেনি এত দ্রুত নড়ে উঠবে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। লেজার সাইট দিয়ে তাকে তাক করতে গিয়ে থমকে যেতে হলো। পাশের মেয়েটাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়েছে লোকটা, পিস্তল ঠেসে ধরেছে কানের ভিতর।

'এক পা এগোলে খুন হবে এই মেয়েলোক!' গর্জে উঠল জ্যারোন ব্রাঙ্কো।

থমকে গেল রানা। মেয়েটাকে ভাল করেই চেনে। ব্রাঙ্কো যেভাবেই হোক জেনে গেছে স্বর্ণা ওর দলের সদস্য। পিছনের অফিস থেকে ধরে এনেছে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য।

'গুলি করুন, মাসুদ ভাই,' নির্দ্বিধায় বলল স্বর্ণা। 'আমি মরলে বাঁচবে না এই নরকের কীটও।'

'আগে মরবে এই মেয়ে,' রানার উদ্দেশে বলল ব্রাঙ্কো। আরও জোরে ঠেসে ধরল পিস্তলের নল। প্রচণ্ড ব্যথায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্বর্ণা। 'অস্ত্র ফেলো, নইলে এই মেয়ে শেষ!'

'মরতে হবে তোমাকেও,' বলল রানা।

'ওসব বোঝা আমার শেষ, আমি এখন মরা লাশ, নতুন করে আর কী মরব? তবে এই মেয়েকে বাঁচাতে চাইলে যা বলছি তা-ই করো। ... হাতে আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পাবে তুমি।'

'শুট করুন, মাসুদ ভাই!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল স্বর্ণা।

'সম্ভব নয়, স্বর্ণা,' নরম স্বরে বলল রানা। হাত থেকে ফেলে দিল মেশিন পিস্তল। খচ্ করে বুকে লাগল। অসহায় চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা। কখনও ভাবতে পারেনি মাসুদ ভাই হেরে যেতে পারে। 'তোমরা সবাই মেঝের উপর অস্ত্র নামিয়ে রাখো।'

একে একে মেঝের উপর পড়ল সাব-মেশিনগানগুলো।

স্বর্ণার কান থেকে পিস্তল সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, সরাসরি রানার মাথা লক্ষ্য করে তাক করল। 'বহু জ্বালিয়েছ। চালাক লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু আর কোনও চালাকি খাটাবার সুযোগ পাবে না। তোমার জাহাজ বা লোক যদি আমার পিছু না ছাড়ে, আমি তো মরবই, গোলাগুলি শেষ হলে তোমাকেও নিজের জাহাজে ফিরতে হবে লাশ হয়ে। ওদের বারণ করো, নইলে এখন তোমার সামনেই যাত্রীদের হাত বেঁধে একে একে ছুঁড়ে ফেলব সাগরে।'

স্বর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে রানার উপর ফেলল ব্রাঙ্কো। দুজন একই সঙ্গে পড়ে গেল মেঝেতে।

পার্ল অভ মুনের এক হাজার গজ সামনে এগিয়ে চলেছে মার্ভেল। স্টার্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে জলিল খান। .৫০ ক্যালিবারের বেরেটা স্নাইপার রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে দেখছে সবই।

'বিদায়, ইবলিশ!' বিড়বিড় করে বলল জলিল।

মাসুদ ভাইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো, জানেও না কখন জানালার সামনে দাঁড়ানো মেয়েগুলো শুয়ে পড়েছে মেঝের উপর, জানালা দিয়ে পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছে জলিল।

টুংক্ করে একটা আওয়াজ পেল রানা ও তার দলের সবাই। সেফটি গ্লাস ভেদ করে ঢুকেছে বুলেট। থ্যাপ্ করে আওয়াজ হলো। জ্যারোন ব্রাঙ্কোর দুই কাঁধের মাঝখানে ঢুকেছে বুলেট। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে দুই কদম এগোল সে, ঘুরে গেল জানালার দিকে, তারপর দড়াম করে চিত হয়ে পড়ল কার্পেটের উপর। ছোট্ট একটা ফুটো করে পিঠ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে মুঠোসমান গর্ত তৈরি করে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। দু'বার ঝাঁকি খেয়েই স্থির হয়ে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল রানা। স্বর্ণাকেও সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

'দেখলে বড়দের কথা না শুনলে কী হয়?'

উত্তরে মাথা নিচু করে লাজুক হাসল স্বর্ণা। 'মাসুদ ভাই, দরজা উড়ে যেতেই বুঝেছি আপনি এসে গেছেন। আর যখন দেখলাম সঙ্গে জলিল খান নেই, তখন সন্দেহ হয়েছিল, পিশাচটাকে শেষ করার জন্য অন্য কোনও প্ল্যান আছে

আপনার।'

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল সোহেল।

'ধন্যবাদ জলিলকে, কোটি টাকার লক্ষ্যভেদের জন্য। ওকে জানিয়ে দে ওর টার্গেট খতম। ব্রাঙ্কো শেষ। স্বর্ণা আর কাশেম সুস্থ।' ইয়ারবাড খুলে ফেলল রানা, রেডিওতে স্পিকার মোড দিল। সবাই শুনবে এখন। 'মার্ভেলের সঙ্গে কথা বলতে পারো, স্বর্ণা।'

'সবাই ভাল তো?' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল স্বর্ণা।

'তোমরা সঙ্গে না থাকলে আমরা ভাল থাকি কী করে?' খুশি মনে বলল সোহেল। 'তবে বকা পাওনা আছে তোমার লিউ ফু-চুং ভাইয়ের কাছে।'

পিছনের অফিস থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে কাশেমকে। ব্রাঙ্কোর পকেট থেকে চাবি নিয়ে খুলে দেয়া হলো দুই হাত। সদা গম্ভীর কাশেম বক্স এখন আকর্ণ হাসছে।

একুশ

ইয়োস দ্বীপ বিপর্যয়ের পর দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, তবে এই ক'দিনেই শরীর ভেঙে পড়েছে লিঙ্ক চ্যাপেলের। বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কসমেটিক সার্জারি করেছে সে, বে-আইনী ভাবে নিজের দেহে প্রতিস্থাপন করেছে অন্যের অঙ্গ; কিন্তু এখন হঠাৎ করেই নড়তে চাইছে না শরীরটা। আসলে

ভেঙে গেছে মন। এত আয়োজনের শেষে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও আজ সে ব্যর্থ। আশ্চর্য, নিজেদের মঙ্গল চায় না পৃথিবীর মানুষ!

এ বয়সে এই চরম ব্যর্থতা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে। জীবনটা বৃথাই গেল।

তার মেয়েদের নিয়ে যখন তুরস্কের দিকে রওনা হলো, তারপর থেকেই সব বদলে গেল। চার্টার্ড প্লেনের পাইলটকে জানিয়ে দিল বার্থা, তারা তুরস্কে যাবে না, বদলে তাদের নামিয়ে দিতে হবে জুরিখে। জুরিখে পৌঁছেই কয়েকটা ব্যাঙ্ক থেকে রেসপন্সিভিস্টদের অ্যাকাউন্ট খালি করে বিপুল টাকা তুলে নিয়েছে বার্থা। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ডামি কোম্পানি তৈরি করে সেই টাকা ঢেলেছে স্টক মার্কেটে। বার্থার বুঝতে দেরি হয়নি ইয়োস দ্বীপ ও ডিয়েটস শেষ, তাদের সংগঠনের বড় বড় নেতাদের গ্রেফতার করবে এবার এফবিআই। তার নিজের বাঁচার একমাত্র উপায় পরিচয় পরিবর্তন করে বোনকে নিয়ে লুকিয়ে পড়া।

ওদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল চ্যাপেল, কিন্তু দুই মেয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আগে আমেরিকায় গিয়ে ছেঁড়া সুতোগুলো গিঁঠ দিয়ে এসো। লিয়োনার্দো চার্চ নামে তুমি রেসপন্সিভিস্টদের বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য দিয়েছ, কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।

সুতরাং লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরেছে চ্যাপেল। একের পর এক সেফ ডিপোজিট বাক্স খালি করেছে। ওগুলোর কথা জানত না এফবিআই। এ মুহূর্তে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছে সে। বেভারলি হিলসের বিশাল বাড়িটা পেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। বাড়ির সামনের ফেন্সের সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে এফবিআইয়ের ক্রাইম-সিন টেপ। ল্যাণ্ড ক্রুজার নিয়ে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ।

তাদের স্বপ্ন দেখা ও দুনিয়ার মঙ্গল করার সমস্ত পরিকল্পনা আসলেই শেষ।

গ্রিক কর্তৃপক্ষ কোরিন্থের রেসপন্সিভিস্ট কম্পাউণ্ড বন্ধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের লাথির মুখে বন্ধ হয়ে গেছে সমস্ত রেসপন্সিভিস্ট ক্লিনিক। কোনও টিভি চ্যানেল যদিও প্রকাশ করেনি দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষকে বন্ধ্যা করতে চেয়েছিল তারা, তবে ফলাও করে প্রচার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলো। পার্লা মোনার মত নামকরা সদস্যরা চ্যাপেলের বিশ্বাসকে পিঠ দেখিয়ে দিয়েছে। টিভিতে কেউ কেউ বলেছে, তাদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মন্ত্রমুগ্ধ করে তাদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার খসিয়ে নেয়া হয়েছে।

মাত্র চোদ্দ দিনে শেষ হয়ে গেছে লিঙ্ক চ্যাপেলের সারা জীবনের সমস্ত অর্জন। সাইকিয়াট্রির প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছে সে, খুশি খুশি ভাব করে সবাইকে জানিয়েছে, তার কাজ শেষ, এবার পুরোপুরি বিশ্রাম নেবে। এসব বলতে গিয়ে অন্তর জ্বলেপুড়ে গেছে তার। ব্রোকারকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রথম সুযোগেই বিক্রি করে দিতে চায় নিজের বাড়িটা।

বিখ্যাত লিঙ্ক চ্যাপেলের বিশাল নাম চিরতরে মুছে দিয়ে শেষে অবসর নিতে হয়েছে অখ্যাত এক লিয়োনার্দো চার্চ হয়ে।

আজ আবার নিজের বাড়ি ফিরছে সে সবকিছু চুকিয়ে দিয়ে ব্রাজিলে চলে যাওয়ার জন্য। আমেরিকার সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্কে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে, তারই সুযোগ নেবে সে। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ওখানে তার টিকিও ছুঁতে পারবে না। ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল চ্যাপেল, পয়সা মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ডান হাতে হিটলারি ছড়ি। এ দেশে ফিরবার পর

থেকে সর্বক্ষণ থাকছে ওটা সঙ্গে। দরজার সামনে থামল সে, হাতের আর্থরাইটিসের কারণে তালা ব্যবহার করতে কষ্ট হয়, তাই ব্যবহার করে সাধারণ পুশ-বাটন প্যাড। সিকিউয়েন্স অনুযায়ী তালা খুলল সে, ঢুকে পড়ল বাড়িতে। কনুই দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। একটা মুভিং কোম্পানি তার প্রিয় জিনিসগুলো বেঁধে রেখেছে। অন্য সব বিক্রি করে দেয়া হবে বাড়ির সঙ্গে।

ফয়ে পেরিয়ে স্টাডির ভিতর ঢুকল চ্যাপেল, ল্যাপটপে দেখে নেবে শেষ খবর। কিন্তু ধপ্ করে পিছনে বন্ধ হলো স্টাডির দরজা। ঘুরে চাইল চ্যাপেল। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে অচেনা এক যুবক।

স্বাভাবিক অবস্থায় এ লোককে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলত চ্যাপেল, কিন্তু এখন কিছু না বলে চুপ করে চেয়ে রইল যুবকের দিকে। বুঝতে চাইছে, এ লোক কে এবং কেন তার বাড়িতে ঢুকেছে।

'আপনিই বোধহয় ডক্টর চার্চ?'

'হ্যাঁ। আপনি কে? কী চান এখানে?'

'কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবীকে সাহায্য করেছেন।'

'আমি কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। অন্য কাউকে দেখান। আর হ্যাঁ, আমি একটু একা থাকতে চাই। কাজেই প্লিজ...'

'কাজ থেকে অবসর নিয়ে আপনার কেমন লাগছে?' জানতে চাইল আগন্তুক। 'রেসপন্সিভিজম তো মারা গেল। আপনি জিতে গেলেন। নিশ্চয়ই মন বলছে প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন?'

জবাব দেয়ার মানসিকতা নেই চ্যাপেলের। মনের ভিতর জেগে উঠল হাজার কষ্ট। বুঝল না কী বলবে বা কী করা উচিত।

'আমি বোধহয় আপনার অনুভূতি বুঝেছি,' বলল যুবক।

'আপনি কাজ থেকে অবসর নিয়ে সন্তুষ্ট নন। মনের ভিতর ভীষণ দ্বিধা। কারণ, আমি এমন একটা কথা জানি; যা শুনলে বিস্মিত হবে বহু মানুষ।'

যেভাবেই হোক, হঠাৎ চ্যাপেলের মন জানিয়ে দিল এ লোক কী বলতে চলেছে। ধপ্ করে কাউচে বসল সে, চেহারা হয়ে গেল ফ্যাকাসে।

'ইয়োস দ্বীপে যদি ব্রাঙ্কোর সামনে বাড়তি বড়াই না করতেন, তবুও আপনার আসল পরিচয় বের করে ফেলতাম আমরা। আপনিই একমাত্র লোক যার পক্ষে রোমে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব ছিল। আমরা ভেবেছিলাম অমল দাশার সঙ্গে রেডিও ট্যাগ আছে, তবে পরে জেনেছি, তা ঠিক নয়। সে জানত না কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্রাঙ্কোকে সতর্ক করবার উপায় ছিল না তার।'

সত্য বেরিয়ে এসেছে। সোফায় সোজা হয়ে বসল চ্যাপেল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমিই ফোন করেছি, রোমে আনিয়েছি ব্রাঙ্কোকে, জানিয়ে দিয়েছি কোন্ হোটেলের কোন্ সুইটে উঠছি। তখন অমল দাশা ঘুমিয়ে ছিল। ...এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন, আপনিই কি হামলা করেছিলেন ইয়োস দ্বীপে?'

মৃদু মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমরা সরিয়ে নিয়েছি পার্ল অভ মুনের ভাইরাসও। অন্য ঊনপঞ্চাশটা ক্রুজ শিপের ভাইরাসও। ওই পঞ্চাশটা কন্টেইনার এখন সযত্নে রাখা আছে এক ল্যাবরেটরিতে।'

'আপনারা কি বুঝতে পারছেন না, ধ্বংস হতে চলেছে পৃথিবী? আমি গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছি।'

মাথা নাড়ল যুবক। বড় নিষ্ঠুর লাগল তাকে দেখতে। 'আপনার মত বহু লোক শত শত বছর ধরে বলে চলেছে: পৃথিবী

ধ্বংস হতে চলল। গুজব ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর সমস্ত খাবার শেষ হবে উনিশ শ' আশিতে। উনিশ শ' নব্বুইয়ে শেষ হওয়ার কথা তেল। দু'হাজার সালে জনসংখ্যা হওয়ার কথা দশ বিলিয়ন। এই প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বইয়ে পড়েছি উনিশ শ' সালে ইউএস পেটেন্ট অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল: ওই পর্যন্ত সময়ে যত যা উদ্ভাবন হয়েছে, তারপর নতুন আর কিছু উদ্ভাবন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে—এই কথা বলে। কী ঘটল আসলে? আপনাকে একটা উপদেশ দিই, মিস্টার অতি-বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে কক্ষনো মন্তব্য করবেন না।'

'আপনি ভুল জানেন। কী ঘটতে চলেছে আমি জানি। অনেক নিচু স্তরের মগজের মানুষও বুঝবে। পঞ্চাশ বছর পেরুনোর আগেই মানব-সভ্যতার ভিতর ছড়িয়ে পড়বে চরম হিংস্রতা। দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ বুঝবে এত মানুষকে খেতে দিতে পারবে না তারা। বাইবেলে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে ভেঙে পড়বে আইন-শৃঙ্খলা।'

'আপনি বাইবেলের কথা বলায় একটা কথা মনে পড়ল,' বলল রানা। তার কুচকুচে কালো চোখদুটো জ্বলছে। 'আমার খারাপ লাগে না বাইবেলিক ওই শাস্তি। একটা চোখের বদলে আরেকটা চোখ।'

'আপনি আমাকে খুন করতে পারেন না। গ্রেফতার করতে পারেন বড়জোর। বিচারের সামনে দাঁড় করাতে পারেন।'

'তা করতে আসিনি আমি।'

এতক্ষণ ধরে একটু একটু করে হিটলারি ছড়ির নল যুবকের বুকের দিকে তুলতে চেষ্টা করছে চ্যাপেল। আর কয়েক ইঞ্চি, তারপর বাম হাতে টিপে দেবে খুদে বাটন। ভারী ক্যালিবারের বুলেট ফুটো করে দেবে ডেঁপো ছোকরার হৃৎপিণ্ড।

'আমার কথা একটু শুনুন,' বলল চ্যাপেল। 'একটু বুঝতে চেষ্টা করুন...'

কিন্তু চ্যাপেলের চোখের কোণে কী যেন নড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আরেক যুবক। তার এক হাত নেই, কিন্তু অন্য হাতে উদ্যত পিস্তল।

'হাতের ওই অস্ত্র আর একটু উঁচু করলেই গুলি করব আমি!' বলল দ্বিতীয় যুবক। 'ফেলে দিন ওটা।' ফেলল না চ্যাপেল, তবে অস্ত্রের মুখটা নামালো নীচে। 'ওটা একটু নড়ে উঠলেই আপনার কপাল ফুটো হয়ে যাবে। যা বলছিলাম... আপনাকে বেশি শাস্তি পেতে হবে না,' বলে চলল যুবক। 'শুধু বাকি জীবন অখণ্ড অবসর নেবেন। উচিত ছিল বহু আগেই কারাগারে পচে মরা।'

'হঠাৎ এ কথা কেন?' শ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করতে চাইল চ্যাপেল।

'যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরতেন, তাতেও কারও কোনও ক্ষতি হতো না; তা-ই না?'

এখন যদি ঝট্ করে উঁচু করি ছড়ি, যদি টিপে দিই বোতাম? প্রথম যুবক হাসছে, পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও তার মাথায় কী চলছে। এখন পিস্তল দেখা যাচ্ছে এর হাতেও। যদি পরোয়া না করে... কিন্তু তাতেই বা কী, হতাশ হয়ে ভাবল চ্যাপেল। নলের ভিতর মাত্র একটা বুলেট। 'জানতে পারি কেন এত আগের কথা উঠছে?'

'আমরা জানি এক নাৎসি ওই ভাইরাস তৈরির কৌশল খুঁজে পেয়ে সেটা তুলে দেয় জাপানি আর্মির হাতে। ওই ঘটনার কোনও রেকর্ড ছিল না। তবে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ লেখা পাওয়া গেছে।'

এবার শুরু করল সোহেল, 'কদিন আগে আমরা জেনেছি

আপনিই সেই লোক যে প্রাচীন ট্যাবলেটের লেখা থেকে ওই ভাইরাসের খোঁজ পান। কীভাবে? সে সময় নরওয়ে দখল করে নিয়েছিল নাজিরা। সেখানে এক হিমশৈলের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে আটকে ছিল প্রাচীন এক জাহাজ। চার ইঞ্জিনওয়ালা এক কণ্ডোর রিকনিসেন্স বিমান গুলি খেয়ে পড়ে গ্লেসিয়ারের উপর। তখন উনিশ শ' তেতাল্লিশ। মারা পড়ে বেশিরভাগ ক্রু, তবে একজন বেঁচে যায়। আর সেই গানারের নাম ছিল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল।'

হাত কাটা যুবকের মুখে নামটা শুনে চমকে উঠল লিঙ্ক চ্যাপেল।

'আমরা ইতিহাস ঘেঁটে বের করেছি, ওই বিমান ধ্বংস হওয়ার পর ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেলকে খুঁজে পেল গেস্টাপোরা। তাকে সুযোগ করে দেয়া হলো মেডিকেল ট্রেইনিঙের। প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নিল সে এক দারুণ জায়গা। ওটার নাম ছিল অস্‌উইচ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তাকে বদলি করা হলো টোকিয়োতে। সেখানে সে যোগ দিল ফিলিপিন্সের ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি-টু-তে। ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল থেকে হলেন লিঙ্ক চ্যাপেল, তারপর লিয়োনার্দো চার্চ, তবে ভিতরে সেই একই পিশাচ রয়ে গেলেন আপনি।'

'ক্যাপেল,' বলল রানা, 'সে-রাতে বিমান বিধ্বস্ত হয়েও বেঁচে গেছেন, তারপর দীর্ঘ জীবনভর নিষ্ঠুর অনেক খেলা দেখিয়েছেন; তবে আর নয়, শেষ হয়ে গেছে আপনার সব খেলা। আর কোনও সুযোগ দেয়া যায় না আপনাকে। এবার উঠে পড়ুন, যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

'ভাবছ, জেলে ভরে দেবে আমাকে?' ভুরু কুঁচকে চাইল ক্যাপেল। রাগে থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ।

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'খুব একটা অসুবিধে হবে না। আপনার দুই মেয়েও হাজির থাকবে সেখানে, দেখাশোনা করতে পারবে। তবে আর কোনদিন কোনও জানালা দিয়ে আপনারা কেউ পৃথিবীর আকাশ দেখবেন না।'

'আমি কোনও কারাগারে বন্দি থাকতে এ দুনিয়ায় আসিনি!' প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। 'তোমরা জানো আমি কে! আমি মানুষ নই, মহামানব! আর এই আমাকে... তোমরা...' তীব্র উত্তেজনা ভর করেছে লোকটার উপর, পরক্ষণে বোঝা গেল মনে কোনও ভয় নেই তার, ঝট্ করে ছড়ি তুলেই আগ্নেয়াস্ত্রের নল ঠেকিয়ে দিল নিজ চিবুকের নীচে। পরক্ষণে বুম্ করে উঠল .৪৫ ক্যালিবারের বুলেট।

লোকটার খুলির বড় এক অংশ ছিটকে গিয়ে লাগল ছাতে। ছোপ-ছোপ রক্ত ও হলদেটে মগজ লেগে রইল সিলিঙে। সোফা থেকে কাত হয়ে মেঝের উপর পড়ল লাশ।

'এ-ই ভাল হলো,' বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল।

'তা-ই বোধহয়। ...চল্, পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়ি।' ভাবছে রানা, এই অদ্ভুত নাটকে এভাবেই তা হলে নেমে এল যবনিকা। এভাবেই বিদায় নিল শরীরী এক প্রেতাত্মা।

নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরুল দুই বন্ধু, হাঁটতে লাগল নিজেদের গাড়ি লক্ষ্য করে।

ফ্রান্স।

প্যারিসের একটু দূরে। মফস্বল এলাকা।

ফরাসি নামজাদা এক সাইকিয়াট্রিস্টের বিশাল বাগান জুড়ে নামছে সন্ধ্যা। কারুকার্যময় এক বেঞ্চে বসেছে উর্বশী। মুখ তুলে চাইল সিঁদুর রাঙা আকাশে। বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

ঘুরে চাইল প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির দিকে। খেয়াল করেনি কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওর ভাই।

'আমি কি একটু তোর পাশে বসব, দিদি?' নিচু স্বরে জানতে চাইল অমল।

'বোস্।' দূরের আকাশে চেয়ে রইল উর্বশী।

পাশে বসে বোনের দিকে চাইল অমল। কথা শুরু করতে চাইছে, তবে পারছে না। ছল-ছল করছে চোখদুটো। টপ করে খসে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রু, নাকের পাশ দিয়ে নামছে। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল সে।

অমলের দিকে ফিরে চাইল উর্বশী। আর শক্ত থাকতে পারল না। একহাতে জড়িয়ে ধরল ছোট ভাইয়ের কাঁধ।

এই আদরটুকু পেয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলল অমল।

'আমি মস্ত ভুল করেছি, দিদি। ওরা... ওরা তোকে কী কষ্টই না দিয়েছে... আর আমি...'

'আমার অত কষ্ট হয়েছে তা কে বলল তোকে। ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু করতে বোনেদের কষ্ট হয় না।'

'আমি সব জানি, দিদি... আমি সব জানি। মাসুদ ভাই বলেছে আমাকে—তোকে... তোকে ওই লোকটা মারতে মারতে...'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল উর্বশী। 'মাসুদ ভাই... মানে, মাসুদ রানা? সে এসেছিল তোকে দেখতে? সত্যিই?'

'প্রায়ই তো আসেন, কত গল্প করেন!' নিজের কথায় চলে গেল অমল, 'দিদি, আমি ভেবেছিলাম কেউ নেই আমার, আমি একা এই দুনিয়ায়। মস্ত ভুল করেছি...'

'সবার জীবনেই ভুল হয়, রে। সবার। কে নেই তোর, বল্?

মা-বোন তো আছেই, অনেক ভাল বন্ধু আছে, যারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তোকে ওই পিশাচদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন...'

অমঁলের গলা কাঁপতে লাগল, 'দিদি... তুই কি... তুই কি আমাকে... মাফ করে দিবি... দিদি?'

'আমি তো ভুলেই গেছি, রে!' ওর কপালে চুমো দিল উর্বশী।

'দুনিয়ার সব বোন এভাবে...' একবার বোনের ফোলা মুখটা দেখে নিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল অম; দাশা। 'বেয়াড়া ভাইয়ের জন্য তারা এত কষ্ট সহ্য...'

ওর চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল উর্বশী, কোমল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ রে, দুনিয়ার কোনও বোন তার ভাইয়ের দোষ খুঁজে পায় না! ভাইয়ের জন্য কিছু করলে কষ্ট হয় না তাদের।'

***